রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর। কবি ও গবেষক হিসেবে পরিচিত হলেও 'আরাকান ও রোহিঙ্গা' তাঁর মৌলিক গবেষণাক্ষেত্র। তিনি ১৯৯৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ডি গ্রুপ অর্থাৎ 'আধুনিক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া' বিষয়ে ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট হয়ে এম. এ করেছেন; অতঃপর ২০০০ সালে 'রোহিঙ্গা সমস্যাঃ বাংলাদেশের দৃষ্টিভংগী' শিরোনামে এম.ফিল এবং ২০০৫ সালে 'আরাকানে ইসলামঃ প্রসার ও প্রভাব' শীর্ষক পিএইচ.ডি ডিগ্রীও অর্জন করেন। গবেষণা অভিসন্দর্ভসহ ইতোমধ্যে তাঁর একুশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর তত্ত্বাবধানে সাতজন গবেষক এম.ফিল এবং একজন পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন ও ছয়জন গবেষণারত আছেন। আরাকান ও রোহিঙ্গা বিষয়ে তাঁর পচিশটির অধিক গবেষণা প্রবন্ধ বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক দুই শতাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক-সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকা এবং অনলাইন ম্যাগাজিনসহ সাহিত্যের ছোট কাগজে ছাপা হয়েছে। সেইসাথে তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছড়াকার, গীতিকার, শিশুসাহিত্যিক, সাহিত্য সমালোচক, সম্পাদক এবং সফল সংগঠক। তিনি ১৯৭২ সালের ২৮ ডিসেম্বর গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নের শ্যামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোজাফফর রহমান আখন্দ এবং মা মর্জিনা বেগমের দ্বিতীয় সন্তান তিনি। নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করে স্থানীয় বোনারপাড়া মাদরাসায় ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া। অতঃপর বগুড়ার সারিয়াকান্দী এবং বগুড়া শহরে অধ্যয়ন করেছেন দীর্ঘসময়। তিনি শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ছোটকাগজ 'মোহনা' এবং 'শব্দকলা'র সম্পাদক।

ড. আখন্দ বাংলা একাডেমী, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, বাংলাদেশ ইতিহাস একাডেমি, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে জড়িত। রাজশাহী পরিচয় সংস্কৃতি সংসদ ও শীলন সাহিত্য পরিষদের সভাপতি তিনি। ইতোপূর্বে তিনি বগুড়ার সমন্বয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ঢাকা সাহিত্য শতদল এর পরিচালক, বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের সহকারী সদস্যসচিব এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লেখক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন।

সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকা শব্দশীলন একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ২০১০, বগুড়া সমন্বয় সাহিত্য সম্মাননা ২০১০, বগুড়া সৃষ্টিশীল লেখকসংঘ সাহিত্য পুরস্কার ২০১১, খুলনা রঙধনু সাহিত্য পুরস্কার ২০১১, বগুড়া সংস্কৃতিকেন্দ্র এ্যাওয়ার্ড ২০১২, দিনাজপুর নজরুল সাহিত্য পদক ২০১২, অপরাজিত ছড়া সম্মাননা বগুড়া ২০১৩, বহুভূজ সাহিত্য সম্মাননা পঞ্চগড় ২০১৩, পাবনা উত্তরণ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৪, পাবনা সিনসা সাহিত্য পুরস্কার ২০১৪, পাবনা মহিয়সী সাহিত্য পুরস্কার ২০১৪, রাজশাহী শহীদ মুক্তিযোদ্ধা কামাল খাঁ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৪, ডিসিএল সাহিত্য পুরস্কার ২০১৪, রূপোস সাহিত্য পুরস্কার ২০১৫, শিরোনাম সাহিত্য পুরস্কার ২০১৬ এবং ঢাকা একাত্তর সাহিত্য পুরস্কার ২০১৭সহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

সন্তান নাশিত, নাবিল, নাজিফা এবং স্ত্রী ডা. নাজমা আখন্দকে নিয়ে তিনি রাজশাহীতে বসবাস করেন।

যোগাযোগ
২২৩, শহীদুল্লাহ কলাভবন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়:
ই-মেইল: mrakhanda@gmail.com
ফেসবুক: www.facebook/Mahfuzur Rahman Akhanda

প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম

রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ

www.pathagar.com

রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

প্রকাশক	□	পরিলেখ ঐশিক, আব্দুল হক সড়ক, রাণীনগর ঘোড়ামারা, রাজশাহী। ০১৭১৬-২৪৫০০২
দ্বিতীয় সংস্করণ	□	বইমেলা ২০১৮
গ্রন্থস্বত্ব	□	ডা. নাজমা আখন্দ
প্রচ্ছদ	□	হামিদুল ইসলাম
প্রচ্ছদের ছবি	□	Adam Dean; The New York Times- এর সৌজন্যে
অক্ষরসজ্জা	□	আনোয়ার হোসেন
মুদ্রণ	□	শাহ্ পীর চিশতি প্রিন্টিং প্রেস কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী
মূল্য	□	চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Rohingya Shomossha O Bangladesh By Dr. Mahfuzur Rahman Akhanda
Published by Porilekh Rajshahi, Cover desgin: Hamidul Islam
Price: 450 Taka only

ISBN: 978-984-93438-4-4

www.pathagar.com

দাদাভাই মরহুম মাওলানা খোদা বখশ আখন্দ

যার হাত ধরেই লেখাপড়া শুরু, যিনি অনেক বড় হবার স্বপ্ন দেখাতেন

দাদী মরহুমা আমিরুন নেসা

যাকে বম্‌মা (বড় আম্মা) বলে ডাকতাম, হৃদয়ের সবগুলো ভালোবাসা উজার করে দিতেন যিনি।

মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসিন করুন। আমিন।

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

গবেষণা

মুসলিম চিত্র ও শিল্পকলার ক্রমোন্নতি, এম. আবদুল্লাহ্ এন্ড সন্স, ঢাকা, ২০১৮
সিরিয়া, মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম শাসনের ইতিহাস, গ্রন্থকুটির, ঢাকা, ২০১৮
মতিউর রহমান মল্লিক: জীবন ও সাহিত্য, পিদিম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলমানদের ইতিহাস, এম. আবদুল্লাহ্ এন্ড সন্স, ঢাকা, ২০১৫
সমকালীন বিশ্বে মুসলিম সংখ্যালঘু, গ্রন্থকুটির, ঢাকা, ২০১৪
History of Islam : Prophet Muhammad (saws) and Khulafae Rashedin, BIIT, Dhaka, 2014.
আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১৩
রোহিঙ্গা সমস্যা : বাংলাদেশের দৃষ্টিভংগী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৫

ছড়া

ফেসবুকীয় স্বপ্নমুকুল, পরিলেখ, রাজশাহী ২০১৮
স্বপ্ন দেখি মানুষ হবার, পরিলেখ, রাজশাহী ২০১৬
জ্বীন পরী আর ভূতোং, অন্যথা, নওগাঁ, ২০১৪
ছড়ামাইট, আত্মপ্রকাশ, ঢাকা ২০১১
স্বপ্নফুলে আগুন, পরিলেখ, রাজশাহী ২০০৯
মামদো ভূতের ছাও, শব্দশিল্প চট্টগ্রাম, ২০০৮
ধনচে ফুলের নাও, পরিলেখ, রাজশাহী ২০০৭
পদ্মাপাড়ের ছড়া, পরিলেখ, রাজশাহী ২০০৪

অনুকবিতা

তোমার চোখে হরিণমায়া, অন্ত্যমিল, বগুড়া, ২০১০

কবিতা

মনটা অবুঝ পাখি, পরিলেখ, রাজশাহী, ২০১৭
জীবন নদীর কাব্য, পরিলেখ, রাজশাহী ২০১৫

শিশুতোষ গল্প

জলজ রাজার দেশে, গ্রন্থকুটির, ঢাকা, ২০১৬
জ্বীনের বাড়ি ভূতের হাড়ি, পরিলেখ, রাজশাহী, ২০১০

গান

হৃদয় বাঁশির সুর, পরিলেখ, রাজশাহী, ২০১২

লিমেরিক

গুমর হলো ফাঁস, পরিলেখ, রাজশাহী, ২০০৭

www.pathagar.com

সারসংক্ষেপ

মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর নাম রোহিঙ্গা। বর্তমানে বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তিন, ফিলিপাইনের মোরো, কাশ্মীর প্রভৃতি সমস্যার চেয়েও রোহিঙ্গা সমস্যা মুসলিম বিশ্ব তথা আন্তর্জাতিক বিশ্বের অন্যতম প্রধান ট্রাজেডি। সমস্যাটি বাংলাদেশের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হবার কারণে এদেশের দৃষ্টিভঙ্গি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এ গবেষণার প্রাথমিক আলোচনায় আরাকান ও রোহিঙ্গাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, রোহিঙ্গাদের ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। অষ্টম শতাব্দী থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে সেখানে তাদের বসতি গড়ে উঠেছে। কৃষি, ব্যবসা, প্রশাসন, সেনাবাহিনী প্রভৃতি অঙ্গন ছাড়াও আরাকান অমাত্যসভায় তাদের ভূমিকা ছিল অনন্য। এমন কি মুসলিম অমাত্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় আরাকানে বাংলা সাহিত্যের প্রভুত বিকাশ সাধিত হয়। সুতরাং তারা ঐতিহ্যগতভাবে সেখানকার নাগরিক।

রোহিঙ্গা সমস্যার সূচনা করে মূলত বৃটিশরা। তারা বার্মাকে স্বাধীনতা দানের পূর্বেই কৌশলে মগ-রোহিঙ্গা বিভেদ সৃষ্টি করে এবং সে সূত্র ধরেই মিয়ানমার শাসকগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে তাদের উপর নির্যাতন চালায়। রোহিঙ্গা সমস্যা সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি, পত্র-পত্রিকায় প্রতিফলন ও সচেতন জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধানে প্রায় অভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের ব্যাপারে সবাই একমত যে, রোহিঙ্গারা জন্মগত সূত্রে ঐতিহ্যগতভাবে আরাকানের নাগরিক। তাদের উপর মিয়ানমার সরকারের নির্যাতন ও নাগরিক অধিকারহরণ অমানবিক এবং মানবাধিকারের চরম লংঘন। বর্তমানে সেখানে নির্বিচারে গণহত্যা চলছে। সে প্রেক্ষাপটে ২০১৬-১৭ সালেও প্রায় আট লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বিভিন্ন সময় মিয়ানমার বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরত নিলেও মূলত তাদের নাগরিক অধিকার প্রদান করেনি। ফলে স্বদেশে ফিরে যাওয়া হাজার হাজার রোহিঙ্গা নাফ নদী পাড়ি দিয়ে পুনরায় বাংলাদেশে আসছে এবং এদেশে স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলছে। এতে দরিদ্র জনবহুল বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটা একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। আন্তর্জাতিক বিশ্বের সহায়তায় অতিসত্বর এর স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন।

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য; যিনি মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন। দূরুদ ও সালাম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি; যিনি জ্ঞানার্জনকে অত্যাবশ্যকীয় বলে ঘোষণা করেছেন। মাগফিরাত কামনা করছি সে সকল মহান ব্যক্তির জন্য; যাঁরা জ্ঞান চর্চা ও গবেষণা করে মানব সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। যে সকল মহৎ প্রাণের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় আমি জীবনের এ পর্যায়ে উপনীত হতে পেরেছি তন্মধ্যে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকীকে প্রথমেই আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। গবেষণার শিরোনাম নির্ধারণ, উপাত্ত সংগ্রহের নির্দেশনা ও সহযোগিতা, অধ্যায় পরিকল্পনা এবং গবেষণাপত্রের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সঠিকভাবে সাজাবার ক্ষেত্রে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমার এ গবেষণাপত্রটির প্রতিটি অধ্যায় তিনি অতি সযত্নে-গুরুত্বের সাথে বার বার দেখে দিয়েছেন। তাঁর অপরিসীম স্নেহ, নিরন্তর উৎসাহ-অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা আমার চলার পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। তাঁকে শুধু কৃতজ্ঞতা জানালে তা হবে অতি সামান্য; বিশাল হৃদয়ের মহান শিক্ষকের নিকট আমি চির ঋণী।

এ গ্রন্থ প্রণয়নে আরো যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি তাঁরা হলেন, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রাবি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা-ইউজিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল বারী, প্রফেসর ইমেরিটাস ড. এবিএম হোসেন, প্রফেসর ইমেরিটাস ড. একেএম ইয়াকুব আলী, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, প্রফেসর মিসেস কামরুন রহমান, প্রফেসর এম.এ. বারী, প্রফেসর ড. সুলতান আহমদ, প্রফেসর ড. এবিএম শাহজাহান, প্রফেসর ড. কাজী মো. মোস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর ড. সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন, প্রফেসর ড. মো. আজিজুল হক, প্রফেসর ড. মো. ফজলুল হক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফায়েকউজ্জামান, প্রফেসর ড. এম. মুনজুরুল হক, প্রফেসর ড. ইমতিয়াজ আহমেদ, প্রফেসর ড. দিলশাদ আরা বুলুসহ আমার বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলী; ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. মু. শমশের আলী এবং প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান। তাঁরা আমার গবেষণাকর্মের উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন এবং কাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর নিয়েছেন। প্রশ্নমালা তৈরির ক্ষেত্রে আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন রাবি নৃবিজ্ঞান বিভাগের তৎকালীন সভাপতি প্রফেসর ড. এএইচএম জেহাদুল করিম, গবেষণাপত্রের চূড়ান্ত খসড়া দেখে দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ এর তৎকালীন পরিচালক প্রফেসর ড. প্রীতিকুমার মিত্র, গবেষণাপত্র প্রণয়নে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আইবিএস'র

www.pathagar.com

প্রফেসর ড. এম. জয়নুল আবেদীন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ড. শেখ তৈয়বুর রহমান নিজামী, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন; আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. এসএম আব্দুছ ছালাম, প্রফেসর ড. এম. নিজাম উদ্দিন প্রমূখ। তাঁদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে আজীবন স্মরণ থাকবে।

জাতীয় অধ্যাপক ড. সৈয়দ আলী আহসান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. আবদুল করিম, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. মঈন উদ্দীন আহমদ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. রতনলাল চক্রবর্তী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রফেসর ড. ইমতিয়াজ আহমেদ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইসচ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. আখতারুজ্জামান এ গ্রন্থ প্রণয়নে মূল্যবান উপদেশ ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেছেন। আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মূল্যবান তথ্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলি সরবরাহ করে আমাকে সহযোগিতা করেছেন- জনাব মীর কাসেম আলী, কবি মতিউর রহমান মল্লিক, ড. আব্দুল ওয়াহিদ, জনাব মাসুদ মজুমদার, জনাব নো'মানুল হক; চট্টগ্রাম থেকে- প্রফেসর এন.এম. হাবিব উল্লাহ, জনাব আশরাফ আলম, জনাব নূর কামাল, জনাব আমানুল্লাহ, জনাব আমিরুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মদ শাহজাহান, বন্ধুবর সাইফুল ইসলাম সাইফ, গোলাম রাসূল খোকন; কক্সবাজারের সাংবাদিক শামসুল হক শারেক প্রমুখ। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ও আতিথিয়তার কথা আজীবন স্মরণযোগ্য। সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কক্সবাজারের উখিয়া, টেকনাফসহ বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের সময় বন্ধুবর সাংবাদিক শওকত বিন আশরাফ আমার সাথে থেকে পর্যাপ্ত সময় ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁর এ সহযোগিতা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অন্যান্য গবেষকদের নিকট থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি তার জন্যও তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে এম.ফিল ফেলোশীপ প্রদান করায় আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁদের এ সহযোগিতার ফলেই গবেষণা কর্মটি যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ২০০৫ সালে এ গবেষণাপত্রটি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এর গবেষণা বিভাগ থেকে *রোহিঙ্গা সমস্যা: বাংলাদেশের দৃষ্টিভংগী* শিরোনামে প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা সূত্রে আবদ্ধ করেছেন। এ জন্য ইফাবা'র সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ ও শুকরিয়া জানাই।

আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা মোজাফফর রহমান আখন্দ ও মা মোছা. মর্জিনা আখন্দ, শশুর আলহাজ্ব আকবর আলী সরকার ও শাশুরী মিসেস রেজিয়া বেগম, বড় ভাই মো. মোস্তাফিজুর রহমান আকন্দ, ভায়রা ভাই জনাব মো. রফিকুল ইসলাম বিশ্বাস, ড. মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান চৌধুরী এবং জনাব মজিবর রহমান, সম্বন্ধী (বড়ভাই) অধ্যাপক ইয়াহইয়া মো. তোহা; যাঁদের অপরিসীম ত্যাগ, অপরিমেয় স্নেহ ও আন্তরিক

www.pathagar.com

সহযোগিতার ফসল আমার এ গবেষণাকর্ম। সর্বোপরি আমার প্রিয়তমা স্ত্রী ডা. নাজমা আখন্দ এ গবেষণাকর্মের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে যে ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন তা কখনোই ভুলবার নয়। সেইসাথে আমাদের তিন সন্তান, ছোট ছয় ভাইবোন, দুই ভগ্নিপতি, ভাতিজা-ভাতিজি, ভাগ্নে-ভাগ্নি সকলের সহযোগিতাকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাই।

গবেষণাকর্মের উপাত্ত সংগ্রহকালে সহায়তা করার জন্য আমি বিশেষভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ গ্রন্থাগার, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর গ্রন্থাগার, ঢাকাস্থ বীজ (BIISS) লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ লাইব্রেরী, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইবস এন্ড লাইব্রেরী, প্রেস ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ লাইব্রেরী, বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ককস্‌বাজারস্থ জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাইকমিশনার অফিস, রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসন কমিশন অফিস, বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি অফিস, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, সিভিল সার্জনের কার্যালয়সহ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গ্রহণ করেছি সে সব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ ছাড়াও দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব ও দৈনিক সংগ্রামসহ ঢাকা থেকে বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাসমূহের সংগ্রহশালা ব্যবহার করেছি। প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট সকলেই আমাকে উপাত্ত সংগ্রহে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং ঋণী। একটিভ কম্পিউটারের সত্ত্বাধিকারী রাবি ডেপুটি রেজিস্ট্রার জনাব মখলেছুর রহমান আন্তরিক সহযোগিতা দিয়ে গবেষণাপত্রটি অতি যত্নসহকারে কম্পোজ করেছেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের এ শ্রমকে কবুল করুন! আমিন!!

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ
জানুয়ারি ২০১৮।

www.pathagar.com

শব্দ সংক্ষেপ

AHS	:	Arakan Historical Society
ARIF	:	Arakan Rohingya Islamic Front
ARNO	:	Arakan Rohingya National Organization
BSPP	:	Burma Socialist Program Party
BSR	:	Bangladesh Secretariat Records
CD	:	Chittagong District
JASB	:	Journal of the Asiatic Society of Bangladesh
JASP	:	Journal of the Asiatic Society of Pakistan
JBRS	:	Journal of the Burma Research Society
MS	:	Myanmar Section
MSKC	:	Mohammad Siddiq Khan Collections
NATO	:	North Atlantic Treaty Organization
NDLHR	:	National Democracy League for Human Rights
NGO	:	Non Government Organization
NLD	:	National League for Democracy
NRC	:	National Registration Card
OIC	:	Organization of Islamic Conference
PC	:	Political Consultations
PP	:	Political Proceedings
RLF	:	Rohingya Liberation Front
RPF	:	Rohingya Patriotic Front
RRRC	:	Refugees Relief and Repatriation Commissioner
RSO	:	Rohingya Solidarity Organization
SC	:	Secret Consultations
SEA	:	South-East Asia
SLORC	:	State Law and Order Restoration Council
UNHCR	:	United Nations High Commissioner for Refugees
WFP	:	World Food Programme

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
উপক্রমণিকা ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
আরাকান ও রোহিঙ্গা : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ২৫
২.১ আরাকানের ভৌগোলিক পরিচিতি ২৫
২.২ আরাকান ও রোহিঙ্গা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৭

তৃতীয় অধ্যায়
রোহিঙ্গা সমস্যা : সূচনা ও বিস্তার ৬৭
৩.১ জাপানী শাসনামলে বার্মা ও রোহিঙ্গা ৬৭
৩.২ বৃটিশ শাসনামলে বার্মা ও রোহিঙ্গা ৬৯
৩.৩ স্বাধীনতা-উত্তর বার্মা : আরাকান ও রোহিঙ্গা ৭১
৩.৪ রোহিঙ্গা নির্যাতন : সম্যক খতিয়ান ৭৯
৩.৫ রোহিঙ্গাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ৮৪

চতুর্থ অধ্যায়
রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ সরকার ৯১
৪.১ রোহিঙ্গা সমস্যা ১৯৭৮ ৯২
৪.২ রোহিঙ্গা সমস্যা ১৯৯২ ও বাংলাদেশ সরকার ৯৬
৪.৩ রোহিঙ্গা সমস্যা ২০১৬-১৭ ও বাংলাদেশ সরকার ১২৫

পঞ্চম অধ্যায়
পত্র-পত্রিকায় রোহিঙ্গা সমস্যার প্রতিফলন ১৪৫
৫.১ মিয়ানমারে নাগরিক নির্যাতন ও রোহিঙ্গা ১৪৫
৫.১ ক) রোহিঙ্গা বসতি উচ্ছেদ ও মগ প্রত্যাবসন ১৪৫
৫.১ খ) বাধ্যতামূলক শ্রম, যাতায়াতের নিষেধাজ্ঞা, অগ্নিসংযোগ ১৪৯
৫.১ গ) সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, মুক্তিপণ ও চাঁদা আদায় ১৫২
৫.১ ঘ) আরাকানী শিশু ও অমানবিকতা : রোহিঙ্গা শিশুদের হাসতে দাও ১৫৩
৫.১ ঙ) গ্রেফতার-অপহরণ, লুণ্ঠন, অমানবিক নির্যাতন ও হত্যা ১৬২

www.pathagar.com

৫.১ চ) নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ ১৬৭
৫.১ ছ) ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান এবং মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্যের ধ্বংস সাধন ১৭৩
৫.১ জ) নির্বাচিত রোহিঙ্গা চেয়ারম্যান-মেম্বারদের অবস্থা ১৭৪
৫.২ রোহিঙ্গাদের শরাণার্থী জীবন ও বাংলাদেশ ১৭৯
৫.৩ রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ১৯৯
৫.৪ প্রত্যাবাসন চুক্তি স্বাক্ষর ২০৪
৫.৫ চুক্তির সমালোচনা ২০৫
৫.৬ শরণার্থী প্রত্যাবাসন ২০৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোহিঙ্গা বিষয়ে সচেতন জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি ২২৭
৬.১ সচেতন জনগোষ্ঠীর শ্রেণি বিন্যাস ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২২৭
৬.২ প্রশ্নের বিষয়বস্তু ও ধরন ২৩০
৬.৩ রোহিঙ্গারা আরাকানের কোন ধরনের নাগরিক? ২৩০
৬.৪ মিয়ানমারের সামরিক সরকার কর্তৃক বিভিন্ন অজুহাতে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ ২৩২
৬.৫ আরাকান থেকে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আসার কারণ ২৩৪
৬.৬ রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ২৩৬
৬.৭ মিয়ানমারে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি রোহিঙ্গা সমস্যার অন্যতম কারণ কিনা? ২৩৮
৬.৮ রোহিঙ্গারা শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে আসায় এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে কিনা ২৪১
৬.৯ রোহিঙ্গা সমস্যার ধরন ২৪৬
৬.১০ রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বাংলাদেশের ভূমিকা ২৫৪
৬.১১ মিয়ানমার সরকারের রোহিঙ্গানীতি পক্ষান্তরে তথাকার মুসলিম জাতিসত্তা বিনাশের সুগভীর চক্রান্ত কিনা ২৫৫
৬.১২ মিয়ানমার সরকারের রোহিঙ্গানীতি প্রতিরোধের জন্য কি বসনিয়া ও কসভো স্টাইলে সামরিক অভিযান প্রয়োজন? ২৬০
৬.১৩ রোহিঙ্গা সমস্যা সর্ম্পকে সচেতন জনগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত অভিমত ১৬১

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার ২৬৯

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি ২৭৯

পরিশিষ্ট ২৯৯

ক) The Ancient Cities of Arakan ২৯৯

খ) আরাকান এর মানচিত্র ৩০০

গ) AGREED MINUTES SIGNED BETWEEN THE GOVERNMENT OF BURMA (MYANMAR) AND THE GOVERNMENT OF BANGLADESH ON REPATRIATION OF THE BURMESE REFUGEES, 1978. ৩০১

ঘ) JOINT STATEMENT BY THE FOREIGN MINISTERS OF BANGLADESH AND MYANMAR ISSUED AT THE CONCLUSION OF THE OFFICIAL VISIT OF THE MYANMAR FOREIGN MINISTER TO BANGLADESH FROM 23-28 APRIL, 1992. ৩০৩

ঙ) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH AND THE OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES ৩০৮

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়
উপক্রমণিকা

রোহিঙ্গা সমস্যা; কাশ্মীর, ফিলিস্তিন কিংবা ফিলিপাইনের মরো মুসলমানদের মতোই একটি আন্তর্জাতিক সংকট। ক্রমশ বাড়তে বাড়তে এটি এখন জাতিসত্ত্বা নির্মূলের সর্বশেষ ধাপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বাংলাদেশের মিয়ানমার সীমান্ত এলাকাজুড়ে মানবতার হাহাকার। গণহত্যার ভয়াবহ স্মৃতি বহন করে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন বাঁচনোর জন্য দীর্ঘকষ্টের পথ পাড়ি দিয়ে আশ্রয় নিয়েছে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার নানা স্থানে। অবুঝ শিশু, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ এবং অসংখ্য আহত মানুষের কান্নায় ভারি সেখানকার আকাশ বাতাস। অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা তো দূরের কথা ন্যূনতম মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও মিলে না। মানবিক বিপর্যয়ে পতিত এ সব অসহায় নারী শিশু বৃদ্ধসহ নির্মমভাবে আহত মানুষের কষ্ট লাঘবে পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের মানুষ। সেইসাথে মুসলিমবিশ্বের নেতৃবৃন্দসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলকে নাড়া দিয়েছে এ অমানবিকতা। আরাকানে হাজার বছরের সোনালি ইতিহাসের নির্মাতা এ সব রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর এ নির্মম পরিণতি বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষকে আহত করলেও নিকটতম প্রতিবেশি ভারত ও চীনের ভূমিকা বিশ্ববাসীকে রীতিমত হতবাক করেছে। মানবতাবোধের কবর দিয়ে এ ধরনের গণহত্যা চালিয়ে মিয়ানমার যে অপরাধ করে চলেছে তা আধুনিক সভ্যসমাজকে বিস্মিত করেছে।

রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের স্থায়ী অধিবাসী। আরাকান খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর যাবত মোটামুটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সে স্বাধীন আরাকানের ম্রাউক উ বংশের রাজা নরমিখলা প্রতিষ্ঠিত রাজধানী ম্রোহং এর বাংলা উচ্চারণ রোসাং। রোসাং এর অধিবাসীদেরকে রোসাইংগা বা রোহিঙ্গা বলা হয়।

আরবে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে আরাকানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে এবং অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে চন্দ্র বংশীয় রাজা মহৎ-ইঙ্গ-চন্দ্রের (৭৮৮-৮১০ খৃ.) রাজত্বকালে আরবীয় মুসলিম বণিকগণ নৌবহর নিয়ে আরাকানের আকিয়াব বন্দরসহ দক্ষিণ-পূর্ব চীনের ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ইসলাম প্রচারের জন্য চলে আসেন। কথিত আছে যে, এ সময় কয়েকটি আরবীয় বাণিজ্য বহর রাহাম্বী দ্বীপের পাশে বিধ্বস্ত হয় এবং জাহাজের আরোহীরা রহম' (দয়া), রহম' বলে চিৎকার করলে স্থানীয় জনগণ তাঁদের উদ্ধার করে। আরাকানরাজ তাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত আচরণ লক্ষ্য করে সেখানেই বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন। আরবি ভাষায় অনভিজ্ঞ স্থানীয় লোকজন তাঁদেরকে রহম জাতির লোক বলে মনে করত এবং পরবর্তীতে রহম শব্দটি বিকৃত হয়েই রোহিঙ্গা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ শতাব্দীতে চন্দ্র-সূর্য বংশের রাজা অয়ুথুর পুত্র নরমিখলা স্বীয় চাচাকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে। অতঃপর ক্ষমতাচ্যুত আরাকান রাজার আমন্ত্রণে বার্মার রাজা মেং শো আই (Meng Show wai 1401-22) ১৪০৬ সালে ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান আক্রমণ করলে নরমিখলা প্রাণ ভয়ে বাংলায় এসে আশ্রয় নেন এবং ১৪৩০ সালে বাংলার সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ সেনাপতি ওয়ালী খানের নেতৃত্বে ২০ হাজার সৈন্য দিয়ে তাঁর স্বদেশভূমি পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেন। ওয়ালী খান রাজ্য জয় করে নিজেকেই আরাকানের স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা দেয়। নরমিখলা পুনরায় গৌড়ে পালিয়ে এলে পরের বছর সুলতান জালাল উদ্দীন সিন্ধি খানের নেতৃত্বে আবারো ৩০ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে তাঁর স্বদেশভূমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। নরমিখলা পিতৃভূমি উদ্ধারের পর লঙ্গিয়েত থেকে রাজধানী স্থানান্তর করে লেম্রু নদীর তীরে ম্রোহং নামক শহরে স্থাপনপূর্বক রাজ্য শাসন করতে থাকেন। বাংলা থেকে আগত দু'পর্বে প্রায় ৫০ হাজার গৌড়ীয় সৈন্যের অধিকাংশই স্বদেশে ফিরে না এসে আরাকানেই স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে।

মোগল সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে বাংলার মোগল সুবাদার শাহজাদা মুহাম্মদ সুজা দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শাহজাদা আওরঙ্গজেবের সাথে পরাজিত হয়ে ১৬৬০ সালের ২৬ আগস্ট আরাকানের রাজধানী ম্রোহংয়ে পলায়ন করে আরাকানরাজ চন্দ্র সুধর্মার দরবারে আশ্রয় নেন এবং এক পর্যায়ে তার হাতেই স্বপরিবারে নিহত হন। তাঁর অনুচরবর্গ আরাকানেই থেকে যায়। সম্রাট আওরঙ্গজেব ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানকে নির্দেশ দেন। তিনি ১৬৬৬ সালে আরাকানী বাহিনী ও মগ জলদস্যুদের পরাজিত করে সমগ্র চট্টগ্রাম দখল করেন। অতঃপর ১৬৮৪ সালে আরাকানরাজ সান্দা থু ধম্মার মৃত্যুর পর থেকে ক্রমশ আরাকানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বিশেষত ১৭১০ সালে সান্দা উইজ্যা আরাকানের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সামান্তদের শক্তি বেড়ে যায়। ফলে আরাকানরাজ ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাজ্যের স্থিতিশীলতাও বিনষ্ট হতে থাকে।

উল্লেখ্য, নরমিখলার (১৪৩০-৩৪) সময় থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরাকানের রাজদরবার মুসলমান প্রভাবিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, মন্ত্রী, কাজি এবং রাজ্যের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে নিম্নশ্রেণির কর্মচারী পর্যন্ত ছিল মুসলমান। তাছাড়া তখন আরাকান রাজসভার (অমাত্যসভা) পৃষ্টপোষকতা ও উৎসাহে মুসলিম কবিগণ সাহিত্য সাধনা করতেন এবং তাঁদের হাতেই বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

সামন্তদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাজ্যে স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হবার সুযোগে বর্মীরাজ বোধপায়া ১৭৮৫ সালে আরাকান দখল করেন। এ সময় তিনি অসংখ্য লোককে হত্যা করেন এবং প্রায় ৫ লক্ষাধিক আরাকানী প্রাণ ভয়ে বাংলায় পালিয়ে আসে। ১৮২৩ সালে ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের পর আরাকান কোম্পানির শাসনাধীনে এলে সেখানে স্থিতিশীলতা

www.pathagar.com

ফিরে আসে এবং আরাকান থেকে পালিয়ে আসা আরাকানীদের অধিকাংশই পুনরায় স্বদেশে ফিরে যায়।

এছাড়া কোম্পানি ও বৃটিশ শাসনামলে আরাকান ও বার্মা বৃটিশ সম্রাজ্যের অধীনে এলে বাংলা এবং ভারতের অনেক মুসলমান ব্যবসা ও চাকরির উদ্দেশ্যে আকিয়াব, ইয়াংগুনসহ বিভিন্ন শহরে গমন করে। অধিকাংশ লোক কাজ শেষে স্বদেশে ফিরলেও কেউ কেউ সেখানেই স্থায়ী আবাসন গড়ে বসবাস করতে থাকে। এভাবে অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পর্যায়ে আরাকানে মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে এবং এটি পুরোপুরিভাবে মুসলিম প্রভাবিত এলাকায় পরিণত হয়। আরাকানে রোহিঙ্গাদের বসতির ইতিহাস প্রায় হাজার বছরের পুরোনো হলেও বৃটিশ প্রশাসন ১৯৪৮ সালে বার্মাকে স্বাধীনতা দানের পূর্ব থেকেই অত্যন্ত সুকৌশলে রোহিঙ্গা-মগদের মধ্যে বিভেদের সূত্রপাত ঘটায় এবং স্বাধীনতা উত্তর বার্মা সরকার ঐতিহাসিক সত্যতাকে পদদলিত করে রোহিঙ্গাদেরকে কুল্লা বা বহিরাগত হিসেবে অপপ্রচার চালিয়ে তাদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন শুরু করে। রোহিঙ্গাদেরকে ক্রমশ প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদপূর্বক গোটা প্রশাসনকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মগদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নিতে শুরু করে। ১৯৪২, '৫৮, '৭৪, '৭৮, '৯১, ২০১২ ও ২০১৬-১৭ সালে বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে বর্মীসেনা ও স্থানীয় মগরা যৌথভাবে ধর্ষণ, হত্যা, অগ্নি সংযোগ, লুণ্ঠন, জবরদস্তি শ্রম; এক কথায় সমস্ত নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিষ্ঠুর নির্যাতনের মাধ্যমে হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা করে এবং লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা প্রাণ ভয়ে স্বদেশ ছেড়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। ১৯৯১এর পূর্বে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দ্বি-পক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে এবং আন্তর্জাতিক চাপের মুখে মিয়ানমার সরকার ফেরত নিলেও ১৯৯১-৯২ সালে আগত শরণার্থীদের অনেকেই নানা কারণে স্বদেশে ফেরত যেতে পারেনি। পরবর্তীতে এ সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ২০১২ সালে মগ ও সেনাবাহিনীর অত্যাচারে রোহিঙ্গারা প্রাণভয়ে পালিয়ে আসে বাংলাদেশে। তবে সবচেয়ে বড় ধরনের গণহত্যা শুরু হয়েছে ২০১৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে। নির্বিচারে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে গণহত্যার মতো ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও রাখাইন পরিচয়ধারী স্থানীয় মগজনগোষ্ঠী।

রোহিঙ্গা সমস্যাটি শুধু মিয়ানমার ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের নয়; এটি এখন বাংলাদেশেরও একটি অন্যতম সমস্যা। বৃটিশ শাসিত বাংলা, স্বাধীনতাপূর্বের পূর্ব পাকিস্তান এবং স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই এ সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। সরকারিভাবে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের সহায়তা নিয়ে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত থাকলেও অদ্যাবধি কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি; বরং ১৯৮২ সালে বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব আইন প্রর্বতনের মাধ্যমে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের দেশহীন বলে চিহ্নিত করেছে। ফলে তারা এখন নিজ দেশেই পরবাসী

www.pathagar.com

হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। মিয়ানমার সরকারের অমানবিক নির্যাতন ও গণহত্যার প্রেক্ষিতে তারা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হয়। কখনো তা সীমান্ত থেকেই আর কখনো দ্বি-পক্ষীয় চুক্তির মাধমে। কিন্তু রোহিঙ্গার তাদের ফেলে আসা বাড়িঘর কিংবা জমিজমা কখনো আর ফেরত পায়না। ফলে আবারো তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে আসে।

উল্লেখিত পটভূমিতে এটা সুস্পষ্ট যে, রোহিঙ্গা সমস্যাটি আন্তর্জাতিক হলেও মিয়ানমার ও বাংলাদেশ উভয় সরকারই এটাকে দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা বলে মনে করে। তবে দু'দেশের সরকারই এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভংগী পোষণ করে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা, বক্তৃতা-বিবৃতি ও চুক্তি সম্পাদনকালের বাক-বিতণ্ডা হতে কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভংগী প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া উভয় দেশের জনসাধারণ এবং বুদ্ধিজীবীগণও এ সমস্যা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত পোষণ করে। ইতোমধ্যে উভয় দেশের পত্র-পত্রিকা, বেতার-টিভি, সাহিত্য ও ইতিহাসে এ সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভংগী প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া আরাকানের ইতিহাস ও রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে বাংলা, ইংরেজি এবং উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ ও অভিসন্দর্ভ প্রণীত হয়েছে। স্বল্প পরিসরে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে তার সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করা হলো-

প্রথমত, ইংরেজি ভাষায় প্রণীত গ্রন্থ ও অভিসন্দর্ভসমূহ; Moshe Yegar এর *The Muslim of Burma : A Study of Minority Groups* (Jerusalem : Hebrew University, 1981) গ্রন্থটি বার্মার মুসলমানদের ইতিহাস পর্যালোচনায় একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক রচনা। এতে বার্মাসহ আরাকানে মুসলমানদের আগমন, আরাকান রাজদরবারে মুসলিম প্রভাব ও স্বাধীনতা উত্তর বর্মী শাসক কর্তৃক মুসলিম নির্যাতনের খণ্ডিত চিত্রও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে গোটা বার্মার মুসলমানদের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে আরাকান ও রোহিঙ্গাদের ইতিহাস খুব কিঞ্চিতই বর্ণিত হয়েছে। তাই রোহিঙ্গা সমস্যায় বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি এ গ্রন্থে আলোচিত হয়নি। Mohammed Yunus এর *A History of Arakan : Past & Present* (Chittagong : Magenta Colour, 1994) গ্রন্থে আরাকান ও রোহিঙ্গাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আরাকান রাজদরবারে মুসলিম প্রভাব, বার্মা কর্তৃক আরাকান দখল এবং আরাকানের সামরিক শাসন ও রোহিঙ্গা নির্যাতনের কিছু খণ্ডিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখার চেষ্টা করা হলেও ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি মোতাবেক প্রণীত হয়নি। তবে রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রণীত গ্রন্থের স্বল্পতায় এ বইটি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার। তাছাড়া আরাকান ও বার্মার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মানচিত্র, মুদ্রা, শিলালিপি ও মসজিদের ছবি সংযোজন করায় গ্রন্থটির মান বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু গ্রন্থটিতে রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কোন আলোচনা

www.pathagar.com

নেই। Abdur Razzaq এবং Mahfuzul Haque প্রণীত *'A Tale of Refugees: Rohingyas in Bangladesh.* (Dhaka: Centre for Human Rights, 1995) গ্রন্থটি রোহিঙ্গা সমস্যা ও তাদের মানবাধিকার লংঘনের উপর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ । এতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে রোহিঙ্গাদের পরিচয়, শরণার্থী আশ্রায়নে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের ভূমিকা, মানবাধিকার লংঘন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনসহ বাংলাদেশ-মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ ও UNHCR এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারকের অনুলিপি সংযোজিত হয়েছে। তবে গ্রন্থটিতে বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য খুবই কম এবং সংক্ষিপ্ত। তাছাড়া এতে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কোন কথা নেই। গ্রন্থটি ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি মোতাবেক প্রণীত নয় এবং এতে কোন কাল বিভাজন নেই। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক Abdul Karim, এর *The Rohingyas : A Short Account of Their Histroy and Culture* (Chittagong: Arakan Historical Society, 2000) গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক রচনা। এ গ্রন্থে আরাকানে মুসলমানদের আগমন; রোহিঙ্গাদের ইতিহাস, আরাকানের রাজদরবারের উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তাদের বিবরণ, আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এবং বৃটিশ শাসনামলে আরাকানে রোহিঙ্গাদের অবস্থা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থটি ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রণীত হলেও তাতে কাল বিভাজনের সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। তাছাড়া এতে রোহিঙ্গা সমস্যা বিষয়ে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কোন তথ্য সংযোজিত হয়নি। *To Host or To Hurt, Counter-narratives on Rohingya Refugee Issue in Bangladesh*, Edeted by Nasir Uddin, (Dhaka: Institute of Culture and Development Research, 2012) রোহিঙ্গা সমস্যা ও আরাকানের ইতিহাসকেন্দ্রিক একটি সংকলিত গ্রন্থ। বিভিন্ন লেখকের ৮টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের সমন্বয়ে সংকলনটি সাজানো হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের গঠন-প্রকৃতি একটু ভিন্নধর্মী। গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমেই প্রবন্ধগুলো লিখিত হয়েছে। আলাদা আলাদা লেখকের ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ হবার কারণে অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসের ধারাবাহিকতার ছেদ ঘটেছে। ইংরেজি ২৮টি প্রবন্ধের সমন্বয়ে Dr. Mohammad Mohibullah Siddiquee সম্পাদিত *The Rohingyas of Arakan: History and Heritage,* (Chittagong: Ali Publishing House, 2014) গ্রন্থটিতে রোহিঙ্গা ও আরাকান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। আরাকানের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও রোহিঙ্গা বিষয়ে জানার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি সংকলন। তবে প্রবন্ধগুলো আলাদা আলাদা লেখক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে লিখিত হবার কারণে কোন কোন বিষয়ে রিপিটেশন এসেছে। আবার রোহিঙ্গা সমস্যার অনেক বিষয়ই অনালোচিত থেকে গেছে। সর্বোপরি সংকলনটিতে রোহিঙ্গা সমস্যার ধারাবাহিক কোন ইতিহাস আলোচিত হয়নি।

অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভের মধ্যে A.S. Bahar এর The Arakani Rohingyas in Burmese Society, M.A. Thesis, University of Windsor, Ontario, Canada, 1981 অন্যতম। এ অভিসন্দর্ভে রোহিঙ্গাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, সামাজিক মর্যাদা,

www.pathagar.com

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকা, বৃটিশ শাসনামলে রোহিঙ্গাদের অবস্থা, বর্মী ও রোহিঙ্গা সম্পর্কের মেরু-বৈপরীত্য এবং বর্মী শাসক কর্তৃক রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের খণ্ড চিত্র সংক্ষিপ্ত আকারে চিত্রিত করা হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতিতে প্রণীত এ অভিসন্দর্ভে রোহিঙ্গা সমস্যায় বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষায় প্রণীত গ্রন্থ ও অভিসন্দর্ভসমূহ; সৈয়দ আলী আহসান এর *পদ্মাবতী* (ঢাকা: ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৮); মুহাম্মদ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এর *আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য*, মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩) গ্রন্থদ্বয়ে আরাকানে ইসলামের আগমন ও বিস্তৃতি, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনুকূলে ইসলামি পরিবেশ গড়ে উঠা এবং যারা আরাকান রাজসভা থেকে বাংলা সাহিত্যকে বিকশিত করেছেন যেমন- দৌলতকাজী ও মহাকবি আলাওলসহ অনেক প্রতিভাধর মুসলিম কবির আর্বিভাব; ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। মুহাম্মদ আবুল হোসেন মাহমুদ লিখিত *বার্মায় মুসলিম গণহত্যা* (ঢাকা : বর্মী মুসলিম কেন্দ্রীয় সাহায্য কমিটি, ১৯৭৮) গ্রন্থে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহৃত না হলেও ১৯৭৮ সালে কিং ড্রাগন অপারেশনের নামে বার্মা সরকার রোহিঙ্গাদের উপর যে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। বিশেষত নির্যাতনের যে সকল খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার সংকলন করা হয়েছে এ গ্রন্থে। এছাড়াও নির্যাতনের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের প্রতিরোধ আন্দোলন এবং বিশ্বের পত্র-পত্রিকা এ সমস্যাকে কিভাবে মূল্যায়ন করেছে তার বিবরণ এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। এন.এম. হাবিব উল্লাহ এর *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ১৯৯৫) এবং আবদুল হক চৌধুরী এর *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪) গ্রন্থদ্বয়ে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস থেকে আধুনিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া রোহিঙ্গাদের পরিচয়, আরাকান রাজদরবারে তাদের প্রভাব এবং স্বাধীনতা উত্তর মিয়ানমার সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গা নির্যাতনের কিছু খণ্ডিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনার ধারাবাহিকতা না থাকলেও আরাকান ও রোহিঙ্গাদের উপর এ গ্রন্থ দু'টির ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। মো. মাইমুল আহসান খান এর *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত* (ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৯৯৮) রোহিঙ্গাদের উপর একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। এতে আরাকানে ইসলাম প্রচার, বিকাশ এবং বৃটিশ শাসনাধীনে আরাকানসহ মিয়ানমার শাসকগোষ্ঠীসহ স্থানীয় মগ কর্তৃক রোহিঙ্গাদের নির্যাতন ও মানবাধিকার লংঘনের উপর আলোচনা করা হয়েছে। নিছক রোহিঙ্গাদের নিয়ে লেখা গ্রন্থের স্বল্পতায় এর মূল্য অবশ্যই অনস্বীকার্য।

রতনলাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক (১৭৮৫-১৮২৪)* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪) একটি মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থ। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত

www.pathagar.com

এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ এবং একটি মূল্যবান গবেষণাকর্ম। এতে ১৭৮৫-১৮২৪ সাল পর্যন্ত বাংলার সীমান্ত পরিস্থিতি, চট্টগ্রামে আশ্রিত আরাকানী উদ্বাস্তু সমস্যা এবং এ বিষয়ে বার্মা ও বাংলার প্রতিক্রিয়া; বর্মী অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সিন পিয়ান ও আরাকানী সর্দারদের তৎপরতা, বার্মা-বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্কসহ প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের পূর্ব-পরিস্থিতির উপর আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এতে রোহিঙ্গা সমস্যা এবং তদসংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কোন আলোকপাত করা হয়নি। অমৃতলাল বালা এর *আলাওলের কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ। এটি ইতিহাস ও সাহিত্য গবেষণা পদ্ধতিতে প্রণীত একটি সাংস্কৃতিক ইতিহাস গ্রন্থ। এতে আরাকানে ইসলামের আগমন ও বিস্তার, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনুকূলে ইসলামি পরিবেশ গড়ে উঠা এবং যারা আরাকান অমাত্যসভা থেকে বাংলা সাহিত্যকে বিকশিত করেছেন- বিশেষ করে দৌলতকাজী ও মহাকবি আলাওলসহ অনেক প্রতিভাধর মুসলিম কবির আর্বিভাব; প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে অভিসন্দর্ভে রোহিঙ্গাদের বর্তমান সমস্যা এবং তার প্রতি বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গির কোন আলোচনা না থাকলেও আরাকানে ইসলাম বিস্তারের প্রেক্ষাপট অনুধাবনে গ্রন্থটি প্রয়োজনীয়। ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ প্রণীত *আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ২০১৩) একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণামূলক ইতিহাস গ্রন্থ। ২৮০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে সাতটি অধ্যায়ে আরাকানের মুসলমানদের একটি পরিপূর্ণ ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। উৎস ও তথ্য-উপাত্তের ব্যবহার এবং গবেষণা পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগে গ্রন্থটি রচিত হলেও রোহিঙ্গা সমস্যা এবং বাংলাদেশের সম্পৃক্ততার উপর তেমন কোন আলোচনা নেই। মো. সিরাজুল ইসলাম-এর *ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮) একটি গবেষণা গ্রন্থ; যা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ হিসেবে প্রণীত ও গৃহীত হয়েছে। এখানে সিরিয়ামে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করার সময় থেকে ১৮৮৫ সালে তৃতীয় ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের অনিবার্য ফলস্বরূপ কিভাবে ইংরেজরা বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিবেশীদেশ বার্মাকে সম্পূর্ণভাবে দখল করে তার একটি ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাসের পাশাপাশি এতে বার্মার অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিসত্তার বিভিন্ন দিক এবং এগুলো কিভাবে বার্মাকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে দ্বন্দ-সংঘাতের পর্যায়ে নিয়ে যায় তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এতে রোহিঙ্গা সমস্যা অথবা সে বিষয়ে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কোন আলোচনা স্থান পায়নি।

তৃতীয়ত, উর্দু ভাষায় প্রণীত গ্রন্থসমূহ; মুহাম্মদ আমিন নদভি রচিত *তারিখে আরকান কা এক গামছুদা বাব* (আরাকান: আরাকান হিষ্ট্রি কনফারেন্স, ১৯৮৬) আরাকানের প্রাচীন ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। এতে আরব মুসলিম বণিকগণ কর্তৃক আরাকানে ইসলাম প্রচার, নরমিখলার সিংহাসন পুনরুদ্ধার এবং পরবর্তীতে মুসলিম নাম ধারণ, ফার্সিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা, শাহ সুজার আরাকান আগমন

www.pathagar.com

ও সপরিবারে হত্যাসহ রোহিঙ্গাদের মুক্তি সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। গ্রন্থটিতে নরমিখালার পর থেকে ১৬৫৮ সাল পর্যন্ত শাসনামলকে মুসলিম সালতানাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মুহাম্মদ তাহের জামাল নদভি এর *সারজামিন আরকান কি তাহরিকে আজাদী : তারিখি পাস মানজার মে* (চট্টগ্রাম : আরাকান হিস্ট্রিক্যাল সোসাইটি, ১৯৯৯) গ্রন্থটি আরাকানের ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়ে উর্দু ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিস্তারিত ও পরিমার্জিত গ্রন্থ। ৪৪৩ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস থেকে শুরু করে ইসলাম প্রচার, নরমিখলা কর্তৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার ও ম্রোহংয়ে রাজধানী স্থাপন, আরাকান রাজ্যে মুসলিম প্রভাব, বাংলা সাহিত্যের বিকাশ, বর্মী শাসক ও বৃটিশ কর্তৃক পর্যায়ক্রমভাবে আরাকান দখল, ১৯৪২ সালের গণহত্যা, বার্মার স্বাধীকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা লাভ, নে উইনের শাসনকাল এবং রোহিঙ্গা সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ খলিলুর রহমান এর *তারিখ-ই-ইসলাম : বার্মা ওয়া আরকান* (কলিকাতা : দি স্টার আর্ট প্রেস, ১৯৮৬) এবং কারবালা-ই-আরকান, বিশেষ সংগ্রহ, আরাকান হিস্ট্রিক্যাল সোসাইটি গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম প্রভৃতি গ্রন্থসমূহেও আরাকানের ইতিহাস, রোহিঙ্গাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, রোহিঙ্গা নির্যাতন প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়া সাইফুল্লাহ খালিদের *তাযকিরায়ে শুহাদায়ে জিহাদে আরকান* (করাচি : ইত্তেহাদ পাবলিকেশন্স ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৯৭) এবং নূর মুহাম্মদ মানসুরী, *কোন সি ওয়াদি মে হ্যায়, কোন সি মনজিল মে হ্যায়, এশ্‌কে বালাখিজ কা কাফেলায়ে সখ্‌ত যা* (করাচি : ইত্তেহাদ পাবলিকেশন্স ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৯৭) রোহিঙ্গাদের মুক্তি সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ইংরেজি, বাংলা ও উর্দু ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থ বা রচনাতেই রোহিঙ্গা সমস্যার পূর্ণাঙ্গরূপ প্রকাশিত হয়নি এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি মোটেও প্রতিফলিত হয়নি। রোহিঙ্গা ও আরাকানের ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রেও প্রত্যেক ইতিহাস কর্মই আংশিক অর্থাৎ আরাকান ও রোহিঙ্গাদের এক একটি বিষয়কে নিয়ে লেখা হয়েছে। ফলে আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস বা আরাকানে মুসলিম আগমন থেকে শুরু করে রোহিঙ্গা সমস্যার শেষ পর্যায় তথা বর্তমানরূপ পর্যন্ত কোন গ্রন্থেই আলোচিত হয়নি। এছাড়া এ সমস্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি কি তাও কোন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়নি।

পক্ষান্তরে রোহিঙ্গা সমস্যার সাথে ইউএনএইচসিআরসহ বিভিন্ন দেশ ও আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহের সম্পৃক্ততা সমস্যার আন্তর্জাতিকতা প্রমাণ করে। নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের একটি মানবিক সমস্যা। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে মানবতা নির্যাতিত হলে তা প্রতিকারের সার্বিক প্রচেষ্টা করা অন্য সকল মানব গোষ্ঠীর নৈতিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে হলে প্রথমে সে সমস্যা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই রোহিঙ্গা সমস্যার স্বরূপ অন্বেষণ অপরিহার্য। তাছাড়া এ সমস্যা সম্পর্কে বাংলাদেশ, মিয়ানমার, জাতিসংঘ এবং রোহিঙ্গারা ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করে। একটি আন্তর্জাতিক মানবিক সমস্যার স্বরূপ উদঘাটন এবং সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত

www.pathagar.com

অন্বেষণ সীমিত গবেষণায় অসম্ভব বিধায় রোহিঙ্গা সমস্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের দৃষ্টিভংগী উদঘাটনের প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন বলে মনে করা হয়েছে।

এ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে; যথা- প্রথমত, সরেজমিন গবেষণা পদ্ধতি (Empirical Research Methods) অর্থাৎ নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার দ্বারা সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ সরেজমিন গবেষণা পদ্ধতির একটি অংশ। একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নমালা তৈরি করে একই প্রশ্নমালার মাধ্যমে সারাদেশের সমগ্র সচেতন জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে যথাক্রমে শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিক-কলামিষ্ট, পেশাজীবী, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ও আশ্রায়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত এনজিওসমূহের বিভিন্ন শ্রেণির বাংলাদেশী কর্মকর্তা, ওলামা, আমলা ও রাজনীতিবিদ প্রভৃতি শ্রেণির সচেতন জনগোষ্ঠীকে ৮ ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক বিভাগ থেকে ৫ জন করে মোট ৪০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। একই প্রশ্নমালার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, মিয়ানমার সরকারের নির্যাতন, বাংলাদেশে আগমনের কারণ, মানবাধিকার লংঘনসহ মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ অবস্থা, শরণার্থী আগমনে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পর্যালোচনা; সর্বোপরি রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে সচেতন জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি সংগ্রহ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে এবং নির্দিষ্ট প্রশ্নের বাইরে রোহিঙ্গা সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের অভিমতসহ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে তাঁদের উন্মুক্ত পরামর্শ গ্রহণের জন্যও আলাদাভাবে দু'টি প্রশ্ন রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি (Historiccal Research Methods). অর্থাৎ রোহিঙ্গা সমস্যাটি বাংলাদেশের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার কারণে এদেশের পত্র-পত্রিকায় বহু খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ লিখিত হয়েছে; যাতে এ বিষয়ে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। তাছাড়া UNHCR, বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বি-পাক্ষিকভাবে এ সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে যে সকল চুক্তিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ তৈরি হয়েছে তাতেও বাংলাদেশের মতামত প্রকাশিত হয়েছে। সর্বোপরি রোহিঙ্গাদেরকে কেন্দ্র করে বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থও প্রণীত হয়েছে। উপরোক্ত পত্র-পত্রিকা, সরকারি নথিপত্র, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের রিপোর্ট এবং প্রণীত গ্রন্থসমূহ হতে ইতিহাস গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। অতঃপর তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রতিফলিত অভিমতসমূহ, সমসাময়িক গ্রন্থ এবং সরকারি দলীল-দস্তাবেজ হতে গৃহীত তথ্যাবলি দ্বারা সমর্থিত করার প্রয়াস চালিয়ে রোহিঙ্গা সমস্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ গবেষণায় প্রাথমিক (Primary) ও গৌণ (Secondary) উভয় ধরনের উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস বলতে বাংলাদেশ-মিয়ানমার বৈঠকসমূহের নথিপত্র ও সম্পাদিত চুক্তিসমূহ, দেশী-বিদেশী, জাতীয়-আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট এবং সচেতন জনগোষ্ঠী থেকে প্রশ্নমালা দ্বারা সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সেমিনার/আলোচনা সভার প্রকাশিত বক্তব্য, সরকারি প্রেস ব্রিফিং ও সংবাদকেও (News) প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত "মুহাম্মদ সিদ্দিক খান সংগ্রহ" প্রভৃতিকে অন্যান্য প্রাথমিক উৎসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গৌণ উৎস বলতে আরাকান ও রোহিঙ্গাকে কেন্দ্র করে বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় প্রণীত গ্রন্থসমূহ এবং বিভিন্ন সাময়িকীতে (Journal) প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধসমূহকে পরিগণিত করা হয়েছে।

সর্বোপরি গবেষণার প্রেক্ষাপট হিসেবে আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস ও মুসলিম আগমন থেকে শুরু করে রোহিঙ্গাদের পরিচয়, আরাকান রাজসভায় রোহিঙ্গাদের অবস্থান উপস্থাপনপূর্বক রোহিঙ্গা সমস্যার সূচনা থেকে ২০১৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সমসাময়িক তথ্যের আলোকে রোহিঙ্গা সমস্যার উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেইসাথে রোহিঙ্গা সমস্যার সাথে বাংলাদেশ সম্পৃক্ত হবার কারণে এ সমস্যাকে ঘিরে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি, অবস্থান ও কর্মতৎপরতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরাই এ গ্রন্থ রচনার লক্ষ্য। আর সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে সংগৃহীত উপাত্ত এবং তার সমর্থিত তথ্যাবলি দিয়ে ইতিহাস গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ গবেষণা গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
আরাকান ও রোহিঙ্গা : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র বার্মা বা মিয়ানমারের অর্ন্তগত বর্তমানে 'রাখাইন ষ্টেট' নামে পরিচিত বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী পাহাড় ঘেরা একটি রাজ্য আরাকান।[১] খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।[২] কিন্তু ১৭৮৫ সালে বর্মীরাজ বোধপায়া (১৭৮২ - ১৮১১ খ্রি.) সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যমে আরাকানের শেষ রাজা থামাডাকে পরাজিত ও নিহত করে আরাকানকে বার্মার অন্তর্ভূক্ত করার পর থেকে অদ্যাবধি সেখানকার প্রদেশ হিসেবে রয়েছে।[৩] আরাকানের জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ ইসলামের অনুসারী; এদের মধ্যে থাম্বইক্য, জেরবাদী, কামানচি, রোহিঙ্গা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর বসবাস থাকলেও রোহিঙ্গারা তাদের মধ্যে বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী।[৪] অত্র অধ্যায়ে আরাকানের ভৌগোলিক পরিচিতি, রোহিঙ্গাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং আরাকানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

২.১ আরাকানের ভৌগোলিক পরিচিতি

আরাকান উত্তর অক্ষাংশের ১৭.১৫° ও ২১.৭০° এর মধ্যে এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ৯২.১৫° ও ৯৪.৫৫° এর মধ্যে অবস্থিত। এর উত্তরে চীন ও ভারত, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, উত্তর ও পশ্চিমে বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব সীমান্তবর্তী নাফ নদীর মধ্যসীমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম। পূর্বে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী ইয়োমা (Yoma) পর্বতমালা। এ সুদীর্ঘ, দূর্গম, সুউচ্চ ও বিশাল ইয়োমা পর্বতমালা দূর্ভেদ্য প্রাচীরের মত মিয়ানমার থেকে আরাকানকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।[৫] বৃটিশ শাসিত আরাকানের আয়তন ছিল ২০,০০০ বর্গ মাইল। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা উত্তর পার্বত্য আরাকান বার্মার চিন প্রদেশে এবং দক্ষিণ আরাকানের কিছু অংশ লোয়ার বার্মার ইরাবতি প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত করায় বর্তমানে এখানকার আয়তন ১৪,২০০ বর্গমাইল। উত্তর আরাকান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। আরাকানের দৈর্ঘ্য ৩৬০ মাইল কিন্তু প্রস্থে স্থান বিশেষে ভিন্নতা রয়েছে। উত্তর আরাকান অঞ্চলটি বেশ প্রশস্ত, যার প্রস্থ প্রায় ১০০ মাইল এবং আরাকানের দক্ষিণাংশ নিচের দিকে ক্রমশ সরু; যার প্রস্থ প্রায় ২০ মাইল। সমগ্র আরাকান অঞ্চল উত্তর-পশ্চিমে ১৭১ মাইলব্যাপী নৌ ও স্থল সীমারেখা সহকারে বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত।[৬] আরাকানে মোট সাতটি উল্লেখযোগ্য নদী রয়েছে যথা:- নাফ (Naf), মায়ু (Mayu), কালাডান (Kaladan), লেমব্রু (Lembru) অনন (Ann), তানগু (Tangup) ও স্যান্ডুওয়ে (Sandoway)। নাফ নদী আরাকান ও বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্ত রেখা হিসেবে কাজ করে।[৭] কালাদান আরাকানের সব'চে বড় নদী; যা হিমালয় পাহাড় হতে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

www.pathagar.com

আরাকান একটি পর্বতময়, ঘনবন সমৃদ্ধ উপকূলীয় এলাকা। এর মোট ভূমির শতকরা ৭০ ভাগ বন। এখানকার পরিবহন ও যোগাযোগের জন্য নদী পথই প্রধান। এখানে সমুদ্রতট সংলগ্ন অনেক দ্বীপ আছে যেগুলোর মধ্যে রাহম্রী এবং চেদুবা সবচেয়ে বড়। রাহম্রী উপকূলে একটি গভীর প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় আছে যা চবপিউ শহর থেকে মাত্র কয়েক মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এ গভীর প্রাকৃতিক সামুদ্রিক পোতাশ্রয়ে সপ্তম নৌবহরের মত বড় জাহাজের সংকুলান হওয়া সম্ভব।[৮] আরাকানে সর্বমোট ১৭টি শহর আছে।[৯] আকিয়াব শহরটি উত্তর আরাকানের প্রধান সমুদ্র বন্দর এবং এটি কালাদান নদীর মোহনায় অবস্থিত। যোগাযোগের জন্য গোটা আরাকানে কোন রেলপথ নেই, অন্যদিকে সকল মৌসুমে গাড়ী চলাচলের উপযোগী মাত্র ১৫০ মাইল রাস্তা রয়েছে।[১০]

কয়েকটি দুর্গম গিরিপথ আরাকান ও বার্মার মধ্যে একমাত্র স্থল পথ; যা সর্বসাধারণের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। জলপথে উভয় অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা থাকলেও তা সব সময় নিরাপদ নয়। ফলে আরাকানের মূল জনগোষ্ঠী বার্মা থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন এবং প্রধানত মধ্য-বার্মা ও আরাকান উপকূলভাগে পাবর্ত্য অঞ্চলের দ্বারা এ বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। সে তুলনায় আরাকানের সঙ্গে চট্টগ্রামের যোগাযোগ অনেক সুবিধাজনক হবার কারণে ইতিহাসে শত শত বছর ধরে আরাকানের সাথে চট্টগ্রাম তথা বাংলার যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। সমুদ্রের তীরবর্তী হবার কারণে এখানকার আবহাওয়া মধ্যম প্রকৃতির। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২০০ ইঞ্চি প্রায়।

আরাকানের জমি খুবই উর্বর। রেকর্ড অনুযায়ী ৯,৬৪, ২৫৭ একর আবাদ যোগ্য জমির মধ্যে প্রতিবছর ৮, ৫৪, ৮২৪ একর জমি চাষ করা হয় এবং বছরে এক ফসল ফলানো হয়ে থাকে। ১৯৮০-এর দশকে উৎপাদন হ্রাস পাওয়া সত্বেও এ অঞ্চলে বার্ষিক উদ্বৃত্ত ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় দুই লাখ টন। চল্লিশ বছর আগে আরাকান সাড়ে চার লক্ষ টন উদ্বৃত্ত ধান উৎপাদন করত। পৃথিবীর অনেক দেশে চাল রপ্তানী করত বলে ঐতিহাসিকভাবে আরাকান ধন্যাবতী নামে পরিচিত ছিল।[১১] ধান ছাড়াও আরাকানে মরিচ, তামাক, শিম, আখ, চীনাবাদাম, ঝিঙ্গে, ধনিয়া, সরিষা, নারিকেল, রসুন, পান, সুপারী, রাবার, গাঁজর, ভুট্টা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, আলু, বেগুন, টমেটো, আম, কাঁঠাল, বরই, পেঁপে, কলা, লিচু, কমলালেবু, বাতাবিলেবু, তরমুজ, জলপাই, প্রভৃতি সবজি, শস্য এবং ফলমূল জন্মে। এসব শাক-সবজি, শস্য ও ফলমূল ক্ষুদ্র পরিসরে চাষ করা হয়; এ ব্যাপারে কোন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যায় না। বরং অনেক মুসলমান ভূমি মালিককে বিতাড়িত করে সেখানে চাষাবাদের প্রতি অনাগ্রহী মগদের পুনর্বাসন করবার ফলে সাম্প্রতিক কালে উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

আরাকানে ৩৬০ মাইল ব্যাপী দীর্ঘ উপকূল মৎস সম্পদে সমৃদ্ধ। নাফ নদী ও কালাদান নদীর পাশ্ববর্তী চিংড়ি ঘেরগুলো থেকেও অনেক উন্নতমানের চিংড়ি উৎপন্ন হয়।[১২] বনাঞ্চল সমৃদ্ধ আরাকানে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নত মানের কাঠ উৎপন্ন হয়। এখানকার পাহাড়ি এলাকায় প্রাকৃতিকভাবেই উৎপন্ন সেগুন কাঠ বার্মার মোট

www.pathagar.com

উৎপাদনের ১৫%। তাছাড়া আরাকানের বনাঞ্চলে পিনকেডু নামে পরিচিত লোহা কাঠ (Iron Wood), বাঁশ, মধু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।[১৩]

আরাকানের জনসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক পরিসংখ্যান লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। রুদ্ধদার দেশ হিসেবে সেখানকার পরিস্থিতি এবং জনসংখ্যার বিন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই অস্পষ্টতা রয়েছে। তাছাড়া, স্বাধীনতা উত্তর মিয়ানমারের আরাকানে কোন আদম শুমারিও হয়নি। ফলে এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

প্রথমত, বাংলাদেশের কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা ও আরাকানের রোহিঙ্গা লেখকদের মতে আরাকানে মোট জনসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ। তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ রোহিঙ্গা; যা প্রায় সমগ্র জনগোষ্ঠীর ৬০%।[১৪]

দ্বিতীয়ত, আরাকানের মোট জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ, তন্মধ্যে ২০ লক্ষ মগ-বৌদ্ধ, ১৪ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমান, ৪ লক্ষ সর্বপ্রাণবাদী (Animists) এবং ২ লক্ষ হিন্দু ও খ্রিস্টান।[১৫]

তৃতীয়ত, U.S. Committee for Refugees এর ভাষ্য - Arakans Population is estimated to be 3 to 3.5 million persons of whom approximately 1.4 million are Rohingya.[১৬]

রোহিঙ্গা লেখকদের পরিসংখ্যানটি উত্তর আরাকান বিশেষত বুচিদং ও মংডু এলাকার রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাছাড়া তাদের হিসেব মোতাবেক প্রায় ৫ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিয়েছে এবং ১৯৪২ সালের পর থেকে রোহিঙ্গাদের একটি বড় অংশ নিহত হয়েছে এবং বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিসংখ্যানটিকে যথাযথ হিসেবে ধরে নেয়া যায়। কেননা ১৯১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী আকিয়াবের মুসলমান ছিল ৩৩%।[১৭] অনুরূপভাবে ১৯৩১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী আরাকানের লোক সংখ্যা হচ্ছে ১২,৯৯,৪১২ জন। তারমধ্যে বৌদ্ধ ৮,৭৮,২৪৪ জন, মুসলমান ৩,৮৮,২৫৪ জন, হিন্দু ৩,২৮১ জন, খৃস্টান ২,৭৫৩ জন এবং অন্যান্য ২৫,৮৮০ জন।[১৮] পক্ষান্তরে ২০১৬-১৭ সালের গণহত্যা চালিয়ে আরাকান থেকে প্রায় দশ লক্ষ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে অসংখ্য রোহিঙ্গা নাগরিককে। তদুপরি মোটামুটিভাবে বলা যায় বর্তমানে আরাকানের মোট ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার বসবাস রয়েছে।

২.২ আরাকান ও রোহিঙ্গা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রাচীনকালে আরাকানীরা তাদের জন্মভূমিকে রখইঙ্গ (Rakhaing) নামে অভিহিত করত;[১৯] যার অর্থ দৈত্য বা রাক্ষস বোঝা গেলেও তারা তাদের জন্মভূমিকে রক্ষইঙ্গতঙ্গী বা রাক্ষসভূমি নামে পরিচয় দিতে সংকোচ বা লজ্জাবোধ করে না। আর্য সমাজ তৎকালীন সময়ে দ্রাবিড়-মঙ্গল নিষাদ অধ্যুষিত আরাকান দেশের এরূপ একটা অপনামে অভিহিত করেছিল।[২০] রক্ষইঙ্গ শব্দটি মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখায় আরখং বা রাখাংগ রূপ লাভ করে। মীর্জা নাথানসহ মোগল ঐতিহাসিকগণ আরাকানকে আরখং বা রাখাংগ নামে

www.pathagar.com

অভিহিত করেন।[২১] কারো মতে আরাকান নামটি ইউরোপীয়দের দেয়া; এটি রক্ষইংগ, আরখং বা রাখাংগ থেকে আরাকানে পরিণত হয়।[২২]

খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে মারু ও কামরাজগজি বংশ স্বাধীনভাবে আরাকান শাসন করার পর ১৪৬ কিংবা ১৫১ খ্রিস্টাব্দের দিকে মগধ থেকে আগত চন্দ্র-সূর্য নামক এক সামন্ত সৈন্যবাহিনীসহ চট্টগ্রাম ও আরাকানে বসবাসকারী আদিম জাতির সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে সেখানে নতুন রাজ্যের গোড়া পত্তন করেন।[২৩] মগধ থেকে আগত হিন্দু ও বৌদ্ধ সেনারা নতুন রাজ্যের আদিম অধিবাসীদের আর্য ধর্মদর্শন সংস্কৃতি ও ভাষালিপিতে শিক্ষিত করে তোলে এবং কালক্রমে চট্টগ্রামে নিম্নবর্ণের হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি এবং আরাকানে বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়।

খ্রিস্টীয় তের শতক পর্যন্ত বর্তমান দক্ষিণ আরাকান 'স্যান্ডুয়ে' ও উত্তর আরাকান 'আরাকান' নামে খ্যাত হত। ১২৮৩ খ্রিস্টাব্দে পঁগা রাজ্যের পতন হলে আরাকানরাজ মেংদী স্যান্ডুয়ে দখল করে আরাকান রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান।[২৪] ১৪৬-১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে চট্টগ্রাম কখনো সম্পূর্ণ এবং কখনো আংশিকভাবে আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দে আরাকান রাজ্য স্থাপন করার সময় থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে বোধপায়া কর্তৃক দখল হবার পূর্ব পর্যন্ত আটটি স্থানে রাজধানী স্থাপন করে বিভিন্ন রাজবংশ কখনো স্বাধীন কখনো করদ রাজ্য হিসেবে আরাকান শাসন করেন। ধান্যবতীর চন্দ্র-সূর্য বংশের রাজত্বকালে একই সময় বৈশালীতেও চন্দ্র বংশের রাজারা শাসন করত। সারণি-১ এ আরাকানের প্রাচীন রাজবংশের নাম, তাদের শাসনকাল ও রাজধানীর নাম উল্লেখ করা হল; যাতে এক নজরে প্রাচীন আরাকানের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য ধারণা করা যায়।

সারণি-১

আরাকানের রাজবংশ, শাসনকাল ও রাজধানী[২৫]

রাজবংশ	রাজধানী	শাসনকাল	মন্তব্য
মারুবংশ	ধান্যবতী	খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬-৮৩৬ খ্রিস্টপূর্ব	স্বাধীন রাজা
কানরাজগজি	ধান্যবতী	খ্রিস্টপূর্ব ৮৩৬-১৪৬ খ্রিস্টপূর্ব	স্বাধীন রাজা[২৬]
চন্দ্র-সূর্যবংশ	ধান্যবতী	খ্রিস্টপূর্ব ১৪৬-৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ	স্বাধীন রাজা[২৭]
চন্দ্রবংশ	বৈশালী	খ্রিস্টপূর্ব ৬৩৮-৭২০ খ্রিস্টাব্দ	স্বাধীন রাজা
		৭৮৮-১০১৮ খ্রিস্টাব্দ	স্বাধীন রাজা[২৮]
পিনসা বংশ	পিনসা	১০১৮-১০৫৪ খ্রিস্টাব্দ	স্বাধীন রাজা
		১০৫৪-১১০৩ খ্রিস্টাব্দ	পঁগার করদ রাজা
পেরিন বংশ	পেরিন	১১০৩-১১৬৭ খ্রিস্টাব্দ	পঁগার করদ রাজা
কিরিত বংশ	কিরিত	১১৬৭-১১৮০ খ্রিস্টাব্দ	পঁগার করদ রাজা
পিনসা বংশ	পিনসা (পুন:)	১১৮০-১২৩৭ খ্রিস্টাব্দ	পঁগার করদ রাজা
লঙ্গিয়েত বংশ	লঙ্গিয়েত	১২৩৭-১২৭৯ খ্রিস্টাব্দ	করদ রাজা
		১২৭৯-১৪০৬ খ্রিস্টাব্দ	স্বাধীন রাজা
আরাকানী সরদার (চেংকা)	লঙ্গিয়েত	১৪০৬-১৪৩০ খ্রিস্টাব্দ	বর্মীরাজের অধীনে
ম্রাউক-উ	ম্রোহং	১৪৩০-১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ	স্বাধীন রাজা[২৯]

www.pathagar.com

ইসলামের আবির্ভাবের ৫০ বছরের (৬১০-৬৬০ খৃ.) মধ্যেই আরাকান এলাকায় মুসলমানদের আগমন শুরু হয়।[৩০] এ সময় থেকেই মুসলমানরা আরাকান থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব চীনের ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত নৌ-বাণিজ্য বহর নিয়ে যাতায়াত করতো। চীনের ক্যান্টনে মহানবী (সা.) এর একজন সাহাবির মাজার রয়েছে।[৩১] আরাকান-চীনের স্থলভাগে মুসলমানরা অনেক মসজিদ ও বাণিজ্য বন্দর স্থাপন করেছিলেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) এর রেওয়ায়েতে হিন্দের জনৈক বাদশা কর্তৃক মহানবী (সা.) এর কাছে হাদিয়া প্রেরণের একটি ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। হাদিসটির অর্থ, হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিন্দের জনৈক বাদশা রাসূল (সা.) এর কাছে এক পোটলা হাদিয়া প্রেরণ করেছিলেন; যার মধ্যে আদাও ছিল। তিনি সাহাবাদেরকে তার (আদার) এক এক টুকরা খেতে দিয়েছিলেন এবং (রাবি বলেন) আমাকেও এক টুকরা খেতে দিয়েছিলেন।[৩২] অনুরূপভাবে রুহমী রাজারা ইরানের বাদশাহর কাছেপূর্বকাল থেকেই মূল্যবান উপহার (হাদিয়া-তোহফা) পাঠাতো। সম্ভবত এ বংশেরই কোন রাজা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে হাদিয়া প্রেরণ করে ছিলেন।[৩৩]

নাঈম বিন হাম্মাদ এর উদ্ধৃতিতে রুহমী বাদশাহ কর্তৃক খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজকে চিঠি প্রেরণের তথ্য পাওয়া যায়। চিঠিতে বলা হয়েছে যে, রুহমী শাহেন শাহের পক্ষ থেকে-যিনি একজন হাজার বাদশাহর অধস্তন পুরুষ, যার স্ত্রীও হাজার বাদশাহর অধস্তন কন্যা এবং যার হাতিশালায় সহস্র হাতি, আর যার দু'টি নহর রয়েছে সেগুলোতে উদ উৎপন্ন হয়। এছাড়া কর্পুর, করমচা, বাদাম গাছও রয়েছে এবং যার প্রভাব প্রতিপত্তি ১২ শত মাইল দূর থেকেও পাওয়া যায়। এর পক্ষ থেকে আরবের বাদশাহ যিনি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেন না-তার প্রতি। অতঃপর আমি আপনার নিকট কিছু হাদিয়া প্রেরণ করেছি, বস্তুত এটি হাদিয়া নয় বরং কৃতজ্ঞতা। আমি আশা করি আপনি আমার নিকট এমন একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যিনি ইসলাম বুঝাবেন ও শুনাবেন। আস সালাম।[৩৪]

অনুরূপভাবে রুহমীর বাদশাহ কর্তৃক বাগদাদের খলিফা আবু আবদুল্লাহ আল মামুনের নিকট লিখিত চিঠি ও খলিফা মামুন কর্তৃক তাঁর প্রতি উত্তরের কথাও জানা যায়।[৩৫] "আল মাসুদী 'রুহমীকে' রাজার ধারণকৃত উপাধি বলে উল্লেখ করেন।[৩৬] এম. এ. রহীম বলেন, রুহমী শব্দটি রামু থেকে উৎগত। রামু ও আরাকানের মধ্যবর্তী স্থানকে রুহমী বলা হয়।[৩৭]

চন্দ্র-সূর্য বংশের প্রথম রাজা মহৎইঙ্গচন্দ্র (Mohataing Chandra 788-810) ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে বৈশালীতে রাজধানী স্থাপন করেন এবং তাঁর শাসনামলের শুরুতেই ইসলাম প্রচারের ব্যাপক সুযোগ পেয়ে আরব মুসলিম বণিকগণ রাহাম্ব্রি বন্দরসহ নৌবন্দরসমূহে ব্যাপকভাবে বাণিজ্য ও ইসলাম প্রচার মিশন পরিচালনা করে।[৩৮] এ অবস্থায় অষ্টম শতাব্দী থেকে আরাকান ও মেঘনা নদীর পূর্বতীরবর্তী বিস্তৃর্ণ ভু-ভাগে আরবীয় বণিকদের কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।[৩৯]

www.pathagar.com

পিনসা বংশীয় রাজা পুন্যাখ এর রাজত্বকালে ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে পঁগা রাজবংশ আরাকান দখল করে করদরাজ্যে পরিণত করে। এ সময় হতে কিছু কিছু মুসলমান পঁগা রাজাদের দেহরক্ষী ও সৈনিকের কাজ করত এবং বণিক, সৈনিক ও নাবিক হিসেবে তারা আরাকানে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে ছিল। তাদের জাহাজ মেরামত করার জন্য কিংবা মৌসুমী হাওয়ার অপেক্ষায় ছয় মাসের অধিককাল এখানে অবস্থান করতে হতো। দূরবর্তী বাণিজ্য মিশনে তারা স্ত্রীদের সাথে আনতো না। পক্ষান্তরে ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে অবৈধভাবে যৌন প্রয়োজন মিটানোও সম্ভব ছিলনা বলে তারা স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করত। স্বদেশে ফিরে যাবার সময় বার্মা আইনে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল বলে মুসলমান বণিকগণ এখানেই দ্বিতীয় আবাস হিসেবে বসতি স্থাপন করত এবং এ সূত্রে অনেকেই স্থায়ী আবাস গড়ে তুলতো।[৪০] ফলে মুসলমানদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দশম ও একদশ শতাব্দীতে আরব বণিক ও সুফি-দরবেশদের মধ্যে বদরুদ্দিন (বদর শাহ)[৪১] নামে জনৈক পির আরাকান অঞ্চলে আসেন এবং ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁর নামানুসারে আসামের সীমা থেকে শুরু করে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত নানা স্থানের নাম বদর মোকাম এবং এ নামে বিভিন্ন স্থানে মসজিদও নির্মিত হয়েছে।[৪২] অদ্যাবধি মাঝি-মাল্লা ও নাবিকরা বদরকে মাঝি-মাল্লার রক্ষাকর্তা, 'দরিয়াপির' বলে স্মরণ করে থাকে। লোকগীতিতেও[৪৩] শাহ বদরের নাম নিয়ে মাঝি-মাল্লাদেরকে চলার নির্দেশিকা দেয়।

সে সময় মুসলমানগণ এতটা জনপ্রিয় ছিল যে, তারা বাণিজ্য বিস্তারের পাশাপাশি ইসলামের সুমহান ঔদার্য রাজশক্তি ব্যতিত সকল স্তরকেই প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এমন কি বার্মা থেকে শত শত নির্যাতিতা মহিলা আরাকানের মুসলমানদের নিকট নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় নিতে আসতো।[৪৪]

রোহিঙ্গা শব্দের উৎপত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ নানা মত প্রকাশ করেছেন। আখতারুজ্জামানের মতে, রোহিঙ্গা নামের উৎপত্তি রাখাইন শব্দ থেকে যথা-রাখাইন >রোয়াং > রোহিঙ্গা।[৪৫] রোয়াং তিব্বতী শব্দ যার অর্থ আরাকান, অদ্যাবধি চট্টগ্রাম জেলায় রোয়াং এবং রোয়াইঙ্গা বা রোহিঙ্গা দ্বারা যথাক্রমে আরাকান ও আরাকানের অধিবাসীকে বুঝায়।

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান এবং আরও অনেকে মনে করেন, রহম থেকে রোহিঙ্গা হয়েছে; যথা-অষ্টম শতাব্দীতে আরাকানে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের শাসনামলে বৈশালী ছিল তাদের রাজধানী। সে সময় চন্দ্রবংশীয় রাজা মহৎ-ইঙ্গ-চন্দ্রের রাজত্বকালে (৭৮৮-৮১১ খৃ.) কয়েকটি আরবীয় মুসলিম বাণিজ্য বহর রামব্রী দ্বীপের পাশে বিধ্বস্ত হলে জাহাজের আরোহীরা রহম' (দয়া), রহম' বলে চিৎকার করে। এ সময় স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে এবং আরাকানরাজ তাদের বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত আচরণে মুগ্ধ হয়ে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি দেন। আরবি ভাষায় অনভিজ্ঞ স্থানীয় লোকজন

www.pathagar.com

তাদেরকে রহম জাতির লোক মনে করে রহম বলে ডাকতো।[৪৬] পরবর্তী কালে রহম কথাটি বিকৃত হয়েই রহম > রোঁয়াই >রোয়াই>রোয়াইঙ্গা বা রোহিঙ্গা নামে খ্যাত হয়।

আরাকানের বিতাড়িত রাজা নরমিখলা ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহের সহায়তায় হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে মুহাম্মদ সোলায়মান শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন এবং লংগিয়েত থেকে রাজধানী স্থানান্তর করে লেম্ব্রু (Lembru) নদীর তীরে ম্রোহং (Mrohaung)[৪৭] নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করে রাজত্ব করতে থাকেন।[৪৮] এ মোহং শব্দটি মুসলমানদের লেখায় রোসাংগ[৪৯] লিখিত হয়। চট্টগ্রামের লোকদের নিকট রোসাংগ শব্দটি রোয়াং বা রোহাং নামে পরিচিত। এ রোয়াং বা রোহাং শব্দটি বিকৃত হয়ে রোহিঙ্গা নামে পরিচিতি লাভ করে। মোট কথা আরাকানের সর্বশেষ রাজধানী হচ্ছে ম্রোহং; এর মুসলিম উচ্চারণ হলো রোহাং। এ রোহাংয়ের মুসলিম অধিবাসীদেরকে রোহিঙ্গা বলা হয়।[৫০] সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী থেকে আরবীয় বাণিজ্য বহরের মাধ্যমে আরাকানে ইসলামের দাওয়াত পৌছলেও মূলত ১৪৩০ সালের পর নরমিখলা ওরফে সোলায়মান শাহের শাসনকাল থেকেই রাস্ট্রীয়ভাবে রোহিঙ্গাদের বিকাশ শুরু হয়।

আরাকানরাজ নরমিখলা (Narameikhla) ১৪০৪ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে অনন্থিউ (Ananthiu) নামক জনৈক সামন্তরাজের বোন চৌবোঙ্গিকে (Tsaubongyo) বলপূর্বক গ্রহণ করলে অননথিউ বোনের প্রতি এ অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার মানসে বর্মীরাজ মেঙশোওয়াই (Mengtswai ১৪০১-১৪২২ খৃ.) এর নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করে। তিনি ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান আক্রমণপূর্বক রাজা নরমিখলাকে পরাজিত করেন। নরমিখলা পলায়ন করে বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের নিকট সাহায্য প্রার্থী হন এবং তিনি তাঁকে সাদর-সম্মানে গ্রহণ করে আশ্রয় দান করেন।[৫১]

নরমিখলার রাজ্য আক্রমণের পিছনে আরো অন্য কারণ পাওয়া যায়, সম্পূর্ণভাবে শান্তি পূর্ণ উপায়ে ইসলাম প্রচারিত হবার কারণে আরাকানের শাসকদের সাথে মুসলমানদের তেমন কোনই বিরোধ ছিল না। হিন্দু ও মুসলমানদের উপস্থিতিতে বৌদ্ধরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার চেয়ে সহযোগিতার ভিতর দিয়েই স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করতো। কিন্তু মুসলমানদের উত্তরোত্তর প্রভাব বৃদ্ধির ফলে বৌদ্ধরা আস্তে আস্তে মুসলমানদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করে। তদুপরি রাজা স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েও মুসলমানদের প্রতি প্রকাশ্য সহানুভূতি প্রদর্শন স্থানীয় বৌদ্ধরা মোটেই পছন্দ করেনি। মূলত রাজা নরমিখলার মুসলিম প্রীতির কারণেই তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে এবং কয়েকজন সামন্ত রাজা নরমিখলার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে অস্বীকার করে। ও সকল রাজাই আরাকানে বার্মার হস্তক্ষেপ কামনা করে।[৫২]

নরমিখলাকে সাহায্য করার আগেই গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ মৃত্যুবরন করেন এবং স্বীয় পুত্র সাইফ উদ্দিন হামজা শাহ সিংহাসনে বসেন।[৫৩] মন্ত্রী গণেশ ষড়যন্ত্রপূর্বক

www.pathagar.com

সুলতানের কৃতদাস শিহাব উদ্‌দীন এর মাধ্যমে তাঁকে হত্যা করে অতঃপর কুটকৌশলে পর্যায়ক্রমে বাংলার সিংহাসন থেকে ইলিয়াসশাহী বংশ ও বায়েজীদ শাহী বংশকে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে উৎখাত করে ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে দণুজ মর্দন দেব উপাধি গ্রহণপূর্বক গণেশ বাংলার সিংহাসনে বসেন এবং মুসলমানদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালাতে থাকেন। দরবেশ নূর কুতুবুল আলমের আহ্বানে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শর্কী গৌড় আক্রমণ করলে রাজা গণেশ বাধ্য হয়ে নূর কুতুল আলমের সাথে আপোষ করে নিজ পুত্র যদুর অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। যদু মুসলমান হয়ে জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করেন এবং কুতুবুল আলমের অনুরোধে সুলতান ইব্রাহীম শর্কী স্বরাজ্যে ফিরে যান। নূর কুতুবুল আলমের মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় পুত্র জালালুদ্দীন মোহাম্মদ শাহকে জোরপূর্বক বন্দী ও ধর্মান্তরীত করে নিজে সিংহাসনে আরোহন করেন। ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা গণেশের মৃত্যু হলে তার অপর ছেলে মহেন্দ্র দেব বাংলার সিংহাসনে বসেন। কিন্তু মন্ত্রীরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহকে মুক্ত করেন এবং তিনি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন।[৫৪] ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইব্রাহীম শর্কী পুনরায় বাংলা আক্রমণ করলে নরমিখলা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহকে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা প্রদান করে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। সেই সাথে তিনি অন্তর্বতীকালীন দীর্ঘ ২৪ বছরে আল্লাহর একত্ববাদসহ অংকশাস্ত্র এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক জ্ঞান অর্জন করেন।[৫৫]

এদিকে বর্মীরাজ স্বীয় জামাতা কমারুকে অন'রাটা উপাধি দিয়ে আরাকানের সিংহাসনে বসান।[৫৬] পেগুঁরাজ আরাকান আক্রমণ করে নতুন রাজা অনুরোথকে প্রথমে বন্দী ও পরে হত্যা করেন। বর্মীরাজ পুনরায় আরাকান আক্রমণ করে বিজয়ী হন এবং আরাকানী সরদার চেংকাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।[৫৭]

জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে ওয়ালী খাঁ (বর্মী ইতিহাসে উলু-খেঙ=Ulu-Kheng) কে নরমিখলার সাথে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ২০,০০০ (বিশ হাজার) সৈন্যসহ প্রেরণ করলে ওয়ালী খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে চেংকা (Tsenka) নামক জনৈক সামন্তের সাথে যোগসাজসে নরমিখলাকে বন্দী করে।[৫৮] নরমিখলা কৌশলে গৌড়ে পালিয়ে এলে সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ সেনাপতি সিন্ধি খানের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার সৈন্য দিয়ে ওয়ালী খানকে শায়েস্তা করে স্বদেশভূমি উদ্ধারের জন্য নরমিখলার সাহায্যে প্রেরণ করেন। তিনি বিশ্বাসঘাতক ওয়ালী খাঁকে পরাজিত ও হত্যা করে তার মাথা কেটে, গায়ের চামড়া খুলে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দেন।[৫৯] নরমিখলা সোলায়মান শাহ নাম ধারণ করে আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে লঙ্গিয়েত থেকে ম্রোহং এ রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং বাংলার করদ রাজা হিসেবে শাসন কার্য পরিচালনা করতে থাকেন।[৬০] তাঁর সাথে বাংলা থেকে দু'পর্বে আগত সৈন্যদের অনেকেই স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করে আরাকানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। নরমিখলা প্রথমত, স্বীয় রাজধানী সুরক্ষিত করার মানসে তার রাজধানীর পূর্ব-দক্ষিণে

www.pathagar.com

সেনা ছাউনি তৈরি করে সৈনিকদের অনেককেই পুনর্বাসন করেন এবং গৌড়ীয় স্থাপত্যরীতিতে সন্দিকান বা সিদ্ধিখান মসজিদ নির্মাণ করেন।[৬১] পরবর্তীকালে তাদের বংশ বিস্তারের ফলে সেখানকার রওয়ানা, নেদানপাড়া, মোয়াল্লেম পাড়া, সাম্পুরিক, কুয়িপাড়া, কামারপাড়া প্রভৃতি মুসলমান জনপদ গড়ে উঠেছিল। এ সব এলাকায় সাতটি পাকা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, বার্মা রাজ্যের সীমান্তবর্তী দক্ষিণ আরাকানের স্যান্ডুয়ে (চাঁদা ও চকপেয় কেপ্রু) সীমান্তে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে সেখানে বাংলা থেকে আগত সেনাদের জন্য দু'টি সেনানিবাস স্থাপন করেন। তারাও মগরমণী বিয়ে করে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। তাদের বংশ বিস্তারের ফলে পরবর্তীকালে স্যান্ডুয়ের শুয়েজুবি, চানবি, নাজবি, জাদি, পেরাং, চাংদয়ক, থাড়ে, ছায়াডো, সিবিন ও চকপিয়ুর চৌকনেমু, ছনে, জালিয়া পাড়া, মেহেরবণ্ প্রভৃতি মুসলিম জনপদ গড়ে উঠেছিল। এ জনপদগুলো কালাপাঞ্চন, কোয়ালং, গৌলংগী নামে খ্যাত।[৬২] এছাড়া নরমিখলা আরাকান জয়ের পর চট্টগ্রাম থেকে অনেক মুসলমান সেখানে গিয়ে স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করে অনাবাদী অঞ্চলে স্থায়ী আবাস গড়ে কৃষি কাজ শুরু করেছিল।[৬৩] তাছাড়া ১৫৭৫-৭৬ সালে গৌড় ধ্বংসকালে বাংলার মুসলমান চক্রশালা হয়ে ম্রোহংয়ে উপস্থিত হয়; যাদের মধ্যে কররাণী সুলতানের আমির ওমরা প্রভৃতি সম্মানীয় ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁরা সেখানে যথাযথ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন।[৬৪]

সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার পর নরমিখলা চার বছর (১৪৩০-১৪৩৪ খ্রি.) রাজত্ব করেন। এ সময় থেকে আরাকানরাজ নরমিখলা বাংলার সুলতানদের মত তাঁদের মুদ্রার এক পৃষ্ঠায় ফারসি অক্ষরে কালেমা ও মুসলমানি নাম লেখার রীতি চালু করেন। তাঁর পরবর্তী রাজাগণ বাংলার অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েও মুদ্রার এক পৃষ্টে ফারসি অক্ষরে কালেমা ও বৌদ্ধ নামের সঙ্গে মুসলমানি নাম ব্যবহার করতেন।[৬৫] নিম্নে সারণি- ২ এ আরাকান রাজাদের মুসলমানী ও বৌদ্ধ নাম এবং তাদের শাসনকাল উল্লেখ করা হল; যা আরাকানে মুসলিম প্রভাব প্রতিপত্তির স্বাক্ষর বহন করে।

সারণি-২

আরাকান রাজাদের মুসলমানি ও বৌদ্ধনামের তালিকাসহ শাসনকাল[৬৬]

	মুসলিম নাম	বৌদ্ধ নাম	শাসনকাল
১.	সোলায়মান শাহ/ সমুনখান	নরমিখলা (Narameekhla)	১৪৩০-১৪৩৪ খৃ.
২.	আলী খান	মিনখরী (Min Kheiri)	১৪৩৪-১৪৫৯ খৃ.
৩.	কলিমা শাহ	বচৌপিউ (Basawpya)	১৪৫৯-১৪৮২ খৃ.
৪.	মাথু/মাউকোশাহ	দাউলি (Doulya)	১৪৮২-১৪৯২ খৃ.
৫.	মুহাম্মদ শাহ	বাসাউনিউ (Ba-Saw-Nyo)	১৪৯২-১৪৯৩ খৃ.
৬.	নূরী শাহ	রানাউনং (Ran Aung)	১৪৯৩-১৪৯৪ খৃ.
৭.	শেখ মাদল্লাহ শাহ	সলিংথু (Salingathu)	১৪৯৪-১৫০১ খৃ.
৮.	ইলি শাহ	মেংরাজা (Meng Raza)	১৫০১-১৫২৩ খৃ.

www.pathagar.com

মুসলিম নাম	বৌদ্ধ নাম	শাসনকাল
৯. ইলিয়াস শাহ	কাছাবাদী (Kasabadi)	১৫২৩-১৫২৫ খৃ.
১০. জালাল শাহ	মিনসোয়াও (Meng Saw Oo)	১৫২৫-১৫২৫ খৃ.
১১. আলী শাহ	থাতাজা (Thatasa)	১৫২৫-১৫৩১ খৃ.
১২. জবৌক শাহ	মিনবিন (Min-bin)	১৫৩১-১৫৫৩ খৃ.
১৩. সিকোন্দার শাহ	মেংফলৌং (Meng-phalaung)	১৫৭১-১৫৯৩ খৃ.
১৪. সেলিম শাহ (১ম)	মিন রাজা গ্যি (Meng Radza gyi)	১৫৯৩-১৬১২ খৃ.
১৫. হুসাইন শাহ	মিং খা মৌং (Meng Kha Moung)	১৬১২-১৬২২ খৃ.
১৬. সেলিম শাহ (২য়)	থিরি থু ধম্মা (Thiri Thu dhamma)	১৬২২-১৬৩৮ খৃ.
১৭. দুষ্পাঠ্য ফারসি নাম	নরপদিগ্যি (Narapadigyi)	১৬৩৮-১৬৪৫ খৃ.

১৪৩০-১৬৪৫ সাল পর্যন্ত দু'শো পনের বছর যাবৎ স্বাধীন আরাকানের রাজাগণ তাঁদের মুদ্রায় মুসলমানি নাম ব্যবহার করলেও এ দীর্ঘ সময় বাংলার মুসলমান শাসকদের সাথে তাদের মোটেই সদ্ভাব ছিল না। অথচ তাঁরা দেশে মুসলমানি রীতিনীতি ও আচার পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে মেনে আসছিল। কারণ আরাকান রাজাগণ তাঁদের নিজস্ব সভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি, ও আচার ব্যবহারের চেয়ে মুসলমানদের সভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি ও আচার ব্যবহার অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত হিসেবে পেয়েছিল। বাংলার মুসলমান রাজশক্তির সাথে তাঁদের বিরোধ থাকলেও মুসলমান জাতির প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ ছিল না। তাই তাঁদের সৈন্যবিভাগের প্রধান সেনাপতি থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক বিশিষ্ট বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার পদ পর্যন্ত মুসলমানদের হাতে সমর্পণ করেছিলেন।[৬৭]

নরমিখলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আরাকানের ম্রাউক-উ-রাজবংশকে অনেক গবেষকই বিভিন্ন পর্যায় পর্যন্ত "আরাকানে মুসলিম শাসনের যুগ" বলে উল্লেখ করেন। মুসলিম শাসনের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ৯৫৭-১৪৩০ সাল পর্যন্ত আরাকানকে তাঁরা বৌদ্ধ রাষ্ট্র মনে করেন।[৬৮] তাঁদের মতে বিভিন্ন সময়ে মুসলমানরা বিভিন্নভাবে ইসলাম প্রচারের কাজকে তরান্বিত করে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই তাঁরা 'সালতানাত' গঠনের মত শক্তি সামর্থ অর্জন করে ইসলামের যুগস্রষ্টা ও শক্তিশালী মূল্যবোধকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৬৯] ১৪৩০-১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের এ দু'শো আট বছরকে আরাকানের মুসলিম শাসনের স্বর্ণযুগ বলা যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ ও পর্তুগিজ নির্বিশেষে সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল যে, আরাকান একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলিম শাসনামলের দু'শো বছরে আরাকানে শুধু মুসলমানদেরই নয় বরং সকলের ভাগ্যের উন্নতি ঘটেছিল। বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক বেড়েছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল; ফলে বিভিন্ন দেশের লোকজন ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য আরাকানে এসে ভিড় করেছিল। বস্তুতঃপক্ষে বাংলা-বার্মার রাজা ও সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আরাকানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।[৭০] ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা এতদূর এগিয়েছিল যে, কোন মুসলিম রাজার সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে অভিজ্ঞ আলেমের নিকট দশ বছরকাল কুরআন হাদিস শিক্ষা নিয়ে ইসলামি জ্ঞানে গ্রাজুয়েশন থাকতে হতো। তখন আরাকানের জাতীয় পতাকা, মুদ্রা ও পদকে ঈমানের চিহ্ন স্বরূপ

www.pathagar.com

কালেমা এবং পৃথিবীর উপর আল্লাহর শাসন কায়েমের অর্থবহনকারী 'আকিমুদ্দীন' এর ছাপ থাকতো, রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ফার্সি গ্রহণ করা হয়েছিল যা ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ আরাকানে বৃটিশ শাসনাধীনে আসার পরও ২২ (বাইশ) বছর পর্যন্ত চালু ছিল।[৭১]

আরাকানের রাজ দরবার ছিল মুসলিম অমাত্য, কাজি ও কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। রাজনীতি, সমরনীতি, দরবারের আদব কায়দায় তাই ইসলামি রীতি-পদ্ধতি অনুসৃত হতো। তাছাড়া সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনেও ইসলামি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেখানে যে পর্দা প্রথার প্রচলন শুরু হয়- তা খাঁটি আরবীয় মুসলমানদের সংশ্রবের ফল। নৌ বিদ্যায় প্রাচীনকালে আরবীয় মুসলমান বণিকরা দক্ষ ছিলেন-তাঁদের সংশ্রবে সেখানকার মুসলমানরাও নৌবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। এ এলাকার বিভিন্ন জায়গার আরবি নাম, কাব্যরীতিতে আরবি ভাষার প্রয়োগ এ সবই আরবি প্রভাব প্রসুত।[৭২] ম্রাউক-উ-রাজবংশের রাজাগণ ১৪৩০-১৭৮৫ খ্রি. পর্যন্ত ৩৫৫ বছরকাল আরাকানে রাজত্ব করেন।[৭৩] তাদের মধ্যে ১৭ জন রাজার মুসলমানি নাম পাওয়া যায়; যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে সারণি- ৩ এ ১৬৪৫-১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবশিষ্ট রাজাদের তালিকা পেশ করা হল।

সারণি-৩

১৬৪৫-১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরকান রাজাদের তালিকা[৭৪]

ক্র. নং	রাজার নাম	শাসনকাল
১.	রাজা থদো (Raza Thado)	১৬৪৫-১৬৫২ খ্রিস্টাব্দ
২.	সান্দা-থু ধম্মা (Sanda-Thu Dhamma)	১৬৫২-১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ
৩.	থিরিথুরিয়া (Thirithuriya)	১৬৮৪-১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দ
৪.	ওয়ারা ধম্মা রাজা (Waradamma Raza)	১৬৮৫-১৬৯২ খ্রিস্টাব্দ
৫.	মুনি থু ধম্মা (Muni Thudhamma)	১৬৯২-১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দ
৬.	সান্দা থুরিয়া ধম্মা (Sanda Thuriya Dhamma)	১৬৯৪-১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দ
৭.	নওরাতাজ (Nawrahtazaw)	১৬৯৬-১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দ
৮.	ময়ুক পিউ (Mayokpiya)	১৬৯৬-১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দ
৯.	কালামনদাত (Kalamandot)	১৬৯৭-১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দ
১০.	নরাধিপতি (Naradipati)	১৬৯৮-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ
১১.	সান্দা উইমালা (Sandawimala)	১৭০০-১৭০৬ খ্রিস্টাব্দ
১২.	সান্দা থুরিয়া (Sanda Thuriya)	১৭০৬-১৭১০ খ্রিস্টাব্দ
১৩.	সান্দা উইজা (Sanda Wizaya)	১৭১০-১৭৩১ খ্রিস্টাব্দ
১৪.	সান্দা থুরিয়া (Sanda Thuriya)	১৭৩১-১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দ
১৫.	নরধিপতি (Naradipati)	১৭৩৪-১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দ
১৬.	নরপাওয়ারা (Narapawara)	১৭৩৪-১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দ
১৭.	সান্দা ইউজ্যা (Sandawiziya)	১৭৩৭-১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দ
১৮.	খাতেয়া (Khatya)	১৭৩৭-১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দ
১৯.	মাদারিত (Madarit)	১৭৩৭-১৭৪২ খ্রিস্টাব্দ

www.pathagar.com

ক্র. নং	রাজার নাম	শাসনকাল
২০.	নরাপায়া (Narapaya)	১৭৪২-১৭৬১ খ্রিস্টাব্দ
২১.	থিরিথু (Thirithu)	১৭৬১-১৭৬১ খ্রিস্টাব্দ
২২.	সান্দা পায়ামা (Sanda Payama)	১৭৬১-১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ
২৩.	আপায়া (Apaya)	১৭৬৪-১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ
২৪.	সান্দা থুমানা (Sanda Thumana)	১৭৭৩-১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দ
২৫.	সান্দা উইমালা (Sanda Wimala)	১৭৭৭-১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দ
২৬.	সান্দা থাডিয়া (Sanda Thadiya)	১৭৭৭-১৭৮২ খ্রিস্টাব্দ
২৭.	থামাডা (Thamada)	১৭৮২-১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ

উল্লেখ্য, ম্রাউক-উ-রাজবংশের রাজাগণ ১৪৩০-১৭৮৫ খ্রি. পর্যন্ত শাসনামলে সিংহাসনে আরোহণকালে তিন প্রকার উপাধি গ্রহণ করতেন।

প্রথমত, ১৪৩০-১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ নরমিখলা থেকে নরপদিগ্যি পর্যন্ত শাসকগণ নিজেদের আরাকানী নামের সাথে মুসলমানি নাম উপাধি হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং তাঁদের প্রচারিত মুদ্রার এক পৃষ্ঠায় আরবি অক্ষরে গ্রহণকৃত মুসলমানি নাম এবং অন্যপৃষ্ঠায় কালেমা উৎকীর্ণ করতেন।[৭৫]

দ্বিতীয়ত, ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ মিন রাজাগ্যি থেকে নরপদিগ্যি পর্যন্ত এ বংশের পাঁচজন রাজা সৌভাগ্যের প্রতীক শ্বেত হস্তির মালিক হয়ে নিজেদের আরাকানী নাম ও মুসলমানি নামের সাথে 'শ্বেত গজেশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের প্রচারিত মুদ্রায় এক পৃষ্টে মুসলমানি নাম ও উপাধি অন্যপৃষ্ঠায় কালেমা উৎকীর্ণ করতেন। কিন্তু রাজা থদো (১৬৪৫-১৬৫২ খ্রি.) মুসলমানি নাম, উপাধি ও আরবি অক্ষরে মুদ্রা উৎকীর্ণ করার প্রথা বাতিল করে শুধু 'শ্বেতরক্ত গজেশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

তৃতীয়ত, রাজা সান্দা থু ধাম্মা (১৬৫২-১৬৮৪) পৈত্রিক ও পূর্বোক্ত উপাধি বাদ দিয়ে 'সুবর্ণ প্রাসাদের অধীশ্বর' নামক একটি নতুন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এরপর আর কারো কোন উপাধি গ্রহণের কথা জানা যায় না।[৭৬]

ম্রাউক-উ-রাজবংশ ছিল আরাকানের জন্য বিশেষত আরাকানী মুসলমানদের জন্য আশির্বাদ। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ম্রাউক-উ-রাজবংশ বিশেষ করে ১৪৩০ থেকে ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ অবধি দু'শো চুয়ান্ন বছর শাসনামলে শাসকদের বিজ্ঞতাও যেমন ছিল, তেমনি ছিল ইসলাম প্রিয়তা। তাঁরা বাঙালী, আরবীয়, ইরানী, কিংবা আরাকানী সব মুসলমানকে প্রধানমন্ত্রী, সৈন্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, কাজি, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও নিম্নশ্রেণির কর্মচারী পর্যন্ত যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দান করে রাজ্যের উন্নতি বিধানে তৎপর ছিলেন। উক্ত সময়ে আরাকান রাজসভার অমাত্যবর্গ, কাজি ও উচ্চ নিম্ন পদস্থ কর্মচারীদের অধিকাংশের নাম, পরিচয়, ইতিহাস সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। কেবল ১৬২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের আরাকান রাজসভার কবিদের

www.pathagar.com

কাব্যের প্রারম্ভে বর্ণিত রাজ-প্রশস্তির বিবরণ সূত্রে তাঁদের পরিচয় জানা যায়। নিম্নে সারণি-৪-এ আরাকানের মুসলিম মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীদের তালিকা উল্লেখ করা হল।

সারণি-৪

আরাকানে মুসলিম প্রধানমন্ত্রী-মন্ত্রীদের নাম ও সময়কাল[৭৭]

ক্র.নং	নাম	পদ	সময়কাল
১.	আশরাফ খান	লস্কর উজির বা প্রতিরক্ষামন্ত্রী	রাজা থিরি থু ধম্মার শাসনামলে (১৬২২-১৬৩৮)
২.	বড় ঠাকুর	ঐ	নরপতিগ্যির শাসনামলে (১৬৩৮-১৬৪৫)
৩.	মাগন ঠাকুর	প্রধানমন্ত্রী	থদোমিন্তার শাসনামলে (১৬৪৫-১৬৫২)
৪.	মোহাম্মদ সোলায়মান	ঐ	সান্দা থু ধম্মার শাসনামলে (১৬৫২-১৬৮৪)
৫.	সৈয়দ মুসা	ঐ	ঐ
৬.	নবরাজ মজলিশ	ঐ	ঐ
৭.	সৈয়দ মোহাম্মদ খান	সৈন্যমন্ত্রী	ঐ

উল্লেখ্য, সারণিতে উদ্ধৃত মন্ত্রীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি কাব্য-কথার ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হলো:

প্রথমত, আশরাফ খান আরাকান রাজ থিরি থু ধম্মার (১৬২২-১৬৩৮ খ্রি.) লস্কর উজির অর্থাৎ প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তাঁর অনুরোধ ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবি দৌলতকাজী 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যগ্রন্থটি রচনায় হাত দেন। কবি তাঁর কাব্যে লস্কর উজির আশরাফ খান সম্পর্কে লেখেন-

ধর্ম পাত্র শ্রীযুক্ত আশরাফ খান
হানাফি মজাব ধরে চিশতি খান্দান

....

মসজিদ পুস্কর্নী দিলা বিবিধ বিধান
মক্কা মদীনাতে গেল প্রতিষ্ঠা বাখান।

....

শ্রী আশরাফ খান লস্কর উজীর
যাহার প্রতাভাবজ্রে চূর্ণ অরিশির। (সতীময়না) [৭৮]

দ্বিতীয়ত, বড় ঠাকুর আরাকান রাজ নরপতিগ্যির (১৬৩৮-১৬৪৫) লস্কর উজির ছিলেন। তাঁর পিতামহ বাংলা থেকে এসে চক্রশালায় বসবাস স্থাপন করেছিলেন- সেখান থেকে তাঁরা আরাকানে আসেন। বড় ঠাকুরের ইসলামি নাম জানা যায় না; এটা ছিল তাঁর রাজ প্রদত্ত উপাধি। তাঁর সম্পর্কে কবি আলাওল লিখেছেন,

রাজ্যপাল সৈন্যমন্ত্রী আছিলেন তাত
শ্রী বড় ঠাকুর নাম জগৎ বিখ্যাত।[৭৯]

www.pathagar.com

তৃতীয়ত, বড় ঠাকুরের পুত্র মাগন ঠাকুর আরাকানরাজ নরপতিগ্যির আমলে মন্ত্রী, তাঁর কন্যার অবিভাবক, থদোমিন্তার (১৬৪৫-৫২) আমলে প্রধানমন্ত্রী এবং থদোমিন্তার শিশুপুত্র সান্দা থু ধম্মার (১৬৫২-১৬৮৪ খ্রি.) আমলে শিশু রাজার প্রধান মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বপালন করে ১৬৫৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি ছিলেন ধর্মভীরু মুসলমান। তাঁর পির ছিলেন শাহ মাসুম, মন্ত্রী সোলায়মান ছিলেন মাগনের পিরভাই।[৮০] কবি আলাওল পদ্মাবতী ও সয়ফুল মুলক কাব্যের ভূমিকায় লেখেন

মুখ্য পাঠেশ্বরীর অমাত্য মহাজন
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ঠাকুর মাগন।

....
সিদ্দিক বংশেত জন্ম শেখ জাদা জাত
কুলশীল সৎকর্মে ভূবন বিখ্যাত।

....
ভীনদেশী যথেক আলেম গুণবন্ত
মান্যকরি আনি নিত্য আদরে পূজন্ত।
(সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল) [৮১]

চতুর্থত, মাগন ঠাকুরের মৃত্যুর পর সান্দা থু ধম্মার শাসনামলে সোলায়মান প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।[৮২] তবে রাজকোষ এবং কর্মকর্তা / কর্মচারী নিয়োগ তাঁর হাতেই ন্যস্ত ছিল।

পঞ্চমত, সিলেট বিজয়ী সৈয়দ নাসির উদ্দীনের বংশধর সৈয়দ মুসা রাজা সান্দা থু ধম্মার শাসনামলে আরাকানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কবি আলাওল তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল কাব্যের শেষাংশ রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রশসংসায় কবি লেখেন-

সৈয়দ মুসা এক পুরুষ মহন্ত
অভিন্ন বদনরূপ মহাগুনবন্ত।।[৮৩]

ষষ্ঠত, সৈয়দ মুসার পরে নবরাজ মজলিশ বা মজলিশ কুতুব (১৬৭৩ খৃ.) সান্দা থু ধম্মার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।[৮৪] তার সম্পর্কে মহাকবি আলাওল লেখেন -

শ্রীমন্ত মজলিশ অতুল মহত্ব
নবরাজ পাইয়া যদি হৈল মহামাত্য।।[৮৫]

এছাড়াও, সৈয়দ মুহাম্মদ খান সান্দা থু ধম্মার আমলে সৈন্য মন্ত্রী ছিলেন।[৮৬]

পিরকাজী ছউদ শাহ আরাকানের প্রধান কাজি ছিলেন এবং গাওয়াকাজী, নালা কাজী, কাজী সউদ, আবদুল করিম, মোহাম্মদ হোসেন, ওসমান, আবদুল জব্বার, আবদুল গফুর, মোহাম্মদ ইউসুফ, নূর মোহাম্মদ, রওশন আলী প্রমুখ বিভিন্ন স্তরের অমাত্য ও কাজি

www.pathagar.com

ছিলেন।[৮৭] সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রধান সেনাপতি ছিলেন ক্বাইমের হ্রেলা, বলদিপাড়ার বুমিং এবং বন্দরের আলিয়া বাইং প্রমুখ। বর্মীরাজ বাজিদের (১৮১৯-১৮৩৭) রাজত্বকালে আরাকানে মালের উজির ও টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন শোঁয়ে বঁইয়া; বন্দর কসরায় তাঁর পাকা মসজিদ ও পাকা কবর এখনও বর্তমান। সৈন্য বিভাগের সুনিপুন দক্ষতার দরুন জায়গীর লাভ করে উনবিংশ শতকের প্রথমে কাইমের সোলেমান, প্রং উ ফক্কে চৌধুরী, কেয়ক্তর ছকফা, মংডুর ফতে আলী বলী, জাফর আলী চৌধুরী এবং আবদুল গফুর চৌধুরী প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। হাজী আলী খান (হোদুবুধ্যা) ও আকরাম আলী ছিলেন সৈন্য বিভাগের সুবেদার। হোদুবুধ্যার পাকা মসজিদ আকিয়াবে এখনও বর্তমান। সেনাপতি আলী বাইং এর পাকা মসজিদও বর্তমান রয়েছে।[৮৮]

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিম অমাত্যবর্গের অনন্য ভূমিকা ছাড়াও তাদের আর একটি বড় অবদান হলো, তারা মুসলিম কবি সাহিত্যিকদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিমূল শক্ত করেছিলেন। মূলত খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলিম প্রভাবে ভরপুর আরাকান রাজসভায় মুসলমান কবিদের হাতেই বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্ট হচ্ছিল; যার ফলাফল বহুমূখী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।[৮৯] আরাকান অমাত্যসভার পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতায় যে সকল কবি সাহিত্যিক সাহিত্য চর্চা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের তালিকা সারণি ৫ এ দেয়া হল।

সারণি-৫

মুসলমান কবি ও কাব্যগ্রন্থের নাম[৯০]

	কবির নাম	কাব্য / পুঁথি
১.	কবি দৌলত কাজী	সতীময়না লোর চন্দ্রনী (অসমাপ্ত)।
২.	কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর	চন্দ্রাবতী কাব্য।
৩.	মহাকবি আলাওল	পদ্মাবতী, সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল, হপ্ত পয়কার, সেকান্দর নামা, তোহফা বা তত্ত্বোপদেশ, দৌলতকাজীর অসমাপ্ত "সতীময়না লোরচন্দ্রানী ও রাগতালনামা প্রভৃতি"।
৪.	কবি মরদন	নসিব নামা।
৫.	কবি আবদুল করিম খোন্দকার	দুল্লা মজলিশ, তমিম আনসারী ও হাজার মাসায়েল।
৬.	কবি আবদুল করিম	রোসাঙ্গ পাঞ্চালী।
৭.	কবি আবুল হোসেন	আদমের লড়াই।
৮.	কাজী আবদুল করিম	রাহাতুল কুলুব, আবদুল্লাহর হাজার সাওয়াল, নূরনামা, মধুমালতি, দরীগে মজলিশ।
৯.	ইসমাঈল সাকেব	বিলকিসনামা।
১০.	কাজী মোহাম্মদ হোসেন	আমীর হামজা, দেওলালমতি, ও হায়দর জঙ্গ।
১১.	নসরুল্লাহ খান	জঙ্গনামা, মুসার সোয়াল, শরীয়তনামা, হিদায়িতুল ইসলাম।

প্রাচীন যুগের হিন্দু কবিরা সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য থেকে অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আরাকান রাজ দরবারে আশ্রিত মুসলমান কবিরা কেবল সংস্কৃত নয়-হিন্দি, আরবি, ফারসি প্রভৃতি উন্নত ভাষা-সাহিত্য

www.pathagar.com

থেকে অনুবাদ করে যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন করেন; তেমনি তাঁরা নিজস্ব বিশ্বাস ও চেতনার উপর ভিত্তি করে পুঁথি সাহিত্য রচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষার ভিত্তিকে মজবুত করেছেন। তাঁরা বাংলা সাহিত্যে মানবীয় প্রেমকে কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে পরিকল্পনা করে সাহিত্য রচনার পথিকৃত। আরাকান মুসলিম কবিগণ বাংলা সাহিত্যকে বিষয় বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ করে ভারতীয় উন্নততর হিন্দি ভাষার সাথে যুক্ত করে এবং নানা বৈচিত্রপূর্ণ ও সুমধুর ফারসি সাহিত্যের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে নানাভাবে সম্প্রসারিত করেছেন। আরাকান রাজসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয় তার তুলনা আর কোথাও মেলেনা।[৯১] কবিরা যেমন ছিলেন ধার্মিক মুসলমান, তেমনি তাঁদের পৃষ্ঠপোষক, আশ্রয়দাতা ও আদেশ দাতারাও (রাজার অমাত্যবর্গ) ছিলেন একই পথের পথিক। তাঁদের কার্যরীতির ভাষা ছিল আরবি-ফার্সি।[৯২]

আরাকান হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এ চার ধর্ম-সম্প্রদায়ের মিলন কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হলেও ইসলাম তাদের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, এ বিচিত্র সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় লালিত পালিত হয়েও তারা সব রকমের দ্বন্দ্ব-কলহ ও জাতি বৈরীকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিল। মূলত ইসলামের শান্তির বাণী তাদের এ মূলমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। ফলে আরাকানের মুসলিম কবি গোষ্ঠীর কাব্যাদর্শ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষের উপাদেয় সামগ্রী হতে পেরেছিল। কিন্তু আরাকান রাজ্যের বিশৃংখলা ও মুসলমানদের ক্ষমতা হ্রাসের কারণে সপ্তদশ শতাব্দী শেষ না হতেই আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা কমে যায়।[৯৩]

পর্তুগিজরা যেমন জলদস্যু তেমনই ছিল শ্রেষ্ঠ নাবিক ও নৌযোদ্ধা। মিনবিন বা জেবুকশাহ (১৫৩১-১৫৫৩ খৃ.) আরাকানী নৌবাহিনীর প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে পর্তুগিজদেরকে চট্টগ্রামে বাণিজ্য ও বসতি গড়ার অনুমতি দেন।[৯৪] অতঃপর রাজা মিন রাজাগ্যি বা সেলিম শাহ (১৫৯৩-১৬১২ খৃ.) তাদেরকে চট্টগ্রামের দেয়াঙ্গ, সন্দীপ ও আরাকানের সিরিয়ামে উপনিবেশ স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন।[৯৫] কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তারা স্বরূপ উন্মোচন করে দক্ষিণ ও পূর্ব-বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ডাকাতি ও মানুষ চুরির মাধ্যমে দাস ব্যবসা শুরু করে। মেঘনা নদীর মোহনা থেকে শুরু করে পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত এলাকায় নিষ্ঠুর জলদস্যুতার তাণ্ডব চালায়। তাদের অত্যাচারে এসব অঞ্চল জনবসতিহীন হয়ে গভীর জংগলে পরিণত হয়।[৯৬] তাদের অত্যাচারের কাহিনীর বর্ণনাদিতে গিয়ে ডিজিইহল বাটাভিয়ার ডাচ-ফ্যাক্টরির ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের নথি থেকে লেখেন-

> Every year a devastating raid, often as far as Dacca and Murshidabad, were carried out and vast numbers of captives carried of to Mrohaung, Where the king, after selecting all the artisans for his own service, sold the rest to foreign traders at a few rupees a head. As there was a constant

www.pathagar.com

demand for slaves in the Duch factories in the Archipelago. Duch merchants soon become the Kings chief customers for these unhappy human beings.[৯৭]

পর্তুগিজ জলদস্যুদের সফলতায় মগেরাও জল দস্যুতায় নেমে পড়ে। মগ ও ফিরিঙ্গিদের সমন্বয়ে গঠিত জলদস্যু বাহিনী জলপথে এসে বারবার বাংলায় লুণ্ঠনকার্য পরিচালনা করত। তারা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে ধরে নিয়ে যেত। বন্দিদের হাতের তালু ছেঁদন করে পাতলা বেত চালিয়ে জাহাজের ডেকের নিচে পশুর মত বেঁধে রাখত এবং খাঁচাবদ্ধ মুরগির মত যৎকিঞ্চিৎ কাঁচা চাউল উপর হতে বন্দীদের উদ্দেশ্য ছুঁড়ে দিত তা খুটে খুটে খেয়ে জীবন বাঁচাতে হত। এত কষ্ট ও অত্যাচারে যে ক'টা শক্ত প্রাণ বেঁচে থাকতো তাদের মধ্যে কাউকে ভূমি কর্ষণ ও অন্যান্য হীনকার্যে নিযুক্ত করত আর কাউকে দাক্ষিণাত্যের বন্দরসমূহে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসি বণিকদের নিকট বিক্রি করত। কখনো কখনো তাদেরকে উড়িষ্যায় নিয়ে যাওয়া হত। অনেক সময় সমুদ্রোপকূল হতে কিছু দূরে নোংগর ফেলে তারা লোক মারফৎ সরকারি কর্মচারীদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে মুক্তিপণের মাধ্যমে বন্দীদের ছেড়ে দিত। সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশের অসংখ্য লোক থেকে শুরু করে সতী-সাধ্বী সৈয়দজাদীও তাদের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে যৌন উম্মাদনার বস্তু হিসেবে পরিগণিত হত।[৯৮] দেশে যেখানে সেখানে তারা অগ্নিসংযোগ, গৃহদাহ, জাতি বিধ্বংসী কাজ করে বাংলার শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে ছিল। মগদের অবাধ অত্যাচারে যেমন 'মগের মুল্লুক' ফিরিঙ্গীদের অবাধ অত্যাচারে তেমনি 'ফিরিঙ্গী খালি,' 'ফিরিঙ্গীর দেয়ানীয়া' 'ফিরিঙ্গী ফাড়ি' 'ফিরিঙ্গী বাজার' প্রভৃতি জায়গায় তাদের অত্যাচারের করুণ কাহিনী জড়িয়ে আছে।[৯৯]

মানুষ চুরি ও দাস ব্যবসার সাথে আরাকান রাজের যোগসাজস থাকলেও পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ যুদ্ধ হয়েছে। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে আরাকানরাজ চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগিজদের উৎখাত করার উদ্দেশ্যে বাকলা রাজের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে আরাকানরাজ দেয়াঙ্গের পর্তুগিজ উপনিবেশ আক্রমণ করে তাদের নৌ সেনাপতিকে আহত, অসংখ্য লোককে হত্যা ও বন্দী করে পর্তুগিজ বাণিজ্য কুঠি, দূর্গ এবং গির্জা ধ্বংস করেছিলন। এ সংবাদ পেয়ে সন্দীপের পর্তুগিজ উপনিবেশের অধিনায়ক কার্ডালো চট্টগ্রামের আরাকানী শাসনকর্তা 'সেনাবাদী'কে হত্যা ও বন্দরের ১৪৯ আরাকানী রণতরী ধ্বংস করে চট্টগ্রামকে দখলে এনে নগরবাসীর উপর চরম অত্যাচার, নরহত্যা, এবং জ্বালাও পোড়াও অভিযানে মেতে উঠে। আরাকানরাজ সিরিয়ামের পর্তুগিজ উপনিবেশের উপরও হামলা করেছিলেন। এ সময় মোগল নৌসেনাপতি ফতে খাঁ পর্তুগিজদের বিতাড়িত করে সন্দীপ দখল করেন। পর্তুগিজ জলদস্যুদের সাথে আরাকানরাজের বহুবার যুদ্ধ হয়েছে এবং পর্তুগিজ বোম্বেট সিবাসটিয়ান গঞ্জালিশ ও গাভিনহারের নৌসেনাসহ অনেক রণতরীও ধ্বংস করেছিলেন। মিন রাজাগ্যির পুত্র মিন খা মৌং ও অনাপুরমের মধ্যে

www.pathagar.com

ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা অনাপুরম দেহরক্ষী হিসেবে পর্তুগিজ সেনাদেরকে নিয়োগ দিয়েছিলেন; কিন্তু পর্তুগিজ নেতা গঞ্জালিশ অনাপুরমকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে তাঁর বিধবাপত্নী ও ২ ছেলে মেয়েকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন।[১০০]

মোগল সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ শুনে শাহজাদা মুহাম্মদ সুজা রাজমহলে ১৬৫৭ সালের নভেম্বর মাসে সিংহাসনের উত্তরাধিকার ঘোষণা করে দিল্লীর মসনদ অধিকারের উদ্দেশ্যে প্রায় ৪০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ বাংলা হতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। আওরঙ্গজেব ও মুরাদ যথাক্রমে দাক্ষিণাত্য ও গুজরাট থেকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা দিয়ে স্বসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে রওনা হন। ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের এক পর্যায়ে আওরঙ্গজেব সেনাপতি মীর জুমলার সহায়তায় ১৬৫৯ সালের ৫ জানুয়ারি খাজওয়ার যুদ্ধে সুজাকে পরাজিত করলে তিনি বাংলার দিকে অগ্রসর হন। বিক্ষিপ্ত যুদ্ধের পর পতন অবশ্যম্ভাবী মনে করে শাহ সুজা ১৬৬০ সালের ১২ এপ্রিল ঢাকায় আগমন করেন। অতঃপর আরাকানরাজ সান্দা থু ধম্মার সাথে যোগাযোগ করে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে পরিবার পরিজন ও দেহরক্ষী ছাড়া পাঁচ শতাধিক[১০১] অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি-সেনানায়কদের নিয়ে ৬ মে ঢাকা থেকে ভুলুয়ায় যান এবং ৬ দিন পরে ১২ মে আরাকানের রাজার পাঠানো জাহাজে তিনি ৩ জুন কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে দেয়াং পৌঁছেন এবং সেখান থেকে সড়ক পথে যাত্রা করে ২৬ আগস্ট আরাকানের রাজধানী ম্রোহং পৌঁছেন।[১০২] মূলত শাহ সুজা আরাকান থেকে মক্কা অথবা তুরস্কে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন।[১০৩] কিন্তু বর্ষাকালে যাত্রা বিপদ সংকুল হেতু শীতকালে তিনি মক্কা যাবার সিদ্ধান্ত নেন এবং আরাকানরাজও তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনুচরসহ তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন। আরাকানরাজের সাথে কিছু দিন ভাল সম্পর্ক থাকলেও আরাকানরাজ শাহ সুজার মূল্যবান সম্পদ ও অপূর্ব সুন্দরী কন্যা আমেনা বেগমকে দেখে তার মক্কা পাঠানোর অঙ্গীকার ভুলে আমেনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। তিনি এ প্রস্তাব অস্বীকার করলে আরাকানরাজ বিশ্বাস ভংগ করে ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি শাহ সুজা ও পরবর্তীতে তাঁর পরিবার পরিজনকে হত্যা করে। অতঃপর তাঁর অনুচরসহ ম্রোহংয়ে বসবাসকারী রোহিঙ্গা মুসলমানরের উপর অমানুষিক নির্যাতন নেমে আসে; অনেককে হত্যা করে এবং অনেককে কারাগারে নিক্ষেপ করে;[১০৪] কবি আলাওলও এসময় কারাবরণ করেছিলেন।[১০৫]

বাণিজ্য তরীর নাবিকের মাধ্যমে ১৬৬১ সালের ৩০ আগস্ট মীর জুমলা সুজা হত্যার খবর সংগ্রহ করে আওরঙ্গজেব এর নিকট পৌঁছান। তিনি ভ্রাতৃহত্যার খবর শুনে প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁকে আদেশ করেন। তিনি ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি আরাকানী বাহিনী ও জলদস্যুদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম দখল করেন।[১০৬] এভাবে ম্রাউক-উ-বংশের শাসনকালের সূচনা থেকে শাহ সুজার হত্যাকাণ্ডের সময় পর্যন্ত বাংলাসহ বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতের লোক আরাকানে পাড়ি জমায়।[১০৭]

www.pathagar.com

রাজা সান্দা থু ধম্মার মৃত্যুর পর ১৬৮৪ খ্রি. থেকে ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে বোধপয়া কর্তৃক আরাকান দখল পর্যন্ত সেখানকার শাসন ব্যবস্থা মোটেই স্থিতিশীল ছিল না। ১৭১০ সালে সান্দউইজ্যা আরাকানের ক্ষমতায় আসার পর ক্রমশ সামন্তদের ক্ষমতা বেড়ে যেতে থাকে এবং এক পর্যায়ে সামন্তদের নেতৃত্বে গোটা আরাকান ছয়টি কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কোন সামন্ত শক্তি সঞ্চয় করে রাজধানী ম্রোহং এর ক্ষমতা দখলে উদ্যোগী হলে অন্য সামন্তগণ জোট বেঁধে সে উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়।[১০৮] সেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা এত চরমে ওঠে যে, ইংরেজ কালেক্টর নাথিয়াল বেইটম্যানের আমলে (১৭৭৫-৭৭) আরাকান থেকে ২,০০০ (দু'হাজর) শরণার্থী চট্টগ্রাম জেলার বারপালং এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। কালেক্টর বেইটম্যান তাদেরকে পরগণা, আনন্দপুর, মৌজাচম্বল, পুঁইছড়ি, সোনাছড়ি, লালকোটা ও মানিকপুরে বসতি স্থাপন করার সুযোগ দেন। এ সকল শরণার্থীর মধ্যে ছিলেন তাজ মোহাম্মদ, আতিকুল্লাহ, ঠাকুর চাঁদ, সাদুল্লাহ, আজিজুল্লাহ, ফকির মোহাম্মদ ও রৌশন প্রমুখ।[১০৯] তাঁরা নিজেদেরকে আরাকান রাজ্যের জমিদার ও তালুকদার বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। বেইটম্যান তাদেরকে চট্টগ্রাম শহরে ডেকে কোম্পানির এলাকায় আশ্রয় গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রত্যুত্তরে তাঁরা বলেন, আরাকানে রাজনৈতিক গোলযোগ শুরু হবার কারণে অনুচরদের নিয়ে কোম্পানির রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন এবং কোম্পানির এলাকায় জমি আবাদ করে বসবাস করতে ইচ্ছুক।[১১০] বেইটম্যান তাঁদেরকে কোম্পানির রাজ্যে বসবাস করার অনুমতি দেন এবং নির্দেশ দেন যে, তারা জয়নগর মহালের অধস্তন জমিদাররূপে পরিগণিত হবে।[১১১] কালেক্টরের এ নির্দেশ তাঁদের মনপুত হয়নি, কেননা তাঁরা গোড়াতেই বলেছিলেন যে, আরাকানে তাঁদের যে পদমর্যাদা ছিল কোম্পানির এলাকায় অধস্তন ভূমিকা গ্রহণ করে তা ক্ষুণ্ন করতে তারা প্রস্তুত নন। এ সময় সদর আদালতের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পে চট্টগ্রাম ভ্রমণে এসেছিলেন। তাজ মোহাম্মদ ও অন্যান্য শরণার্থীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি তৎকালীন ফ্রান্সিস ল'কে একখানি দলীল দিয়ে তাঁদের অধিকার সংরক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। কিন্তু অচিরেই তাঁদের অনেকেই মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং তাজ মোহাম্মদ ব্যতিত অন্য সবাই আরাকানে প্রত্যাবর্তন করেন। এমন কি কিছুদিন পর তাজ মোহাম্মদও আরাকানে ফিরে যেতে বাধ্য হন।[১১২] জমি আবাদে আরাকানীদের এ ব্যর্থতা সম্পর্কে কালেক্টর পাইরাডের ১৭৭৮ সালের ২০ ডিসেম্বর এক রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়; মাটি এরূপ জঙ্গলাবৃত শক্ত ঘাসে আচ্ছাদিত ছিল যে, আবাদ করা ছিল খুব কঠিন এবং আরাকানীদের পক্ষে স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্য পাওয়া ছিল খুবই কষ্টকর।[১১৩]

বিদ্রোহ, হত্যা ও ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে আরাকানে জনজীবন বিপন্ন ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। দীর্ঘকাল অশান্তি ও অনিশ্চয়তা আরাকানীদের মনে শান্তি ও স্থায়ীত্বের চেতনা জাগিয়ে তোলে। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে থামাডা নামক রাম্রীর জনৈক সামন্ত আরাকানের ক্ষমতা দখল করলে অন্যান্য সামন্তগণ হারি (ঘা-থীন ডা) [১১৪] নামক জনৈক সামন্তের

www.pathagar.com

নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়। হারি তৎকালীন আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজা থামাডাকে অপসারণের মাধ্যমে আরাকানের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে বার্মার করদ রাজা হিসেবে রাজ্য শাসনের আশায় বার্মার আলাংপায়া বংশের সাম্রাজ্যবাদী রাজা বোধপায়ার সাথে চুক্তি করে এবং আরাকান আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায়।[১১৫] আরাকানের রাজনৈতিক বিশৃংখলা ইংরেজ বা ফরাসী শক্তিকে হস্তক্ষেপে উৎসাহিত করতে পারে এবং এতে বার্মার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকায় রাজা বোধপায়া এ আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করে ১৭৮৫ সালে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান আক্রমণ করে এবং আরাকানীরা সামন্ত রাজাদের অনুপ্রেরণায় বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নৃত্যের মাধ্যমে বর্মীদের স্বাগত জানায়।[১১৬] আরাকানী রাজা তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মরণপণ যুদ্ধ করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যুদ্ধে বর্মী রাজা জয়ী হয় এবং আরাকানকে বার্মার সাথে সংযুক্ত করে। থামাডা পরাজিত হয়ে সপরিবারে নৌকা যোগে চট্টগ্রামে পালিয়ে যাবার সময় বর্মী সেনাদের হাতে ধরা পড়ে এবং তাকে শিরচ্ছেদ করা হয়।[১১৭] বোধপায়া আরাকান বিজয় শেষে হারির সাথে সম্পাদিত চুক্তি অস্বীকার করে আরাকানকে বার্মার অংশ হিসেবে নিয়ে তাকে রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার পরিবর্তে আরাকানের গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দান করে।[১১৮] এ পর্যায়ে বোধপায়া আরাকানকে রামরী, স্যান্ডুয়ে, ম্রোহং এবং আরাকান এই চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে স্বমনোনীত চারজন প্রতিনিধির হাতে আরাকানের শাসনভার অর্পণ করেন। এ প্রতিনিধিগণের রাষ্ট্র শাসন বিষয়ে যে কোন নীতি, ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বর্মীরাজের অনুমোদন ছিল অত্যাবশ্যকীয়।[১১৯]

ক্ষমতা লোভী সামন্তদের অনুপ্রেরণায় আরাকানীরা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে পরম আনন্দে বর্মী সৈন্যদের স্বাগত জানালেও এক মাস না যেতেই আনন্দের পরিবর্তে বর্মী সৈন্যদের বর্বরতা, নির্মম উম্মত্ততা ও পাশবিকতার হিংস্র থাবা নেমে আসে। মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ, অনুন্নত বর্মী সৈন্যরা আরাকানের মুদ্রা ব্যবস্থা ও ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে লুণ্ঠন, হত্যা, নির্দোষ মানুষকে বন্দী করে মুক্তিপন আদায়, এমন কি চরম নির্যাতনের পর আগুনে পুড়িয়ে মানুষকে হত্যা করত। ত্রাণকর্তা হিসেবে এসে বোধপায়া কয়েক বছরেই আরাকানকে দেউলিয়া করে ফেলে।[১২০]

বোধপায়ার আরাকান দখল ছিল নিঃসন্দেহে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। তাঁর সৈন্যবাহিনী এত নিষ্ঠুরতা ও জঘণ্য চাতুরী করেছিল যে, পরাজিত পলাতক আরাকানী সৈন্যদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে এবং সবাইকে অস্ত্র ফেলে সেনানিবাসে এসে আত্মসমর্পণ করে নিরাপদে নিজ নিজ ঘরবাড়িতে থাকার সুযোগ লাভের উপদেশ দেয়। কিন্তু সৈন্যরা সেনানিবাসে এসে আত্মসমর্পণ করলে বর্মী সেনারা সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এছাড়াও বর্মীরাজ ব্যাপক হারে আরাকানীদের গ্রেফতার করে স্ত্রী লোকদের বার্মায় পাঠিয়ে দেয় এবং পুরুষদেরকে হত্যা করে।[১২১] শুধু ১৭৮৫ সালে আরাকান দখল করার সময়ই বর্মী শাসকশ্রেণি প্রায় বিশ হাজার আরাকানীকে হত্যা করে এবং কয়েক লক্ষ আরাকানী প্রাণ ভয়ে চট্টগ্রাম জেলায় পালিয়ে আসে।[১২২]

www.pathagar.com

আরাকান বিজয় সাম্রাজ্যবাদী বোধপায়াকে দিগ্বীজয়ে উৎসাহিত করে এবং ১৭৮৬ সালে বার্মার দক্ষিণ পশ্চিম প্রতিবেশী রাজ্য শ্যাম (বর্তমানে থাইল্যান্ড) দখলের মনোভাব পোষণ করে।[১২৩] এরই প্রেক্ষিতে বোধপায়া আরাকান থেকে প্রচুর লোক, অস্ত্র-সস্ত্র ও রসদ দাবি করে।[১২৪] দাবির অর্ধেক পুরণের অঙ্গীকার করলে হারির বড় ছেলেকে স্বপরিবারে রাজদরবারে ডেকে হত্যা করে। তাছাড়া এ দাবি আদায়ের জন্য আরাকানীদেরকে একত্রিত করে মরিচ পুড়িয়ে ধুঁয়া দেয়াসহ বিভিন্নভাবে দৈহিক নির্যাতন চালায়।[১২৫]

মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব আদায় ছাড়াও শিশুদের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হত। কখনও কখনও তিনশ' যুবক একত্র করে রাজস্ব হিসেবে বার্মায় প্রেরণ করা হত।[১২৬] বস্তুত আরাকানে ধর্মের নামে জনসাধারণকে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করার যে প্রক্রিয়া বোধপায়া চালু করেছিল সেটা রীতিমত একটি আতংক ও ঘৃণার বিষয়। বর্মীরাজ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রাণদণ্ড দিতেন, বৌদ্ধ সন্যাসীরা এ ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন করলে রাজা পাল্টা হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুশাসনের অনেক ধারা সংশোধন করেন এবং সন্যাসীদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করেন। মেইক্‌টিলা হ্রদ পুনঃনির্মাণে ছ'হাজার আরাকানীকে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কেউ ফিরে আসেনি। এছাড়া বার্মার মিনগুনে অবস্থিত পাঁচ'শ ফুট উচু প্যাগোডা নির্মাণে বর্মীরাজ আরাকানীদের বলপূর্বক কাজে নিয়োগ করেন।[১২৭]

নিরীহ আরাকানীদের উপর বর্মী রাজা ও সৈন্যবাহিনীর বহুবিধ অত্যাচার তাদেরকে অতিষ্ট করে তোলে এবং এ প্রেক্ষিতে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে অত্যাচারিত আরাকানীরা তাদের প্রাক্তন রাজবংশের 'ওয়োমা' নামে জনৈক বংশধরকে রাজা হিসেবে মনোনীত করে বর্মী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যুদ্ধে বহু বর্মীসেনা নিহত হলেও শেষ পর্যন্ত বর্মী সেনাপতি বিদ্রোহ দমনে সামর্থ হন। এরপর আরাকানীদের উপর অত্যাচার বহুগুনে বেড়ে যায়।[১২৮] প্রত্যক্ষদর্শী এ্যাপোলং নামক জনৈক আরাকানী সর্দার বর্ণনা করেন, বর্মী সেনারা স্ত্রী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে প্রায় দু'লাখ আরকানীকে হত্যা করে এবং সমসংখ্যককে দাস হিসেবে বার্মায় প্রেরণ করে। যারা এ হত্যাযজ্ঞ হতে বাঁচার আশায় জংগলে পালিয়ে ছিল, তাদেরও অনেককে হয় বর্মী সেনার হাতে নয়তো বাঘের মুখে প্রাণ বির্সজন দিতে হয়েছিল।[১২৯] লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ইরাস্কিন বর্মী অত্যাচার সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "বর্মীরা বিজীত ও নিরীহদের উপর অত্যাচারের জন্য দায়ী। আমার আদৌ সন্দেহ নেই যে, তারা হাজার হাজার নর-নারী ও শিশুকে সুস্থ মস্তিকে হত্যা করে তাদের বাড়িঘর জালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে খাদ্য-শস্যসহ সম্পদ লুন্ঠন করেছে।"[১৩০] বর্মীদের হত্যাযজ্ঞ থেকে বাঁচার জন্য ১৭৯৮ সালে আরাকানের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ লোক চট্টগ্রাম জেলায় আশ্রয় গ্রহণ করে।[১৩১] ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ালটার হেমিলটন রামুর বার মাইলের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ আরাকানী শরণার্থী দেখে ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩২] আরাকানী উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে প্রত্যুত্তুরে তাদের এক সর্দার বলেছিলেন- "We will never return to Arakan if you choose to slaughter us here; We are ready to die; if by force to drive away we will go and dwell in the jungle of the mountain which offerds shelter for wild beasts."[১৩৩]

www.pathagar.com

মূলত বোধপায়ার আরাকান দখলের পর বর্মী সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের শোষণ, অত্যাচার ও হয়রানীর হাত থেকে বেঁচে এক সুস্থ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শান্তিপূর্ণ নিরাপদ পরিবেশে বসবাস করার উদ্দেশ্যে আরাকানী শরণার্থীদের বৃটিশ শাসিত চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।[১৩৪] বর্মী সেনার অত্যাচারে বিপর্যস্ত ও নিগৃহীত অসংখ্য আরাকানী উদ্বাস্তু নিজেদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে আশ্রয় নেবার পেছনে কয়েকটি কারণ বিদ্যমান–

প্রথমত, ভৌগোলিক দিক থেকে চট্টগ্রাম আরাকানের সব'চে নিকটতম অঞ্চল। অন্যদিকে বার্মা নিকটতম এলাকা হলেও তা ছিল মূলত একটি শত্রুরাজ্য এবং ভৌগোলিকভাবে আরাকান থেকে বিচ্ছিন্ন।

দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রামের সাথে রয়েছে আরাকানের ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক।

তৃতীয়ত, তুলনামূলকভাবে তৎকালীন পরিস্থিতি আরাকান অপেক্ষা চট্টগ্রামে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা উদ্বাস্তুদের প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণা যোগায়।[১৩৫]

চতুর্থত, আরাকানে ব্যাপক অরাজকতার ফলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়; অন্যদিকে কোম্পানির রাজ্যে জীবন ধারণের নিশ্চয়তা আরাকানীদের প্রলুব্ধ করে।

আরাকানী উদ্বাস্তুদের মধ্যে সর্দার শ্রেণি চট্টগ্রামকে একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করে আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের বৈপ্লবিক তৎপরতা শুরু করে। সর্দারদের এ বৈপ্লবিক তৎপরতা তাদের পূর্বের স্বভাবগত প্রবণতার প্রতিশ্রুতি ছিলনা, বরং এটা ছিল বর্মী বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। চট্টগ্রামের দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্তের পাহাড় ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নিয়ে তারা বর্মী অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের অভিপ্রায়ে আরাকানে অবস্থানরত বর্মীদের উপর আক্রমণ চালাতো।[১৩৬] আরাকানরাজ ওয়েমো, চট্টগ্রামের লাহোমরাং, আরাকানী সর্দার এ্যাপোলং এবং সিন পিয়ানের তৎপরতা রাজদ্রোহী মনে হলেও তা ছিল মূলত বর্মীদের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ।[১৩৭]

আরাকানের নিহত গভর্ণর হারি (ঘা থিন ডা) এর একমাত্র জীবিত পুত্র সিন পিয়ান (Nga Chin Pyan) বর্মীরাজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে রুখে দাঁড়ান। ইংরেজদের নিকট তিনি কিং বেরিং নামে পরিচিত।[১৩৮] ১৮১১ সালের প্রথম দিকে বাংলা-বার্মা সীমান্তের মুরুসুগিরি[১৩৯] নামক একটি ছোট ভূখণ্ড অধিকারের মধ্য দিয়ে সিন পিয়ানের প্রতিরোধ বা স্বাধীকার আন্দোলন শক্তিশালী, সংঘবদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহের সূচনা করে।[১৪০] মুরুসুগিরি দখলের প্রেক্ষিতে আরাকান গভর্ণর কোম্পানির নিকট তার ভূ-খণ্ড লুণ্ঠণ ও জবর দখলের অভিযোগ করেন।[১৪১] এর ফলে বাংলা-বার্মার মধ্যে ভূমি সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং কোম্পানী চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট পি.ডব্লিউ পিচেলকে এ সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দেন। সিন পিয়ান দখলকৃত স্থানটি বাংলার ভূখণ্ড হলেও চট্টগ্রামের স্থানীয় কর্মচারীগণ কর্তৃক ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণে পিচেল

www.pathagar.com

প্রাথমিকভাবে স্থানটি বর্মীদের বলে স্বীকার করে এবং তিনি বাংলা-বার্মা সম্পর্কের অবনতির আশংকায় সিন পিয়ানকে সীমান্ত এলাকা থেকে বিতাড়িত করার সুপারিশ করেন। কিন্তু পিচেলের এ সুপারিশ কার্যকর হয়নি।[১৪২]

আঠার'শ এগার সালের মে মাসের মাঝামাঝি প্রায় রোহিঙ্গাসহ তিন সহস্রাধিক সহযোদ্ধা নিয়ে সিন পিয়ান অতর্কিতভাবে আরাকান আক্রমণ করে মংডু দখল করেন এবং কোম্পানি এলাকায় বসবাসরত জুম চাষীসহ সকল অধিবাসীকে বর্মী ভাষায় লিখিত এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেন।[১৪৩] কোম্পানি সিন পিয়ানের গ্রেফতারের ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহী না হলেও চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট পিচেল এ ব্যাপারে তৎপর ছিলেন এবং তাঁকে গ্রেফতারের জন্য চাপরাসীও প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু কর্মোদ্যোগ বিলম্বিত হবার কারণে তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।[১৪৪] সিন পিয়ানের তৎপরতা বৃদ্ধিতে কোম্পানি বাংলা-বার্মা সম্পর্কের অবনতির আশঙ্কায় অবেশেষে সীমান্তে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে।[১৪৫]

সিন পিয়ানের আহ্বানে আরাকানী উদ্বাস্তুরা স্বাধীন স্বদেশের আশায় তাঁর দলে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য আরাকান অভিমুখে যাত্রা করে। পিচেল তাদের যাত্রার কারণ জিজ্ঞেস করলে উদ্বাস্তুরা উত্তর দেয় "আমাদের রাজা আরাকানের কয়েকটা থানা দখল করে ফেলেছেন। আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে (২১শে মে ১৮১১) রাজধানী ম্রোহং দখল করে ফেলবেন। আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে স্বাধীনতাকামীদের সাথে যোগ দান না করলে আমাদের রাজা আমাদেরকে হত্যা করবেন।"[১৪৬]

সিন পিয়ানের প্রবল আক্রমণে ১৮১১ সালের জুন মাসের মধ্যেই আরাকানের রাজধানী ম্রোহং ছাড়া সমগ্র অঞ্চল বিজয় হয়। অতিবৃষ্টিতে যুদ্ধের তীব্রতা কমে এলে ম্রোহং অবরোধ করে তাঁরা শহরের বাইরে যুদ্ধ চালাতে থাকে। দূর্ভাগ্যজনকভাবে এ সময় সিন পিয়ান বাহিনীর গোলাবারুদ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তিনি কোম্পানির নিকট রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকারসহ জন্মভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে পত্র পাঠান। কিন্তু গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্টো সিন পিয়ানের প্রস্তাব দ্ব্যার্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে তিনি পরাজিত হয়ে বৃটিশ ভুখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১৪৭] সিন পিয়ানের ব্যাপক তৎপরতা ও সফলতায় বর্মী সরকারের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং তারা কোম্পানিকে সিন পিয়ানের পরিকল্পনার উদ্যোক্তা হিসেবে সন্দেহ করে।[১৪৮] বর্মীদের এ সন্দেহের অবসান কল্পে গর্ভণর জেনারেল লর্ড মিন্টো বার্মায় ক্যাপ্টেন ক্যানিং এর নেতৃত্বে একটি মিশন প্রেরণ করলে ক্যানিং সিন পিয়ানের তৎপরতায় কোম্পানির নিরপেক্ষ ভূমিকা প্রমাণের সবিশেষ চেষ্টা করেন।[১৪৯]

বিপর্যয়ের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ এক বৎসর প্রস্তুতির পর সিন পিয়ান ১৮১২ সালের জুন মাসে ৬ হাজার সৈন্য নিয়ে নাফ নদী অতিক্রম করে অনায়াসে মংডু ও তার পাশ্ববর্তী এলাকা জয় করেন।[১৫০] কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট পিচেল প্রেরিত পূর্বাভাস অনুযায়ী একদল বর্মী সেনার আগমনের ফলে সিন পিয়ানের

www.pathagar.com

বাহিনী মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়। সমুদ্র উপকূলে রক্ষিত নৌকাগুলো নিমজ্জিত হবার ফলে সিন পিয়ানের অধিকাংশ সৈন্য পালাতে না পেরে বর্মী সৈন্যের হাতে হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। সিন পিয়ানসহ কিছু অনুসারী পালিয়ে আসতে সক্ষম হলেও তাদের গ্রেফতারের জন্য প্রত্যেককে গ্রেফতারের বিনিময়ে ন্যূনতম এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে পক্ষান্তরে তাদেরকে সাহায্য করলে শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়।[১৫১] কিন্তু আরাকানী রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা কোম্পানির আদেশ অমান্য করেই পলাতক সর্দারদের সাহায্য করে।[১৫২]

জন্মভূমির প্রতি অগাধ ভালবাসা ও দরদ নিয়ে সিন পিয়ান পুনরায় বিপর্যস্ত সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠন করেন। ১৮১২ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে তিনি কক্সবাজার দখল করে সেখানে প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন।[১৫৩] কোম্পানি পুনরায় কক্সবাজার দখল করে নেয় এবং ১৮১৪ সালে সিন পিয়ান আরাকানে পালিয়ে গিয়ে মংডুর নিকটে ঘাঁটি নির্মাণ করে তাঁর অনুসারীদেরকে সেখানে সমবেত করেন। অতঃপর স্থানীয় আরাকানীদের সহায়তায় মংডু, বুচিদং, রাথিদং দখল করে কালাদান নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে শেষবারের মত যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে চট্টগ্রামে আশ্রয় নেন।[১৫৪] বর্মীসেনারা তাদের পিছু ধাওয়া করে চট্টগ্রাম সীমান্ত অতিক্রম করে কোম্পানি এলাকায় চলে আসে। তারা সিন পিয়ানের সাথে কোম্পানির সম্পৃক্ততার অভিযোগে রত্নগিরি ও গর্জানিয়ার গ্রামগুলোতে লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং কয়েকজন আরাকানী উদ্বাস্তুকে অপহরণ করে সীমান্ত হতে পালিয়ে যায়।[১৫৫]

কোম্পানি নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণের সার্বিক প্রক্রিয়া চালু রাখে এবং অবশেষে সিন পিয়ান কর্তৃক কোম্পানিকে প্রদত্ত চিঠি পত্রগুলোও তৎসংশ্লিষ্ট নথি-পত্রের প্রদর্শনীর মাধ্যমে নিজেদের নিরপেক্ষতা প্রমাণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।[১৫৬] কোম্পানি নিরপেক্ষতা বজায়ের লক্ষ্যে সিন পিয়ান বাহিনীর উপর নির্যাতনসহ কড়া নজর রাখে অন্যদিকে সিন পিয়ান বাহিনীর মনোবলও ভেঙ্গে যায়। দীর্ঘদিন বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর ফলে সিন পিয়ান শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি ১৮১৫ সালের ২৫ জানুয়ারি পোলং চরানের পাহাড়ি এলাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১৫৭]

সিন পিয়ানের মৃত্যুর পর সুযোগ্য নেতার অভাবে তাদের তৎপরতা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং আরাকানী উদ্বাস্তুদের অনেকেই নিজ এলাকায় বিভিন্ন পেশা গ্রহণের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ বসবাস করতে আগ্রহী হয়। কোম্পানি বিদ্রোহাত্মক তৎপরতার প্রতি উৎসাহী হবার আশংকায় চট্টগ্রামের দক্ষিণ সীমান্তের পূর্বেকার আশ্রয়ে বসতি স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে অন্য যে কোন স্থানে তাদেরকে পুনর্বাসন করার জন্য চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিলেও সেখানে শান্তি স্থাপন সম্ভব হয়নি। কেননা সিন পিয়ানের মৃত্যুর পর ১৮১৬ সালের মে মাসে তার প্রধানসহচর রেইংমিনের নেতৃত্বে আবার আরাকানীদের দল গঠিত হয়। কিন্তু দারিদ্র ও প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাবে তিনি কোম্পানির নিকট

www.pathagar.com

আত্মসমর্পণে বাধ্য হন।[১৫৮] ১৮১৬ সালের জুলাই মাসে সিন পিয়ানের জামাতা ও রেইংমিনের প্রধানসহচর চারিপোর তৎপরতা শুরু হয়। ফলে কোম্পানি কিছু সংখ্যক স্বাধীনতাকামীকে গ্রেফতারপূর্বক হত্যা ও ডাকাতির অভিযোগে অনেককে কোর্ট অব সার্কিটে প্রেরণ করে এবং কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুকে কোম্পানির সমর্থনকারী আরাকানী সর্দারদের অধীনে পুনর্বাসন করে চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।[১৫৯] ১৮১৭ সালের মে মাসে কোম্পানি চারিপোরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় এবং বিদ্রোহীদের বিচার ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে সীমান্ত অবস্থা আয়ত্বে আনে।[১৬০] সিন পিয়ানের সীমিত সামরিক শক্তি, কোম্পানি ও বর্মী দ্বি-শক্তির মোকাবেলা করা এবং এ সময় সীমান্তের দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া আরাকানীদের জন্মভূমি পুনরুদ্ধারের স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দেয়। সর্বোপরি সিন পিয়ানের মৃত্যুর পর আরাকানীদের মধ্যে সুযোগ্য নেতার অভাব আরাকানীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[১৬১]

আরাকানী শরণার্থী সমস্যা সংক্রান্ত সীমান্ত উত্তেজনা কিছুটা প্রশমনের পর ভারতের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বার্মার সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন মুখী প্রচেষ্টা চালায়। এ সমস্ত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনামলের শেষের দিকে বার্মার রাজদরবারে বৃটিশ প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। এ সকল প্রতিনিধির মধ্যে ১৭৯৪ সালের ৩০শে মার্চ ক্যাপ্টেন জর্জ সোরেলের মিশন ছিল আধাসরকারি পর্যায়ের। অন্যদিকে সরকারি পর্যায়ে ১৭৯৫ ও ১৮০২ সালের ক্যাপ্টেন মাইকেল সাইমস্ দু'বার বার্মায় গমন করেন। ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স ১৭৯৬ সালে, ক্যাপ্টেন টমাস হিল ১৭৯৯ সালে এবং সবশেষে ক্যাপ্টেন ক্যানিংকে ১৮০৩, ১৮০৯ ও ১৮১১ সালে বার্মায় বৃটিশ প্রতিনিধি দলের নেতারূপে প্রেরণ করা হয়। এতে সাময়িক সফলতা মনে হলেও স্থায়ী সুসম্পর্কের পথ নির্মিত হয়নি।[১৬২]

ক্যানিং মিশনের শেষ পর্যায়ে আরাকান সীমান্তে পুনরায় ইংরেজ ও বর্মীদের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বর্মীরাজ কর্তৃক আরাকান দখলের পর আশ্রিত উদ্বাস্তুদের মধ্যকার স্বাধীনতাকামীদের গ্রেফতার করার অজুহাতে সশস্ত্র বর্মীরা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ছাড়াই বৃটিশ ভারতীয় ভূখণ্ডে র অভ্যন্তরে ঘন ঘন অভিযান চালাতে থাকে। তারা আরাকান সীমান্তে বিশ হাজার সৈন্য সমাবেশ করে এবং রত্নাপালং নামকস্থানে একটি অনুসন্ধান ফাঁড়িও প্রতিষ্ঠা করে। বর্মীদের এ সমস্ত উস্কানীমূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে বৃটিশ প্রশাসন কর্ণেল এরস্কিনের নেতৃত্বে পুনরায় বর্মীদের বিররুদ্ধে সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত করে। তবে বর্মী সেনাপতির সতর্কতা অবলম্বনের ফলে আপাতত সংঘাত এড়ানো সম্ভব হয়। অতঃপর এ সময় অতিবৃষ্টির কারণে বর্মী বাহিনীকে আরাকানের ম্রাউক উ (Mrauk-U) তে প্রত্যাহার করা হয় এবং ইংরেজ বাহিনীকে রামুতে অপসারণ করা হয়।[১৬৩]

www.pathagar.com

বৃটিশ-বার্মা সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য অবনতি লক্ষ্য করা যায় ১৮১১ সালের পর থেকে আরাকানে সিন পিয়ানের ব্যাপক বৈপ্লবিক তৎপরতাকে কেন্দ্র করে। কেননা সিন পিয়ানের তৎপরতায় কোম্পানির সহযোগিতা রয়েছে বলে বর্মী কর্তৃপক্ষ মনে করে। সিন পিয়ানের মৃত্যুর পর এ অস্বস্তিকর অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটলেও তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং বৃটিশ শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অবমূল্যায়ন করে নিজেদেরকে শক্তিশালী মনে করতে থাকে। মারাঠা যুদ্ধ এবং অভ্যন্তরীণ অসুবিধার কারণেই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এ সময় চট্টগ্রাম-আরাকান সীমান্তে দৃঢ়নীতি গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছিল এ কথা বর্মীরা অনুধাবন করতে পারেনি।[১৬৪]

ক্যাপ্টেন ক্যানিং এর ১৮১১-১২ সালে প্রেরিত তৃতীয় মিশনের পর বার্মায় ইংরেজরা আর কোন মিশন পাঠায়নি। কেবলমাত্র চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় ছিল।[১৬৫] উভয় পক্ষ একে অপরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীরভাবে সন্দিহান ছিল। বহুদিন পর্যন্ত চট্টগ্রামে বর্মীদের যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যাপক গুজব শোনা যেতে থাকে। এ সময় চট্টগ্রাম বৃটিশ প্রশাসনের নিকট আশ্রিত আরাকানী উদ্বাস্তুদের প্রত্যার্পণ এবং চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজার এলাকাকে সাবেক আরাকানী ভূ-খণ্ডে র অধিনস্থ ছিল বলে উদ্ধৃতি দিয়ে এ সমস্ত অঞ্চলের উপর বর্মীদের দাবি সংক্রান্ত চিঠি আসতে থাকে।[১৬৬] এমন কি এক সময় উল্লেখিত জেলাগুলোর রাজস্ব বর্মী কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেবার আদেশ দান করেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কোলকাতায় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বার্মার সাথে সব সময় শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌছার ব্যাপারে আশাবাদী ছিল। অন্যদিকে কোম্পানি এ কথা বিশ্বাস করতে পারেনি যে, বার্মার রাজদরবার বৃটিশ সামরিক ও নৌশক্তি সম্পর্কে এত বেশি অজ্ঞ যে তারা কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে। ভারতে মারাঠাদের ভয় দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়াই ছিল কোম্পানির এ সময়ের নীতি। এ নীতি বোধপায়ার জীবিত কালে কার্যকর থাকলেও ১৮১৯ সালে বোধপায়ার মৃত্যুর পর তার দৌহিত্র বাজীদের যুদ্ধবাজ মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের উদ্ধতপূর্ণ যুদ্ধাংদেহী মনোভাবের কারণে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।[১৬৭]

এদিকে ১৮২১ সালের প্রথম দিক থেকে চট্টগ্রাম সীমান্তের বিভিন্ন ঘটনা কোম্পানিকে উত্তেজিত করে তোলে। বিশেষ করে বর্মী সৈন্যরা ১৮২১ সালের এপ্রিল মাসে বাংলার ভুখণ্ড হতে ২৫ জন হাতি শিকারীকে অপহরণ করে কারারুদ্ধ করে এবং মুরসী নদী ও গর্জানিয়ার মধ্যবর্তী এলাকা নিজেদের হিসেবে দাবি করে।[১৬৮]

একদল বর্মীসেনা ১৮২১ সালের ৪ঠা নভেম্বর আসাম সীমান্তে বাংলার হাবরাঘাট পরগণা আক্রমণ করলে জনগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এলাকা ত্যাগ করে। এর প্রেক্ষিতে ডেভিট স্কট বর্মী কমান্ডিং অফিসারের নিকট দোষী ব্যক্তিদের প্রত্যার্পণ দাবি করেন। কিন্তু বর্মী কমান্ডিং অফিসার এ কথার গুরুত্ব দেয়নি বরং বর্মী বাহিনী পুনরায় আসাম সীমান্তবর্তী বাংলার কয়েকটি গ্রাম আক্রমণ করে লুটতরাজ চালায়।[১৬৯]

www.pathagar.com

পরবর্তী পর্যায়ে নাফ এলাকায় বর্মীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ১৮২৩ সালের জানুয়ারি মাসে কোম্পানির কতিপয় নাগরিকসহ চালবোঝাই নৌকা নীলার নিকটবর্তী স্থান অতিক্রম করার সময় বর্মীরা উপশুল্ক দাবি করে এবং এ দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে তারা নৌকার উপর গুলি চালিয়ে একজন মাঝিকে হত্যা করে। এ ঘটনার পর পরই বর্মীরা আরাকান সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে। কোম্পানি টেকনাফের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য টেকনাফে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে শাহপুরীতে সৈন্যদল প্রেরণ করলে আরাকানের গভর্ণর কোম্পানির গভর্ণর জেনারেলের কাছে একখানা পত্রে শাহপুরীকে তাদের নিজস্ব ভূখণ্ড "মেইন-মা-বু" হিসেবে দাবি করেন এবং ঐ অঞ্চল হতে কোম্পানির সৈন্য অপসারণের দাবি জানান। কোম্পানির গভর্ণর জেনারেল লর্ড আর্মহার্স্ট এ দাবিকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং অনুকূল পরিবেশে বাংলার দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তের বিভিন্ন সমস্যা পর্যালোচনার জন্য কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের নিশ্চয়তা দান করেন। এ পর্যায়ে একজন পদস্থ আরাকানী এজেন্ট নিয়োগের জন্য তিনি আরাকানের গর্ভণরের নিকট প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু এ প্রস্তাব তার নিকট পৌঁছার পূর্বেই ঐ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর এক হাজার বর্মী সৈন্য অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে কোম্পানির কতিপয় সৈন্যকে নিহত ও আহত করে শাহপুরী দখল করে।[১৭০] কোম্পানি পুনরায় ঐ সালের ২১ নভেম্বর এক অভিযান পরিচালনা করে শাহপুরী পুনরুদ্ধার করে[১৭১] এবং সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে রবার্টসনকে নিয়োগ দান করে। সেখানে প্রতিকূল পরিবেশে সৈন্যগণ জ্বরে আক্রান্ত হলে ১৮২৪ সালের জানুয়ারি মাসে ম্যাজিস্ট্রেটের সুপারিশে কোম্পানি শাহপুরী হতে সৈন্য অপসারণ করে।[১৭২] এ সুযোগে বর্মী বাহিনী সুকৌশলে শাহপুরী পুনরাধিকার করে। কোম্পানি এ বিষয়ে বার্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বর্মী কর্তৃপক্ষ একজন দোভাষীর মাধ্যমে কোম্পানির সামরিক ও নৌবাহিনীর কর্মচারিদের এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আরাকানের মংডুতে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার আমন্ত্রণ জানায়। কোম্পানির সামরিক কর্মচারীগণ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও নৌবাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মচারী এবং কমান্ডার চিউ ও রয়েস প্রস্তাবে রাজি হন। আটজন লস্কর ও কোম্পানির জাহাজ 'সোফিয়া'কে নিয়ে মংডু পৌঁছলে বর্মী সৈন্যরা জাহাজ আটকপূর্বক তাদেরকে গ্রেফতার করে লংদু'র প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠায়।[১৭৩]

এ ইস্যুতে ক্রমশ সীমান্ত পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আত্মোৎস্বর্গী বর্মী সেনানায়ক মহাবান্দুলা চট্টগ্রামে একটি আক্রমণ পরিচালনা করেন। ফলে গভর্ণর জেনারেল লর্ড আর্মহার্স্ট অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, বর্মীরা প্রত্যক্ষভাবেই কোম্পানির সাথে যুদ্ধরত। এ প্রেক্ষিতে ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ফোর্ট উইলিয়াম হতে ১৮২৪ সালের ৫ মার্চ বার্মার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কোম্পানির সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ লিপ্সা ও বার্মার জংগী মনোভাবের প্রতিফলনই ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধের অন্যতম কারণ।[১৭৪]

www.pathagar.com

ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের প্রথম দিকেই আসাম, কাছাড় ও আরাকানে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৮২৪ সালের মে মাসের শুরুর দিকে বর্মী সেনাপতি মহাবান্দুলার নেতৃত্বে বর্মী সৈন্যরা বাংলা দখল করার মানসে আরাকানে অবস্থান করছিল। যুদ্ধ শুরু হবার পর তারা নাফ নদী অতিক্রম করে রামুর ১৪ মাইল দক্ষিণে রত্নাপালং-এ অবস্থান গ্রহণ করে। ইংরেজ ক্যাপ্টেন মর্টন তিন'শ নেটিভ পদাতিক বাহিনী নিয়ে অগ্রসরমান বর্মী বাহিনীর মোকাবেলার চেষ্টা করলে দশ হাজার সৈন্যের বর্মী বাহিনী তাকে পরাজিত এবং হত্যা করে। মহাবান্দুলার এ বিজয়ের ফলে সারা চট্টগ্রামে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।[১৭৫]

ওদিকে ১৮২৪ সালের ১২ মে বর্মীদের সম্পূর্ণভাবে বিস্মিত করে দিয়ে ইংরেজরা রেঙ্গুন দখল করে নেয়। থোন বা উংগি এবং কিউংগি নামক দুই বর্মী সেনানায়ক ইংরেজদের অগ্রযাত্রায় বাধা দানে ব্যর্থ হলে সেনাপতি মহাবান্দুলাকে আরাকান থেকে ডেকে পাঠানো হয় এবং তাকে প্রচুর সম্মানে ভূষিত করে জাতীয় বীরের মর্যাদা দিয়ে ইংরেজ বাহিনীকে দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে তাড়িয়ে দেবার জন্য প্রেরণ করা হয়। বান্দুলা এ সময় আস্ফালন করে রাজকুমার থারাওয়ার্দীকে বলেছিল- "In eight days I shall diney in the public hall at Rangoon and afterwards return thanks at the Shwe Dagon Pagoda."[১৭৬] বান্দুলা ষাট হাজার পদাতিক সৈন্য এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গোলন্দাজ সেনাসহ রেঙ্গুনের দিকে অগ্রসর হয়ে অর্ধবৃত্ত আকারে কেসেনদাইন থেকে পাজুনগং নদী পর্যন্ত নিজের সৈন্যদের বুহ্য রচনা করে বৃটিশ বাহিনীর মোকাবেলা করতে থাকে।[১৭৭] আরাকান থেকে বান্দুলাকে ডেকে পাঠানো এবং স্যার আর্চিবল্ড ক্যাম্পবেলের বাহিনী দীর্ঘকাল যাবৎ রেঙ্গুনে আবস্থান করার ফলে কোলকাতার বৃটিশ প্রশাসনকে আরাকান-ইয়োমা গিরিপথের মধ্য দিয়ে আরাকানের অভ্যন্তরে যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটানোর বিষয়ে উৎসাহিত করে তোলে। এর ফলে ১৮২৫ সালের জানুয়ারি মাসে জেনারেল মরিসণের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী আরাকানে অনুপ্রবেশ করে এবং শীঘ্রই আরাকানের রাজধানী ম্রোহংয়ে পৌছায়। এ অভিযানে একটি স্থল বাহিনী এবং ছোট জাহাজের সমন্বয়ে গঠিত নৌবহর অংশ গ্রহণ করে। ফলে সহজেই বৃটিশ সৈন্যরা আরাকানের রাজধানী দখল করে। এরপর বৃটিশ বাহিনী দক্ষিণ দিকে স্যান্ডুয়ে এবং চেদুবা দখলের জন্য অগ্রসর হয় এবং কিছু সৈন্য আরাকানের রাজধানীতে অবস্থান করতে থাকে। বর্ষার শেষে ভারত থেকে আরাকানে পুনরায় অস্ত্র-সস্ত্র, রসদ এবং নতুন সৈন্যদের আগমন ঘটলে জেনারেল মরিসন বিনা বাধায় দ্রুত সমস্ত আরাকান দখল করেন। ১৮২৫ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই সমস্ত আরাকান বৃটিশ দখলাধীনে আসে।[১৭৮]

১৮২৫ সালের ১ এপ্রিল দানবুতে বোমা বিস্ফোরণে বান্দুলা মৃত্যুবরণ করার পর ১৮২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্মী সেনানায়ক মহা নেমিও (Maha Nemyo) প্রোমের যুদ্ধে পরাজিত হলেও বায়জীদ পরাজয় স্বীকার করে চুক্তি স্বাক্ষরে রাজি ছিলেন না।[১৭৯] অতঃপর বৃটিশের চাপের মুখে অসহায়, বিপর্যস্ত ও ভীত সন্ত্রস্ত বর্মীদের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত শান্তি প্রস্তাব মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অবশেষে

www.pathagar.com

১৮২৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রেঙ্গুন থেকে মাত্র ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত ইয়ান্দাবু (Yandaboo) গ্রামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির ধারা অনুসারে বর্মীরাজ -

প্রথমত, আসাম এবং এর অধীনস্থ এলাকা ও মণিপুরের উপর থেকে সমস্ত দাবি প্রত্যাহার করে।

দ্বিতীয়ত, বর্মীরাজ ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আরাকান এবং টেনাসেরিম প্রদেশ ছেড়ে দিতে রাজি হয়।

তৃতীয়ত, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ইংরেজকে এক মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং দিতে বাধ্য হয়।

চতুর্থত, এই মর্মে ঐকমত্যে পৌঁছে যে, আভাতে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট অবস্থান করবেন এবং কোলকাতায় একজন বর্মীদূত স্থায়ীভাবে অবস্থান করবেন।[১৮০]

এ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ইংরেজদের সফলতা অর্জন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে D.P. Singhal বলেন-

> They (The British) got much more by military power than they had asked for through diplomatic negotiations. Their diplomatic ventures to establish a permanent misson at the court of Ava were previously rejected by the king of Burma, but now under the terms of the Yandabo Treaty they obtained the right to send their aceredited representatives to Ava, accompanied by a military escort. In fact, the Treaty provided for the mutual exchange of permanent diplomatic missions.[১৮১]

প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের মাধ্যমে বৃটিশ আরাকান দখল করে নিলেও শুরুতেই সেখানে কোন সুস্পষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। এ যুদ্ধের ফলাফল স্বরূপ সম্পাদিত ইয়ান্দাবুর চুক্তির শর্ত বাস্তবায়নে বর্মী কর্তৃপক্ষ কালক্ষেপণ করতে থাকলে দীর্ঘ ২৬ বছর যাবৎ ইঙ্গ-বর্মীর অবনতিশীল রাজনৈতিক সম্পর্কের ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮৫২-৫৩ সালের যুদ্ধে ইংরেজরা বার্মার সমৃদ্ধশালী পেগু প্রদেশটি দখল করে নেয়। ফলে বার্মার অবশিষ্টাংশ একটি স্থল বেষ্টিত দেশে পরিণত হয়। অধিকন্তু বিভিন্ন বন্দর ও সমৃদ্ধশালী পেগু প্রদেশ হাতছাড়া হবার ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে বার্মা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।[১৮২] মং মং মন্তব্য করেন-

> The Second war marked the beginning of the end of Burma. Her natural wealth was lost in war, all her seaports had been taken, and she could reach the world only by the sufference of the British. The remaining years of the kingdom were a leage of life.[১৮৩]

www.pathagar.com

পেগু দখলের পর বৃটিশরা আরাকান সম্পর্কে অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠে। অতঃপর তৃতীয় ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধে (১৮৫২-১৮৮৫) বিজয়ের মাধ্যমে বার্মা বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

তৃতীয় ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের (১৮৮৫ খৃ.) মাধ্যমে বার্মায় পুরোপুরিভাবে বৃটিশ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানকার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে কাঠামোগত ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।

প্রথমত, সমগ্র বার্মা বৃটিশ ভারতের একটি প্রশাসনিক প্রদেশে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়ত, বার্মার রাজধানী পরিবর্তন করে বন্দর নগরী রেঙ্গুনকে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাজধানীতে পরিণত করা হয়।

তৃতীয়ত, বর্মী রাজাদের সামন্তবাদী কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে নগরকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য ভিত্তিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়।[১৮৪]

বৃটিশ প্রবর্তিত প্রশাসন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বর্মীদের নিকটে খুবই অপরিচিত ছিল। তাছাড়া বার্মায় জনশক্তির অপ্রতুলতা যেমন ছিল তেমনি ভারতীয়রা ছিল কর্ম সংস্থানের অনুসন্ধানী। ফলে ভারতীয়দেরকে বার্মায় কর্মসংস্থানের জন্য যাবার সুযোগ দেয়া হয়। এমতাবস্থায় প্রাথমিকভাবে ভারতীয়রা সরকারি কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর তল্পীবাহক হিসেবে বার্মায় আগমন করে। এরপর ক্রমশ ব্যবসায়ী, দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক, রেলশ্রমিক, দোকানদার, দোকান কর্মচারী, বন্দরের কুলি, স্কুল শিক্ষক, নৌকার মাঝি, খনি শ্রমিক, ব্যাংক কর্মচারী, পোষ্ট অফিসের কর্মচারী এবং ফেরিওয়ালা প্রভৃতি পেশায় বাংলা ও ভারত থেকে বহু লোকের আগমন ঘটে।[১৮৫]

বৃটিশ কর্তৃক আরাকান জয়ের পর বাংলার আরাকানী উদ্বাস্তুদের ভাগ্যের কিছুটা পটপরিবর্তন হয়। বৃটিশরা আরাকানের পতিত জমির ব্যাবহারের প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে ১৮৩৯ সালে আরাকান 'পতিত জমি অধ্যাদেশ আইন ১৮৩৯' এর মাধ্যমে সেখানে আবাদ ও বসতি স্থাপনে আগ্রহী হয়। বৃটিশদের কঠোর খাজনানীতি কিছুটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও ১৭৮৫ সালের পর হতে আরাকান থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গা ও মগরা পুনরায় সেখানে ফিরে গিয়ে দেশ প্রেমের টানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং অনাহার অর্ধাহার থেকে পাহাড়ি রোগ, ও হিংস্র জানোয়ারের সাথে যুদ্ধ করে অমানবিক পরিশ্রমের মাধ্যমে শ্রম বিনিয়োগ করে আরাকানের গভীর অরণ্য পতিত অঞ্চলসমূহ বাসযোগ্য করে তোলে।[১৮৬] তারপরেও সকল রোহিঙ্গা মুসলমান ও আরাকানী মগ সেখানে ফিরে যায়নি। কারণ এসময় ভারত উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা একই শাসক শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকায় বাংলা ও আরাকানের মধ্যে যাতায়াত-ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্যাগুলি দূরীভূত হয় এবং আরাকানীরা বৃটিশ ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। কক্সবাজার জেলার হারবাং, মানিকপুর, রামু, কক্সবাজার সদর, খুরুস্কুল, চৌফলদণ্ডী, মহিষখালী, খারাংখালী, নীলা, চৌধুরীপাড়া ও টেকনাফ প্রভৃতি এলাকায় আরাকানী মগদের বসতি আজও বিদ্যমান। তাদের অনেকে

www.pathagar.com

বিভিন্ন মওসুমে শ্রমিক হিসেবে কিংবা ব্যবসা করার জন্য আরাকান যেত অতঃপর নিজ বাড়িতে ফিরে আসত।[১৮৭]

যে সব আরাকানী উদ্বাস্তু পুনরায় আরাকানে ফিরে যায়- তাদের গমন ছিল স্বেচ্ছায়, তবে বৃটিশ কিছু সুযোগ সুবিধা দেখিয়ে তাদেরকে আরাকানে যেতে উৎসাহিত করেছে মাত্র। এ ছাড়াও আরো কিছু কারণও বিদ্যমান ছিল:-

প্রথমত, বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলের সর্বত্র ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকরি করার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হবার কারণে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী আরাকানী জনসমষ্টির একটি বিরাট অংশ আরাকানে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে।

দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রাম অঞ্চলে তীব্র বেকার সমস্যা ও অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে আরাকানের ব্যবসায়িক সুবিধা ও মজুরির উচ্চাহার তাদের নিজ ভূমে যেতে উৎসাহিত করে। ১৮৮৭ সালে বাংলার চট্টগ্রাম জেলার একজন মজুরের দৈনিক গড় মজুরি ছিল ৯ টাকা ১২ আনা। অথচ একই সময়ে আরাকানের আকিয়াবে একজন শ্রমিকের দৈনিক গড় মজুরি ছিল ১৫ টাকা।[১৮৮]

তৃতীয়ত, বাপদাদার বাস্তুভিটার প্রতি প্রত্যেক মানুষেরই আকর্ষণ থাকে। সে আকর্ষণেও অনেকে আরাকানে নিজ বাসভূমে ফিরে যায়। বৃটিশ সরকারের অবাধ শ্রমনীতির ফলে আরাকানী অভিবাসী ছাড়াও বাংলা ও ভারতের অনেক শ্রমিক ব্যবসায়ী ভাগ্যোন্নয়নের জন্য আরাকানে পাড়ি জমায়। তবে এ সংখ্যা খুব বেশি হবে না।[১৮৯]

বার্মা পুরোপুরিভাবে বৃটিশ মুক্ত হবার পর সেখানকার বৌদ্ধ নাগরিকদের সুসংঘবদ্ধকরণ, শিক্ষার সম্প্রসারণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তার লক্ষ্যে রেঙ্গুন কলেজের ছাত্র-যুবকদের সমন্বয়ে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে Young Men's Buddhist Association (YMBA) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে সংগঠনটি রাজনৈতিক কর্মপন্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করে। পরবর্তীতে YMBA থেকে General Council of Burmese Association (GCBA) নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৯০]

এদিকে বৃটিশ শাসনামলেও বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আরাকানসহ বার্মায় মুসলমানদের আগমন ঘটে। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বহিরাগত ও স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য দেখা দেয় । বিশেষ করে আগত মুসলমানরা বাংলা, তেলেগু ও উর্দুসহ নিজ নিজ এলাকার স্থানীয় ভাষায় কথা বলে; পক্ষান্তরে স্থানীয় মুসলমানরা বর্মী ভাষা ব্যবহার করে। এ অবস্থায় স্বকীয়তা বজায় রাখার মানসে অনেকেই সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনে অনীহা প্রকাশ করে। অন্যদিকে মগরা অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সুসংঘবদ্ধ হয় এবং গোপনে মুসলিম বিদ্বেষী কার্যকলাপ শুরু করে। এ প্রেক্ষিতে বার্মায় বসবাসরত সকল মুসলমানকে স্থানীয় পরিবেশে অভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে সহায়তার লক্ষ্যে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর উ বা অ (U Bah Oh) নামক

www.pathagar.com

রেঙ্গুনের জনৈক মুসলিম ব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্যে 'বার্মা মুসলিম সোসাইটি' গঠিত হয়। বৃটিশ সরকার কর্তৃক গঠিত তথ্যানুসন্ধানী কমিটিসমূহের নিকট এ সংগঠনটি বার্মার মুসলমানদের একক প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পেশ করে। বিশেষ করে ১৯১৬ এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে লর্ড চেমস্ ফোর্ড ভারত শাসন আইন সংস্কারের লক্ষ্যে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বার্মায় আসে। তখন এ সোসাইটির পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিভিন্ন দাবি সম্বলিত স্মারক লিপি পেশ করে আইন পরিষদে (Legislative Council) মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দানের জন্য অনুরোধ জানায় । এছাড়াও ভারত শাসন আইনের অধীনে গঠিত সাইমন কমিশন গঠিত হলে তাতেও এ সোসাইটি স্মারক লিপি প্রদান করে। পরবর্তী কালেও মুসলমানদের মধ্যে জনকল্যাণমূলক আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১৯১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বার্মার গ্রামীণ জীবনে দূর্দিন নেমে আসে। কৃষকরা ধান-চালসহ কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। এ সময়ে ভারতীয় হিন্দু সুদখোর মহাজনরা সেখানকার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে বন্ধকী ব্যবসা শুরু করে। ফলে হাজার হাজার কৃষক সর্বস্ব হারিয়ে ভারতীয় মহাজনদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে শহরে পাড়ি জমায়। কিন্তু শহরের শ্রমিকদের অধিকাংশ ভারতীয় বিধায় তারা বাংলা ও ভারত থেকে আগত মুসলমানসহ সবার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করে।[১৯২] এ থেকে ক্রমশ জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে ওঠে এবং বার্মাকে ভারত শাসন আইন থেকে পৃথক করে দেশ শাসনের ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমন্বয়ে DOHBAME ASIAYONE (Our Burman Association) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনের কর্মীরা নিজেদের নামের প্রথমে থাকিন (THAKIN)[১৯৩] শব্দটি লিখত বলে জনগণের নিকট এটি 'থাকিন পার্টি' নামে খ্যাত হয়। পরবর্তীতে এ সংগঠনটি মুসলিম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।[১৯৪]

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী থেকেই মূলত আরাকানে মুসলিম বসতির সূচনা হয়। কিন্তু তখনকার মুসলমানদেরকে রোহিঙ্গা নামে সম্বোধন করা হতো না। ১৪৩০ সালে নরমিখলা কর্তৃক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের পর ম্রোহংয়ে রাজধানী স্থাপন করার মধ্য দিয়ে আরাকানে মুসলমানদের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি ম্রোহংয়ের অধিবাসী হবার সূত্রে তাদেরকে রোহিঙ্গা বলা হয়। যেমনটি বাংলার অধিবাসীদেরকে বাঙ্গালী বলা হয়ে থাকে। এভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই রোহিঙ্গা নামের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সূচনা হয় এবং অচিরেই আরাকানের রাজদরবার থেকে শুরু করে ব্যবসায়-বাণিজ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৮৫ সালে বর্মীরাজ বোধপায়া কর্তৃক আরাকান দখলের মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গাদের নির্যাতিত জীবনের সূত্রপাত ঘটে এবং বৃটিশ শাসনামলের কিছুটা সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে এলেও স্বাধীনতা উত্তর

www.pathagar.com

মিয়ানমারে এর বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। বর্মী শাসক গোষ্ঠী ও স্থানীয় মগরা রোহিঙ্গাদেরকে কল্লা বা ভিনদেশী বলে চিহ্নিত করে নির্যাতনের মাধ্যমে বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করলেও রোহিঙ্গারা মূলত আরাকানেরই স্থায়ী নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত।

পাদটীকা ও তথ্যপঞ্জী

---

১ ১৯৮৯ সালের ১৮ জুন সরকারিভাবে বার্মার নাম পরিবর্তন করে মিয়ানমার রাখা হয়েছে। রাজধানী রেঙ্গুনের নামও পরিবর্তন করে রেখেছে ইয়াংগুন। বর্তমানে নেইপিডু মিয়ানমারের রাজধানী। তবে এ গ্রন্থে ইয়াংগুনের স্থলে রেঙ্গুন, বার্মার স্থলে বার্মা এবং মিয়ানমার উভয়ই ব্যবহার করা হবে। এছাড়া আরো বিভিন্ন স্থানের নামের ক্ষেত্রেও একই ধরনের পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বর্মী সরকারের ঘোষণা হয়েছ, বার্মায় কারেন, কাচিন, মন, বর্মী প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর লোক বাস করে। বর্মীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও কেবল তাদের নামানুসারে গোটা দেশের নামকরণ করা সম্ভব নয়। [দ্রষ্টব্য. *Far Eastern Economic Review*, 29 June, 1989, p. 14.]; অন্যদিকে ১৯৭৪ সালে মিয়ানমার সরকার নে উইন আরাকানকে 'রাখাইন স্টেট' নামকরণ করে একটি অঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা দান করেন। (দ্র. The Constitution of the Socialist Republic of Union of Burma, 1974, Sec. No. 30/5.)

২ D.G.E. Hall, *A History of South-East Asia* (London: Macmillan Press Ltd., 1994), pp. 411-12.

৩ D.G.E. Hall, *Burma* (London: Hutchinson and Co. Ltd. 1960), p. 62.

৪ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ১; মুহম্মদ সিদ্দিক খান, "ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে মুসলমান" *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৬৮, পৃ. ৪৭।

৫ আবদুল করিম, "রোহিঙ্গাদের হাজার বছরের ইতিহাস," *পাক্ষিক পালাবদল*, ঢাকা, ১ম বর্ষ, ২৩ সংখ্যা ১৯৯২, পৃ. ২৮।

৬ AFK, Jilani, "A Brief Account of the Regional Geography of Arakan" (Physical Features) TMs (photocopy), Special Collection, Arakan Historical Society Library, Chittagong p.1.; *The High School Geography of Burma* (in Burmese), The Textbook Committee, Ministry of Education, The Socialist Republic of Union of Burma, Rangoon, 1975, p. 283.

৭ Jilani, Regional Geography of Arakan, p. 4; Mohammed Yunus, *A History of Arakan: Past and Present* (Chittagong: Magenta colour, 1994), p. 2.

৮ আবদুল মাবুদ খান, "আরাকানের মুক্তি সংগ্রাম ও তার উৎস," *ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ত্রয়োদশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৮৬, পৃ. ১০০; *ইসলামি বিশ্বকোষ*, পৃ. ৭১৬।

৯ Jilani, "Regional Geography of Arakan," p. 10; উল্লেখ্য, শহরগুলি হচ্ছে ১. আকিয়াব (Akyab), ২. কিয়াউক পায়ু (Kyauk Pyu), ৩. সাণ্ডওয়ে (Sandoway), ৪. কিয়াউকতাউ (Kyauktaw), ৫. বুচিদং (Buthidaung), ৬. মংডু (maungdaw), ৭. মিনবিয়া (Minbya), ৮. ম্রাউক-উ (Mrauk-U), ৯. ওয়া (Gwa), ১০. টংগুপ (Tangup), ১১. পিউক তাউ (Pauk Taw), ১২. পোন্নাগিউন (Ponnagun), ১৩. মেবন (Maybon), ১৪. মেনাং (Manaung), ১৫. রামব্রী (Rambree), ১৬. রাথিদং (Rathedaung), ১৭. অন (Ann)। (দ্র; Jilani, "Regional Geography of Arakan," p. 10.)

১০ আবদুল মাবুদ খান, "আরাকানের মুক্তি সংগ্রাম," পৃ. ১০০; *ইসলামি বিশ্বকোষ*, পৃ. ৭১৬।

১১ Jilani, "Regional Geography of Arakan," p. 7.

১২ *ইসলামি বিশ্বকোষ*, পৃ. ৭১৭ ও মুহাম্মদ ইউনুছ, *অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস* (আরাকান: আরএসও, ১৯৯০) পৃ.৪।

www.pathagar.com

১৩ আবদুল করিম, *পালাবদল*, পৃ. ২৮; *ইসলামি বিশ্বকোষ*, পৃ. ৭১৭।

১৪ Yunus, *A History of Arakan*, p. 12; *Manifesto of ARNO*, Arakan, 1998, p. 2; *দৈনিক জনতা*, ১৭ নভেম্বর, ১৯৯১; *দৈনিক সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯০; *দৈনিক আজাদ*, ১৫ও১৭ নভেম্বর, ১৯৯১।

১৫ Abdul Karim, *The Rohingyas: A Short Account of their Histroy and Culture* (Chittagong: Arakan Historical Society, 2000), p. 2.

১৬ The Return of the Rohingya Refugees to Burma: Voluntary Repatriation or Refaulement? *U.S. Committee for Refugees*, Washington, March 1995, p. 3.

১৭ R.B. Smart, *Burma Gazetteer Akyab District*, Vol. A (Rangoon: Burma Government, Printing & Stay 1959), p.83.

১৮ *Government Official Population Census of Arakan in 1931*, Union of Burman.

১৯ এনামুল হক ও আবদুল করিম, *আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য*, পৃ. ৩২।

২০ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* ১ম পর্ব (কলিকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লি. ১৯৮০), পৃ. ৬৯১।

২১ মীর্জা নাথান, *বাহারীস্তান-ই-গায়বী*, ২য় খণ্ড, খালেকদাদ চৌধুরী অনূদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১৪২।

২২ আবদুল করিম, *পালাবদল*, পৃ. ২৮; উল্লেখ্য, ভূগোলবিদ টলেমী যে দেশকে Argyre বলেছেন, সে দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে ঐতিহাসিগণ আরাকান কে অভিন্ন মনে করেন; (দ্র. *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ঢাকা, ১৯ সংখ্যা, ১৩৭৫ বাংলা, পৃ. ৮০); তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারাকানাথ আরাকানকে 'রকন' উল্লেখ করেছেন এবং পিলোভিনের ল্যাটিন ভাষায় লিখিত ভূগোলে আরাকান নাম লিখিত রয়েছে। (দ্র. Sarat Chandra Das, "Antiquity of Chittagong", *JASB*, 1898, pp. 21-22); আরাকানের রোহিঙ্গারা আরাকানকে আররেকন বা আররুকন শব্দের অপভ্রংশ বলে থাকেন। (দ্র. *The Call of Rhingya*, Arakan Rohingya Patroetic Front, 1st Year, No., 1981)।

২৩ অমৃতলাল বালা, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃ. ৫৪।

২৪ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ১।

২৫ Harvey, *History of Burma: From the Earliest Time to 10 March 1824, The Begining of the English Conquest* (London: Frank Cass & Co., 1967), p. 137.

২৬ Smart, *Burma Gazetteer*, pp. 44-45.

২৭ Harvey, *History of Burma*, pp. 369-70.

২৮ E.H. Johnston, "Inscription of Arakan,"; *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, No 11, London, 1944, pp. 357-86.

২৯ Harvey, *History of Burma*, pp.137, 370-72.

৩০ Mozzammil Haq, *The Institute of Muslim Minority Affairs Bulletin*, Jeddah, king Abdul Aziz University, 1978.

৩১ আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৫), পৃ. ১৫; Mohammad Ali Chowdhury, "The Advent of Islam in Arakan and the Rohingyas" *Anual Magazine 1995-96, Arakan Historical Society*, Chittagong;

৩২ আবু আবদুল্লাহ হাকিম, *মুস্তাদরাক-ই-হাকিম*, ১ম খণ্ড (দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ: প্র.বি., তা.বি.), পৃ. ৩৫।

৩৩ কাজী আতাহার মুবারকপুরী, *আরব ওয়া হিন্দ আহদে রেসালাত মে* (দিল্লী: নদওয়াতুল মুসান্নেফিন, তা.বি.), পৃ. ১৬০।

৩৪ ইবনে আবদুর রাব্বী আল আন্দালছী, *আল ইকদুল ফরিদ*, ১ম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ (কায়রো: প্র.বি., ১৯৬৯), পৃ. ২০২।

www.pathagar.com

৩৫ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, কাজী রশিদ বিন জুবাইর, *কিতাবুস যাখায়ের ওয়াত তুহুফ* (কুয়েত: প্র.বি., ১৯৫৯), পৃ. ২১-২২, ২৬-২৭।

৩৬ আমিন নদভি, *তারিখে আরকান*, পৃ. ৯-১০।

৩৭ এম এ রহীম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৩৪। সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভি, রুহমী বলতে বার্মাকে বুঝিয়েছেন। [দ্র. সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভি, *হিন্দুস্থান আরাবিউ কি নজর মে* (আজমগড়: দারুল মুসান্নেফিন, তা.বি.), পৃ. ১১০]; কাজী আতাহার মুবারকপুরী রুহমী বলতে আরাকান অথবা বার্মার পার্শ্ববর্তী কোন এলাকাকে বুঝিয়েছেন। (দ্র. কাজী আতাহার মুবারকপুরী, *ইসলামি হিন্দ কি আজমত রফতা* (দিল্লী: নদওয়াতুল মুসান্নেফীন, তা.বি.), পৃ. ২৩৭।

৩৮ A.P. Phayre, *Journal of Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. XII, part 1, 1844, p. 36; শাহ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, "বার্মার রোহিঙ্গা মুসলমানদের জীবন," *দৈনিক ইনকিলাব*, ২০ এপ্রিল ১৯৯০, ঢাকা।

৩৯ M. Siddique Khan, "Muslim Intercouse with Burma" *Islamic Culture*, Vol. X, Hydrabad, July 1936, p. 418. উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক সুলয়মান, আবু জায়দুল হাসান, ইবনুখুরদবা, আল মাসুদী, ইবনু হাওকল, আল্ইদরিসি প্রমূখ প্রাচীন আরব পরিব্রাজক ও ভৌগোলিকদের বিবরণ থেকেও এ ধরনের তথ্য জানা যায়। [দ্র. এনামুল হক ও আবদুল করিম, *আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য*, পৃ. ৩৩]

৪০ মাইন্ট আং, ইমদাদুল হক সরকার অনুদিত, "বার্মায় ইসলাম", *দৈনিক আজাদ*, ২৩ জানু. ১৯৮৭।

৪১ উল্লেখ্য, অনুরূপভাবে দিনাজপুরের হেমতাবাদে, বর্ধমানের কালনায় এবং বিহারে বদরউদ্দিন-'বদর-ই-আলম' দরবেশের দরগা রয়েছে। এতে অনুমান করা যায়, বদর শাহ নামে একাধিক পির ছিলেন। [দ্র. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড] পৃ. ৮৪৮।

৪২ Harvey, *History of Burma*, 137; P. E. Maung Tin and C. H. Luce, *The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma* (London: Humphrey, Milford, 1913), p. 75.

৪৩ লোকগীতির একটি সঞ্চারি-
বদর বদর বলি/কিনারে কিনারে চলি/ভাটি গাঙ্গে ভাটিয়ালী গাইও
থাকিলে জোয়ারে দেরি/লগি মাইরো তরা তরি/বেলা বেলী ঘাটে ফিরে আইও।

৪৪ শাহ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, "বার্মার রোহিঙ্গা মুসলমান" *দৈনিক ইনকিলাব*, ২০ এপ্রিল, ১৯৯০।

৪৫ আখতারুজ্জামান, "আরাকানী রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর উৎস ও ক্রমবিকাশ একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা (১২০৪-১৭৮৫ খৃ.), *ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ*, পঞ্চবিংশ বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৯৮ সংখ্যা, পৃ. ১১৭-১৮।

৪৬ মুহাম্মদ খলিলুর হমান, *তাওয়ারিখে ইসলাম: বার্মা ওয়া আরকান* (কলিকাতা: দি স্টার আর্ট প্রেস, ১৯৪২) পৃ. ২৪; আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি*, (চট্টগ্রাম] জোবাইদা বানু চৌধুরী, ১৯৮০), পৃ. ১০১; Smart, *Burma Gazetteer*, p. 17.

৪৭ ম্রোহং আকিয়াব জেলার একটি অন্যতম শহর। এখানকার লোক প্রচলিত নাম পাথুরেকেল্লা। [দ্র. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ৪৩৮।

৪৮ মুহাম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, *আরাকান রাজ সভায় বাঙালা সাহিত্য*, মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৩৪-৩৫; এবং আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ আধিবাসী*, পৃ. ২৩,২৫-৩১।

৪৯ উল্লেখ্য, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও আহমদ শরীফ প্রমূখ মনে করেন রোসাঙ্গ শব্দটি আরাকানের পূর্বতম রাজধানী ম্রোহং এর বিকৃত রূপ; যথা: ম্রোহং (Mrohaung) > রোয়াং (Roang) > রোহাং (Rohang) > রোসাং (Roshang)। পূর্ববাংলার কথ্যভাষায় 'স' 'হ' উচ্চারিত হয় কিন্তু লিখিত 'স' রক্ষিত থাকে সেই সাদৃশ্যে হয়তো রোহাংয়ের 'স' 'হ' তে রূপান্তরীত হয়ে রোসাঙ্গ হয়েছে। [দ্র.

www.pathagar.com

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত, এবং আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পুঁথি পরিচিতি* (ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮), পৃ. ৩১৬; Yunus, *A History of Arakan*, p. 7.

৫০ মুহাম্মদ আমিন নদভি, *তারিখে আরকান কা এক গামসুদা বাব* (আরাকান: আরাকান হিস্ট্রি কনফারেন্স, ১৯৮৬), পৃ. ১৭-১৮।

৫১ Harvey, *History of Burma*, pp. 139-40; মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল*, (চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৫) পৃ. ৪৮-৪৯।

৫২ মো: মাইনুল আহমাসন খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত* (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৯৯৮), পৃ. ১০।

৫৩ আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ১৯০; শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রা. লি., ১৩৮০), পৃ. ৪৪।

৫৪ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, পৃ. ১৯০-২০১।

৫৫ Moshe Yegar, *The Muslims of Burma* (Jerusalem: Hebrew University, 1981), p. 18.

৫৬ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল*, পৃ. ৪৯।

৫৭ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ২৩।

৫৮ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৫১; এনামুল হক ও আবদুল করিম, *আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য*, পৃ. ৩৪-৩৫।

৫৯ Harvey, *History of Burma*, p. 137; রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৫১।

৬০ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, পৃ. ২৩৬; আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস মোগল আমল* (রাজশাহী : ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯২), পৃ. ২১৮। উল্লেখ্য, কোন কোন গবেষক মনে করেন, আরাকান রাজাগণ বাংলার করদ রাজা ছিল না বরং মুসলমানদের উন্নত সভ্যতা গ্রহণের নিমিত্তেই তাদের বৌদ্ধ নামের সাথে মুসলিম নাম ও মুদ্রায় কালেমা উৎকীর্ণ করত। [দ্র. এনামুল হক ও আবদুল করিম,*আরাকান রাজ সভায় বাঙালা সাহিত্য*, পৃ. ৩৬; মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল*, পৃ. ৫২ ; Yunus, *A History of Arakan*, pp. 35-36 এবং আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ*, (চট্টগ্রাম: কথামালা প্রকাশন, ১৯৯২), পৃ. ৮৪-৯৮।]

৬১ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, পৃ. ২০৯-৫৪; আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস মোগল আমল*, পৃ. ২১৮; Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, p. 18.

৬২ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল*, পৃ. ৫৫-৫৭।

৬৩ M.S. Collis, "Arakan's place in the civilization of the Bay" *JBRS*, 50th Anniversary publication, No. 2, Rangoon, 1960, p. 486।

৬৪ আহমদ শরীফ, *সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৭৯ বাং), পৃ. ৩৪।

৬৫ M.S. Collis, "Arakan's place in the civilization of the Bay," p. 491.

৬৬ M.S.Collis and San Shwe Bu,"Arakans Place in The Civilisation of the Bay" *JBRS*, Vol. xv, No.1. 1925, pp. 39-43 ; Harvey, *History of Burma*, pp. 139-45 ;371-72 ; R.C. Majumdar, *Hindu Colonies in the Far East* (Calcutta: General Printers and Publication, 1944), pp. 202, 205-206; A.S. Bahar, The *Arakani Rohingyas in Burmese Socity*, M.A. Thesis, University of windsor, Onterio, Canada, p. 27.

৬৭ এনামুল হক ও আবদুল করিম, *আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য*, পৃ. ৩৬; মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল*, পৃ. ৫৪-৫৭; Yunus, *A History of Arakan*, pp. 35-36; আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ৩৫-৩৬, এবং আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ*, পৃ. ৮৪-৯৮।

www.pathagar.com

৬৮ Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslim of Bengal,* vol. IB, (Ryadh: Imam Muhammad Ebn Soud Islamic University, 1985), p. 865 ; মাইমুল আহসান খান *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, পৃ. ১২।

৬৯ ফকিরগাজী, "রকমফের" *দৈনিক সংগ্রাম*, ২১ জানুয়ারি ১৯৯০।

৭০ মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, পৃ. ১৯।

৭১ Yunus, *A History of Arakan*, pp. 33-37; Nurul Kamal, "Chittagon-Arakan: A Rigion of a People; A Cronicle Studies of Medieval Period", *Annual Magazine 1995-96*, AHS., Chittagon, 1996, p. 84.

৭২ বালা, *হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি*, পৃ. ৬৭।

৭৩ Harvey, *History of Burma*, pp. 137-49.

৭৪ *Ibid*. pp. 145-49, 372.

৭৫ *Ibid*. pp. 137-40.

৭৬ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ৩৪।

৭৭ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৪-৪৫, ৪৫০-৫৩, ৪৮৩-৮৫; মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল*, পৃ. ১৬২-৬৩।

৭৮ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৪-৪৫।

৭৯ এনামুল হক ও আবদুল করিম, *আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য*, পৃ. ৩৭-৩৮।

৮০ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫০-৫৩।

৮১ *তদেব*।

৮২ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল*, পৃ. ১৬২।

৮৩ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৩।

৮৪ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল*, পৃ. ১৬৩।

৮৫ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৫।

৮৬ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল*, পৃ. ৫৫।

৮৭ *তদেব*, পৃ. ৫৫।

৮৮ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস নবাবী আমল* (চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৫), পৃ. ৭২।

৮৯ বালা, *হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি*, পৃ. ৬৮।

৯০ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৩-৯৬,৭২১; শফিউল আলম "ভাষা ও সাহিত্য" *কক্সবাজারের ইতিহাস*, (কক্সবাজার: কক্সবাজার ফাউণ্ডেশন, ১৯৯০), পৃ. ১৮৯-৯০।

৯১ এনামুল হক ও আবদুল করিম, *আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য*, পৃ. ৯৬-৯৭।

৯২ বালা, *হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি*, পৃ. ৬৮।

৯৩ ডক্টর সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ১ম খণ্ড (কলিকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭৫), পৃ. ৫৪৮।

৯৪ এন.এম. হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. ১৯৯৫), পৃ. ৩৬।

৯৫ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ৫৭।

৯৬ *তদেব*, পৃ. ১১৯-২০।

৯৭ Hall, "Studies in Duch relation with Arakan," pp. 3-5.

৯৮ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ৫৬, ১১৯-২০।

৯৯ বালা, *হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি*, পৃ. ৬৫।

১০০ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল*, পৃ. ১২৯-৩০।

১০১ Hall, *A History of South-East Asia*, p. 421.

www.pathagar.com

১০২ M. Siddiq Khan, "The Tragedy of Mrauk-U-(1660-1666)", *JASP*, vol. XI, No. 2, August 1966, p. 198.

১০৩ আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস-মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত ১২০০-১৮৫৭* (ঢাকা: বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ১৬৮-৭২।

১০৪ *তদেব*; J.C. Powell price, *A History of India* (London: Jhomas Nelson, 1950), p. 342; George Durber, *A History of India from the Earliest Times to Nineteen Thirty Nine* (London: Nicholson and Watson, 1939), pp. 259-60; S.W.Cooks, *A Short History of Burma* (London: Macmellan, 1910), pp. 203-204 and G.E. Harvey, "The Fate of Shah Shuja, 1661" *Journal of the Burma Research Society*, Vol. xii, August 1922, pp. 107-12.

১০৫ Hall, *A History of South-East Asia*, p. 422; ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস, প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল* (চট্টগ্রাম: আলমবাগ প্রকাশনী, ১৯৮২), পৃ. ১২২। উল্লেখ্য, এ প্রসঙ্গে কবির উক্তি, শাহ সুজা সঙ্গে যদি আইনু দৈব গতি/হতবুদ্ধি পাত্র সবে দিল হতমতি/কারাগারে পৈনু আমি না পাই বিচার/ যত ইতি বসতি হৈল ছাড়খার। [দ্র: আহমদ শরীফ, বাঙালী ও *বাঙলা সাহিত্য* ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৫।

১০৬ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৮; S.M.Ali, "Arakan Rule in Chittagong", *Journal of Asiatic Society of Pakistan*, Vol. xii, No. 3, 1967, pp. 331-51.

১০৭ এনামুল হক ও আবদুল করিম,*আরাকান রাজ সভায় বাঙালা সাহিত্য*, পৃ. ৪২। পদ্মাবতী কাব্যে কবি আলাওলের ভাষায়:

নানা দেশে নানা লোক/ শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ/ আইসেন্ত নৃপ ছায়াতলে
আরবী মিশরী শামী/ তুরকী হাবশী রুমী/ খোরাসানী উদ্বেগ সকল।।
লাহুরী সুলতানী সিন্ধী/ কাশ্মিরী দক্ষিণী হিন্দী/ কামরূপী আর বঙ্গদেশী।
আওপিহ খুতাচতারী/ কান্নাই মলয়াবরী/ আছন্দার কর্ণাটবাসী ।।
বহু শেখ সৈএদ জাদা/ মোগল পাঠান যোদ্ধা/ রাজপুত হিন্দু নানাজাতি।
আভাই বরমা শ্যাম/ ত্রিপুরা কুকির নাম/ কতক কহিব ভাঁতি ভাঁতি।।
আরমানি অলন্দাজ/ দিনেমার ইংরাজ/ কাস্তিলাম আর ফ্রানসিস।
কামরিত আলসানী/ চেলিদার নসরাণী/ নানাজাত আর পর্তুগীস। [দ্র. এনামুল হক ও আবদুল করিম, *আরাকান রাজ সভায় বাঙালা সাহিত্য*, পৃ. ৪২।]

১০৮ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৮৭।

১০৯ H.J.S. Cotton, *Memorandum on the Revenue History of Chittagong*, (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1880), pp. 18-19.

১১০ *Ibid*, p. 92.

১১১ *Ibid*, p. 93.

১১২ A.M. Sirajuddin, *The Revenue Administation of the East India Company in Chittagong* (Chittagong: University Press, 1971), p. 127.

১১৩ আবদুল মাবুদ খান, "চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস ও প্রসঙ্গ কথা, *ইতিহাস*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৫শ-২০বর্ষ সম্মিলিত সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৮৮-চৈত্র ১৩৯৩, পৃ. ৮৯।

১১৪ হারির প্রকৃত নাম ছিল ঘা থিন ডা (NGa Thin Da) এবং পদবী ছিল মোথুজী (Myothogyi) [দ্র. আবদুল মাবুদ খান, "চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস", পৃ. ৯০।]

১১৫ Hall, *Burma*, p. 94.

১১৬ রতন লাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক, ১৭৮৫-১৮২৪* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪), পৃ. ৯।

১১৭ আবদুল মাবুদ খান, "চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস", পৃ. ৯০।

১১৮ Harvey, *History of Burma*, p. 149; Hall, *A History of South East Asia*, p. 402; আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ৮৬-৮৮।

www.pathagar.com

১১৯ চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক*, পৃ. ৯।

১২০ *তদেব*।

১২১ মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, পৃ. ২৬-২৭; A. Aspinal, "English Relations with Burma in the time of Cornwallis and shore (1786-1798)", *Bengal past and present*, Vol.XL. Part, II, 1930, p. 101.

১২২ Harvey, *History of Burma*, p.180.

১২৩ Ibid., 270-73; হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৯০।

১২৪ এ প্রেক্ষিতে তিনি আরাকানের গভর্ণর হারি (Hari) বা ঘা থিন ডা (Nga-thin-Da) কে চল্লিশ হাজার সৈন্য ও চল্লিশ হাজার মুদ্রা প্রদান করতে বলেন। [দ্র. হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৯০।] সিন পিয়ানের চিঠিতে বিশ হাজার সৈন্য ও বিশ হাজার বন্দুক দাবি করার কথা উল্লেখ রয়েছে। [দ্র. Secret Consultation, 29 October, 1813, No. 28, *MSKC*, Secret Procedings, Vol. 6, 1721-26.]

১২৫ Captain of Infantry to the Secretary to Government, 19 February, 1799, *BSR*, CD, Vol. 515, pp. 49-102.

১২৬ Harvey, *History of Burma*, p. 280.

১২৭ Hall, *Burma*, pp. 94-95.

১২৮ Lieutenant Colonnel to the Commander-in-Chief PC, 25 April, 1794, No. 14, *MSKC*, PP, Vol. 1, p. 195. উল্লেখ্য যে, মরহুম মুহাম্মদ সিদ্দিক খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তিনি এক সময়ে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৩৯-৪০ সালে তিনি ভারত সরকারের ন্যাশনাল আর্কাইব থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, যার অধিকাংশই এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত।

১২৯ Anil Chandra Banerjee, *The Estern frontier of India* (Calcutta: Mukhergee, 1964), p. 59.

১৩০ Colonel to the Secretary to Government, PC, 10 November, 1794, No. 41, *MSKC*, PP, Vol. 1, p. 234.

১৩১ R.B. Pearn, "King Bearing", *JBRS*, XXIII, Part 1, 1933, p. 57.

১৩২ Walter Hamiltan, *A Geographical Statistical and Description of Hindustan and Adjacent Countries*, Vol. 1, Reprint (Delhi: 1971), p. 168.

১৩৩ J. Stuart, "An Appeal for more light on Arakane History", *JBRS*, Vol. VIII, Part. 1, 1923, p. 95.

১৩৪ A. Aspinal, "English Relations with Burma," p. 101.

১৩৫ চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক*, পৃ. ১১-১২; J. Stuart, "Political History of the Extraordinary Events Which led to the Burmese war," *JBRS*, Vol. XI, Part. III, 1921, p. 114.

১৩৬ চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক*, পৃ. ১১-১৫।

১৩৭ Harvey, *History of Burma*, p. 281.

১৩৮ B.R.Pearn, "King Berring," *JBRS*. Vol. XXII, Part. 1, 1933, p. 55. উল্লেখ্য, সম্ভবত সিন পিয়ান রাজা উপাধি ধারণ করেছিলেন বলে কিংবিয়ারিং (King Bearing) শব্দটি বিকৃত হয়ে কিংবেরিং এ পরিণত হয়েছে।(দ্র. হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৯১।)

১৩৯ বাংলাদেশ-বার্মা সীমান্ত সংলগ্ন নাফ নদীর তীরে একটি ছোট ভূ-খণ্ডের নাম মুরুসুগিরি। কোম্পানির নথিপত্রে থানডি মুরুসিগিরি নামেই পরিচিত এবং তার নামানুসারেই ভূখণ্ডটির নামকরণ করা হয়। [দ্র. চক্রবর্তী,*বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক*, পৃ. ১০৭-৮]

১৪০ চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক*, পৃ. ১০৭-৮।

১৪১ Civil Surgeon to the Collector of Chittagong, 28 January, 1811, BSR, CD, vol. 89, p. 35.

www.pathagar.com

[১৪২] চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক*, পৃ. ১০৮।

[১৪৩] তদেব, পৃ. ১০৯।

[১৪৪] Secretary to Government to the Envoy to the Court of Ava. PC, 6 September, 1811, No. 50, *MSKC*, PP, Vol. 5, p. 1267.

[১৪৫] চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক*, পৃ. ১০৯।

[১৪৬] Pearn, "King Berring," pp. 55-56.

[১৪৭] Envoy to the Court of Ava to the viceroy of pegu. PC, 22 November, 1811, No. 4, *MSKC*, PP, Vol. 5, pp. 1306-12.

[১৪৮] চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক*, পৃ. ১১১।

[১৪৯] B.R. Pearn 'King Bearing,,' *JBRS* Fifteenth Anniversary Publications No. 2. pp. 456-57.

[১৫০] Magistrate of Chittagong to the Secretary to Government, SC, 25 June, 1812, No. 18, *MSKC*, SP, Vol. 4, pp. 1038-40.

[১৫১] Magistrate of Chittagong to the Secretary to Government, SC, 12 June, 1812, No. 18, *MSKC*, SP, Vol. 3, pp. 821-28.

[১৫২] Magistrate of Chittagong to the Secretary to Government, SC, 15 June, 1812, No. 41, *MSKC*, SP, Vol. 4, p. 1054.

[১৫৩] Magistrate of Chittagong to the Secretary to Government, SC, 25 November, 1812, No. 71, *MSKC*, SP, Vol.5, pp. 1325-31.

[১৫৪] আবদুল মাবুদ খান, "চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস", পৃ. ৯২।

[১৫৫] Magistrate of Chattagong to the Secretary to Government, SC, 15 January, 1813, No. 26, *MSKC*, SP, Vol. 5, pp. 1395-1400.

[১৫৬] Secretary to Government to the Magistrate of Chittagong, SC, 12 November, 1813, No. 29, *MSKC*, SP, Vol. 6, p. 1756.

[১৫৭] আবদুল মাবুদ খান, "চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস", পৃ. ৮৩।

[১৫৮] Magistrate of Chittagong to the Secretary to Government, PC, 17 May, 1816, No. 48, *MSKC*, PP, Vol. 7, pp. 24-28.

[১৫৯] Magistrate of Chittagong to the Secretary to Government, PC, 27 July, 1816, No. 19, *MSKC*, PP, Vol. 7, pp. 29-41.

[১৬০] Governor of Arakan to the Magistrate of Chittagong, PC, 14 June, 1817, No. 32, *MSKC*, PP, Vol.7, pp. 94-96.

[১৬১] চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক*, পৃ. ১২৬-২৭।

[১৬২] মো: সিরাজুল ইসলাম, *ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ৭৪-৭৫।

[১৬৩] D.G.E., Hall, *Europe and Burma* (London: Oxford University Press, 1945), p. 103.

[১৬৪] Hall, *Burma*, p. 13.

[১৬৫] Hall, *Europe and Burma*, p. 108.

[১৬৬] Ibid; Harvey, *History of Burma*, p. 293.

[১৬৭] Harvey, *History of Burma*, p. 293.

[১৬৮] Sub-Assistant Commissioner to the Magistrate of Chittagong, PC, 7 June, 1822, No. 47, *MSKC*, PP, Vol. 9, pp. 341-43.

[১৬৯] Banerjee, *The Estern Frontier of India*, pp. 192-94.

[১৭০] চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক*, পৃ. ১৪৬।

[১৭১] Secret Letter to Court, 9 February 1824, *MSKC*, PP, Vol. 10, pp. 40-42.

[১৭২] Secret Letter to Court, 23 February 1824, *MSKC*, PP, Vol. 10, p. 52.

www.pathagar.com

১৭৩ চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক*, পৃ. ১৫৩।

১৭৪ Proclamation of war, 5 March, 1824, SC, No. 2, *MSKC,* PP, Vol. 10, pp. 126-32.

১৭৫ সিরাজুল ইসলাম, *ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক*, পৃ. ৯৬।

১৭৬ Hall, *Europe and Burma,* p. 115.

১৭৭ *Ibid.*, pp.115-16.

১৭৮ W.S. Desai, *A Pageant of Burmese History* (Bomby: Orient Longmens, 1961), pp. 131-39.

১৭৯ *Ibid.*, pp. 131-39; 141-47.

১৮০ D.P.Singhal, *The Annexation of Upper Burma* (Singapore: Eastern University Press, 1960), pp. 91-94.

১৮১ Ibid., pp. 16-17.

১৮২ সিরাজুল ইসলাম, *ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক*, পৃ. ১৩।

১৮৩ Maung Maung, *Burma in the Family of Nations* (Amsterdam: Uitgverij Djambatan, 1956), p. 44.

১৮৪ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৯৮।

১৮৫ তদেব।

১৮৬ তদেব, পৃ. ৯৯।

১৮৭ আবদুল মাবুদ খান, "চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস", পৃ. ৯২।

১৮৮ Philip Nolan, *Report on Emigration from Bengal to Burma. Proceeding of Governor General 1888,* Bangladesh National Archives, p. 4.

১৮৯ মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, পৃ. ৩৬-৩৭।

১৯০ Hall, *A History of South East Asia,* pp.780-81.

১৯১ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০০-১০৫।

১৯২ তদেব, পৃ. ১০৫।

১৯৩ উল্লেখ্য, থাকিন শব্দের অর্থ মালিক। (তদেব, পৃ. ১০৬।)

১৯৪ Yunus, *A History of Arakan,* pp. 102-103.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
রোহিঙ্গা সমস্যা : সূচনা ও বিস্তার

রোহিঙ্গারা ১৯৪২ সালের পূর্ব পর্যন্ত আরাকানে দু'একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা ছাড়া ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে শুরু করে সর্ব প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছিল এবং সেখানকার মগ সম্প্রদায়ের সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্ক এত গভীর ছিল যে, স্থানীয় মগরা ইয়োমা পাহাড়ের উচ্চ শৃংগের অপর পাড়ের বৌদ্ধদের চেয়ে প্রতিবেশী রোহিঙ্গাদেরকে বেশি আপন মনে করতো।[১] কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে গোটা উপমহাদেশের বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সুবাদে বার্মায় থাকিন পার্টির নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলে পার্টির নেতৃবৃন্দ আরাকানের মগ নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক গড়ে মুসলমান-মগদের মাঝে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাধীনতা-উত্তর আরাকানকে বর্মীভূক্ত রাখার পরিকল্পনা করে। তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মগদের মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে।[২] ১৯৩৭ সালে বৃটিশ-ভারত থেকে বৃটিশ বার্মা আলাদা হবার পর বৃটিশ প্রশাসন Home Rule (Local Self Government of 1937) জারি করে বার্মায় অভ্যন্তরীণ স্থানীয় সরকার গঠনের বিষয় অনুমোদনের মাধ্যমে বর্মী নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেয়, ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানী দিয়ে ১৯৩৮ সালে রেঙ্গুনসহ নিচু অংশে (Lower Burma) মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালিয়ে ৩০,০০০ মুসলমানকে হত্যা করে।[৩] এ সূত্র ধরে ১৯৪০ সালে মুসলমানদের উপর বৌদ্ধ ধর্ম ও এর প্রচারক গৌতম বুদ্ধের অবমাননার অভিযোগ এনে থাকিন পার্টি নামে বর্মী জাতীয়তাবাদী চরমপন্থী দল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা করে; যার পরিণতি হিসেবেই ১৯৪২ সালে আরাকানে মুসলিম নিধনযজ্ঞ সংঘটিত হয়।[৪] রোহিঙ্গা সমস্যা মূলত ১৯৪২ সালের পর হতেই প্রসারতা লাভ করে এবং তা আজও বিকাশমান থাকলেও আলোচনার সুবিধার্থে ১৯৪২-৭৮ পর্যন্ত রোহিঙ্গা সমস্যার স্বরূপ উদঘাটনের প্রচেষ্টা এ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

৩.১ জাপানী শাসনামলে বার্মা ও রোহিঙ্গা

উনিশ'শ উনচল্লিশ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে থাকিন পার্টির নেতৃবৃন্দ বার্মার স্বাধীনতার অঙ্গীকারের পূর্ব পর্যন্ত বৃটিশকে সমর্থন না দেবার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানালে বৃটিশ সরকার অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাকে গ্রেফতার করে। এ সময় অং সান এর নেতৃত্বে ত্রিশ সদস্যের একটি দল গোপনে জাপানে পালিয়ে গেলে জাপান সরকার এদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেন এবং জাপানের অর্থ, প্রশিক্ষণ ও নিজস্ব তত্ত্বাবধানে Burma Independent Army (BIA) গঠিত হয়।[৫] ১৯৪১ সালে জাপানী বাহিনীর সাথে BIA বার্মায় প্রবেশ করে এবং ১৯৪১ সালের ২৩ ডিসেম্বর জাপানীদের

www.pathagar.com

কাছে রেঙ্গুনের পতন ঘটলে BIA এর শক্তি বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ জাপানী বিমানবাহিনী আকিয়াবের উপর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করে, ফলে অনেক বৃটিশ, গুর্খা, রাজপুত, এবং কারেন সৈন্য নিহত হয়।[৬] জাপানীদের আক্রমনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে বৃটিশ শক্তি আরাকান ছেড়ে পলায়ন করে; ফলে আরাকানে এক প্রশাসনিক শুন্যতার সৃষ্টি হয়। এ সময় BIA-এর কিছু সদস্য জাপানী সেনাবাহিনীর সাথে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে আরাকানে এলে স্থানীয় মগরা BIA এর সহযোগিতায় আরাকানের নিরাপত্তা ও সেনাবাহিনীর অস্ত্র-সস্ত্র হস্তগত করে আকিয়াব, রাছিডং ক্যাকথ, মাব্রা, মিনবিয়া, পুনাজুয়ে, বাহারপাড়া, মহামুনী, পাকটুলিসহ গোটা আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায় যা- '৪২ মাস্যাকার' হিসেবে কুখ্যাত।[৭] নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে হত্যা, লুটতরাজ নারী ধর্ষণসহ গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে পুড়িয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি, উম্মত্ত হামলাকারীরা মৃত মানুষের মস্তক বর্ষার মাথায় বিঁধে তাণ্ডব নৃত্যের মাধ্যমে বিজয়ানন্দ উদযাপন করেছে।[৮] আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য লাখ লাখ লোক দূর্গম 'আপক' গিরিপথ দিয়ে উত্তর আরাকানের মংডু, বুচিদং এলাকায় পলায়ন করার সময় পথিমধ্যে হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে; নাফ নদী ছিল নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বণিতাসহ অসংখ্য রোহিঙ্গা মুসলমানের লাশে পরিপূর্ণ।[৯] এ সময়ে প্রায় ১ লাখ রোহিঙ্গাকে হত্যা এবং প্রায় ৫ লাখ রোহিঙ্গাকে ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। অনেকে সৌদি আরব, পাকিস্তান, ভারত, ইরান, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমীরাত ও পার্শ্ববতী দেশসহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।[১০] বৃটিশ সরকার রংপুরের সুবীর নগরে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের জন্য উদ্বাস্তু শিবির স্থাপন করেছিলেন। উত্তর আরাকান হতে বহু দূরে রংপুরের সুবীর নগরে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তুর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। কক্সবাজারের স্থানীয় প্রশাসন সমুদ্রের উপকূলবর্তী একটি এলাকায় বহু উদ্বাস্তুকে পুর্নবাসন করেছিলেন; যা এখনও 'রিফিউজি ঘোনা' নামে পরিচিত। দেশ স্বাধীন হলেও বার্মা সরকার এ সমস্ত উদ্বাস্তুদের আর স্বদেশে ফিরে নেয়নি।[১১]

জাপানীরা পরিপূর্ণভাবে বার্মা দখলের পর তাদের ফ্যাসিবাদী রূপ ক্রমশ জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করে। ফলে জাতীয়তাবাদীরা বার্মা থেকে জাপানীদের বিতাড়িত করার জন্য ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ১৯৪৪ সালে Anti-Fascist Organisation (AFO) গঠন করে।[১২] ১৯৪৫ সালের ১৬ মার্চ Burma National Army (BNA)[১৩] রেংগুনে জাপানীদের সাথে একটি আনুষ্ঠানিক যৌথ প্যারেডে অংশ গ্রহণের পর মহড়া প্রদর্শনের নামে রেংগুন হতে বের হয়ে পড়ে। ১৯৪৫ সালের ২৭ মার্চ BNA সারা দেশ ব্যাপী জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। এ সময় William Slim এর নেতৃত্বে বৃটিশ বাহিনী অগ্রসর হতে থাকলে ১৯৪৫ সালের ১৫ই মে জেনারেল অং সান[১৪] BNA এর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তৎকালীন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলির সাথে দেখা করেন। অতঃপর BNA কে বৃটিশ

www.pathagar.com

বাহিনীর সাথে একটি শরিক সেনাবাহিনী হিসেবে মর্যাদা দেবার শর্তে তিনি বৃটিশ কমান্ডারকে জাপানীদের বিরুদ্ধে যৌথ সামরিক অভিযানে অংশ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। ১৯৪৫ সালের ১৫ জুন সমগ্র বার্মা বৃটিশদের দখলে আসে এবং ঐ দিন রেঙ্গুনে বৃটিশ বাহিনীর বিজয়ী প্যারেডে BNA-ও অংশ গ্রহণ করে।[১৫]

৩.২ বৃটিশ শাসনামলে বার্মা ও রোহিঙ্গা

ফ্যাসিবাদী জাপানীদের অধিকৃত বার্মায় স্থগিত থাকা বৃটিশের সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরায় শুরু হলে দখল পূর্ব ১৯৪৫ সালের মে মাসে শ্বেতপত্রের মাধ্যমে ঘোষিত ভবিষ্যত নীতি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ ঘোষণায় বলা হয়েছিল, বার্মায় সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ কর্তৃক আইন শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হলে একটি সর্বজন সম্মত সংবিধান রচনার পর বার্মাকে ডমিনিয়ন মর্যাদা (Domunion Status) দেয়া হবে। কিন্তু সীমান্তবর্তী ও পাহাড়ি জাতিসমূহ যথা, শান, কারেন, কায়া, মন, চিন, কাচিন প্রভৃতি বার্মার সাথে স্বেচ্ছায় যোগদান করতে না চাইলে এ সমস্ত এলাকা বার্মার ডমিনিয়ন মর্যাদার অন্তর্ভূক্ত হবে না। এমতাবস্থায় বার্মা পুনরায় বৃটিশ দখলীভূক্ত হলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বিশেষত অং সান 'সর্ব বার্মাভিত্তিক' রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে BNA থেকে পদত্যাগ করে সরাসরি রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং AFO কে সর্ব বার্মা ভিত্তিক রূপ দিয়ে ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে Anti Fascist Peoples Freedom League (AFPFL) প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় জেনারেল অং সানকে রেংগুনস্থ বৃটিশ গভর্ণর জেনারেলের অধীনে গঠিত অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। AFPFL প্রতিষ্ঠার ৪ মাস পর ১৯৪৫ সালের ২৪-২৬ ডিসেম্বর বার্মার সকল মুসলিম সংগঠনকে একিভূত করে সকল মুসলমানকে বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অভিন্ন স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে Pyinmana নামক স্থানে সর্ব বার্মা ভিত্তিক মুসলিম সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে সিয়াজী উ আবদুর রাজ্জাক Burma Muslim Congress (BMC) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনিই এর সভাপতি নির্বাচিত হন। অতঃপর একে AFPFLএর অংগ সংগঠনরূপে ঘোষণা দেয়া হয়।[১৬] তিনি General Council of Burma Muslisn Associations (GCBMA)[১৭] কর্তৃক বার্মা সংবিধানে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র অধিকার ঘোষণার দাবিকে অযৌক্তি বলে অভিহিত করেন এবং এর মাধ্যমে মুসলমানেরা স্থায়ীভাবে বার্মার মূল ধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে GCBMA কে BMC এর পদাংক অনুসরণ করে AFPFL-এ যোগদানের পরামর্শ দান করেন।[১৮]

বৃটিশ প্রদত্ত শর্ত পূরণের জন্য জেনারেল অং সান সারা দেশব্যাপী সফর করেন। সীমান্তবর্তী ও পাহাড়ি জাতিসমূহ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে বর্মী জাতীর সাথে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেও অং সান অবশেষে তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হন

www.pathagar.com

যে, বার্মার স্বাধীনতার জন্যই প্রাথমিকভাবে সবাইকে ইউনিয়নে থাকতে হবে। জাতিগত ও রাজ্যগত স্বায়ত্বশাসনের কথা পরে বিবেচনা করা হবে। অন্যদিকে আরাকানে এসে মগ নেতাদের বুঝাতে সক্ষম হন যে, এ মুহূর্তে স্বায়ত্বশাসনের চিন্তা বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকলেই সার্বিক স্বার্থ রক্ষা করা হবে। আরাকানের রোহিঙ্গারা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে দূর্বল ও শক্তিহীন হলেই তোমাদের হাতে স্বায়ত্বশাসন ন্যাস্ত করা হবে।[১৯]

বার্মার সকল জাতিগোষ্ঠীকে ঐকমত্যে আনা এবং স্বাধীনতা উত্তর ভবিষ্যত জাতীয় নীতিনির্ধারণ প্রশ্নে আলোচনার্থে জেনারেল অং সান ১৯৪৭ সালের ২-১২ ফেব্রুয়ারি বার্মার শান রাজ্যের অন্তর্গত 'প্যানলং' নামক পার্বত্য শহরে 'প্যানলং জাতীয় সম্মেলনের' আহ্বান করেন। সম্মেলনে সীমান্তবর্তী ও পাহাড়ি জাতিসমূহকে আমন্ত্রণ জানালেও আরাকানের মুসলিম জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের কোন প্রতিনিধিকে আহ্বান না করে উ অং জান ওয়াই (U Aung Zan Wai) নামক জনৈক মগকে আরাকান জাতিসত্ত্বা ও জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্যানলং সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, বৃটিশদের কাছ থেকে Union of Burma-এর স্বাধীনতা আদায়ের মাধ্যমেই সকল জাতিসত্ত্বার স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত হবে। সর্ব বার্মার সকল জাতির প্রতিনিধিকে নিয়ে Union of Burma-এর ফেডারেল সরকার গঠিত হবে। স্বাধীনতার দশ বছর পর সান এবং কায়াজাতি ইচ্ছা করলে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সুযোগ পাবে। সকল জাতির স্বকীয় অধিকার ঐতিহ্য, ভাষা-ধর্ম প্রভৃতি সুনিশ্চিত করার জন্য ফেডারেল সরকার ওয়াদাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু এক সময়ের স্বাধীন সার্বভৌম ঐতিহ্য-মণ্ডিতরাজ্য আরাকানের মগ প্রতিনিধি সম্মেলনে আরাকানের স্বাধীনতা বা স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে কোন প্রস্তাব কিংবা কোন প্রশ্নই উত্থাপন করেন নি; যা অং সান ও মগদের গোপন আঁতাতের রাজনৈতিক কৌশলের ফলশ্রুতি বলেই রোহিঙ্গা নেতৃবৃন্দসহ অনেকে মনে করেন।[২০]

প্যানলং সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্বাধীন বার্মা ইউনিয়নের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে উ চান টুনকে উপদেষ্টা মনোনয়ন করে একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ইতোমধ্যেই ১৯৪৭ সালের ১৯ জুলাই দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা চলাকালে জেনারেল অং সান, উ আবদুর রাজ্জাকসহ সাতজন শীর্ষস্থানীয় নেতা আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে উ নু বার্মার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হন।[২১] ১৯৪৬ সালের ১৪ই জানুয়ারি GCBMA নেতৃবৃন্দ বৃটিশ গভর্ণর সমীপে বার্মা ইউনিয়নের স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়ায় মুসলমানদের অধিকার বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধিকারনামা ঘোষণার দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি পেশ করে ব্যর্থ হলেও পুনরায় ১৯৪৭ সালের ৪ আগস্ট প্রস্তাবিত সংবিধানে একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসেবে বার্মার মুসলমানদের স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানিয়ে বার্মার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী উ নু'র কাছে চিঠি প্রেরণ করেন। ২ অক্টোবর সংবিধান

www.pathagar.com

প্রণয়ন কমিটির উপদেষ্টা উ চান টুন GCBMA এর সভাপতি বরাবরে প্রেরিত চিঠির উত্তরে উল্লেখ করেন "বার্মা ইউনিয়নের সংবিধান অনুসারে যে সমস্ত মুসলমান বার্মায় জন্ম গ্রহণ করেছে, বার্মায় লালিত পালিত হয়েছে, বার্মায় শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং যাদের পিতা-মাতা অথবা পিতা-মাতার যে কোন একজন বার্মার নাগরিক তাদের সবাই বার্মার নাগরিক।"[২২] কিন্তু GCBMA নেতৃবৃন্দ এতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা মনে করে যে, সংখ্যালঘু হবার কারণে বার্মার মুসলমানগণ যে কোন আইন পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হবার সুযোগ লাভ করবেনা। তাই সংস্থার পক্ষ থেকে সংবিধানের ৮৭ নং অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘুদের আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থার মত মুসলমানদের জন্যও সংখ্যালঘু হিসেবে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেবার জন্য অনুরোধ জানানো হলেও সরকারিভাবে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়।[২৩]

৩.৩ স্বাধীনতা-উত্তর বার্মা : আরাকান ও রোহিঙ্গা

বার্মা ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি বৃটিশের নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। অতঃপর ১৯ নভেম্বর বার্মার অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মত মুসলমানদের নিরাপত্তা ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানিয়ে GCBMA এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্থানে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।[২৪] প্যানলং সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শান, কাচিন, কায়া, কারেন ও চিন রাজ্যগুলো অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। ঐ রাজ্যগুলোর মতই আরাকান পৃথক ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তা অধ্যুষিত রাজ্য হয়েও বোধপায়া কর্তৃক দখলীভূক্ত আরাকানের এক ইঞ্চিও শৃংখল মুক্ত হয়নি। যে স্বপ্ন আর প্রত্যাশায় রোহিঙ্গারা স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয় নেতা জেনারেল অং সানকে সমর্থন দিয়েছিল, শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণ, রোহিঙ্গা মুসলমানদের ধর্মচ্যুতিকরণ ও সাংস্কৃতিক আত্মীকরণের নামে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিনাশ সাধন করে ব্যাপকভাবে বর্মীকরণ প্রক্রিয়ায় তাদের সে প্রত্যাশা গভীর হতাশায় রূপান্তরিত হয়।[২৫]

স্বাধীনতার পর সাময়িক সংকট কেটে বার্মা ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন কর্তৃক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পূর্ব পর্যন্ত সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মোতাবেক জনপ্রতিনিধিত্বশীল, জবাবদিহিমূলক শাসনতন্ত্রের অধীনে শাসিত হয়েও রোহিঙ্গারা মানবাধিকার ফিরে পায়নি; বরং জাতিগত রোষানলে পড়ে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়।[২৬]

বার্মা কর্তৃপক্ষ ১৯৪৭ সালে নতুন শাসনতান্ত্রিক পরিষদ নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রণীত ভোটার তালিকায় 'সন্দেহজনক নাগরিক' অজুহাতে আরাকানের মুসলিম অধ্যুষিত জনপদগুলোকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়। বার্মার প্রথম প্রধানমন্ত্রী উ নু'র মত ব্যক্তিত্ব আরাকানে রোহিঙ্গাদের প্রতি সর্বজনীন সুনজর প্রয়োগ করতে পারেননি; বরং ন্যূনতম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন। উ নু'র শাসনকালে স্বাধীনতার পর পরই ১৯৪৮ সালে আরাকান থেকে মুসলমানদের বিতাড়ন ও তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি সৃষ্টির পদক্ষেপ হিসেবে আকিয়াবের মগ ডেপুটি কমিশনার ক্যাইউ (Kyawu) এর নেতৃত্বে

www.pathagar.com

৯৯% মগদের নিয়ে ইমিগ্রেশন অ্যাক্টের অধীনে তদন্তের নামে Burma Territorial Force (BTF) গঠিত হয়। BTF উত্তর আরাকানের বুদ্ধিজীবী, গ্রাম্য প্রধান, উলামা এবং হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে হত্যা করে এবং মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামের বাড়িঘর জালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।[২৭] Mohammed Yunus এর ভাষায়-

> The BTF Under the direction of the Deputy Commissionar of Akyab district, Kyaw U, a Magh, unleashed a reign of terror in the whole north Arakan. Muslim men-women and children were moved down by machingun fire. Hundreds of intellectuals, vellage elders and Ulema were killed like dogs and rats. Almost all-Muslim villages were razed to the ground. The BTF massacre triggered refugee exodus into the then East Pakistan numbering more than 50,000 people.[২৮]

মূলত বৃটিশ কর্তৃপক্ষই সাম্প্রদায়িক বিভেদের সূচনা করেছিল। রোহিঙ্গারা বৃটিশের পক্ষে যুদ্ধ করে জাপানীদের তাড়িয়ে দিলেও তারা প্রচার করে- "Burma for the Budhist Burmans এবং Burmese Muslims are Foreign Immigrants or kalas"[২৯] আরাকানে রোহিঙ্গাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের বিরুদ্ধে মগ সম্প্রদায় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এ প্রচারণাকে তুঙ্গে তুলতে থাকলে বর্মী সরকার পরিকল্পিতভাবে উচ্ছেদ অভিযানে নামে। অপর পক্ষে স্বাধীকার আন্দোলনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় রোহিঙ্গারা স্বতন্ত্র কোন নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে না পারায় অপপ্রচার সত্যায়নের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে রোহিঙ্গারা আরাকানের বৈধ নাগরিক হয়েও বার্মার সংবিধানে নৃতাত্ত্বিক বা বুনিয়াদী জাতি হিসেবে তালিকাভুক্তির দাবিতে ব্যর্থ হয়।[৩০]

রোহিঙ্গা নেতৃবৃন্দ বর্মী সরকারের কাছে '৪২ এর গণহত্যার উপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের স্বীয় বসতবাড়ীতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেবার আবেদন জানালে AFPFL সরকার এসকল দাবি প্রত্যাখ্যান করেন এবং সরকারি চাকরি হতে রোহিঙ্গাদের অপসারণ করে তদস্থলে মগদের নিয়োগ শুরু করেন। ফলে রোহিঙ্গারা ক্রমশ আন্দোলনমুখী ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।[৩১]

প্রথমে মোহাম্মদ জাফর হুসাইন কাওয়াল[৩২] বা জাফর কাওয়াল নামে আকিয়াবের জনৈক যুবক রোহিঙ্গা মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি কাওয়ালী[৩৩] গাইতেন বলে তাঁকে কাওয়াল বলা হয়। তিনি নিজেই রোহিঙ্গাদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে গান রচনা করতেন, গানের মাধ্যমে সরকারের জুলুম সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতেন এবং রোহিঙ্গাদের বাঁচার একমাত্র পথ হিসেবে সশস্ত্র বিপ্লবে যোগদানের জন্য রোহিঙ্গা যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতেন।[৩৪] তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই শত শত লোক তাঁর বিপ্লবত্মক গান শুনে মুজাহিদ আন্দোলনে[৩৫] যোগদান করত। ১৯৫০ সালের ১১ অক্টোবর আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হলে মোহাম্মদ আব্বাস[৩৬] এ আন্দোলনের

www.pathagar.com

নেতৃত্ব দান করেন। আন্দোলন যত তীব্রতর হয়, সরকারের পক্ষ থেকে কৌশলগত বিরোধিতাও তত বৃদ্ধি পায়। রোহিঙ্গাদের পাশাপাশি কারেন জাতির একটি সশস্ত্রদল তাদের স্বাধীন আবাসভূমির দাবিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আরাকানের মগ সম্প্রদায়ের একটি দল আরাকানের স্বাধীনতার দাবিতে Arakan National Liberation Party নামে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। স্বাধীনতা উত্তর দশ বৎসর পূর্ণ না হতেই প্যানলং সম্মেলনের শর্ত বাস্তবায়নের জন্য শান ও কায়া জাতি কেন্দ্রীয় সরকার হতে বিচ্ছিন্ন হবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। রোহিঙ্গাদের মুজাহিদ আন্দোলন সফলতার সাথে এগুতে থাকলে আব্বাসের নেতৃত্বাধীন বাহিনী হতে দলত্যাগী কিছু স্বাধীনতাকামী মোহাম্মদ কাসিম[৩৭] ওরফে কাসিম রাজার নেতৃত্বে Rohingya Libaration Front (RLF) নামে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র বাহিনী ১৯৫৪ সালের মধ্যে মংডু, বুচিদং, ও রাথিডংসহ উত্তর আরাকানের ৮০% এলাকা বর্মী শাসনমুক্ত করতে সক্ষম হলে কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের মুজাহিদ আন্দোলনকে বন্ধ করার প্রথম রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ১৯৫৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর রাত ৮টায় প্রধানমন্ত্রী উ নু রেডিও'র মাধ্যমে তাদেরকে স্বদেশী (Indigenous Ethnic Community) হিসেবে ঘোষণা করেন। এছাড়া তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদ ও চাকরিতে নিয়োগের কথা বলা হয়, বার্মা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতিসপ্তাহে নিয়মিত দু'বার রোহিঙ্গা ভাষায় প্রোগ্রাম প্রচার করা হয়, পার্লামেন্ট ও অন্যান্য সংস্থায় রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত হয় এবং ৫৭'এর নির্বাচনে রোহিঙ্গারা প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে সাতটি আসনে পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে বিজয়ী হয়।[৩৮]

এক দিকে শাসক শ্রেণি রোহিঙ্গা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে অপরদিকে একই সময়ে তাদের উপর কঠোরভাবে সামরিক চাপ সৃষ্টি করে এবং Combined Emmigration and Army Operation, Union Military Police Operation প্রভৃতির নামে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন চালায়। দেশের বিশৃংখল পরিস্থিতিতে ১৯৫৮ সালে প্রধানমন্ত্রী উ নু দেশে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল নে-উইনের নেতৃত্বাধীন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশের শাসনভার অর্পণ করেন। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী উ নু এর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।[৩৯] জেনারেল নে উইন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বে এসে আরাকানে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বেপরোয়া উচ্ছেদ অভিযান শুরু করলে প্রায় বিশ হাজার রোহিঙ্গা সীমান্ত অতিক্রম করে কক্সবাজার এলাকায় পালিয়ে আসে। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জাকির হোসেনের নেতৃত্বে পাকিস্তান-বার্মা উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় এবং বর্মীপক্ষ একে আকিয়াবের মগ গোষ্ঠীর একটি সাম্প্রদায়িক কারসাজি বলে অভিহিত করে সকল উদ্বাস্তুকে স্বদেশে ফিরিয়ে নেয়।[৪০]

www.pathagar.com

এ উচ্ছেদ অভিযানকালে বার্মার ইমিগ্রেশন পুলিশ মংডু মহকুমা থেকে শতাধিক রোহিঙ্গাকে বন্দী করে এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নামায় উল্লেখ করে যে, তারা বার্মার নাগরিক নয়, কেননা তারা পুলিশের কাছে তাদের নাগরিকত্বের সমর্থনে কোন প্রমাণপত্র দেখাতে সক্ষম হয়নি। ইমেগ্রেশন পুলিশ নির্দিষ্ট ফরমে বন্দীদের নাম পূরণ করে বার্মা থেকে তাড়িয়ে দেবার আদেশনামা জারির জন্য পূরণকৃত ফরম মংডুর মহকুমা প্রশাসনের নিকট উপস্থাপন করে। মহকুমা প্রশাসক আদেশনামা জারি করে সংশ্লিষ্ট ফরমে দস্তখত করেন এবং বার্মা থেকে বহিস্কারের আদেশ কার্যকর করার জন্য বন্দীদেরকে রেংগুনে প্রেরণ করেন।[৪১]

বন্দীদের মধ্য হতে জনৈক হাসান আলী ও মুসা আলী নামে দু'ব্যক্তি বার্মার সুপ্রিম কোর্ট বরাবরে ফরিয়াদ জানায় যে, তারা বার্মার বৈধ নাগরিক, পুলিশ তাদেরকে অন্যায়ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে গ্রেফতার করেছে। মহামান্য আদালত ১৯৫৯ সালের ৪ নভেম্বর বন্দীদ্বয়কে মুক্তি দেবার জন্যে নির্দেশ দেন। এরপর বন্দীদের মধ্য থেকে আরও ৭৬ জন বন্দী সুপ্রিম কোর্টে ফরিয়াদ জানালে মহামান্য আদালত তাদেরও মুক্তি দেবার জন্য নির্দেশ দেন। পুনরায় একইভাবে অভিযুক্ত ২৩ জন বন্দী বার্মার সুপ্রিম কোর্ট বরাবরে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দানের জন্য আবেদন জানায়। এরপর সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞবিচারপতি তাদের মুক্তিদানের আদেশ দিয়ে এক নির্দেশনামা জারি করেন এবং তাতে উল্লেখ করেন, বার্মার ইমিগ্রেশন পুলিশ সুপ্রিম কোর্টের পরপর দু'টি নির্দেশ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।[৪২]

প্রথমত, হাসান আলী ও মুসা আলী নামক দু'জন বন্দীকে মুক্তিদেবার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছিল, সংগত কারণেই ইমিগ্রেশন পুলিশের উচিৎ ছিল একই প্রক্রিয়ায় আটককৃত সকল বন্দীর মুক্তি দেয়া; কিন্তু তা করা হয়নি।[৪৩]

দ্বিতীয়ত, অপর ৭৬ জন বন্দীকে মুক্তি দেবার জন্য বিজ্ঞবিচারপতি পুনরায় নির্দেশ জারি করলেও ইমিগ্রেশন পুলিশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক আরো ২৩ জনকে মুক্তি দেবার নির্দেশ জারি করেছে কিন্তু তারাসহ একই অভিযোগে আটকৃত অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়নি।[৪৪]

নির্দেশনামায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে, ইমিগ্রেশন কর্তৃক উপস্থাপিত সংশ্লিষ্ট ছাপানো ফরমে মংডু মহুকুমা প্রশাসক কোন বিচার বিবেচনা ব্যতিরেকে দস্তখত করেছেন যার অর্থ দাঁড়ায়, বেআইনীভাবে দেশের কিছু নাগরিককে তাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করা এবং দেশের বৈধ নাগরিক অধিকারকে অস্বীকার করা; আর একজন নাগরিককে স্বীয় আবাসভূমি থেকে বিতাড়ন করা মূলত মৃত্যুর দণ্ডাদেশ দেবার শামিল।[৪৫]

মাননীয় আদালত আরো প্রত্যক্ষ করেন যে, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাদের সরবরাহকৃত অভিযোগনামায় আটককৃতরা বর্মী ভাষা জানেনা বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের বার্মার নাগরিকত্বের স্বপক্ষে কোন প্রমাণপত্র দেখাতে পারেনি বলে জানিয়েছেন।[৪৬] বিজ্ঞবিচারপতি এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, ইউনিয়ন অব বার্মায় বহু

www.pathagar.com

ধর্ম, বর্ণ ও জাতি বসবাস করে। বার্মা ইউনিয়নে অনেক জাতি আছে যারা বর্মী ভাষা জানেনা। তাই বর্মীভাষা জানা বার্মার নাগরিকত্বের আবশ্যকীয় শর্ত নয়। নির্দেশনামার উল্লেখ মতে বার্মার সংবিধানের ৪(২) অনুচ্ছেদে নাগরিকত্বের উপর অধ্যাদেশে বলা হয়েছে যে, তারা বার্মার নাগরিক; যারা বার্মায় জন্ম গ্রহণ করেছে, লালিত পালিত হয়েছে এবং যাদের পূর্ব পুরুষ বার্মাতে তাদের আবাস গড়ে তুলেছে। অতএব, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ ও মংডু মহকুমা প্রশাসকের কার্যকলাপ বেআইনী । তাই মাননীয় আদালত সকল বন্দীর অবিলম্বে মুক্তি দেবার জন্য নির্দেশ জারি করছেন।[৪৭]

উ নু ১৯৬০ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নে উইন এর নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করে বার্মা ফেডারেশনের অধীনে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি উত্তর আরাকানের রোহিঙ্গা প্রধান অঞ্চল নিয়ে Meyu Frontier Administration গঠন করে এ অঞ্চলকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের বার্মার একটি বুনিয়াদী জাতি হিসেবে অভিহিত করে।[৪৮] আরাকানের মগ গোষ্ঠীর নির্যাতন থেকে রোহিঙ্গাদের রক্ষা করার জন্য মূলত এ ব্যবস্থা নেয়া হয়। রোহিঙ্গারা সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও মগ সম্প্রদায় একে বার্মা সরকারের Divide and Rule নীতি বলে অভিহিত করে এবং আরাকানের Kala (বিদেশীদের) রক্ষার উদ্যোগ বলে অভিযোগ এনে একে হাস্যস্পদ উদ্যোগ হিসেবে অভিহিত করলেও রোহিঙ্গারা একে "নিপীড়িত মানুষের হাফ ছেড়ে বাঁচা" বলে উল্লেখ করে।।[৪৯] প্রধানমন্ত্রী উ নু রোহিঙ্গাদেরকে একটি শান্তি প্রিয় জাতি হিসেবে উল্লেখ করে সশস্ত্র আন্দোলনকারীদেরকে আত্মসমসর্পনের অনুরোধ জানান। উ নু'র আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৬১ সালের ৪ জুলাই সকল রোহিঙ্গা মুজাহিদ অস্ত্র সমর্পন করেন।[৫০] এ অস্ত্র সমর্পন অনুষ্ঠানে বার্মার ভাইস চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার অং জি ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন এবং বার্মা সরকারের পক্ষ থেকে সে ভাষণ প্রচার করা হয়। ব্রিগেডিয়ার অং জি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন যে, রোহিঙ্গারা আরাকানেরই শান্তিপ্রিয় নাগরিক। বার্মা সরকারের তরফ থেকে শুধুমাত্র ভুল বুঝাবুঝির কারণে রোহিঙ্গাদের প্রতি বহু অন্যায় করা হয়েছে; আজ এ ভুল বুঝাবুঝি অবসানের মাধ্যমে সকল সমস্যা দূরীভূত হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, পৃথিবীর সব সীমান্তে একই জাতি সীমান্তের দুই পাড়ে বসবাস করে। এ জন্যে কোন নাগরিকের জাতীয়তা প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া উচিত নয়।[৫১]

বার্মার স্বাধীনতার এক দশকেরও বেশি সময় অতিবাহিত হবার পরও অবর্মী সম্প্রদায়গুলো লক্ষ্য করলো অধিকাংশ বর্মী শাসক তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের সাথে সাথে সাংঘাতিকভাবে অবহেলা ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক ব্যবহার করছে। বঞ্চনা ও আধিপত্যবাদী শাসন-শোষণ সম্প্রদায়গুলোর মাঝে বিদ্রোহের জন্ম দেয়। বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উ নু বিদ্যমান সম্প্রদায়গত বৈষম্য সমাধানের লক্ষ্যে একটি ফেডারেল সম্মেলন আহবান করেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রধান

www.pathagar.com

জেনারেল নে উইন বর্মী জাতিগত অভিযানের প্রশ্নে কোন ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে,'এ মুহূর্তে বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বীকৃতি প্রদান উ নু শাসনের জন্য অনির্বায হয়ে পড়েছে'। তাই তিনি ১৯৬২ সালের ২ মার্চ ফেডারেল সম্মেলন শেষ হবার পূর্ব মুহূর্তে একটি রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উ নুকে হটিয়ে ক্ষমতা দখলপূর্বক বার্মাকে নিষিদ্ধ গণতন্ত্রের দেশে পরিণত করে রোহিঙ্গাসহ বার্মার সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সকল প্রকার সাংবিধানিক অধিকার বাতিল করেন।[৫২] Mohammed Yunus এর ভাষায়- In March 2, 1962 Gen. Ne Win, the then Burma`s Army Chief, seized power in a bloodless military coup, abolished the constitution and dissolved the Parliament. All power of the states - ligeslative, judiciary and executive had fallen automatically under the control of the 'Revolutionary Council' (RC) headed by him."[৫৩]

জেনারেল নে উইন ক্ষমতায় এসে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ৯৫% সামরিক অফিসার ও সামান্য সংখ্যক বর্মী সিভিলিয়ান নিয়ে Burma Socialist Programme Party (BSPP) গঠন করে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। রোহিঙ্গারা নবগঠিত BSPP-তে যোগ না দিলেও আরাকানের মগরা ব্যাপকভাবে যোগদান করে।

রোহিঙ্গারা প্রধানত কৃষিজীবি হলেও আকিয়াবসহ আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের অনেকেই প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ছিল। কেউ কেউ আবার ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য করেও জীবন যাপন করত। নে উইন ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশের ব্যাংক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রীয়করণ করলে রোহিঙ্গা ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষত বিভিন্ন ইস্যুতে মগদের অত্যাচার ও লুটপাটের কারণে আতংকিত ব্যবসায়ীরা জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন শুরু করে। জেনারেল নে উইন Burmese Way to Socialism কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে মূলত বৌদ্ধধর্ম, বর্মী-জাতীয়তাবাদ ও মার্ক্সবাদের একটি অদ্ভুত মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করে দেশের অর্থনীতিকেও মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেন। ১৯৬০ সালে বার্মার মাথাপিছু আয় যেখানে ৬৭০ ডলার ছিল, পরবর্তীতে তাঁর এ নতুন ব্যবস্থার কারণেই ২০০ ডলারে নেমে আসে।[৫৪]

জেনারেল নে উইন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই রোহিঙ্গা নির্মূলের জন্য আরাকানী মগদের উস্কিয়ে দেয়। ১৯৬৪ সালে রোহিঙ্গাদের United Rohingya Organisation,[৫৫] The Rohingya Youth Organisation,[৫৬] Rangoon University Rohingya Students Association,[৫৭] Rohingya Jamiatul Ulama,[৫৮] Arakan National Muslim Organisation[৫৯], Arakanese Muslim Youth Organisation[৬০] এবং Rohingya Student Association[৬১] প্রভৃতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ নিষিদ্ধ করেন এবং ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে Burma Broadcasting Service (BBS) থেকে নিয়মিতভাবে রোহিঙ্গা ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে দেন।[৬২] অতঃপর ১৯৬৬ সালে সমস্ত বেসরকারি সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৬৩]

www.pathagar.com

উ নু এর শাসনামলেও বার্মার ক্যাবিনেটে মুসলমান সদস্য ছিল। আরাকানের আকিয়াব অঞ্চলের অধিবাসী সুলতান মাহমুদ ছিলেন মুসলিম মন্ত্রী। এ ছাড়াও খনিজ ও শ্রম মন্ত্রী ছিলেন উ খিন মং লাট, শিল্পমন্ত্রী ছিলেন উ রশীদ এবং মালয় ফেডারেশন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে বার্মার রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্বপালন করেছিলেন উ পে খিন। উ খিন মং লাট খনিজ ও শ্রম মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ ও স্বাস্থ্য বিভাগেরও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বার্মা মুসলিম কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব পালনের সুবাদে তিনি সে সময় মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলোতে সার্থকভাবে মিশন পরিচালনা করেন এবং সে সময় বহু খ্যাতিমান ও উচ্চপদস্থ মুসলমান বার্মায় আগমন করেন। কিন্তু নে উইন ক্ষমতা গ্রহণের পর আর কোন মুসলমানকে মন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়নি; বরং তিনি আরাকানের প্রশাসনকে বৌদ্ধিকরণ করে অনেক মুসলমান পুলিশকে বার্মার দূর্গম এলাকায় বদলী করেন এবং অনেককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। উচ্চপদস্থ মুসলিম কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ অথবা উত্তর আরাকান হতে অন্যত্র বদলি করা হয়। পক্ষান্তরে মগদের চাকরি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দানের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মুসলমানদের চাকরি রক্ষা কিংবা পদোন্নতির জন্য স্বধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল।[৬৪]

নে উইনের শাসনামলে কয়েকবার মুদ্রা অচল ঘোষণার ফলে মুসলমানদের জন্য এক শাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৬৪ সালের ১৭ মে ৫০ ও ১০০ টাকার মুদ্রামূল্য রহিত করা হলে আরাকানী রোহিঙ্গারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আরাকানী মগরা নিজেদের মধ্যকার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও স্থানীয় BSPP এর সদস্য থাকার সুবাদে জমাকৃত অর্থের মূল্যমান নতুন টাকা ফেরৎ পেলেও রোহিঙ্গারা তাদের ডিপোজিটকৃত টাকা ফেরৎ পায়নি। পক্ষান্তরে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ও রেশন বিতরণের সার্বিক তদারকি মগদের হাতে থাকায় মুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে। উপরন্ত ১৯৬৭ সালে বার্মায় বিশেষত রাজধানী রেংগুনে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে আরাকান থেকে চাল আমদানী করে রেংগুনে পাঠানো হয়। সরকারিভাবে রোহিঙ্গাদের মজুতকৃত খাদ্য-শস্য জোরপূর্বক আদায় করে এবং সামরিক আধাসামরিক বাহিনীর লুটপাটের মাধ্যমে তাদের গোলা শূন্য করে নেয়া হয়। একদিকে অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, খাদ্য-শস্য লুট, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ এবং মুদ্রা অচল ঘোষণায় অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে যাত্রা; অন্যদিকে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিবাদের ভাষা কেড়ে নিয়ে সরকারিভাবে নির্যাতন চালায়। এমতাবস্থায় রোহিঙ্গাদের মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ছাড়া আর কোন গত্যান্তর ছিল না। Mohammed Yunus এর ভাষায়-

> After the nationalisation of the shops, demonelisation and imposition of restriction on movement, the backbone of economy of the Rohingyas crumbled.... The military quelled the riots with iron hand killing many persons. During 1967 crisis many Muslims died of starvation.[৬৫]

www.pathagar.com

নির্যাতনের এক পর্যায়ে রোহিঙ্গা মুজাহিদরা পুনরায় Rohingya Patriotic Front নামে নতুন করে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে; যা ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করে।[৬৬]

বার্মার সামরিক প্রশাসন আরাকানী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রমশ আরো মারমুখি হয়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালে সামরিক অফিসারগণ শিউ কাই (Shwe Kyi) ও কাই গান (Kyi Gan) অপারেশনের নামে বিনা কারণে বিনা নোটিশে রাতের শেষ প্রহরে ইচ্ছামত মুসলিম এলাকায় হানা দিয়ে মারাত্মক অস্ত্রের মুখে মুসলিম মহিলাদের ইজ্জত লুটে নেয়। তাদের দৃষ্টিতে মুসলিম মহিলাদের শ্লীলতাহানি মোটেই অপরাধ নয়। এলাকার প্রভাবশালী মুসলমানেরা যাতে প্রতিবাদ করতে না পারে এজন্য তাদেরকে অস্ত্রের মুখে ধরে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন কায়দায় দিনভর শারীরিক নির্যাতনের পর জীবন নাশের হুমকি দিয়ে ছেড়ে দেয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মুসলমানদেরকে উৎপীড়নের জন্য মগদেরকে সরাসরি নির্দেশ দেয়। ফলে মগরা মুসলমানদেরকে যে কোন সময় আক্রমন চালিয়ে মারপিট করতে, তাদের অস্থাবর সম্পত্তি লুট ও মুসলিম মহিলাদের ইজ্জতহানী করতে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। রোহিঙ্গারা এ সকল দুঃখ দুদর্শা ও সমস্যার বিচারের জন্য পুলিশ ষ্টেশনে গেলে পাল্টা তাদেরকেই নির্যাতন সহ্য করতে হয়। শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা, মহিলাদের শ্লীলতাহানী, সম্পদ লুট এবং বিনা কারণে কারাগারে নিক্ষেপ প্রভৃতি নির্যাতনের মুখে টিকতে না পেরে অবশেষে Kyawktaw, Mrohaung, Pauktaw, Minbya প্রভৃতি অঞ্চলের অসংখ্য রোহিঙ্গা নিজেদের বাড়িঘর, স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি রেখে জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে।[৬৭] বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পরই ১৯৭৩ এবং '৭৪ সালে বর্মী বাহিনীর অত্যাচারে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা এদেশে আসে। ১৯৭৪ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন বন্ধ করে আগত শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরৎ নেবার জন্য বর্মী সরকারকে চরমপত্র প্রদান করলে তারা বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের পুনরায় তাদের বসতবাড়ীতে পুনর্বাসনে বাধ্য হয়।[৬৮] বাংলাদেশ সরকারের চরমপত্র পাবার মাত্র তিন বছর পরই ১৯৭৮ সালে ইয়াঙ্গুনের সামরিক জান পুনরায় রোহিঙ্গদের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ অপারেশন চালায়; যার নামকরণ করে কিং ড্রাগন (King Dragon) বা নাগা মিন (Naga Min) অপারেশন।[৬৯] ১৯৭৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ২৫০ জন বহিরাগমন কর্মকর্তা মিন গং নামক জনৈক দুধর্ষ সেনাপতির নেতৃত্বে সশস্ত্র অবস্থায় রেঙ্গুন থেকে আকিয়াবে এসে স্থানীয় অধিবাসীদের জাতীয়তা যাচাইয়ের নামে National Registration Card (NRC)[৭০] তল্লাশির অজুহাতে বিভিন্নমুখী নির্যাতন শুরু করে।[৭১] ইতোমধ্যে আরো অধিকসংখ্যক সামরিক অফিসার তাদের সাথে যোগ দিয়ে ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রায় ৪০০ জন রোহিঙ্গা মহিলাকে ধরে নিয়ে অমানবিক নির্যাতন চালায়। এর প্রতিবাদে রোহিঙ্গারা একত্রিত হলে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে।[৭২] ২০ ফেব্রুয়ারি আরাকান ষ্টেট হলে ভাষণ দিতে গিয়ে অপারেশনের নায়ক কর্ণেল মিন গং হুমকি দিয়ে বলেন, "ড্রাগন অপারেশনের

www.pathagar.com

বিরোধীতা করা হলে রোহিঙ্গাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে।" এ ঘোষণার পরপরই তারা অত্যন্ত আগ্রাসী মনোভাবে স্থানীয় মগদের সাথে নিয়ে হত্যা, ধর্ষণ, গ্রেফতার, লুণ্ঠণ প্রভৃতিতে নেমে পড়ে। ১ মার্চ ড্রাগন অপারেশনের নামে Kyauktaw জেলার Myebon শহরের ৫০০ জন রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করে। ৩ মার্চ কিয়াকুট (Kyauktaw) থেকে ২০০ জন রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করে বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালায়। ১৬ই মার্চ অত্যন্ত ভোর বেলায় বুচিদং এ অপারেশন করে ৩০০ জন রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করে এবং উম্মত্ত লালসা মেটনোরা জন্য আরো ১০০ জন মহিলাকে ধরে নিয়ে যায়। পরে এদেরকে বুচিদং থেকে মংডুতে নিয়ে যাওয়া হলেও তারা আর ফিরে আসেনি। বর্মী বাহিনী ২৬ মার্চ বুচিদং এর দাবিনসারা (Dawinsara) জাদিবুরং (Zadibrung) কাদিরপাড়া (Kadirpara), কাদিব্রুং (Kadibrung), গনিবারপাড়া (Gonibarpara), নাকিনদক (Nakindauk), মরিসাবিল (Morissabil), গারংচং (Ngaranchaung), খিনোক্তি (Kyinokthi), হোক্কাপাড়া (Hokkapara), কাগিয়াপা (Kagyapa), কানব্রান (Kanbran), মনিরবিল (Monirbil), প্রভৃতি গ্রাম জালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়।[৭৩] বর্মী বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে জন্মভূমির সমস্ত সম্পদের মায়া ত্যাগ করে হাজার হাজার রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবক ও শিশু জীবন বাঁচানোর তাগিদে নাফ নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। এ অপারেশনে ১০ হাজারের অধিক রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়; প্রায় আড়াই লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে আসে এবং পথিমধ্যে-ক্যাম্পে প্রায় ৪০ হাজার নারী, শিশু ও বৃদ্ধ মৃত্যুবরণ করে।[৭৪] শরণার্থীদের এহেন বিপজ্জনক ঢল জাতিসংঘসহ বিশ্ববিবেককে নাড়া দেয়; ফলে United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) সহ বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার ত্রাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেয়া হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কুটনৈতিক প্রচেষ্টায় জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার চাপের মুখে বার্মা সরকার এসব উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

৩.৪ রোহিঙ্গা নির্যাতন : সম্যক খতিয়ান

রোহিঙ্গা নির্যাতনের অধ্যায় মূলত ১৯৪২ সাল থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে চরম আকার ধারণ করে। ১৯৯২ সালের নির্যাতনের ইতিহাস অন্য অধ্যায়ে আলোচনা করার প্রয়াসে এখানে ১৯৪২-৭৮ পর্যন্ত নির্যাতনের কিছু খতিয়ান উপস্থাপন করা হল।

বর্মী সরকার পরিকল্পনার ভিত্তিতে ১৯৪৮ সাল থেকে '৭৮ পর্যন্ত প্রায় ১৪টি বড় রকমের অপারেশন চালিয়ে রোহিঙ্গাদের জীবনকে বিপন্ন করে তোলার মাধ্যমে মানবাধিকার লংঘন করে। নিম্নে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরচালিত প্রধান প্রধান ১১টি অপারেশনের বিবরণ সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো-[৭৫]

www.pathagar.com

সারণি-১
আরাকানে রোহিঙ্গা বিরোধী সশস্ত্র অপারেশন

সংখ্যা	অপারেশনের নাম	অপারেশনের এলাকা	সাল
১.	বিটিএফ অপারেশন (BurmaTerritoria Force Operation)	উত্তর আরাকান	১৯৪৮
২.	কমবাইন্ড ইমিগ্রেশন এন্ড আর্মি ("Combined Immigration & Army")	উত্তর আরাকান	১৯৫৫
৩.	ইউ,এম,পি, অপারেশন (Union Military Police Operation)	উত্তর আরাকান	১৯৫৫-৫৯
৪.	ক্যাপ্টেন টিন ক্যাইউ অপারেশন (Captain Htin Kyaw Operation)	বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা	১৯৫৯
৫.	শিউ কাই অপারেশন (Shwe Kyi Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৬৬
৬.	কাই গান অপারেশন (Kyi Gan Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৬৬
৭.	নাগাজিন কা অপারেশন (Nagazin Ka Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৬৭-৬৮
৮.	মাইয়াট মন অপারেশন (Myat Mon Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৬৯-৭১
৯.	মেজর অং থান অপারেশন (Major Aung Than Operation)	উত্তর আরাকান	১৯৭৩
১০.	সেব অপারেশন (Sabe Operation)	সমগ্র আরাকান	১৯৭৪
১১.	নাগামিন (ড্রাগন) অপারেশন [Nagamin (Dragon) Opertation]	সমগ্র আরাকান	১৯৭৮

সারণিতে উল্লেখিত অপারেশনসমূহ বাহ্যিকভাবে রাষ্ট্রীয় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার নামে পরিচালিত হলেও তা মূলত রোহিঙ্গা উৎখাতেরই নীল নক্শা। উল্লেখিত ১১টি অপারেশনের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল বিটিএফ, শিউ কাই, কাই গান, মেজর অং থান, সেব (Sabe) এবং ড্রাগন অপারেশন। এ অপারেশনসমূহ পরিচালনা করে সরকারি পরিকল্পনার ভিত্তিতে হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয় এবং লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করা হয়।

Nagamin Operation এর পর ১৯৭৯ ও ১৯৯২ সালে আরো কয়েকটি মারত্মক অপারেশন পরিচালনা করে লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের অনেকেই স্বদেশে ফেরৎ গেলেও হাজার হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশের উদ্বাস্তু শিবির কিংবা তার বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়ে বাংলাদেশেই থেকে যায়।[৭৬]

বার্মা সরকার ১৯৭৪ সালে BSPP এর নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য First Peoples Congress (Pyethu Hlutn Taw) আহবান করে আরাকানকে শুধুমাত্র 'বৌদ্ধশাসিত ষ্টেট' ঘোষণা করলে স্বৈরশাসকের ছত্রছায়ায় মগরা আরো উচ্ছৃংখল হয়ে ওঠে এবং আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে অনবরত রোহিঙ্গা মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা বাঁধিয়ে মুসলিম নিধন শুরু করে।[৭৭] নিম্নে সারণির মাধ্যমে কয়েকটি এলাকার রোহিঙ্গা বিরোধী দাঙ্গার বিবরণী উপস্থাপন করা হল:

www.pathagar.com

সারণি-২

আরাকানে রোহিঙ্গা বিরোধী দাঙ্গা[৭৮]

সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা	সন
১.	আকিয়াব (Akyab)	১৯৬৭, ১৯৭৬,১৯৮৫
২.	কাউক পাইউ (Kyaukpya)	মার্চ ১৯৭৬
৩.	স্যান্ডুয়ে (Sandoway)	১৯৭৮, ১৯৮৪
৪.	টংগুপ (Taungup)	মে ১৯৮৪
৫.	গাওয়া (Gwa)	মে ১৯৮৪
৬.	রাহম্রী (Rahamri)	মার্চ ১৯৭৬
৭.	বুচিদং (Buthidaung)	১৯৭৬, ১৯৭৮, ১৯৮৪, ১৯৮৫
৮.	মংডু (Maungdaw)	১৯৬৭, ১৯৭৬, ১৯৭৮, ১৯৮৫
৯.	চেদুবা (Cheduba)	মে ১৯৮৪

আরাকানের রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকাসমুহ ছাড়াও সমগ্র আরাকানে স্থানীয় মগগোষ্ঠী কর্তৃক রোহিঙ্গা বিরোধী দাঙ্গা পরিচালিত হলেও সারণিতে মুসলিম প্রধান কয়েকটি এলাকার নাম দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯৪২ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সংঘটিত দাঙ্গার তালিকা দেয়া সম্ভব হয় নি। তবে ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ৯ টি শহরে পরিচালিত দাঙ্গার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, সারণিতে উল্লেখিত ১১টি এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাঙ্গা পরিচালিত হয়েছে আকিয়াব, বুচিদং, মংডু এবং স্যান্ডুয়েতে; কারণ এখানকার অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই রোহিঙ্গা। মূলত এ রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকা হতে তাদেরকে তাড়িয়ে নতুনভাবে মগ প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদেরকে সংখ্যা লঘু করার জন্যই সরকারি সহযোগিতায় এসকল দাঙ্গা পরিচালনা করা হয়।

শুধু অপারেশন বা দাঙ্গা বাঁধানোই নয়, এছাড়াও বর্মী কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গা নির্মূলে আরো বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র রোহিঙ্গাদের কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর ব্যাপকভাবে উচ্চ হারে করারোপ করে এবং আরোপিত কর পরিশোধ করতে না পারলে তাদের বাড়িঘর ঘেরাও করে জীবিকার জন্য মজুদকৃত খাদ্য-শস্যাদি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অজুহাতে অনেক অস্থাবর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই সাথে বর্মী সরকার ওয়াক্‌ফকৃত জমি ও সম্পত্তি বেআইনীভাবে ভিত্তিহীন অজুহাতে ছিনিয়ে নেয়। আরাকানে জনসংখ্যাগত অবস্থান পরিবর্তন এবং রোহিঙ্গাদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার জন্য তাদের বাজেয়াপ্তকৃত ভূমিতে নতুন নতুন মগ বসতি স্থাপন করে।[৭৯]

রোহিঙ্গাদের জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সরকারি অনুমতি ব্যতিত তারা এক থানা থেকে অন্য থানায় যেতে পারে না।[৮০] অপরদিকে বিনা মজুরিতে জবরদস্তিমূলক শ্রমের মাধ্যমে প্রতিদিন শত শত রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ ও যুবকদেরকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি ও

www.pathagar.com

নিরাপত্তা বাহিনীর কাজে দিনের পর দিন খাটানো হয়। শ্রমের মূল্য দাবি করলে কিংবা শ্রমদানে অস্বীকৃতি জানালে অমানবিক নির্যাতন অথবা মৃত্যুকেই সহজে মেনে নিতে হয়। রোহিঙ্গাদের উপর সেনাবাহিনী ও আইনশৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার জন্য নিয়মিত খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করা অনেকটা বাধ্যতামূলক।[৮১]

শুধু রোহিঙ্গাদের জীবন ও সম্পদই নয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহও বর্মী সরকারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বুচিদং শহরের বাজার মসজিদ, রাহাদ্রী ও গাওয়ার প্রধান মসজিদ, আমবরী, আকিয়াব, কাইউক, নিমাই মসজিদ এবং বুচিদং শহরের টংবাজার দারুল উলুম মাদ্রাসাসহ বিপুল সংখ্যক মসজিদ মাদ্রাসা বিধ্বস্থ ও উচ্ছেদ সাধন করা হয়; সেই সাথে ১৯৭৬ সালে কাইউক পাইউ শহরের মাদ্রাসাকে ভস্মিভূত করা হয়।[৮২] আকিয়াবের পাইকতালী ও আকিয়াব জামে মসজিদের ওয়াক্‌ফভূমিসহ অনেক ওয়াক্‌ফকৃত জমি, মংডু টাউনের কবরস্থান, মংডুর গ্যাকুরা গ্রামের কবরস্থান ও কাইউক পাইক শহরের কবরস্থানসহ অনেক কবরস্থানকে শুকুরের চারণভূমি এবং গণপায়খানা বানানো হয়। পবিত্র কুরআন মজিদ ও ধর্মীয় বই পুস্তকগুলোকে প্রায়ই নষ্ট করে ফেলা হয় এবং প্যাকিং সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।[৮৩] কোরবানীর ক্ষেত্রে নানা রকম বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে দুই থেকে পাঁচ হাজার লোক অধ্যুষিত গ্রামে দু'টি খাসি অথবা ১টি দু'টি গরু কোরবানীর অনুমতি দেয়া হয়।[৮৪] ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কোন মুসলমানকেই হজ্জ গমনের অনুমতি দেয়া হয়নি। স্কুল-কলেজে ধর্মীয় শিক্ষার কোন সুযোগ নেই।[৮৫] বিভিন্ন সূত্রের তথ্যানুসারে ১৯৪২-১৯৭৬ সালের রোহিঙ্গা নির্যাতনের পরিসংখ্যান সারণির মাধ্যমে চিত্রিত করা হল ঃ

সারণি-৩

রোহিঙ্গা নির্যাতনের পরিসংখ্যান (১৯৪২ -১৯৭৬) [৮৬]

ক্র. নং	অপরাধ	আনুমানিক সংখ্যা	মন্তব্য
১.	বসতি ধ্বংস	৬৯২	সমগ্র আরাকান
২.	বিস্ফোরণ	৫,০০,০০০	সমগ্র আরাকান
৩.	ম্যাসাকার	১,০০,০০০	শুধু মাত্র ১৯৪২ সালেই
৪.	জখম	৫,০০০	সমগ্র আরাকান
৫.	ধর্ষণ	১,৫০০	সমগ্র আরাকান
৬.	হত্যা	৫,০০০	লক্ষণীয় হারে বর্ধিত বিটিএফ কর্তৃক
৭.	আটক রাখা	৩,০০০	মংডু, বুচিদং, আকিয়াব রথিদং, ইনসেইন মৌলমেইন
৮.	মসজিদ, মাদ্রাসা ও মক্তব ধ্বংস	৬০০	আরাকান
৯.	ধর্মীয় বই ও দলীল পত্র ধ্বংস	২,০০,০০০	আরাকান
১০.	ওয়াক্‌ফ জমি-ট্রাষ্ট সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত	২,০০০ একর	আরাকান

www.pathagar.com

১১.	জমি-সম্পত্তি ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত	লক্ষ লক্ষ কীয়ট সমমূল্যের	আরাকান
১২.	সরকারি চাকরি থেকে অপসারণ	১০,০০০	আরাকান
১৩.	নিখোঁজ	২০,০০০	সরকারি ভাষ্য অনুসারে তারা দেশ ত্যাগ করেছে।

উল্লেখ্য, সারণিতে উদ্ধৃত পরিসংখ্যানটি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী সময় থেকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোন বড় ধরনের অপারেশন ছাড়াই সংঘটিত। Rohngya Petriotic Front প্রদত্ত তথ্যানুসারে ১৯৫৫-৭৮ সাল পর্যন্ত তেইশ বছরের মধ্যে প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয় এবং প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বর্মীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।[৮৭]

১৯৭৮ সালের King Dragon অপারেশনে বাংলাদেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের একটি খতিয়ান সারণির মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো।

সারণি-৪

বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা শরণার্থী, ১২ জুলাই ১৯৭৮ পর্যন্ত[৮৮]

ক্র.নং	ক্যাম্পের নাম	শরণার্থী সংখ্যা		জন্ম-মৃত্যুও সংখ্যা	
		রেজিস্টার্ড	অপেক্ষমান	জন্ম	মৃত্যু
১.	ধেচুয়াপালং (১)	২৩,২০২	-	৫৩	-
২.	ধেচুয়াপালং (২)	২৭,১৯৯	-	৮৭	-
৩.	ধুয়াপালং	২০,৭৫৩	-	৪৮	৭৭
৪.	কুতুপালং (১)	১০,০৩০	১৬	৫৭	১৬২
৫.	কুতুপালং (২)	১৫,১৫০	-	২০	১২৪
৬.	আঞ্জুমানপাড়া	১৩,০১১	৬৩	৩৭	১০২
৭.	উইকং (Whykong)	১৪,৫১৬	-	৪৭	৮৪
৮.	নিলা	২৬,২৩৬	-	১১৮	২০৫
৯.	লেধা (Ledha)	২০,১৮৯	-	১১৭	৫৫৩
১০.	গুমধুম	৭,৩১২	-	৪৫	৭১
১১.	নাইক্ষ্যংছড়ি	২১,৬৯০	-	৬২	১১৪
১২.	খুনিয়াপালং	-	৩,৮১১	২	২
১৩.	মরিচ্চাপালং	-	২,০৬৪	২	-
	মোট	১৯৯,২৮৮	৫,৮৭৫	৬৯৫	১,৪৯৪

সারণিতে উল্লেখিত বাংলাদেশে আশ্রিত শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ২ লাখ হলেও মূলত এর সংখ্যা আরও বেশি ছিল। বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির পরিসংখ্যান মতে বাংলাদেশের উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রিত রোহিঙ্গা শরণার্থী সংখ্যা ২,২২,৫৩৫ জন জানা যায়।[৮৯] তবে শিবিরের তালিকাভূক্ত রোহিঙ্গা ছাড়াও অনেকেই এলোমেলোভাবে শিবিরের তালিকার বাইরে ছিল এবং তারা পরবর্তীতে এদেশেই রয়ে গেছে; সব মিলে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থী সংখ্যা ৩ লাখেরও বেশি।[৯০]

www.pathagar.com

১৯৪৮-৭৮ সাল পর্যন্ত আরাকানে বর্মী শাসনের চিত্র বর্ণনা করতে আবদুল মাবুদ খান মন্তব্য করেন-

> ১৯৪৮-৭৮ পর্যন্ত সুদীর্ঘ তিরিশ বছর বর্মী শাসকশ্রেণি এই দেশটির (আরাকান রাজ্যের) উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেনি। শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরাকান এখনো মধ্যযুগীয় অবস্থায় রয়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রায় চল্লিশ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত আরাকানে মাত্র সতেরটি হাই স্কুল ও একটি মাত্র ইন্টারমিডিয়েট কলেজ রয়েছে। আরাকানের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও মধ্যযুগীয় অবস্থায় বিদ্যমান। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মাইল পাকা রাস্তা রয়েছে (সড়কটি রাথিডং থেকে বুথিডং পর্যন্ত প্রসারিত)। আরাকানে আজও কোন রেলপথ তৈরি হয়নি। ব্রহ্মদেশের (বার্মা) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস হল ধান। আরাকান তার সিংহভাগ সরবরাহ করা সত্ত্বেও সেখানে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয়নি। আরাকানে আজও কোন ছোট-খাট কলকারখানাও গড়ে ওঠেনি। প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোকের জন্য আরাকানে দু'শ ষাট শয্যা বিশিষ্ট মাত্র তিনটি হাসপাতাল রয়েছে। উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্মীশাসন আরাকানীদের নিকট বরাবরই মনে হয়েছে বিদেশী শাসন। হত্যা, গৃহযুদ্ধ, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন ও অরাজকতা আরাকানীদের নিত্যসহচর।[৯১]

৩.৫ রোহিঙ্গাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

সামরিক বাহিনী ও মগদের বর্বরোচিত নির্যাতন নিস্পেষণে রোহিঙ্গাদের জীবনের শাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি শুরু হলে তাদের মধ্যকার কিছু বুদ্ধিজীবী বর্মী স্বৈরশাসনের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার নিমিত্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ও সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে ১৯৭০ সালে Rohingya Independence Front (RIF) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। অচিরেই উত্তর আরাকানের শহর-গ্রামাঞ্চলসহ রোহিঙ্গা অধ্যুষিত বার্মায় এর কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনের মাধ্যমেই বাইরের দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ করে তাদের নতুন সংগ্রামের প্রতি সমর্থন আদায়সহ পূর্বের মুজাহিদ আন্দোলনের কিছু বিচ্ছিন্ন সদস্যকে একত্রিত করার প্রয়াস চালায়। অব্যাহত হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, লুটপাট ও নিজস্ব বাড়িঘর থেকে বহিস্কারের প্রেক্ষিতে RIF নেতা মোহাম্মদ সুলতান রোহিঙ্গাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানালে তাকেও বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়ে অবশেষে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পলায়ন করতে হয়।[৯২]

১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে রোহিঙ্গারা সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য Rohingya Patriotic Front (RPF) নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। আরাকানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে তাদের কার্যাবলি সীমাবদ্ধ থাকে। নেতৃত্বের কোন্দলের ফলে ১৯৭৮ সালে উক্ত সংগঠনটি Rohingya Liberation Front (RLF) নামে আরও একটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৯৩]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নির্যাতনের পরাকাষ্টায় চল্লিশের দশক থেকে মুজাহিদ আন্দোলন (Mujahid Movement), Rohingya Liberation Front (RLF), Rohingya Patriotic Front (RPF), সময়ের প্রেক্ষিতে গঠনমূলক ও সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ৮০'র

www.pathagar.com

দশকের সুচনা লগ্ন পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে এলেও নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দূর্বলতা, বাস্তবতা বিবর্জিত চিন্তা, গণযোগাযোগের অভাব প্রভৃতি কারণে লক্ষ্য হাসিলে তেমন ফলদায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ১৯৭৮ সালের ড্রাগন আপারেশনের কারণে রোহিঙ্গারা ব্যাপকভাবে উদ্বাস্তু হবার পর আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে গভীর যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগে অতীত দূর্বলতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, দুনিয়ার আধুনিক বাস্তবতাকে সামনে রেখে, বার্মার উগ্র স্বাদেশিকতাবাদী শোষণ, জুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে মজলুম জনগোষ্টীর মুক্তির লক্ষ্যে জেহাদ করে স্বাধীন সার্বভৌম শান্তিময় ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯৮২ সালে Rohingya Solidarity Organisation (RSO) প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯৪] ছাত্র যুবকদের মধ্যেও শিক্ষা সংক্রান্ত দাবি দাওয়াসহ ইসলামি চেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলাদাভাবে ১৯৮৮ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর 'ইত্তেহাদ আত তুল্লাব আল মুসলিমিন'[৯৫] (Ittihad Al Tullab Al Muslimeen) নামক একটি ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুক্ত স্বাধীন আরাকান রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে রোহিঙ্গারা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করলেও আর্থিক সংকট, সৈন্য ও অস্ত্রের অভাব, আন্তর্জাতিক বিশ্বের সমর্থন ও সহযোগিতার অভাব, অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দলসহ বিভিন্ন দূর্বলতার কারণে বর্মী জান্তার শক্তিশালী সুসজ্জিত বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করতে অচিরেই ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তবে, ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে ARIF ও RSOসহ বিভিন্ন দল ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠনিক তৎপরতা পরিচালনার নিমিত্তে Arakan Rahingya National Organisation (ARNO) নামে এক মঞ্চে যোগ দিয়ে এ্যাডভোকেট মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ও ডা. মুহাম্মদ ইউনুছ এর নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালনার চেষ্টা করে। কিন্তু সে প্রয়াস খুব বেশি দিন টিকে থাকেনি। অল্পদিনের মধ্যেই তাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয় এবং তারা আলাদা আলাদাভাবে কর্মসূচি পালন করে থাকে।

অধ্যায় আলোচনার শেষে বলা যায়, বৃটিশ শাসনের শেষ পর্ব পর্যন্ত রোহিঙ্গারা তাদের জন্মভূমির নিজস্ব বসতবাড়ীতে মৌলিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার প্রয়াস পেলেও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কোন বলিষ্ঠ ধারা সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে বৃটিশ রাজত্বের শেষ পর্যায়ে থাকিন পার্টির নেতৃবৃন্দ তাদের দাবি-দাওয়া যথাযথভাবে আদায় করতে সক্ষম হলেও রোহিঙ্গারা এক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়। তারা স্বাধীনতা পাবার আকাংখায় স্বাধীকার আন্দোলনের জাতীয় নেতা জেনারেল অং সানকে সমর্থন করলেও কোন সফলতা পায়নি। বরং বার্মা স্বাধীন হবার পর থেকে রোহিঙ্গাদের উপর ক্রমশ নির্যাতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রশাসনসহ দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বরত থাকার ফলে জাতীয়ভাবে কিছুটা মজবুতি থাকলেও পরবর্তীতে সকল পদ থেকে রোহিঙ্গাদের চাকরিচ্যুত করা হয়। জাফর কাওয়ালের প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলেও তার মৃত্যুর পরে দলীয় কোন্দলসহ বিভিন্ন কারণে দলে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং সমস্যার বিবর্তনে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন দলের উদ্ভব হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু কোন দলই তাদের আন্দোলনে সফল হতে পারেনি। এক্ষেত্রে রোহিঙ্গা নেতৃত্বের অযোগ্যতা ও স্বার্থান্ধতা অনেকাংশে দায়ী। এছাড়া উ নু'র সরকার রোহিঙ্গাদের দাবি-দাওয়া পূরণ করার প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে এবং নে উইনের শাসনামলে রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহকে নিষিদ্ধকরণ; অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্তকরণের জন্য সরকারের মুদ্রা অচলকরণসহ বিভিন্ন অপকৌশল, আত্মরক্ষার্থে বিত্তশালী শিক্ষিত রোহিঙ্গাদের স্বদেশ ত্যাগ এবং শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে থাকা রোহিঙ্গাদের আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেয়। রোহিঙ্গারা বিশ্বের মজলুম-মানবাধিকার বঞ্চিত জাতিসমূহের অন্যতম। সুতরাং এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরো তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ সামিউল আহমদ খান, "রোহিঙ্গা মুসলমান" *ইসলামিক ফাইন্ডেশন পত্রিকা*, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, তেইশ বর্ষ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩, পৃ. ২২৬।

২ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

৩ মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী*, পৃ. ৪০; আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ১৪৭।

৪ "বার্মার মুসলমান" মুহাম্মদ রুহুল আমিন অনুদিত, তেহরান টাইমস, ২৪ মে ১৯৮৩ এর সৌজন্যে, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, তেইশ বর্ষ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩, পৃ. ২১৭।

৫ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০৬।

৬ Yunus, *A History of Arakan*, p. 105.

৭ *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ১৪৭; অচিন সাঁই, "আরশী নগর" *দৈনিক জনতা*, ২৭ নভেম্বর ১৯৯১ এবং মোঃ শাহেদ হুসেইন, "আরাকান : আরেক কাশ্মীর" *দৈনিক সংগ্রাম*, ২২ নভেম্বর, ১৯৯১।

৮ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০৭।

৯ *তদেব*।

১০ Muin-ud-Din Ahmad Khan, *Muslim Communities of South-Esat Asia : A Brif Survey* (Chittagong: Islamic Cultural Centre, 1980) p. 54; Abdur Razzaq and Mahfuzul Haque, *A Tale of Refugees : Rohingyas in Bangladesh*, pp. 15-16.

১১ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মো: মাহফুজুর রহমান "রংপুর সুবীরনগরে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির: প্রসঙ্গিক পর্যালোচনা" *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, বিংশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০০২, পৃ. ১৪৭-১৬১।

১২ *তদেব*, পৃ. ১০৮।

১৩ Burma National Army (BNA) Burma Independent Army (BIA) এর পরবর্তী নামকরণ।

১৪ Burma Independent Army (BIA) এর বাহিনী প্রধান হিসেবে কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ জাপান সরকার অং সানকে জেনারেল উপাধিতে ভূষিত করেন। (দ্রঃ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০৭)।

১৫ Yunus, *A History of Arakan*, pp. 114-18; হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০৮-১০৯।

১৬ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০৮-১০৯।

www.pathagar.com

১৭ বার্মার মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে ১৯৩৬ সালে GCBMA প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বার্মায় জাপানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে বার্মার সকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়ে। ১৯৪৫ সালে বার্মা হতে জাপানীদের বিতাড়নের পর এটি পুনর্গঠিত হয় এবং বার্মার মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কর্মকান্ড শুরু করে। [দ্রঃ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০২।]

১৮ Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, pp. 75-96; হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০৮-১১০।

১৯ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ১৪৭; হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১১৩।

২০ Abdur Razzaq and Mahfuzul Haque, *A Tale of Refugees : Rohingyas in Bangladesh*, (Dhaka : Center for Human Rights 1995), p.16; Yunus, *A History of Arakan*, pp.122-123; David 1. Stenbarg, "Constetutional and Political Bases of Minority Insurrection in Burma" *Armd Separatisisum in South Asia,* (Singapor: Institute of South East Asian studies, 1984), p. 60.

২১ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, ১০৩; *Insaf,* Rohinyas' Voice and Vision, Vol. 10. June 1997, pp. 3-4.

২২ Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, pp. 75-96; হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০৩।

২৩ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০৪।

২৪ *তদেব।*

২৫ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ১৪৮।

২৬ *তদেব।*

২৭ Mohammad Yusuf, "The plight of the Rohingyas: A living Human Tragedy in Arakan, "*Arakan*-Official Mouthpiece of ARIF, Vol. 5, ISSUE 7, 31 July 1992, pp. 5 - 6.

২৮ Yunus, *A History of Arakan*, p. 133.

২৯ Kala বা কল্লা শব্দের অর্থ প্রথমত: ভারতীয় এবং দ্বিতীয়ত: পাশ্চাত্যের অধিবাসী বা যে কোন বিদেশী, যেমন : ইউরোপীয় বা আরবীয়। [দ্রঃ H. Yule, *A Narative of the Mission Sent by the Governor General of India to the Court of Ava in 1855*, p. 5; সিরাজুল ইসলাম, ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক, পৃ. ১৬৯।] মূলত: বর্মীরা এ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বিদেশী বুঝিয়ে থাকে।

৩০ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১১৫ ।

৩১ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১১৬ - ১১৭ এবং Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, pp. 96-98.

৩২ জাফর হুসাইন ১৯১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর আকিয়াব জেলার বুচিদং শহরের (Township) আলী চং (Ali Chaung) গ্রামের সম্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা সুলতান হুসাইন এবং দাদার নাম মাওলানা আবদুল বারী; তারা ছিলেন আবরীয় বংশোদ্ভুত এবং অত্র টাউনশীপের মধ্যে প্রখ্যাত আলেম। বাল্যকাল থেকে জাফর ছিলেন অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও মেধাবী। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষে আকিয়াব জেলা শহরের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করেন। বাল্যকাল থেকেই কাওয়ালী গানের প্রতি তার ভীষণ ঝোঁক ছিল এবং স্কুল জীবনে তিনি সংগীত চর্চায় প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। স্কুল জীবনেই তিনি জাফর কাওয়াল হিসেবে পরিচিত হন। তিনি রোহিঙ্গাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাওয়ালী পরিবেশনের মাধ্যমে মুজাহিদ আন্দোলন গড়ে তোলেন। অতঃপর ১৯৫০ সালের ২১ অক্টোবর আততায়ীর হাতে নিহত হন। তিনি রোহিঙ্গাদের নিকট মুজাহিদ-ই-আজম হিসেবে সমাদৃত। [দ্রঃ "Tribute to a departed revolutionary: Martayr Mujahid-e-Azam Jafar Hussain Kawwal" *Insaf. Rohingyas Voice and Vision,* Vol. 3, Issue 2-3, 30 September, 1986, pp. 17-22.]

www.pathagar.com

৩৩ কাওয়ালী এক ধরনের লোক সঙ্গীত; যা একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রশংসা এ ক্ষেত্রে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। জাফর কাওয়াল হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর বিপ্লবী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে কাওয়ালী রচনা করতেন এবং রোহিঙ্গাদের নির্যাতিত জীবন চিত্রকে উপস্থাপন করে মুক্তির জন্য মহানবীর আদর্শ অনুসরণে জেহাদে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান।

৩৪ Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, p. 99; *Insaf. Rohingyas Voice and Vision*, pp. 17-22; *দৈনিক ইনকিলাব*, ২০ নভেম্বর, ১৯৯১, ঢাকা।

৩৫ বৃটিশ-বার্মা শাসিত আরাকানে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে জাফর কাওয়াল প্রাথমিকভাবে বিপ্লবাত্মক কাওয়ালী গেয়ে জনগণকে তাদের অধিকার আদায়ে সচেতন করে তোলেন। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ২০ আগস্ট বুচিদংয়ের দাব্রুচং (Dabbru-Chaung) গ্রামে জাফর কাওয়ালের নেতৃত্বে মুজাহিদ পার্টি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। বার্মা স্বাধীনতা অর্জনকালে এ পার্টির পক্ষ থেকে স্বাধীনতা অথবা পূর্ণস্বায়ত্ব শাসন দাবী করে ব্যর্থ হলে ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে বুচিদং শহরের ১২ মাইল উত্তরে টং বাজার নামক স্থানে এক সমাবেশ করে আন্দোলনের নীতি পুনর্নির্ধারণ করেন এবং পরবর্তীতে ক্রমশ সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নেয়। [দ্রঃ *Insaf. Rohingyas Voice and Vision*, pp. 17-22.]

৩৬ মুহাম্মদ আব্বাস ছিলেন মুজাহিদ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম। আবদুর রশীদ, আবদুর রহমান, আবদুশ শুকুর এবং আবুল কাশিম বা কাশিম রাজা প্রমুখ মিলে জাফর কাওয়ালের নেতৃত্বে মুজাহিদ পার্টি গঠন করেন।

৩৭ মুহাম্মদ কাশিম মুজাহিদ পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি সশস্ত্র সংগ্রামকেই রোহিঙ্গাদের একমাত্র মুক্তির পথ হিসেবে উপলব্ধি করে Rohingya Liberation Front গঠন করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই এ আন্দোলন ব্যাপক সফলতা অর্জন করেন। এমনকি তিনি রাজা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। সরকারিভাবে তাকে ডাকাতের সরদার আখ্যা দিয়ে গ্রেফতারের জন্য আড়াই হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার এলাকায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তার মৃত্যুর পর এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। [দ্রঃ Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, p. 99 এবং আরাকানের মুক্তি সংগ্রাম ও তার উৎস, পৃ. ১০৩।]

৩৮ Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, p.99; Yunus, *A History of Arakan*, pp.133 - 135.

৩৯ *The Pakistan Times*, 27th August 1959; Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, p. 82.

৪০ *Ibid.*

৪১ *The Pakistan Times*, 27th August 1959.

৪২ *Ibid.*

৪৩ *Ibid.*

৪৪ *Ibid.*

৪৫ *Ibid.*

৪৬ *Ibid.*

৪৭ *Ibid.*

৪৮ *Ibid.*

৪৯ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১১৮।

৫০ *তদেব*, পৃ. ১১৮-১৯।

৫১ *The Daily Guardian*, Rangoon, 27 October, 1960.

৫২ ওসমান গণি মনসুর, "আরাকানে স্বাধীনতার লড়াই; *নতুন ঢাকা ডাইজেষ্ট*, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ১৯৯১, ঢাকা; আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ১৪৯; *নিউজ লেটার*, আরএসও ১ম সংখ্যা ডিসেম্বর, ১৯৮৯, পৃ. ২; Yunus, *A History of Arakan*, p. 148 এবং *দৈনিক সংবাদ*, ৭ অক্টোবর ১৯৮৭, ঢাকা।

www.pathagar.com

৫৩ Yunus, *A History of Arakan*, p. 148.

৫৪ Ibid., p. 148 এবং ইউনুছ, *অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস*, পৃ. ২৯।

৫৫ এটি ১৯৫০ সালে আরাকানের মংডু শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসমুল আলম চৌধুরী এবং মাস্টার বদিউর রহমান যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সংগঠনটি ১৯৬৪ সালে নে উইন কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। [আশরাফ আলম, আরাকান হিস্ট্রিক্যাল সোসাইটি, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রাপ্ত।]

৫৬ ছাত্র-যুব সমাজের মাঝে ইসলামি চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য ১৯৫৬ সালে রেঙ্গুনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আবদুল মান্নান (U Tin Win) এবং রশীদ বা মং (Rashid Ba Maung) যথাক্রমে এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। [তদেব।]

৫৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের রোহিঙ্গা ছাত্রদের মাঝে ইসলামি চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৯ সালের ৩ ডিসেম্বর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে মোহাম্মদ হুসাইন কাশিম এবং মোহাম্মদ খান দায়িত্ব পালন করেন। [তদেব।]

৫৮ রোহিঙ্গা আলিম সমাজকে একতাবদ্ধ করার জন্য এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা আবদুল কুদ্দুস এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। [তদেব।]

৫৯ সুবহান উকিলের নেতৃত্বে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। [তদেব।]

৬০ আরাকানের মুসলিম যুব সমাজকে ইসলামি মূল্যবোধের ভিত্তিতে নৈতিকতা গঠনের নিমিত্তে মোহাম্মদ কাশিম (Nata Kasim) ও মং মং গিয়াই (Maung Maung Gyi) এর নেতৃত্বে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। [তদেব।]

৬১ রোহিঙ্গা ছাত্রদের মাঝে দ্বীনই চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে শাহ্ আলম ও শাহ্ লতিফ এর নেতৃত্বে রেঙ্গুনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উপরোল্লেখিত সংগঠনসমূহ ১৯৬৪ সালে নে উইন কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। [তদেব।]

৬২ Yunus, *A History of Arakan*, pp. 149-50 .

৬৩ National Refugee Week, *The Refugee Council of Australia*, 17 June, 1992, p. 37.

৬৪ ডক্টর অং, "বার্মায় মুসলিম সমাজ : অতীত এবং বর্তমান; *দৈনিক সংগ্রাম*, ৩১ মে, ১৯৯১ ঢাকা এবং তামো " বার্মার মুসলমান : এক নিদারুণ দুঃসময়ের মুখোমুখি" *দৈনিক আজাদ*, ৬ জানুয়ারি, ১৯৯১, ঢাকা।

৬৫ Yunus, *A History of Arakan*, pp. 150-51.

৬৬ *দৈনিক জনতা*, ১৭ নভেম্বর ১৯৯১।

৬৭ Yunus, *A History of Arakan*, pp.152-53.

৬৮ *The Bangladesh Observer*, 8, 14 May, 1978; *The Bangladesh Times*, 21 May, 1978; *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ নভেম্বর, ১৯৯১।

৬৯ আবদুল মাবুদ খান, "আরাকানে মুক্তি সংগ্রাম", পৃ. ১০২।

৭০ আরাকানের নাগরিকদের দেশের অভ্যন্তরে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতের জন্য National Registration Card (NRC) ব্যবহার করা হয়। এ কার্ড কারো কাছে না থাকলে তাকে অনুপ্রবেশকারী কিংবা বিদ্রোহী বলে সন্দেহ করে দেশীয় আইনে তাকে শাস্তি দেবার বিধি রয়েছে। সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত এ কার্ড প্রতি ১০ বছর পর পর ইস্যু করা হয় এবং এগার বছর বয়সের নিচে কারো জন্য এ কার্ড ইস্যু করা হয় না। প্রতি দশ বছর পর NRC পরীক্ষা করতে এলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, কেননা ১০ বছর আগের ১১ বছরের সেই শিশুটি এখন ২১ বছরের যুবক/যুবতী। তখন তাকে বিদেশী নাগরিক, অনুপ্রবেশকারী কিংবা বিদ্রোহী বলে চিহ্নিত করে জেলে পাঠানো হয়। অনেক সময় সামরিক কিংবা পুলিশ বাহিনীর লোক এসে বিভিন্ন তল্লাশির নাম করে NRC ছিনিয়ে নেয় এবং আর কখনো এ কার্ড ফেরৎ দেয়া হয় না। ফলে বহু নাগরিক অযথা হয়রানির শিকার হন। (দ্রঃ আবদুল মাবুদ খান, "আরাকানে মুক্তি সংগ্রাম", পৃ. ১০৬)।

www.pathagar.com

৭১ মুহাম্মদ আবুল হোসেন মাহমুদ, *বার্মায় মুসলিম গণহত্যা* (ঢাকা : বর্মী মুসলিম কেন্দ্রীয় সাহায্য কমিটি, ১৯৭৮), পৃ. ৪; *The Bangladesh Illustrated Weekly*, May 14-21, 1978.

৭২ Documentation, *Warld Press On Rohingya Muslim Refugees in Bangladesh*, 1978-79, compiled by N. Kamal, Chittagong, 56-58; মাহফুজউল্লাহ / জাহিদুল করিম, প্রচ্ছদ কাহিনী, "মানুষ আসতি আছে নাফ নদীর বানের লাহান" *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৬ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ১২ মে, ১৯৭৮।

৭৩ *The Bangladesh Illustrated Weekly*, May 14-21, 1978.

৭৪ কাজী নিজামুল হক, "শতাব্দীর শিকার : বর্মী মুসলমান" *দৈনিক সংগ্রাম*, ২২ আগস্ট, ১৯৭৯।

৭৫ *Insaf, Rohingyas Voice & Vision*, Vol. 3, Issue 2 - 3, 30 September, 1986, Arakan, Burma, p. 7.

৭৬ *Ibid.*

৭৭ Yunus, *A History of Arakan*, p. 155.

৭৮ মুহম্মদ তাহের জামাল নদভী, *সারজমিন আরকান কি তাহরিকে আজাদী তারিখি পাচ মানজার মে*, (চট্টগ্রাম : আরাকান হিষ্ট্রিক্যাল সোসাইটি, ১৯৯৯), পৃঃ ৩১৮; *Insaf Rohingya's Voice and Vision*, Vol. 3, Issue 2 - 3, 30 September, 1986, Arakan, Burma, p. 11.

৭৯ ইউনুছ, *অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস*, পৃ. ২৬-২৭।

৮০ *New Straits Times*, 11 November, 1992.

৮১ ইউনুছ, *অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস*, পৃ. ২৬-২৮।

৮২ *তদেব*, পৃ. ২৮-২৯; আবুল হোসেন মাহমুদ, *বার্মায় মুসলিম গণহত্যা*, পৃ. ৫০।

৮৩ ইউনুছ, *অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস*, পৃ. ২৯।

৮৪ আবুল হোসেন মাহমুদ, *বার্মায় মুসলিম গণহত্যা*, পৃ. ৫০।

৮৫ "*বার্মার মুসলমান*" *মুহাম্মদ রুহুল আমিন অনুদিত*, পৃ. ২১৭।

৮৬ তাহের জামাল নদভী, *সারজমিন আরকান কি তাহরিকে আজাদী*, পৃ. ৩১১; *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৩০। N.A. Shahib, *History of Arakan* (Karachi : Department of Dawah, 1978), 36; *Insaf Rohingyas Voice & Vision*, Vol. 3, Issue 2-3, 30 September, 1986, Arakan, Burma, p. 8.

৮৭ *Genocide in Burma Against The Muslim of Arakan*, published by Rohingya Patriotic Front, Arakan, Burma, pp. 2-7.

৮৮ A.S. Bahar, pp. 79-80; উল্লেখ্য শরণার্থীর সংখ্যা ও জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যানটি নিবন্ধ চলাকালীন সময়ের হিসেব অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের আশ্রয় শিবিরে অবস্থানকালীন দশ হাজারেরও বেশী শরণার্থী মৃত্যুবরণ করেছে। [দ্রঃ South Asian Refugee Watch, p. 39.]

৮৯ Headquarters of 1978 Rohingya Refugee Control Room in Ukiya, Bangladesh. উল্লেখ্য, N. Kamal, Bangladesh Red Cross Society 1978 as quoted in: Kamaluddin, 1983, p. 146.

৯০ *দৈনিক আজাদ* ও *দৈনিক কিষান*, সম্পাদকীয় ৩০ এপ্রিল, ১৯৮১।

৯১ আবদুল মাবুদ খান, "আরাকানে মুক্তি সংগ্রাম", পৃ. ১০০।

৯২ Yunus, *A History of Arakan*, pp. 153-54.

৯৩ আবদুল মাবুদ খান, " আরাকানে মুক্তি সংগ্রাম," পৃ. ১০৩ - ৪।

৯৪ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ জুন, ১৯৯১ ও ২৬ জানুঃ, ১৯৯২; *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ জুন, ১৯৯১; *দৈনিক ইনকিলাব*, ২০ অক্টোঃ, ১৯৯১।

৯৫ *নিউজ লেটার*, আরএসও, আরাকান, ২য় সংখ্যা, ফেব্রুঃ ১৯৯০, ৭ ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ১১। উল্লেখ্য, এ সংগঠনটি পাঁচটি কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে। দাওয়াহ, সংগঠন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সামাজকল্যাণ, খারাপ কাজ থেকে আল্লাহর দিকে আহ্বান। নিপীড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের এগিয়ে নিতে সংগঠনটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ সরকার

রোহিঙ্গারা বার্মার নাগরিক; শতশত বছর ধরে বংশ পরম্পরায় তারা সেখানে বসবাস করলেও সরকারি নির্যাতনের মুখে পৈতৃক বসতবাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে শরণার্থী হিসেবে বারবার বাংলাদেশে আগমন করে এবং সম্পূর্ণ মানবিক কারণে আন্তর্জাতিক বিধি মোতাবেক তাদেরকে এদেশে আশ্রয় দেয়া হয়।[১] বৃটিশ শাসিত বাংলা, স্বাধীনতা পূর্বের পূর্ব-পাকিস্তান এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সূচনা লগ্ন থেকেই সরকারিভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে এ সমস্যাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। ১৯৭৩ সালে উত্তর আরাকানে Major Aung Than Operation ও '৭৪ সালের Sabe Operation এর নামে সমগ্র আরাকানে রোহিঙ্গা নির্যাতন চলাকালে Burma Socialist Programme Party নতুন সংবিধান প্রণয়ের জন্য First People Congress আহ্বান করে আরাকানকে 'রাখাইন ষ্টেট' ঘোষণা করলে সামরিক শাসক ও মগসেনাদের ছত্রছায়ায় স্থানীয় মগ অধিবাসীরা আরো উচ্ছৃংখল হয়ে রোহিঙ্গা বিরোধী দাঙ্গা শুরু করে। ফলে ১০ হাজার রোহিঙ্গা বসতবাড়ী ছেড়ে আত্মরক্ষার্থে স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও '৭৪ সালের দূর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশের কক্সবাজার অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয় নেয়। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন বন্ধ করে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরৎ নেবার জন্য বর্মী সরকারকে চরমপত্র প্রদান করলে তারা বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের পুনরায় আরাকানে তাদের নিজস্ব বসতবাড়ীতে পুনর্বাসনে বাধ্য হয়।[২]

সর্বোচ্চ হুঁশিয়ারী প্রদানের লক্ষ্যেই সাধারণত চরমপত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। রোহিঙ্গারা যেহেতু মিয়ানমারের নাগরিক সেহেতু তাদেরকে সরকারিভাবে পৈতৃক বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে বাংলাদেশে তাড়িয়ে দেয়া শুধু মানবাধিকার হরণই নয় বরং আন্তর্জাতিক আইনের চরম লংঘন। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমারকে চরমপত্র প্রদানের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের নিজস্ব বসতবাড়ীতে পুনর্বাসনের জন্য জোর তাগিদ প্রদান করেন। মিয়ানমার সরকার দু'দেশের মধ্যকার প্রতিবেশীসুলভ সুসম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে তাদেরকে পুনরায় স্বদেশে ফেরত নিয়ে স্ব স্ব বসতবাড়ীতেই পুনর্বাসন করেন। মূলত এ চরমপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদেরকে মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতির সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই বাংলাদেশ-মিয়ানমার প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করে আসছে। ১৯৭৪ সালে রোহিঙ্গাদের আগমনের প্রেক্ষিতে দু'দেশের সম্পর্ক শিথিল হবার প্রেক্ষাপট তৈরি হলেও মিয়ানমার সরকার শরণার্থীদের ফেরত নিয়ে তাদের নিজস্ব বসতবাড়ীতে পুনর্বাসন করায় ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে

www.pathagar.com

পূর্বের মতই প্রতিবেশীসুলভ সুসম্পর্ক বজায় থাকে। কিন্তু বার্মা সরকার ও স্থানীয় মগদের নির্যাতনের প্রেক্ষিতে রোহিঙ্গারা ১৯৭৮ এবং ১৯৯১-৯২ সালে নিজস্ব বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ হয়ে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। ফলে দু'দেশের মধ্যকার প্রতিবেশীসূলভ সম্পর্কের অবনতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

এ অধ্যায়ে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন তৎপরতা; বিশেষত সমস্যাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পাদিত চুক্তিসমূহ, বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত প্রেস নিউজ ও বাংলাদেশ-মিয়ানমার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক রোহিঙ্গা সমস্যা সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

৪.১ রোহিঙ্গা সমস্যা ১৯৭৮

বাংলাদেশ সরকারের চরমপত্রের সুবাদে বর্মী সামরিক জান্তা ১৯৭৪ সালে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফেরত নিলেও তিন বছর অতিবাহিত না হতেই ১৯৭৮ সালে Nagamin Operation বা King Dragon Operation এর নামে অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে ১০ হাজার রোহিঙ্গাকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং প্রায় আড়াই লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে তাদের পৈতৃক বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদের মাধ্যমে প্রতিবেশী বাংলাদেশে তাড়িয়ে দেয়।[৩] বাংলাদেশ সরকার সীমিত সামর্থ নিয়েই অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ত্রাণ কার্যক্রমসহ ১৩টি আশ্রায়ন ক্যাম্প তৈরি করে আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতায় বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। তথাপিও রোগ-শোক, অনাহার-অর্ধাহারে নাফ নদী পেরিয়ে আসা অসংখ্য লোক প্রাণ হারায়; যাদের মধ্যে অধিকাংশই নারী, শিশু ও বৃদ্ধ।[৪] বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও কৌশল অবলম্বন করে দ্বি-পক্ষীয় ভিত্তিতে এ সমস্যার সমাধান করেন। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৮ সালের ৭ মে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বার্মা সরকারের রোহিঙ্গা নির্যাতন ও দেশ থেকে বিতাড়নকে অমানবিক আখ্যা দিয়ে তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "বার্মার মুসলিম নাগরিকদেরকে নির্যাতনের মাধ্যমে নিজস্ব বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে বাংলাদেশে তাড়িয়ে দেয়ায় আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। ৮ কোটি লোকের একটি জাতি হিসেবে আমাদের বিচলিত না হয়ে সুষ্ঠুভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং রোহিঙ্গাদের অবশ্যই স্বদেশে ফিরে নিতে হবে।"[৫] প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের এ ঘোষণা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক হিসেবে কাজ করে।

তখন রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানকল্পে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ-বার্মার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় ১৩-১৬ এপ্রিল'৭৮ ঢাকায় বৈঠকে মিলিত হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। অতঃপর ১ জুন'৭৮ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব তোবারক হোসেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর

www.pathagar.com

জেনারেল আতিকুর রহমান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব হারুন উর রশিদ, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার আব্দুল আউয়াল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব নূরুল ইসলাম ও তথ্য বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা এনামুল হক সহ ৯ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে বার্মার রাজধানী রেঙ্গুন সফর করেন। এ সফরে শরণার্থী প্রশ্নে কয়েক দফা আলোচনা হলেও কাংখিত অগ্রগতি না হবার কারণে বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক খারাপ হবার আশংকা দেখা দেয়। তবে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সফরে আসার প্রতিশ্রুতি প্রদান করায় সফরকে স্বার্থক হিসেবে ধরে নেয়া হয়।[৬]

বাংলাদেশ কর্তৃক বার্মা সফরের সূত্র ধরে ৬ জুলাই'৭৮ বার্মার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী উ তিন অহন এর নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা দফতরের পশ্চিমাঞ্চল কমান্ডের অধিনায়ক কর্ণেল মিন গাউং এবং আরাকান প্রদেশ গণপরিষদের চেয়ারম্যান লে. কমান্ডার কি ষাউ মং সহ ১১ সদস্যের একটি বর্মী প্রতিনিধিদল রোহিঙ্গা সমস্যা নিরসনে বাংলাদেশের আহবানে সাড়া দিয়ে ঢাকায় আসেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব তোবারক হোসেন ও জেনারেল স্টাফ প্রধান ব্রিগেডিয়ার নূরুল ইসলাম বর্মী প্রতিনিধিদলকে ঢাকা বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানানোর পর বর্মী দলনেতা সাংবাদিকদের জানান যে, ইতোপূর্বে রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত উভয় দেশের আলোচনা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যেই বর্তমান আলোচনা শুরু হচ্ছে।[৭]

বাংলাদেশ বরাবরই মিয়ানমারের সাথে প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বহাল রাখার পক্ষপাতি থাকলেও মিয়ানমারের রোহিঙ্গানীতি এ ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়; ৭ জুলাই '৭৮ সকালে বর্মী প্রতিনিধিদলের নেতা উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. উ তিন অহন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হকের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কথাই তার প্রমাণ। তিনি বলেন, "মানবিক কারণে এবং দু'দেশের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ সর্ম্পক পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বার্থে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মতৈক্যে পৌঁছা অপরিহার্য। তিনি উল্লেখ করেন যে, বংশ পরম্পরায় বার্মায় বসবাসকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সম্পূর্ণ মানবিক কারণে বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দেয়া হয়েছে। জবাবে বর্মী উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশিত উৎকণ্ঠায় কণ্ঠ মিলে দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৎপ্রতিবেশী সুলভ সম্পর্কের স্বার্থে শরণার্থী সমস্যার আশু সমাধানের প্রশ্নে তার সরকারের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন। পরে বর্মী প্রতিনিধিদলের নেতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্ণেল মোস্তাফিজুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।[৮]

বর্মী শরণার্থী সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে বাংলাদেশ-বার্মা সরকারি কর্মকর্তা পর্যায়ের সকাল ও বিকেলের দু'টি অধিবেশনে প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে আলোচনা অনুষ্ঠিত হলেও তাতে কাংখিত সফলতা অর্জিত হয়নি। বিকেলের অধিবেশন শেষে বাংলাদেশ দলের নেতা পররাষ্ট্র সচিব তোবারক হোসেন সাংবাদিকদের জানান, 'বর্মী শরণার্থীদের দ্রুত স্বদেশ প্রত্যাগমনের সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে বের করার জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।'[৯]

www.pathagar.com

বর্মী শরণার্থীদের প্রত্যাগমন প্রশ্নে চলতি আলোচনায় মতৈক্যে পৌঁছার সম্ভাবনা আছে কিনা সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করা হলে তোবারক হোসেন বলেন, "সে ব্যাপারে জোরালো প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং সমস্যার সকল দিক নিয়ে আলোচনাপূর্বক শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রশ্নে বাংলাদেশের নীতি অপরিবর্তিত রেখে বর্মী পক্ষের উত্থাপিত প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।" অধিবেশন শেষে বর্মী উপ পররাষ্ট্রন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, শান্তিপূর্ণ উপায়ে শরণার্থী সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশী প্রতিনিধিদলের মনোভাব ও সদিচ্ছায় তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন।[১০] উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের নীতি বলতে রোহিঙ্গাদেরকে বার্মার নাগরিক মর্যাদা সহকারে নিজস্ব বসতবাড়ীতে পুনর্বাসন করা অর্থাৎ রোহিঙ্গাদের নাগরিক মর্যাদা ও জানমালের নিরাপত্তা সহকারে নিজস্ব বসতবাড়ীতে পুনর্বাসন করাই হলো বাংলাদেশ সরকারের এ বৈঠকের লক্ষ্য।

তিন দিন ব্যাপী আলোচনা শেষে ৯ জুলাই'৭৮ রবিবার বর্মী কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফিরে নেবার ব্যাপারে সম্মত হয়ে রাষ্ট্রীয় ভবনে বাংলাদেশ-বার্মা এক সমঝোতা স্মারক (Agreed Minutes) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্রসচিব তোবারক হোসেন ও বার্মার পক্ষে বর্মী প্রতিনিধিদলের নেতা এবং উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী উ তিন অহন সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর শেষে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বলেন, বর্মী শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরে নেবার ব্যাপারে আমরা ঐকমত্যে উপনীত হয়েছি, বর্মী সরকার বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী ***বর্মী নাগরিকদের*** ফিরে নিতে সম্মত হয়েছেন এবং আগামী মাসের শেষ নাগাদ শরণার্থীদের ফেরৎ নেবার কাজ শুরু হবে। সাংবাদিকদের সাথে আলোচনার সময় বর্মী উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বর্মী প্রতিনিধিদলের নেতা উ তিন অহনও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সাংবাদিকদের জানান আলোচনা সাফল্যমন্ডিত হবার কারণে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।[১১] সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, শরণার্থীদের ফিরে নেবার ব্যাপারে খুঁটিনাটি বিষয়গুলি উভয়দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।[১২]

স্মারকের মূল অংশে উল্লেখ করা হয়েছে -

> 1. (a) The Government of the Socialist Republic of The Union of Burma agrees to the repatriation at the earliest of the lawful residents of Burma who are now sheltered in the camps in Bangladesh on the presentation of Burmese National Regestration cards along with the members of their families, such as, husband, wife, parents, parents-in-law, children, foster-children, grandchildren, son-in- law, daughter-in-law and widowed sisters.
>
> (b) The Government of the Socialist Republic of the Union of Burma also agrees in the second phase to the repatriation of the people who are able to present their

www.pathagar.com

documents issued in Burma with indication their residence in Burma, along with the members of their families, such as, husband, wife parents, parents-in-law children, foster-children, grand children, son-in-law, daughter-in-law and widowed sisters and also those persons and the members of their families such as husband, wife, parents, parints-in-law, children, foster children, grandchildren, son-in-law, daughter-in-law, and widowed sisters, who will be able to furnish evedence of their residence in Burma, such as address or any other particulars.

2. The residents of Burma mentioned in paragraph 1 above will be received on the border by the authorities of the Government of Burma in batches from the authorities of the Government of Bangladesh. The process of repatriation of such residents will commence not later than August 31, 1978, and is expected to be completed within six months from the date the first batch is received.[১৩]

উপরোল্লিখিত স্মারকের মূল অংশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে -

প্রথমত, বাংলাদেশের বিভিন্ন শিবিরে আশ্রিতদের মধ্যে Lawful Residents of Burma বা বার্মার আইনগত বৈধ প্রকৃত অধিবাসীদেরকে বার্মা সরকার স্বদেশে ফেরত নেবে; যারা National Registration Card (NRC) প্রদর্শন করতে পারবে।

দ্বিতীয়ত, আশ্রিতদের মধ্য থেকে যারা কোন প্রমাণপত্র বা নিজেদের বসতবাড়ীর ঠিকানা দ্বারা বার্মার অধিবাসী হিসেবে প্রমাণ করতে পারবে তাদেরকে ফেরত নেয়া হবে।

তৃতীয়ত, উপরোল্লিখিত অধিবাসীদেরকে বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে গ্রুপ ভিত্তিক গ্রহণ করা হবে এবং ১৯৭৮ সালের ৩১ আগষ্টের পূর্বে প্রত্যাবাসন শুরু হয়ে সর্বোচ্চ ৬ মাসের মধ্যে প্রত্যাবাসন সমাপ্ত করা হবে।

স্মারকের শর্ত মোতাবেক NRC প্রদর্শনী ও বার্মায় বসবাসের প্রমাণ সাপেক্ষে প্রায় নির্দিষ্ট সময়েই আগত রোহিঙ্গারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু লক্ষ্যনীয় যে, বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গারা জন্মসূত্রে বার্মার নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও স্মারকে Lawful Citizen of Burma না বলে Lawful Residents of Burma উল্লেখ করা হয়েছে; যাতে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের বিষয়টি প্রচ্ছন্নই থেকে যাবার সুযোগ লক্ষ্য করা যায়। কেননা, Citizen শব্দের অর্থ রাষ্ট্রের প্রজা বা নাগরিক[১৪] অর্থাৎ A person who has full rights as a member of a country, either by birth or by being given such rights[১৫] পক্ষান্তরে Resident অর্থ হলো বসবাসকারী, বাসিন্দা অর্থাৎ A person who lives or has a home in a place, not a visitior.[১৬]

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সরকার বরাবরই রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে খেয়াল করলেও স্মারকে এমন ধরনের শব্দের ব্যবহার অবশ্যই ভাবনার বিষয়। তবে এর পিছনে তিনটি কারণ থাকতে পারে;

প্রথমত, বাংলাদেশ সরকার Lawful Residents of Burma বলতে Lawful Citizens of Burma বুঝিয়েছেন; হয়তো তাদের ধারণা ছিল যারাই নাগরিক তারাই বাসিন্দা বা অধিবাসী।

দ্বিতীয়ত, কর্তৃপক্ষের অসর্তকতা বশত বিষয়টি এমন হয়েছে।

তৃতীয়ত, বার্মা কর্তৃপক্ষের একগুয়েমী সিদ্ধান্তের কারণেই বাংলাদেশ স্মারকে এ শব্দকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণের চেয়ে প্রথম কারণকেই প্রধান্য দেয়া উচিত, কেননা সমঝোতা স্মারক (Agreed Minutes) স্বাক্ষরিত হবার পর সাংবাদিকদের নিকট বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব তোবারক হোসেন উল্লেখ করেন, "বর্মী সরকার বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী ***বর্মী নাগরিকদের*** ফিরে নিতে সম্মত হয়েছেন এবং আগামী মাসের শেষ নাগাদ এ প্রত্যাবাসনের কাজ শুরু হবে।"[১৭] এখানে তিনি রোহিঙ্গাদেরকে বর্মী নাগরিক বলেছেন; বাসিন্দা বা বসবাসকারী নয়। তাছাড়া বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অসর্তকতার অবকাশ থাকে না। আর বার্মার একরোখা মনোভাবকে মেনে না নেবার জন্যই পররাষ্ট্র সচিব ইতোপূর্বে বলেছেন যে, প্রত্যাবাসন প্রশ্নে বাংলাদেশের নীতি অপরিবর্তিত রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রথম কারণই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিন্তু বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এত বড় ভুল হবে তা অনুমান করা যায়না। বাহ্যত বিষয়টি পাশ কাটিয়ে পার পাবার একটি কর্মসূচি বলেও মনে হয়। সেইসাথে স্মারকে Lawful Citizens of Burma এর স্থলে Lawful Residents of Burma শব্দের ব্যবহার মেনে নেয়া দূর্বল পররাষ্ট্র নীতিরই বর্হিপ্রকাশ। কেননা সরকারি আমলাদের মতামত জরিপেও রোহিঙ্গাদেরকে জন্মসূত্রে মিয়ানমারের নাগরিক বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

৪.২ রোহিঙ্গা সমস্যা ১৯৯২ ও বাংলাদেশ সরকার

১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ-বার্মা শরণার্থী প্রত্যাবাসন সমঝোত স্মারক সম্পাদনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদেরকে তাদের নিজস্ব বসতবাড়ীতে নির্বিঘ্নে বসবাসের অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করে ২ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে স্বদেশে ফেরত নিলেও বর্মী সামরিক জান্তা তাদের অঙ্গীকারের উপর বেশি দিন প্রতিষ্ঠিত থাকেনি। প্রত্যাবাসনের পর ২ বছর যেতে না যেতেই পুনরায় তাদের উপর নির্যাতন শুরু হয় এবং অনেক রোহিঙ্গা পরিবার দেশ থেকে পালিয়ে এসে বাংলাদেশের দক্ষিণাংশে স্থায়ী আবাসন গড়ে তোলে।[১৮] ১৯৮৮ থেকে '৯০ সালের মধ্যে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা টেকনাফ দিয়ে বাংলাদেশে এসে কক্সবাজার জেলায় আশ্রয় নেয় এবং স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলে বসবাস করতে থাকে।[১৯]

www.pathagar.com

আরাকানের রোহিঙ্গাদের উপর বর্মী নির্যাতন বেড়ে যাবার প্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসে ব্যাপকভাবে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আগমন শুরু করে। রোহিঙ্গা সমস্যার যাতে বিস্তৃতি না ঘটে সেজন্যে ঐ সালের মাঝামাঝি পর্যায়ে রোহিঙ্গা আগমনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে এ সমস্যা নিরসনকল্পে তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে; যথা-

প্রথমত, এ বিষয়ে মিয়ানমার সরকারের সাথে উচ্চ কুটনৈতিক পর্যায়ে যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে রেঙ্গুনস্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশ দেয়।

দ্বিতীয়ত, বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন মিয়ানমারের একমাত্র চীনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকায় বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে চীনের সাহায্য নেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

তৃতীয়ত, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন উপলক্ষে নিউইয়র্কে অবস্থানকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লে. কর্ণেল (অব.) এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান ৩০ সেপ্টেম্বর'৯১ মিয়ানমারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী উ অহন গিয়াও এর সঙ্গে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে কথা বলেন।[২০] কিন্তু মিয়ানমার সরকার বাংলাদেশ সরকারের তিনটি পদক্ষেপের একটিকেও গুরুত্ব দেয়নি।

মিয়ানমারের রোহিঙ্গানীতি প্রসঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত হচ্ছে, ১৯৭৮ সালের মতো অভ্যন্তরীণ সংকটজনক অবস্থায় স্থানীয় নাজুক পরিস্থিতি থেকে অন্যদিকে দৃষ্টি সরিয়ে দেবার জন্যই মিয়ানমার সরকার পরিকল্পিতভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। পূর্বের মত তথাকথিত বিদেশী (?) ইস্যুকে কেন্দ্র করে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শক্তির সমর্থন পাওয়াই তাদের লক্ষ্য। তাছাড়া অং সান সুকির স্বামী একজন বৃটিশ নাগরিক হবার কারণে সরকারিভাবে বিদেশীদের বিরুদ্ধে ঘৃনা সৃষ্টির লক্ষ্যে "মিয়ানমার-বৌদ্ধবাদ" ভিত্তিতে বৃহৎ জগত্যাভিমান সৃষ্টি করে মিয়ানমারের বিরোধীদলীয় নেত্রী, কারাবন্দী অং সান সুকির বিপক্ষে জনমত সৃষ্টি করাই তাদের লক্ষ্য। সেই সাথে বাংলাদেশ- মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী আরাকান অঞ্চলের মুসলিমসহ বিভিন্ন স্থানে অন্যান্য উপজাতি ও সংখ্যালঘুরা মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করছে তা দমন করার জন্যই তারা মাঝে মধ্যে সামরিক অভিযান তীব্র করে।[২১]

বাংলাদেশে আশ্রিত শরণার্থীদের সংখ্যা ১৯৯১ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যায়ে যখন প্রায় ২০ হাজার, তখন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কয়েক দফা প্রতিবাদ জানানো সত্বেও কোন ফল না হবার কারণে বাংলাদেশী কুটনীতিকগণ মিয়ানমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, "অবস্থা এরূপ চলতে থাকলে দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষতি হতে পারে।" দৃষ্টি আকর্ষণীর প্রথম প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মিয়ানমার সরকার উল্লেখ করেন, "মিয়ানমারের মুসলমানদের উপর কোন অত্যাচার করা হচ্ছে না।" কিন্তু পরবর্তীতে তারা স্বীকার করেন যে, নিরাপত্তা বাহিনী স্থানীয় পর্যায়ে কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছে। কিন্তু সে ধরনের তৎপরতা বন্ধের জন্য রেঙ্গুন সরকার কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন

www.pathagar.com

তার কোন জবাব বাংলাদেশ সরকার না পাবার কারণে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে যে, বাংলাদেশ কোন ক্রমেই ১৯৭০-এর দশকের মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে চায় না।[২২] কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ কঠোর হুঁশিয়ারীর প্রেক্ষিতে মিয়ানমার সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদেও আলোচনা-পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯১ সালের ৩ নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৬৮ বিধি অনুসারে এনডিপি সংসদ সদস্য সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরী "মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর স্থানীয় সেনাবাহিনীর অত্যাচার ও হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীর বাংলাদেশে প্রবেশ" শীর্ষক জন গুরুত্বপূর্ণ সম্পন্ন নোটিশের উপর আলোচনা হয়। নোটিশটিতে সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী উল্লেখ করেন, মিয়ানমার মুসলিম অধ্যুষিত আরাকান রাজ্যে বার্মার সেনাবাহিনী এবং ধর্মান্ধ মিয়ানমার নাগরিক কর্তৃক হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ তথা নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ আরাকানের রোহিঙ্গা সম্প্রদায় স্বদেশ ভূমি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় দলে দলে বাংলাদেশে প্রবেশ করায় স্থানীয় জনগণের মনে উৎকণ্ঠা ও ক্ষোভের সঞ্চার করছে। আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে উচ্ছেদ করে সেখানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বসতি স্থাপন করা হচ্ছে বলে বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী এবং গুরুত্ব সম্পন্ন হেতু এ বিষয়ের উপর আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তিনি মিয়ানমারের এ সব নাগরিকদের জন্য আশ্রয় শিবির খোলার দাবি জানান এবং উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি ইসলামি সম্মেলন সংস্থা ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে তুলে ধরার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা। তিনি আরো জানতে চান, " মিয়ানমারের নিরীহ মুসলমানরা যে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, সেখানে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে, সরকার তা জাতির সামনে কবে উপস্থাপন করবেন।" উত্তরে বাংলাদেশের পররাষ্টমন্ত্রী এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান উল্লেখ করেন,-"আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিষয়টি বেশ কিছু দিন থেকেই সরকারের দৃষ্টি গোচরে রয়েছে এবং মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্কের আলোকে শান্তিপূর্ণ ও ন্যায় সঙ্গতভাবে এ সমস্যার একটি কুটনৈতিক সমাধান সম্ভব বলে আমরা আশা করি।" তিনি উল্লেখ করেন যে, "১৯৭৮-৭৯ সালে তৎকালীন বার্মা থেকে যে সকল মুসলিম নাগরিক বাংলাদেশে শরণার্থী হিসেবে এসেছিল; দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার প্রেক্ষিতেই তারা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিল এবং এ বিষয়টিও এরূপ অভাবিত কুটনৈতিক সাফল্যের আলোকে সমাধান করতে হবে।" তিনি আরো উল্লেখ করেন, "আগামী ২১ নভেম্বর'৯১ তিন দিনের সফরে মিয়ানমার যাচ্ছি এবং সফর শেষে বিষয়টির সাফল্যজনক সমাধান সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ মহান সংসদকে অবগত করতে সক্ষম হবো।" বিষয়টি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে কুটনৈতিকভাবে সমাধান করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।[২৩]

www.pathagar.com

রোহিঙ্গা প্রশ্নে আলোচনার জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমানের ২১ নভেম্বরের'৯১ রেঙ্গুন সফরের প্রস্তুতি চলাকালে কূটনৈতিকগণ আগাম মন্তব্য করেন যে, মিয়ানমার প্রতিবেশী সুলভ আচরণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কেননা মিয়ানমার সরকার আলোচনায় বসতে এখনো অসম্মতি জ্ঞাপন করেনি। বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামে তোলা না হলেও ইতোমধ্যেই বিপুল সংখ্যক আরাকানী নাগরিকের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের কারণে সরকার বিভিন্ন সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং দ্বি-পক্ষীয় ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবে যদি মিয়ানমার সরকারের অনুকূল সাড়া না পাওয়া যায় তবে বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামে না তুলে উপায় থাকবে না। বাংলাদেশ মনে করে, মিয়ানমার এ সমস্যা প্রশ্নে শুভবুদ্ধির পরিচয় দেবে এবং দ্বি-পক্ষীয় ভিত্তিতে সমাধানে এগিয়ে আসবে।[২৪]

বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্ধারিত মিয়ানমার সফর ১৯৯১ সালের ২১ নভেম্বর শুরু হয় এবং ২২ নভেম্বর বার্মায় সফর কালিন সময়ে তিনি মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উ অহন গিয়াও এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনায় আরাকান অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা নাগরিকের বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণের কথা উত্থাপন করে তাদের শীঘ্র মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টায় রেংগুন সেনাবাহিনীর রেষ্টহাউস "গগ্যা ইয়েই থ্যা" তে অনুষ্ঠিত দ্বি-পক্ষীয় এ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, আরাকান রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী লোকদের একটি তালিকা বাংলাদেশ মিয়ানমারকে প্রদান করবে। তাদের নাগরিকত্ব ও আবাসস্থলের প্রমাণ এবং সীমান্ত অতিক্রমের কারণ সম্পর্কে কোন কাগজপত্র থাকলে তাও সরবরাহ করতে হবে। অতঃপর মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ এ তালিকা পরীক্ষা করে মিয়ানমারের প্রকৃত নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের নীতিমালা প্রণয়ন করবেন।[২৫] মূলত এ সফরেই শরণার্থী প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া চূড়ান্তরূপ নেয় এবং অতিসত্বর প্রত্যাবাসনের কাজ শুরু হবার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। সফর শেষে বাংলাদেশে এসে পররাষ্টমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান যে, মিয়ানমার সরকার তাদের প্রকৃত নাগরিকদের গ্রহণ করতে নীতিগতভাবে সম্মত হবার কারণে খুব শিগগিরই পরিচয় প্রণালী শুরু হবে।[২৬]

রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান ও প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার পাশাপাশি শরণার্থীদের আশ্রায়ন এবং ভরণ-পোষণ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র ও জনবহুল রাষ্ট্রের পক্ষে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা সত্যিই অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তদুপরি ২০ জানুয়ারি '৯২ পররররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে জানান যে, গত কয়েক মাসে যে সব উদ্বাস্তু সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে স্বরাষ্ট্র ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে তাদের সংখ্যা নিরূপন করে মিয়ানমারে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত খাদ্য ও সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করছে।[২৭]

www.pathagar.com

সারণি-১

মিয়ানমার থেকে ১৯৯২ সালে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ক্যাম্প ভিত্তিক হিসেব।[২৮]

	জেলার নাম	থানা	ক্যাম্পের নাম	ক্যাম্পে অবস্থানরত শরণার্থী সংখ্যা	মন্তব্য
১.	কক্সবাজার	রামু	ধুয়াপালং	১৬,৯৫৭	
			ধেচুয়াপালং-১	৪,৭৯০	
			ধেচুয়াপালং-২	২২,৬৫৯	
		উখিয়া	মরিচ্যাপালং	১০,৮৪৫	
			হলুদিয়াপালং	৭,৫১৪	
			জুমাপাড়া	৩৯৪	নির্মাণাধীন
			কুতুপালং	১২,৪৮৪	
			বালুখালি-১	১৮,৮৪১	
			বালুখালি-২	৯,৭২০	
		টেকনাফ	শৈলার চেবা	৯,৭৮৯	
			হরিখোলা	২,৩৭১	
			নয়াপাড়া-১	১৬,৪৭০	
			নয়াপাড়া-২		নির্মাণাধীন
			দমদমিয়া-১	২১,৩৮৮	
			দমদমিয়া-২	৩১,৭১৫	
২.	বান্দরবান	নাইক্ষ্যংছড়ি	গুনধুম-১	২৪,১২৯	
			গুনধুম-২	১৬,৮৬৫	
			গুনধুম-৩	৮,৮১৪	
			আদর্শগ্রাম	১৫,০৩২	
			রংগী খালি	১০০	নির্মাণাধীন
			মোট	২,৫০,৮৭৭ জন	

(দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটশ সাতাত্তর জন)

সারণিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলাধীন রামু, উখিয়া, টেকনাফ ও নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় মোট ২০টি ক্যাম্পে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটশত সাতাত্তর জন শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে। আশ্রয় শিবিরের বাইরেও ৩৯,২৮৭ জন শরণার্থী এলোমেলোভাবে বিভিন্ন স্থানে আত্মীয়তার পরিচয়ে স্থায়ী আবাসন গড়ে তোলে।[২৯] তবে ক্যাম্পে আশ্রিত শরণার্থীদেরকেই ভরণ-পোষণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার এ সকল শরণার্থীর জন্য ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে।

www.pathagar.com

সারণি-২
১৯৯২ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত রিলিফের বিবরণ।[৩০]

ক.	নগদ অর্থ	=	১০,৯৫০,০০০/=
খ.	খাদ্য দ্রব্য		
	১. চাল - ৪৯০ মে. টন এবং ৩৬০ বস্তা	=	৬,৬৫৮,০০০/=
	২. গম - ২৪০ মে. টন	=	২,৪০০,০০০/=
	৩. গুড়ো দুধ - ২,০০০ কার্টুন	=	৩,৮৪০,০০০/=
	৪. মুগ ডাল - ১০০ মে. টন	=	৩,০০০,০০০/=
	৫. বিস্কুট - ২৫৫০ কার্টুন	=	৭৬৫,০০০/=
	৬. চিনি - ২৫৭ বস্তা	=	৩৮,৫০০/=
	৭. চা - ১০০ কার্টুন	=	৯০,০০০/=
	৮. বেবী ফুড - ৯৬২ কার্টুন	=	১,১৫৪,৪০০/=
	৯. মেকারেল - (Macarel) - ৪৩ কার্টুন	=	৪১,৫০০/=
	১০. টমেটো সোয়াস - ১০৮ কার্টুন	=	৩২,৪০০/=
	১১. অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য ৫,০১৯ কার্টুন	=	২,৭৫০,০০০/=
গ.	পুরাতন কাপড় এবং গার্মেন্টস = ১০০ কার্টুন	=	১,০১৩,০৭০/=
ঘ.	আশ্রায়ন সামগ্রী		
	১. সি. আই. সিট ৭,৭৯৩ বান্ডিল	=	২৭,২৭৫,৫০০/=
	২. তাঁবু ১,২৩২ টি	=	৬১৬,০০০/=
ঙ.	নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (ম্যাচ, রান্না সামগ্রী ইত্যাদি)	=	১০,৬২৯,৭৭০/=
	সর্বমোট	=	৭,১০,৭২,০০০/=
	(সাত কোটি দশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার মাত্র)		

মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থী আগমনের পরই বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাদের রেজিস্ট্রেশনপূর্বক ক্যাম্প নির্মাণ করে ভরণ-পোষনের ব্যবস্থা শুরু হয়। সারণিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে শরণার্থীদের জন্য ৭,১০,৭২,০০০/= ব্যয় করেছে। শরণার্থীদের সংখ্যানুসারে এ ভরণ-পোষনের তৎপরতা অত্যন্ত অপ্রতুল হলেও বাংলাদেশ তার সীমিত সামর্থ নিয়েই সাহস ও আন্তরিকতার সাথে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। শরণার্থী সমস্যার সমাধান দ্রুততর না হবার কারণে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিশ্বের নিকট বিভিন্নভাবে সাহায্য কামনা করে এবং UNHCR, WFP সহ বিভিন্ন দেশ ও NGO শরণার্থীদের আশ্রায়ন ও ভরণ পোষণসহ বিভিন্নমুখী সেবায় এগিয়ে আসে। বাংলাদেশ ১৯৯২ সালের মার্চ মাস থেকে UNHCR, WFP ও বিভিন্ন দেশ NGO'র সাহায্য-সহযোগিতায় এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। এ ভরণ-পোষণের তৎপরতা ও মানবিক সাহায্য মূলত রোহিঙ্গাদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের সহানুভূতি ও হৃদতার বহিঃপ্রকাশ।

www.pathagar.com

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ মন্ত্রণালয় জরুরীভাবে Rohingya Affairs Cell গঠন করে এবং এর তত্ত্বাবধানে একজন সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব এবং একজন সহকারী সচিব নিয়োগ করেন। ত্রান তৎপরতা পরিচালনার জন্য কক্সবাজারে অফিস স্থাপন করে; যার প্রধান হিসেবে একজন যুগ্ম সচিবকে Refugee Relief and Repatriation Commissioner পদ মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করেন। Refugee Relief and Repatriation Commissioner এর সহযোগি হিসেবে দু'জন Aditional Relief and Repatriation Commissioner নিয়োগ ছাড়াও ২০টি ক্যাম্পের জন্য ২০জন Camp-in-Charge হিসেবে Sinior Assistant Secretary অথবা Aditional Deputy Commissioner কে নিয়োগ দান করে। চিকিৎসা সেবার জন্য সিভিল সার্জন পদবী ধারী সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ করে। বিভাগীয় কমিশনার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান করেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা-স্বাস্থ্যসেবাসহ শরণার্থী রেজিষ্ট্রিকরণ, ক্যাম্প ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, খাদ্য বন্টন, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং মানবীয় অন্যান্য কর্মকাণ্ড। এ সব কাজে ১৬০৭ জন অফিসার ও কর্মচারী ডেপুটেশনে নিয়োজিত। প্রতিরক্ষার জন্য ক্যাম্প প্রতি ১৯১ জন পুলিশ, ৬৮০ জন আনসার, খাদ্য বন্টনের জন্য বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ১০৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ৪১০ জন সেচ্ছাসেবী কাজ করে। সেই সাথে ৩১টি NGO ও সেচ্ছাসেবী সংগঠন অর্থনৈতিক সহযোগিতাসহ শরণার্থী ক্যাম্পে বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৩১]

সারণি-৩

NGO ও সেচ্ছাসেবী সংগঠনের তালিকা এবং সাহায্যের বিবরণ।[৩২]

NGO ও সেচ্ছাসেবী সংগঠনের তালিকা			সাহায্যের পরিমান
1.	Association for Social Advancement (ASA)	Tk.	62,75,100.00
2.	Adventist Development & Relief Agency (ADRA)	Tk.	52,10,000.00
3.	Al Haramine Islamic Foundation	Tk.	40,57,000.00
4.	Association for Medical Doctors for Asia (AMDA)	Tk.	4,73,000.00
5.	CCDB	Tk.	1,52,25,000.00
6.	CARE-Bangladesh	Tk.	1,57,45,000.00
7.	Caritas-Bangladesh	Tk.	54,95,070.00
8.	Concern-Bangladesh	Tk.	1,37,49,371.00
9.	Enfants Du Monde (EDM)	Tk.	1,42,32,000.00
10.	Families for Children	Tk.	8,77,500.00
11.	Gono Shasthya Kendra	Tk.	8,05,12,366.00
12.	Heed-Bangladesh	Tk.	17,20,500.00
13.	Helen Keller	Tk.	73,67,904.00
14.	International Islamic Relief Organisation (IIRO)	Tk.	8,31,85,782.00
15.	Islamic Relief (U.K.)	Tk.	26,42,000.00
16.	Islamic Relief Agency (IRA)	Tk.	Tk.8,64,000.00

www.pathagar.com

NGO ও সেচ্ছাসেবী সংগঠনের তালিকা			সাহায্যের পরিমান
17.	ISRA, Islamic Foundation (Guarantee) LTD. (Pakistan)	Tk.	19,50,000.00
18.	Koinonia	Tk.	37,40,000.00
19.	Mennonite Central Committee (MCC)	Tk.	40,47,978.00
20.	Medicines Sans Frontieres (MSF, France)	Tk.	7,85,49,000.00
21.	MSF (Holland)	Tk.	10,18,50,051.00
22.	Muslim Aid	Tk.	59,65,856.00
23.	OXFAM	Tk.	2,11,99,215.00
24.	RDRS	Tk.	20,00,000.00
25.	Rabita-Al-Alam-Al-Islami	Tk.	1,06,98,004.00
26.	Save the Children Fund (U.K.)	Tk.	2,31,96,000.00
27.	Shapla Neer	Tk.	60,36,250.00
28.	Terre-Dess-Homes (Netherland)	Tk.	80,80,500.00
29.	The Church of Bangladesh Social Development Programmes	Tk.	1,11,15,000.00
30.	World Concern	Tk.	1,01,80,486.00
31.	World Vision of Bangladesh	Tk.	58,36,000.00
		Tk.	65,44,18,213.00

উপরোল্লেখিত NGO ও সেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবলম্বনহীন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে বাংলাদেশ সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে এবং এককালীনভাবে ৬৫,৪৪,১৮,২১৩.০০ টাকা সমমূল্যের সাহায্য প্রদান করে। পরবর্তী পর্যায়ে সার্বক্ষণিকভাবে নিম্নোক্ত NGO সমূহ বিভিন্নমুখী সেবা প্রদান অব্যাহত রাখে।

সারণি-৪
সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত NGO সমূহের বিবরণ।[৩৩]

1.	Al Markazal Islam.
2.	Concern-Bangladesh
3.	Gono Shasthya Kendra
4.	International Islamic Relief Organisation (IIRO)
5.	Islamic Relief Agency ISRA (Sudan)
6.	ISRA Islamic Foundation (Guarantee) Ltd. (Pakistan)
7.	MSF (France)
8.	MSF (Holland)
9.	OXFAM
10.	Save the Children Fund (UK)
11.	Terre-Dess Homes (Netherland)
12.	The Church of Bangladesh Social Development Programme
13.	World Concern

www.pathagar.com

উপরোল্লেখিত NGO সমূহ ছাড়াও রাবেতা আলম আল ইসলামী বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ চিকিৎসা সেবাসহ বিভিন্নমুখী সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে UNHCR দায়িত্ব নেবার পর থেকে WFP সহ বিভিন্ন সংস্থা ও দাতা দেশসমূহের সহায়তায় অদ্যাবধি রোহিঙ্গাদের ভরণ-পোষণ এবং প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া তদারকী করছে। বিভিন্ন মহল থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যাটিকে জাতিসংঘ, ওআইসি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থায় উত্থাপনের দাবি জানালেও সরকার দ্বি-পক্ষীয়ভাবে সমাধানের লক্ষ্যে তৎপরতা চালান। তবে ইতোমধ্যে সৌদি আরব, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রগুলির পাশাপাশি চীন ও আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোকে বাংলাদেশ সরকার সীমান্ত ফাঁড়ি হামলা, রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা প্রভৃতির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করে মিয়ানমার সরকারের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য অনুরোধ জানায়।[৩৪] মূলত এটা ছিল সমস্যাটিকে আন্তর্জাতিকীকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ। অন্যদিকে ২৩ জানুয়ারি '৯২ বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদার বলেন-পালিয়ে আসা বর্মী রোহিঙ্গা মুসলমানদের নিরাপদে নিজদেশে ফিরে যাবার বিষয়ে রেঙ্গুনের সামরিক প্রশাসনের কাছ থেকে নিশ্চয়তা পেতে আগামী সপ্তাহে (২৮ জানুয়ারি '৯২) মিয়ানমার সরকারের সাথে প্রস্তাবিত আলোচনা ব্যর্থ হলে সরকার সমস্যাটি নিরসনকল্পে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ কামনা করবে। সংকট নিরসনের লক্ষ্যে ২৮ জানুয়ারি'৯২ মঙ্গলবার দু'দেশের সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য আলোচনায় আরাকান প্রদেশের সমস্ত মুসলমানের উপর অত্যাচার বন্ধ না হলে দু'দেশের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যেতে পারে বলে বার্মার প্রতি বাংলাদেশের হুমকি দেবার কথাও বিবিসি থেকে প্রচার করা হয়। সালাম তালুকদার আরাকান সীমান্ত এলাকায় রোহিঙ্গাদের নির্যাতনের নিন্দা করে বলেন, এটা নেহায়েতই বার্মার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে বর্মী সরকার যে দাবি করেছে তা অমূলক- এটা শুধু বাংলাদেশের সাথেই সংশ্লিষ্ট নয় বরং গোটা মুসলিমবিশ্বে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের দুর্ভোগের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আগামী সপ্তাহের আলোচনা ব্যর্থ হলে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার পুরো বর্ণনা না দিলেও তিনি উল্লেখ করেন যে, অতীতে সামরিক শাসকচক্রের হাতে জনগণ যখন নিগৃহীত হয়েছে তখনই মুক্তবিশ্বের বহু শক্তিশালী দেশই হস্তক্ষেপ করেছে। বাংলাদেশ সরকার এর শান্তিপূর্ণ সমাধান চায় কিন্তু যদি কোন সামরিক সংঘাত সৃষ্টি হয় তবে বাংলাদেশ তার নাগরিক ও নিজস্ব এলাকা সর্বোৎভাবে রক্ষার অধিকার রয়েছে বলে তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।[৩৫] ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার এ হুঁশিয়ারী উচ্চারণের মাধ্যমে মিয়ানমারকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলায় রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সরকার যে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে তারই প্রমাণ বহন করে।

পক্ষান্তরে ১৯৯২ সালের ২৮ জানুয়ারি আরাকানের মংডু টাউনশীপে ৩য় দফায় উচ্চ পর্যায়ের বাংলাদেশ-মিয়ানমার ফ্লাগ মিটিংয়ে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কথা হলে

www.pathagar.com

মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ অভিযোগ উত্থাপন করে যে, বাংলাদেশের ভেতরে রোহিঙ্গা বিদ্রোহীরা কোন না কোনভাবে আশ্রয় পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ দ্বারা এ অভিযোগের অসারতা প্রমাণ করা হয়। অতঃপর বৈঠকের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় 'নির্যাতনের মুখে আরাকানী রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অব্যাহতভাবে পালিয়ে আসা প্রসঙ্গে' বাংলাদেশের জোড়ালো বক্তব্যের জবাবে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করে যে, শরণার্থীসহ বৈঠকে আলোচিত যাবতীয় বিষয় রেঙ্গুন সরকারের নিকট বিবেচনার জন্য পৌঁছানো হবে; কেননা এসব বিষয়ে এখনই আমরা সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষমতা রাখি না।[৩৬] মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের এ মন্তব্য মূলত রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে কালক্ষেপণ করার আরেক কৌশল মাত্র।

মিয়ানমার সরকার ৩১ ডিসেম্বর'৯১, ৭ ও ২৮ জানুয়ারি '৯২ তিনদফা ফ্লাগ মিটিং এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ইয়াঙ্গুন সফরসহ বিভিন্নমুখী তৎপরতার প্রেক্ষিতে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের প্রমাণসহ তালিকা গ্রহণে সম্মতি জানায় এবং বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তিন দফায় ঢাকাস্থ মিয়ানমারের কূটনীতিকের মাধ্যমে ১০ হাজার ৬শ ১৬জন শরণার্থীর তালিকা মিয়ানমারের কাছে হস্তান্তর করে। অতঃপর এ ব্যাপারে মিয়ানমারের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বললেও তারা কোন উত্তর দেয়নি। ঢাকাস্থ মিয়ানমার দূতাবাসের একজন কূটনীতিককে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তরে ডেকে এনে উত্তর না দেবার কারণ এবং শরণার্থী আগমন বন্ধ না হবার কারণ জানতে চাইলে কূটনীতিক তাৎক্ষণিক কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বলেন, আমরা এ সব বিষয় সরকারকে অবগত করেছি; অচিরেই তাঁরা উত্তর দিবেন। কিন্তু ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মিয়ানমারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু জানা সম্ভব হয়নি।[৩৭] রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মিয়ানমারের আন্তরিকতার অভাব ও কালক্ষেপণ করার এটাও একটি ঘৃন্য দৃষ্টান্ত।

জাতীয় প্রেসক্লাবে ২০ ফেব্রুয়ারি '৯২ বাংলাদেশ বৈদেশিক সংবাদদাতা সমিতির সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান কালে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী উল্লেখ করেন যে, রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যা বাংলাদেশের কোন সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেনি, তবে তা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয় নিয়ে মিয়ানমারের সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা বাংলাদেশের নেই, কিন্তু সংকট নিরসনের জন্য সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এমন কি জাতিসংঘের কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া হলে তারাও সাড়া দিয়েছে।[৩৮] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতায় বুঝা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যাকে বাংলাদেশের জন্য সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ মনে করেননি; বরং উদ্বেগের কারণ হয়েছে মাত্র। কেননা তারাও প্রতিবেশী মুসলমান; তাদের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় স্বভাবতই বাংলাদেশ সরকারের উদ্বেগের কারণ হবেই। তাই বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধ এড়ালেও এ সমস্যা সমাধানে সার্বিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে।

www.pathagar.com

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রায়ন ও পুনর্বাসনসহ রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, NGO এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। এতে খুব বেশি অগ্রগতি না হবার কারণে বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রনালয় সরাসরি রোহিঙ্গা সমস্যা নিরসনে আন্তর্জাতিক সাহায্যের জন্য ২৭ ফেব্রুয়ারি '৯২ থেকে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন বিদেশী মিশনকে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে এবং অল্প দিনের মধ্যেই ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের ১৪টি এবং পশ্চিমা বিশ্বের ২০টি দেশের মিশন প্রধান ও পদস্থ কুটনীতিকদের নিকট কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলায় আশ্রিত হাজার হাজার রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর অবনতিশীল পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করেন। ফলে বিশ্বের অনেক দেশ রোহিঙ্গাদের সাময়িক আশ্রায়ন, খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসার যোগান দিতে সম্মত হয়।[৩৯] অর্থাৎ মার্চ '৯২ থেকেই UNHCH, WFP সহ বিভিন্ন দেশ, NGO এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা সমাধানে ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমারের বাংলাদেশস্থ রাষ্ট্রদূত U Soo Myint-কে তাঁর মন্ত্রণালয়ে ডেকে বার্মার রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধের জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। নীরব কুটনীতিক অর্থাৎ গোপন তৎপরতার মাধ্যমে সমাধানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার কারণে রোহিঙ্গা সমস্যাকে আন্তর্জাতিকীকরণের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ঢাকার বিভিন্ন সংস্থা ও দেশের রাষ্ট্রদূত এবং প্রতিনিধিসহ সার্কভুক্ত দেশ ও নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদেশগুলির সাথে এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করেন। ফলে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স মিয়ানমার সরকারকে মানবাধিকার লংঘনের জন্য উদ্বেগের কথা জানায় এবং জাতিসংঘ মহাসচিব বুট্রোস ঘালি রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট দেশগুলির প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন।[৪০] নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য দেশগুলির প্রতিনিধি ও জাতিসংঘের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবিরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেন।[৪১]

রোহিঙ্গারা জন্মসূত্রে মিয়ানমারের নাগরিক হলেও মিয়ানমার সরকার বরাবরই এটাকে অস্বীকৃতি জানায়। ইতোপূর্বে পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সাথে শরণার্থী সমস্যা সমাধানে বার্মা সরকার রোহিঙ্গাদেরকে তাদের নাগরিক হিসেবে ফিরে নিলেও তারা একথাকে অস্বীকৃতি দিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে যে, "ঐতিহাসিকভাবে কখনই কোন রোহিঙ্গা জাতি ছিল না। রোহিঙ্গা নামটি আরাকান রাজ্যের একদল বিদ্রোহীর দেওয়া এবং ১৭৮৪ সালের প্রথম এ্যাংলো-বার্মা যুদ্ধের পর প্রতিবেশী দেশের মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা বে-আইনীভাবে বার্মা; বিশেষ করে আরাকান রাজ্যে প্রবেশ করে।"[৪২] রেঙ্গুনের এ খবরকে নাকচ করে দিয়ে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞাপ্তিতে বলা হয় যে, বার্মা উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে এ ধরনের বক্তব্য সত্যের অপলাপ

www.pathagar.com

মাত্র। ইতোপূর্বে ১৯৭৮ সালেও আবার রোহিঙ্গা মুসলমানরা তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল এবং ৩ লক্ষ রোহিঙ্গা সে সময় বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। বার্মা সরকার তাদেরকে সেখানকার নাগরিক হিসেবেই ফেরত নিয়েছিল। এবারও (১৯৯২) মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক বহুসংখ্যক উদ্বাস্তুর নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট ও দলিল পত্র জোরপূর্বক কেড়ে নেয়া সত্বেও বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু এ সব দলিলপত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছে-যা যে কেউ দেখতে পারেন। এ সব খবরের লক্ষ্য হলো উদ্বাস্তুদের মর্যাদা সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করা।[৪৩]

বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ১৩ মার্চ '৯২ ভোরের কাগজের সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রদান কালে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন-প্রথমে আমরা মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছি এবং আমি রেঙ্গুনে গিয়ে কথা বলেছি; সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমরা আড়াই মাস অপেক্ষা করার পরও কোন আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতিসংঘের কাছে আবেদন জানিয়েছি এবং জাতিসংঘের মহাসচিব বুট্রোস ঘালি আমাদের গঠনমূলক অবস্থানের প্রশংসা করেছেন। আমরা চাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও জাতিসংঘ মিয়ানমার সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে উদ্বাস্তুদের ফিরে নিতে বাধ্য করুক। তিনি আরো বলেন, উত্তেজনা সৃষ্টি বা সংঘর্ষ কোনটাই সমস্যা সমাধানের পথ নয় বলে মিয়ানমারের সঙ্গে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে আমরা আন্তর্জাতিক নীতিমালা মেনে চলবো। আমরা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের সাহায্য চেয়েছি ও নিরাপত্তা পরিষদ কি পদক্ষেপ নেয় সেটা দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি এবং মিয়ানমারের সরকারের সঙ্গেও আলোচনার পথ খোলা রেখেছি। আমরা রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের তালিকা মিয়ানমারকে দিচ্ছি আশাকরি তারা তাদের নাগরিকদের ফিরে নিবে।[৪৪] পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশ সরকার সব সময়ই শান্তিপূর্ণ উপায়ে দ্বি-পক্ষীয় ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে প্রত্যাশী। কিন্তু মিয়ানমার সরকার বাংলাদেশের কোন পদক্ষেপকেই আন্তরিকতার সাথে গুরুত্ব না দেবার কারণে এ সমস্যাকে আন্তর্জাতিকীকরণে বাধ্য হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টার পাশাপাশি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া স্বয়ং আন্তর্জাতিক বিশ্ব তথা জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনার মাধ্যমে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা চালান। ২১ মার্চ, ১৯৯২ তিনি রোহিঙ্গা সমস্যাকে আন্তর্জাতিকীকরণের নিমিত্তে জাতিসংঘের মহাসচিব বুট্রোস ঘালির সঙ্গে নিউ ইয়র্কে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন "বাংলাদেশ একটি দরিদ্র জনবহুল দেশ। মিয়ানমারের নাগরিকদের দীর্ঘস্থায়ী আশ্রয় দানের মত অর্থনৈতিক অবস্থা বাংলাদেশের নেই। রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে মিয়ানমারের সাথে আমরা দ্বি-পক্ষীয়ভাবে সমাধান চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে এখন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দরকার।"[৪৫] বাংলাদেশের নিয়মতান্ত্রিক কুটনৈতিক পদক্ষেপের বর্ণনায় বুট্রোস ঘালি উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে আন্তরিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।[৪৬]

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সরকার শুধুমাত্র উদ্বাস্তুদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোকেই রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের পথ মনে করে না; বরং সরকার মনে যে, রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকারসহ ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে নিজস্ব বসতবাড়ীতে পুনর্বাসন করে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের নিশ্চয়তা প্রদানই রোহিঙ্গা সমস্যার একমাত্র পথ। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরত, তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও মানবিক সহানুভূতি-সহযোগিতা সম্পর্কে ৩ এপ্রিল'৯২ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান দৈনিক ইত্তেফাককে এক সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। তিনি বলেন "আমরা দ্বি-পক্ষীয় ভিত্তিতে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বিশ্বাসী। আমরা নীতিগতভাবে বিশ্বাস করি যে, টেবিলে বসলে অবশ্যই এ সংকট হতে দু'দেশই মুক্তি পাবে।" তবে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন যে, "শরণার্থীদের শুধুমাত্র ফেরতই নয়; তাদের জানমালের নিরাপত্তা, এবং নির্ভয়ে যাতে স্বদেশে ফিরে যেতে পারে সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে চাই।" তিনি বলেন "একটি দেশ হতে এভাবে কোন সংখ্যালঘু নাগরিককে জোর করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হলে এ অঞ্চলের কোন প্রদেশেই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা থাকবেনা এবং পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়ন তো দূরের কথা আঞ্চলিক ভারসাম্যও বিঘ্নিত হতে পারে।" সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সরকার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আশাবাদী।" অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকটের ফলশ্রুতিতে রোহিঙ্গাদের দেশ ত্যাগে বাধ্য করে সমস্যাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা হচ্ছে কি না জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন "এ প্রশ্নে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মন্তব্য করা উচিৎ নয়।" শরণার্থীদের ফেরত নেয়াসহ মিয়ানমার সরকারের বিভিন্ন চাপের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি বাংলাদেশ প্রয়োজনে সামরিক শক্তি দিয়ে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত অথবা এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কিংবা তাঁর কোন আলোচনা হয়েছে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, সামরিক শক্তির মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা অথবা পদক্ষেপ অবশ্যই থাকতে পারে। তবে সেটি কখনো স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কাজেই আমরা দ্বি-পক্ষীয় ভিত্তিতে সমাধানে বিশ্বাসী। তিনি আরো বলেন ১৯৭৮ সালে যে সব কারণে রোহিঙ্গাদের শরণার্থী জীবন বেছে নিতে হয়েছিল পরবর্তীতে তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে তখন মনে করা হয়নি। কাজেই এবার এ সকল শরণার্থী স্বদেশে ফেরত যাবার পর আর যাতে শরণার্থী হতে না হয় সে জন্য মিয়ানমার সরকারকে বিষয়টি স্থায়ী সমাধানের আহ্বান জানান হবে।[৪৭]

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২৯ মার্চ '৯২ এর নিউইয়র্ক সফরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও জাতিসংঘের মহাসচিব বুট্রোস ঘালির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ছাড়াও বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে রোহিঙ্গা সমস্যাটি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে উত্থাপনের চেষ্টা করেন। সে প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের মহাসচিবের বিশেষদূত, জাতিসংঘ আন্ডার সেক্রেটারি জান-কে এলিয়াসন মিয়ানমার উদ্বাস্তু সমস্যার

www.pathagar.com

সন্তোষজনক সমাধানের লক্ষ্যে (৩+৩) মোট ৬ দিন ধরে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সফর করেন। ঢাকায় এসে তিনি বলেন-মিয়ানমার থেকে অব্যাহতভাবে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু বাংলাদেশে প্রবেশের ঘটনায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উদ্বিগ্ন। সমস্যাটি খুবই দুঃখজনক; এটা এখন আর আঞ্চলিক কোন সমস্যা নয় বরং আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।[৪৮] মিয়ানমার সফরকালীন সময়ে তিনি মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী প্রধানের সঙ্গে আলাপকালে বলেছেন যে, যতদ্রুত সম্ভব বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বি-পক্ষীয় আলোচনার ভিত্তিতে উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নেয়া উচিৎ।[৪৯] মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানান যে, তাঁরা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে আগ্রহী আছেন, যদি তারা নাগরিকত্বের প্রমাণ দেখাতে পারে। তাঁরা আরো বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে মিয়ানমারের একটি প্রতিনিধি দল শিগ্‌গীরই বাংলাদেশ সফর করবে।[৫০]

বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে মিয়ানমার সফরকালীন প্রদত্ত আমন্ত্রণ ও জাতিসংঘের বিশেষদূত এলিয়াসনের সফরকালীন পরামর্শ ও চাপের প্রেক্ষিতে ২৩ এপ্রিল'৯২ মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উ অহন গিয়াও ১৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে শরণার্থী সমস্যা সমাধান কল্পে আলোচনার উদ্দেশ্যে ঢাকা আসেন।[৫১] ১৯৭৮-৭৯ সালের শরণার্থী প্রত্যাবাসনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়, যেমন-

প্রথমত, বর্ষার আগেই (জুলাই-আগস্ট'৯২) শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য দ্রুত বাংলাদেশ, মিয়ানমার এবং জাতিসংঘের মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন;

দ্বিতীয়ত, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্ব-স্ব জায়গায় পুনর্বাসনের জন্য মিয়ানমার এবং জাতিসংঘের মধ্যে সমঝোতা হওয়া;

তৃতীয়ত, ভবিষ্যতে যাতে একই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় সে জন্য মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ, জাতিসংঘ ও স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পর্যবেক্ষণ বা তদারকীর ব্যবস্থা করা।[৫২]

বাংলাদেশ-বার্মা দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার প্রথম পর্যায়েই মিয়ানমারে বসবাস করা বা নাগরিকত্বের সামান্যতম প্রমাণ থাকলেই রোহিঙ্গাদের স্বদেশে ফিরে নিতে সম্মত থাকলেও শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন পক্রিয়ায় জাতিসংঘকে সক্রিয়ভাবে জড়িত রাখার ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রস্তাবকে মিয়ানমার মেনে নিতে রাজি হয়নি। ছয় দিন ব্যাপী কয়েকদফা আলোচনার পর বাংলাদেশ-মিয়ানমার এ মর্মে ঐকমত্যে উপনীত হয় যে, বাংলাদেশে চলে আসা যে সকল রোহিঙ্গা শরণার্থী মিয়ানমারে বসবাস করত বলে প্রমাণ করতে পারবে তারেদকে নিজ বসতবাড়ীতেই প্রত্যাবাসন করা হবে। প্রত্যাবাসন কার্যক্রমের সাথে শরণার্থী বিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশনার (UNHCR) যুক্ত

www.pathagar.com

থাকবে এবং তারা ইতোমধ্যে এ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত বলে এর তদারকী-তত্ত্বাবধান করবে।[৫৩] কিন্তু রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত বিষয়টি একটি স্থায়ী চুক্তিতে নিয়ে আসার জন্য মিয়ানমারের উপর বাংলাদেশ যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করলেও বার্মাকে রাজি করাতে পারেনি। এ নিয়ে ২৭ এপ্রিল '৯২ সোমবার রাতে আলোচনা ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হলে বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত Joint Statement বা যৌথ ঘোষণাতেই রাজি হয়ে পরদিন ২৮ এপ্রিল'৯২ মঙ্গলবার উভয়দেশ উক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করে।[৫৪]

বাংলাদেশ-মিয়ানমার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় প্রয়োজনীয় প্রতিনিধি নিয়ে দু'বার দীর্ঘ সময় ধরে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হওয়াসহ ছয়দিনের এ দীর্ঘ সফর শেষে একটি Joint Statement প্রণীত হয়। এ Joint Statement এর শিরোনাম ছিল- "JOINT STATEMENT BY THE FOREIGN MINISTERS OF BANGLADESH AND MYANMAR ISSUED AT THE CONCLUSION OF THE OFFICIAL VISIT OF THE MYANMAR FOREIGN MINISTER TO BANGLADESH FROM 23-28 APRIL, 1992".[55]

Joint Statement বা যৌথঘোষণার মূল অংশে বলা হয়েছে -

a) The exodus of people from Myanmar to Bangladesh to stop immediately;

b) Repatriation of the refugees to their original place of residence in honour, safty and dignity;

c) Undertaking of certain confidence building measures such as with drawal / cutback of troops from border areas / for ward position and

d) Lasting solution of the problem in the sense that there should be on recurrence of such or similar problems in future.[56]

Joint Statement বা যৌথঘোষণার উপরোল্লেখিত অংশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মিয়ানমার সরকার সেদেশের জনগণকে বাংলাদেশে আসা বন্ধ করতে, আগত শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় ফিরে নিতে এবং প্রত্যাবাসন ব্যাপারে UNHCR এর সাহায্য নেবার ব্যাপারে উভয়দেশ নীতিগতভাবে একমত হয়। কিন্তু প্রত্যাবাসনের কাজটি প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বি-পক্ষীয় আলোচনার ভিত্তিতে হবার কথা উল্লেখ করা হয়।[৫৭] Joint Statement প্রণীত হবার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অতিথিভবন পদ্মায় আয়োজিত যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় বলেন, স্থায়ী দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার স্বার্থেই এ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।[৫৮] রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন ব্যাপারে এক প্রশ্নের জবাবে মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "রোহিঙ্গাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ ভিত্তিহীন; মূলত গুজবের উপর ভিত্তি করেই তারা দেশত্যাগ করেছে।"[৫৯] বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এমন বক্তব্য প্রদান চিন্তাশীল মহলকে ভাবিয়ে তোলে।

www.pathagar.com

১৯৯২ সালের ৭ মে বৃহস্পতবার মিয়ানমারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ ও বাংলাদেশে নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত উ মোয়েমিন্ত নিজ নিজ দেশের পক্ষে স্বাক্ষর করে কৌশলগত চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ২৮ এপ্রিল '৯২ দু'দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত Joint Statement বা যৌথঘোষণার আওতায় ১৫ মে '৯২ এর মধ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরুর পদক্ষেপ নেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হবার পর ছয় মাসের মধ্যে তা সম্পন্ন হবে এবং এ চুক্তিতে শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় UNHCR এর উপস্থিতি নিশ্চত করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, মিয়ানমার সরকার শরণার্থীদের ফিরে নেবার পর তাদের জন্য যুক্তি সঙ্গত পরিমান খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করবে। পরিস্থিতির কারণে প্রয়োজন হলে UNHCR খাদ্য ও আশ্রয় সামগ্রীর মত ত্রাণ সামগ্রী এবং কিছু পরিমান পুঁজিরও ব্যবস্থা করবে। পদ্ধতিগত যুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী ফিরে যাবার ১০টি ট্রানজিট শিবিরের সাথে সম্পর্ক রেখে মিয়ানমার ৫টি অভ্যর্থনা কেন্দ্র স্থাপন করবে। একদিন পরপর পাঁচ হাজার শরণার্থী মিয়ানমারে ফিরে যাবে এবং প্রত্যাবাসন উদ্ভূত কোন সমস্যা পারস্পারিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার জন্য কর্মকর্তাও নিয়োগ করার ব্যাপারে একমত হয়।[৬০] কিন্তু "আর্থিক সাহায্য এবং ত্রাণসামগ্রী যোগানো ছাড়া প্রত্যাবাসন পদ্ধতিতে UNHCR এর কোন ভূমিকা থাকবেনা" মিয়ানমার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এমন বক্তব্যে UNHCR এ Joint Statement এ সন্তোষ না হয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, শরণার্থীরা বাংলাদেশের সীমা পেরিয়ে মিয়ানমারে ঢুকে পড়লে তাদের প্রত্যাবাসন নিরাপদ হবে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখার কোন ব্যবস্থা এ চুক্তিতে নেই। এছাড়া মিয়ানমার থেকে প্রতিদিন শরণার্থীর ঢল আসছে, এমতাবস্থায় অনুকূল পরিবেশ না এলে তড়িঘড়ি করে এতো সংখ্যায় প্রত্যাবাসন কাজ অসম্ভব।[৬১] এদিকে ১৪ ও ১৭ মে '৯২ টেকনাফ সড়ক ও জনপদ বিভাগের রেষ্ট হাউসে দু'দেশের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পৃথক দু'টি বৈঠকে প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত তালিকা প্রণয়নের আলোচনা অনুষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশ তাতে পুরোপুরি সন্তোষ প্রকাশ করতে পারেনি।[৬২] তদুপরি প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় শরণার্থীদের বিরাট একটি অংশ অস্থির পরিবেশ হেতু স্বদেশে ফেরত যেতে অস্বীকার করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উচ্চ পর্যায়ের আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করার পরিবেশ তৈরির পদক্ষেপ নেয়া হয়।[৬৩] উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালের সমঝোতাস্মারক (Agreed Minutes) স্বাক্ষর পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব তোবারক হোসেন এটাকে চুক্তি বলে উল্লেখ করেন এবং বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাসমূহ একে চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রচার করে এবং ১৯৯২ সালের এ Joint Statement বা যৌথঘোষণাকেও চুক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা সর্বজন বিদিত যে, চুক্তি বলতে Treaty বা Agreement বুঝানো হয়ে থাকে যা আর্ন্তজাতিক আইনে উভয় পক্ষ অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ উভয় দেশ পালন করতে বাধ্য। কিন্তু সমঝোতা স্মারক (Agreed

www.pathagar.com

Minutes) কিংবা Joint Statement বা যৌথঘোষণাকে কোন পক্ষ নাও মানতে পারে। সে সুযোগকে কাজি লাগিয়ে মিয়ানমার সরকার স্মারক ও যৌথঘোষণার শর্তাবলি মানতে আন্তরিকতার পরিচয় দেয়নি।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে UNHCR এর যুক্ত থাকার কথা থাকলেও মিয়ানমার বাস্তবক্ষেত্রে তা মানতে অস্বীকৃতি জানানোর ফলে নির্ধারিত সময়ে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।[৬৪] দু'দেশের মধ্যস্থতা বৈঠকে সফল না হয়ে অবশেষে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা সমাধানকল্পে রেঙ্গুন যাবার প্রস্তাব দিলে কয়েক সপ্তাহ পর মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ এক কুটনৈতিক সূত্রে বলেন যে, "আমরা সত্যই দুঃখিত; আমাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবর্গ এ সময় দেশে থাকবেন না হেতু অন্য কোন পর্যায়ে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করলে আপত্তি নেই।" জবাবে বাংলাদেশও বলে দেয় যে, আমরাও অন্য পর্যায়ের প্রতিনিধিদল পাঠাতে প্রস্তুত নই।[৬৫] মূলত মিয়ানমারের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য মন্ত্রীদ্বয়ের সাথে রোহিঙ্গাদের কয়েকজন নেতাকে নিয়ে যাবার কথা ছিল; তাদের যাত্রা ঠেকানোর অপকৌশল হিসেবে মিয়ানমার এ প্রস্তাব দিয়েছে।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য Joint Statement বা যৌথঘোষণা সম্পাদিত হলেও অসহনীয় নির্যাতনের মুখে দেশ ছেড়ে আসা রোহিঙ্গারা সহজে স্বদেশে ফিরে যেতে আগ্রহী হয় না। তারা নিরাপত্তা চায়, প্রত্যাবাসন কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে জাতিসংঘের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে চায়। বাংলাদেশ সরকার এক্ষেত্রে আন্তরিকতার পরিচয় দিলেও মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের সম্মতি পাওয়া যায়নি। তাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান ১৯৯২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪৭তম অধিবেশনে ভাষণদানকালে ভয়াবহ ঘূর্নিঝড় বিধ্বস্ত বাংলাদেশে মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে ভারী বোঝা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, আগত শরণার্থীদের সম্মান-মর্যাদা, নিরাপত্তা ও স্বেচ্ছাভিত্তিক প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার প্রেক্ষাপটে ২ লক্ষ ৭০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে অবস্থান করছে। তিনি আরো বলেন "যেভাবে চরম নির্যাতন ও বল প্রয়োগে শরণার্থীরা মিয়ানমারে তাদের বসতবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছে তাতে ফেরত যেতে রাজি করানোটা এক দূরহ ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।" তার সফরে প্রত্যাবাসন কার্যক্রমে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধান নিশ্চিতকরণের তৎপরতার পাশাপাশি উভয় দেশ দ্বি-পক্ষীয়ভাবে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের ইতিবাচক সহযোগিতায় এগিয়ে যায়।[৬৬]

বাংলাদেশ-মিয়ানমার যথাক্রমে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মুহাম্মদ ওমার ফারুক এবং মিয়ানমার অভিবাসন ও জনশক্তি বিভাগের ডিরেকটর জেনারেল উ মং অং-এর নেতৃত্বে সরকারি পর্যায়ের ২২ আগস্ট'৯২ কক্সবাজারে ৮ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে আরাকানের পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখার জন্য মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা

www.pathagar.com

শরণার্থীদের আরাকানে সফরের অনুমতি প্রদান করার আশ্বাস প্রদান করে। বৈঠকে আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের চলাচলের উপর থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করা হবে এবং নামাজের সময় মুসল্লীদের মসজিদে মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে দেয়া হবে।" পয়লা সেপ্টেম্বর'৯২ থেকে এ ধরনের নির্দেশ বলবৎ হবার কথা উল্লেখ করা হয়। তবে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় UNHCR-কে জড়িত করার প্রশ্নে মিয়ানমার সরকার বিষয়টি বিবেচনাধীন সূচক মত প্রকাশ করেন।[৬৭]

অধিবেশন শেষে ২ অক্টোবর '৯২ দেশে ফিরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দ্রুত ও স্বেচ্ছায় মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক উৎসাহ উদ্দীপনার কথা উল্লেখ করে সাংবাদিকদের বলেন "বাংলাদেশে শরণার্থীদের ব্যাপক উপস্থিতিতে বিশ্বসম্প্রদায় উদ্বিগ্ন এবং তারা স্বল্প সময়ে শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দেখতে আগ্রহী।" তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ভাষণে ও জাতিসংঘের মহাসচিব বুট্রোস ঘালিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলাপকালে রোহিঙ্গা সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ফোরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সকলেই এর দ্রুত সমাধান চান এবং এ সমস্যা সমাধানে তারা সকল প্রকার সাহায্য দেবার আশ্বাস দিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন,"রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তাহীনতা ভীতি কাটাতে তাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার উপর ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং রোহিঙ্গাদের স্বার্থে মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর এ ধরনের একটি ভূমিকা পালনের দায়িত্ব জাতিসংঘের উপর বর্তাবে।" মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উ অহন গিয়াও এর সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, UNHCR এর ভূমিকার সঙ্গে ইয়াঙ্গুন একমত না হয়ে মি. গিয়াও ব্যক্তিগতভাবে UNDP-র ভূমিকার পক্ষে গিয়ে এটাকে প্রকল্পের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করার পক্ষপাতি।" তিনি বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাথে আলাপ করার পাশাপাশি প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের ভূমিকাকে মেনে নিতে মিয়ানমার সরকারকে রাজি করানোর জন্য চীনের উপ প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন।[৬৮]

প্রত্যাবাসন কার্যক্রমে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বাংলাদেশ সরকার বহুমুখী তৎপরতা অব্যাহত রাখলেও মিয়ানমার সরকার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে তা বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকে। রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবাসন তরান্বিত করার সকল প্রচেষ্টা জোরদার ও UNHCR-কে প্রত্যাবাসন কাজে জড়িত করার লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ মিয়ানমারের সাথে বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সে প্রেক্ষিতে ২৪ অক্টোবর '৯২ উভয় দেশের উচ্চকর্মকর্তা পর্যায়ের দশম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে মুহাম্মদ ওমার ফারুক ও মিয়ানমারের পক্ষে উ মং অং বৈঠকের নেতৃত্ব দেন। বৈঠকের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আরাকানে প্রত্যাবাসিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে বাংলাদেশের সাংবাদিকগণ পূর্ব অনুমতি ছাড়াই তথায় সফর

www.pathagar.com

করতে পারবেন।[৬৯] কিন্তু বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল মিয়ানমারকে ২৮ এপ্রিল '৯২ সম্পাদিত যৌথ ইশতেহারের কথা স্মরণ করে দিয়ে UNHCR-এর প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব এবং ইয়াঙ্গুনে নিযুক্ত বর্হিবিশ্বের রাষ্ট্রদূতদের আরাকান রাজ্য প্রদর্শনের সুযোগ দানের জন্য ব্যাপক কুটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করলেও তা বিবেচনা করা হচ্ছে বলে তারা এড়িয়ে যান। অতঃপর পরোক্ষভাবে হলেও প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় UNHCR এর প্রতিনিধিত্ব মেনে নেবার কৌশল হিসেবে বাংলাদেশ UNHCR-এ কর্মরত বাংলাদেশী কর্মকর্তাদের মধ্যে নির্বাচিত কয়েকজনকে অনুমোদিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বিকল্প কর্মকর্তার মিয়ানমার সফরকালে তাদের সফরসঙ্গী হিসেবে আরাকানে যাবার অনুমতি দেবার জন্য প্রস্তাব করে। মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ ১০ নভেম্বর '৯২ এর মধ্যে বিষয়টি জানাবেন বলে ঘোষণা করলেও ১৯ নভেম্বর '৯২ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন উত্তর পাওয়া যায় নি।[৭০]

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু প্রত্যাবাসন প্রশ্নে বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বাদশ বৈঠক ৩০ ডিসেম্বর '৯২ সকালে চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিংয়ে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মুহাম্মদ ওমার ফারুকের নেতৃত্বে ১০ জন কর্মকর্তা ও বার্মার ইমিগ্রেশন বিভাগের মহাপরিচালক উ মং অং এর নেতৃত্বে ৮ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন।[৭১] এ আলোচনায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন তরান্বিত করার প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের দেয়া তালিকা অনুয়াযী মিয়ানমার পক্ষের ছাড়পত্র আরো সহজতর করা, প্রতি দফায় প্রত্যাবাসনকালে লোক সংখ্যাবৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রত্যাবাসন, ছাড়পত্র তালিকায় ভুলত্রুটি লাঘব, প্রয়োজনবশত প্রত্যাবাসন মাঠ কর্মীদের ব্যবধান ঘুচানো প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও ঐকমত্যে পৌঁছে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে জাতিসংঘের অংশ গ্রহণের জন্য মিয়ানমার সরকার সম্মতিজ্ঞাপন না করলেও UNHCR উদ্বাস্তুদের ভরণ-পোষণ ও চিকিৎসার মূল দায়িত্ব যথারীতি পালন করতে থাকে। কিন্তু ২৩ ডিসেম্বর '৯২ সংস্থার হাইকমিশনার ড. সাদাকো ওগাতা এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি রোহিঙ্গাদেরকে জবরদস্তিমূলকভাবে আরাকানে ফেরত পাঠানোর অভিযোগ করলে পরের দিন যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ও জাতিসংঘ স্থায়ী প্রতিনিধি এ অভিযোগ সমর্থন করে এবং সে মূহুর্তে UNHCR রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় অসহযোগিতার পাশাপাশি বিরোধীতা করে; ফলে প্রত্যাবাসনসহ রোহিঙ্গা সমস্যার আশুসমাধান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব রিয়াজ রহমান এ অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন "বর্তমান প্রত্যাবাসন কার্যক্রম পুরোপুরি স্বেচ্ছামূলক, একজন রোহিঙ্গাকেও ইচ্ছার বিরূদ্ধে পাঠানো হয়নি, বরং যারা যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন কেবল তাদেরকেই মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।[৭২]

এ বিষয়কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ সরকারের শরণার্থী সংক্রান্ত ও সংশ্লিষ্ট দফতরসমূহ এবং বাংলাদেশে অবস্থিত UNHCR অফিসের কর্মকর্তাদের মধ্যকার আচরণ ও সম্পর্কের টানাপোড়নের এক পর্যায়ে পরিস্থিতি জটিল আকার করে। এ অবস্থা নিরসনের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ১৪ জানুয়ারি '৯৩ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এক বৈঠক

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হয়।[৭৩] অতঃপর তিনি UNHCR এর এশিয়া ব্যুরোর পরিচালক ওয়ার্নার ব্লাটার এর সাথেও কয়েক দফা বৈঠক করেন এবং বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথেও বৈঠক করেন। ফলে UNHCR ও বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের মধ্যকার সম্পর্ক পুনরায় সাভাবিক পর্যায়ে চলে আসে।[৭৪] এ ছাড়াও পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র সফর করে ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট বৈঠক ছাড়াও জাতিসংঘের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনাপূর্বক শরণার্থীদের মিয়ানমারে স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন প্রমাণ করেন।[৭৫] আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও UNHCR মিয়ানমার শরণার্থীদের নিরাপদ ও স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন নিশ্চিতকল্পে পরস্পরকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ১২ মে '৯৩ বুধবার UNHCR এর হাইকমিশনার ড. সাদাকো ওগাতা ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব রিয়াজ রহমান স্বাক্ষরিত এক সমঝোতা চুক্তি সম্পাদিত হয়। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী দেশে ফিরতে আগ্রহী শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের অবাধ প্রবেশ নিশ্চিত করে এবং তারা শিবিরে অবস্থানরত শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে তাদের স্বাধীন মতামতের বিষয়টির উপর নজর রাখার কথা উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়াও স্বাক্ষরিত স্মারকে নিম্নোক্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। প্রথমত, বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘ উভয়ই রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ দানে তৎপর থাকবে। দ্বিতীয়ত, দেশে ফিরতে ইচ্ছুক শরণার্থীদের সুষ্ঠু প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘ প্রয়োজনে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করবে। তৃতীয়ত, স্মারকের কার্যকারিতার মেয়াদ এক বছর হলে কোন পক্ষের তরফ থেকে নোটিশ না দেয়া হলেও বছর শেষে স্মারকটি আপনা আপনিই আরও এক বছরের জন্য নবায়িত হবে।[৭৬]

চারদিনের সরকারি সফর শেষে ১৫ মে'৯২ UNHCR এর সদর দপ্তর জেনেভায় যাত্রার আগে ড. সাদাকো ওগাতা ঢাকা শেরাটন হোটেলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শরণার্থীদের আশ্রয়, আহার-চিকিৎসা সর্বোপরি সার্বিক ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি বলেন "বিশ্বের অন্যান্য স্থানের বহু শরণার্থী অপেক্ষা রোহিঙ্গারা খুব ভালো অবস্থায় রয়েছে।" শরণার্থী সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সংশ্লিষ্টতার প্রশংসা করলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, শত অসুবিধা ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ মানবিক কারণে এ বিশাল শরণার্থীর বোঝা কাঁধে নিয়ে যথাসম্ভব আশ্রয়দান ও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করলেও অনির্দিষ্টকালের জন্য এত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়া বাংলাদেশের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের স্বদেশে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি জাতিসংঘের সহযোগিতা কামনা করেন।[৭৭]

বাংলাদেশ সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা ও যোগাযোগ এবং আন্তর্জাতিক চাপের প্রেক্ষিতে মিয়ানমার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লে. জেনারেল মিয়া থিন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন দ্রুততর

www.pathagar.com

করার লক্ষ্যে ৪ দিনের সফরে ১৯৯৩ সালের ২৪ মে ঢাকা পৌঁছেন। সফরে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, সীমান্তনীতি, দু'দেশের সম্পর্ক উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে ফলপ্রসু আলোচনা করেন।[৭৮] বিদায় লগ্নে তিনি সাংবাদিকদের জানান, আমাদের দু'সরকার (বাংলাদেশ-মিয়ানমার) রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন দ্রুততর সম্পন্ন করার যথা সাধ্য চেষ্টা করছে; তবে সময় সীমা বেঁধে দেয়া সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন "রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত প্রত্যাবাসন করা হবে এবং এটি হবে শরণার্থী সমস্যার স্থায়ী ও টেকসই সমাধান।" UNHCR সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মিয়ানমার সরকার জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাইকমিশনার ড. সাদাকো ওগাতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং পারস্পারিক সুবিধামত তারিখে তিনি সফরে যাবেন।[৭৯]

বাংলাদেশ সরকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জোর দাবি সত্বেও মিয়ানমার সরকার সে দেশের ভূখণ্ডে UNHCR এর উপস্থিতি এবং প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে দীর্ঘদিন যাবৎ বিরোধীতা করে আসে। অতঃপর ১৯৯৩ সালের মে মাসে মাইকেল প্রিষ্টলির নেতৃত্বে UNHCR এর একটি মিশনসহ জুলাই '৯৩ তে জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাইকমিশনার ড. সাদাকো ওগাতার মিয়ানমার সফরের পর তারা UNHCR এর উপস্থিতির ব্যাপারে সম্মতি জানায়। এ প্রেক্ষিতে ৬ নভেম্বর '৯৩ UNHCR ও মিয়ানমার সরকারের মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবার পর রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় UNHCR এর যুক্ত হবার ব্যাপারে দীর্ঘ জটিলতার অবসান হয়।[৮০] আরাকান প্রদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের জন্য UNHCR দু'বছর মেয়াদী এক কর্মসূচি প্রণয়ন করে এবং এ কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য মিয়ানমারের সীমান্ত শহর মংডুতে UNHCR অফিস স্থাপন করে; সেইসাথে বুচিদং ও রাথেদং সীমান্ত শহর দু'টিতে এ কর্মসূচি পরিচালিত হবার সিদ্ধান্ত নেয়।[৮১] রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের জন্য UNHCR দু'বছর মেয়াদী কর্মসূচিকে তিনটি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

প্রথমত, মিয়ানমার সরকার কর্তৃক স্থাপিত পাঁচটি অভ্যর্থনা কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাবাসিত শরণার্থীদের গ্রহণ করা;

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক শরণার্থীকে নিজ নিজ ভূখণ্ডে প্রতিস্থাপন করা;

তৃতীয়ত, প্রতিটি প্রতিস্থাপিত এলাকায় UNHCR এর উদ্যোগে Community Development এর বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালিত করা।[৮২]

এছাড়া প্রত্যাবাসনের পর প্রথম দু'মাস প্রতিটি প্রত্যাবাসিত পরিবারকে UNHCR ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির (WFP) সহযোগিতায় খাদ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা এবং প্রত্যাবাসিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি ফিরে পাওয়া এবং তাদের পরিচয় পত্র দেওয়ার বিষয়টিও তদারকী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৮৩] এ Joint Statement কে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম মোস্তাফিজুর

www.pathagar.com

রহমান বলেন UNHCR এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে মিয়ানমার সঠিক কাজটিই করেছে যা আমরা চেয়েছিলাম। এ চুক্তি স্বাক্ষর শুধু শরণার্থী সমস্যা সমাধানেই সাহায্য করবেনা বরং দু'দেশের সম্পর্ক উন্নয়নেও সহায়তা করবে।[৮৪]

Joint Statement স্বাক্ষরের মাধ্যমে মিয়ানমার সরকার তাদের নাগরিকদের প্রত্যাবাসনে আগ্রহী মনোভাব দেখায়। ফলে শরণার্থী ও সংশ্লিষ্ট দেশীয় আন্তর্জাতিক মিশনে আশান্বিত পরিবেশের সূচনা করে। কিন্তু তারা আরাকানের স্থানীয় ও প্রত্যাবাসিত রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন অব্যাহত রাখে এবং পত্র-পত্রিকাসমূহে পুনরায় রোহিঙ্গা নির্যাতনের খবর প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন- ২০ ডিসেম্বর'৯৩ থেকে মাত্র এক সপ্তাহে ২০/২৫ জন আলিম-ইমামের চুলদাঁড়ি মুড়িয়ে দেবার খবর ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত মংডু শহরের কুয়ারবিল জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা জিয়াউল হাকিম (৭০) কে ধরে নিয়ে গিয়ে মাথা ও গোফ দাড়ি উপড়িয়ে অমানবিক নির্যাতন করার খবর ছাড়াও বলিবাজার মিয়াজানপুর দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসার মোহতামীম মুফতি মওলানা সোলতান (৯০) মাওলানা সিরাজুল হক (৬০) মাওলানা জাফর আলী (৬৫) সহ অনেকের উপর নির্যাতনের বিভৎস খবর প্রকাশিত হয়।[৮৫] এক দিকে মিয়ানমার সরকারের নির্যাতন অন্যদিকে বাংলাদেশের আশ্রয় শিবিরে জীবন চালানোর মত রেশন ও মাথা গৌজার ঠাঁইসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কারণে আরাকানে ফিরে যাওয়া রোহিঙ্গারা পুনরায় সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশ আসতে শুরু করে। রোহিঙ্গাদের এ ক্রমবর্দ্ধমান অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বাংলাদেশ রাইফেলস এর জওয়ানরা বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে ব্যাপক টহল ব্যবস্থা জোরদার করে। সেইসাথে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে মিয়ানমার বিশেষত আরাকান রাজ্যে রোহিঙ্গাদের জন্য কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৮৬]

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন সূত্র মতে, বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের উভয় দিকেই জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাইকমিশন প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার তদারকির দায়িত্ব নেবার পর অধিকসংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থী দেশে ফিরে যেতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। জুলাই'৯৪ মিয়ানমার সীমান্তে UNHCR ক্যাম্প স্থাপনের পর শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দ্রুতগতি লাভ করলেও পরবর্তীতে মিয়ানমার সরকার নানা অজুহাতে এ প্রক্রিয়াকে বিলম্ব করে। সেপ্টম্বর'৯৪ প্লেগের অজুহাতে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বন্ধ রাখলে পরবর্তীতে জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাই কমিশনের প্রচেষ্টায় এ প্রক্রিয়া আবার শুরু হলেও মিয়ানমার সরকার ছাড়পত্র দানে গড়িমসি শুরু করায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরত যাওয়াকে আরো বিলম্বিত করে তোলে। জানুয়ারি'৯৫ তে ৬০ হাজারের বেশি শরণার্থী মিয়ানমার সরকারের নিকট থেকে ছাড়পত্র পাবার অপেক্ষায় থাকায় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ধীরগতি হয়ে পড়ে।[৮৭] নিম্নে সারণির মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার গতি নির্ণয় করা হল।

www.pathagar.com

সারণি-৫
মাসিক ভিত্তিতে প্রত্যাবাসিত শরণার্থীর তালিকা[৮৮]

ক্রমিক নং	মাস/বৎসর	পরিবার	লোক সংখ্যা	পরিবার সংখ্যা	মোট লোক সংখ্যা	মন্তব্য
১.	সেপ্টেম্বর'৯২	১১	৪৯	১১	৪৯	
২.	অক্টোবর'৯২	৩৫	১৬৭	৪৬	২১৬	
৩.	নভেম্বর'৯২	২২৬	৯৩২	২৭২	১,১৪৮	
৪.	ডিসেম্বর'৯২	১,০৬৩	৪,৮১৪	১,৩৩৫	৫,৯৬২	
৫.	জানুয়ারি'৯৩	২,৬৩০	১২,১১৬	৩,৯৬৫	১৮,০৭৮	
৬.	ফেব্রুয়ারি'৯৩	৮০৩	৩,৬৪৭	৪,৭৬৮	২১,৭২৫	
৭.	মার্চ'৯৩	১৯৬	৭৫০	৪,৯৬৪	২২,৪৭৫	
৮.	এপ্রিল'৯৩	৮৯	৪১৫	৫,০৫৩	২২,৮৯০	
৯.	মে'৯৩	৭১৫	৩,০৪৫	৫,৭৬৮	২৫,৯৩৫	
১০.	জুন'৯৩	৪৫৩	১,৯২৯	৬,২২১	২৭,৮৬৪	
১১.	জুলাই'৯৩	৮২৫	৩,৬১১	৭,০৪৬	৩১,৪৭৫	
১২.	আগস্ট'৯৩	৭০৫	৩,০৮১	৭,৭৫১	৩৪,৫৫৬	
১৩.	সেপ্টেম্বর'৯৩	৮৮৫	৩,৯৩০	৮,৬৩৬	৩৮,৪৮৬	
১৪.	অক্টোবর'৯৩	১,২৭৪	৫,৭৯৮	৯,৯১০	৪৪,২৮৪	
১৫.	নভেম্বর'৯৩	১,৪০৩	৬,২৩২	১১,৩১৩	৫০,৫১৬	
১৬.	ডিসেম্বর'৯৩	৩৬২	১,৫৭৫	১১,৬৭৫	৫২,০৯১	
১৭.	জানুয়ারি'৯৪	১১৯	৫১৫	১১,৭৯৪	৫২,৬০৬	
১৮.	ফেব্রুয়ারি'৯৪	১০৩	৪১৮	১১,৮৯৭	৫৩,০২৪	
১৯.	মার্চ'৯৪	১০২	৪৫৯	১১,৯৯৯	৫৩,৪৮৩	
২০.	এপ্রিল'৯৪	২৯৮	১,৩৫৭	১২,২৯৭	৫৪,৮৪০	
২১.	মে'৯৪	১৯	৮০	১২,৩১৬	৫৪,৯২০	
২২.	জুন'৯৪	১০৬	৪৪৪	১২,৪২২	৫৫,৩৬৪	
২৩.	জুলাই'৯৪	৭৬০	৩,৫৯২	১৩,১৮২	৫৮,৯৫৬	
২৪.	আগস্ট'৯৪	১,০৮৮	৫,৪০০	১৪,২৭০	৬৪,৩৫৬	
২৫.	সেপ্টেম্বর'৯৪	২,৭০৬	১৩,৯২৭	১৬,৯৭৬	৭৮,২৮৩	
২৬.	অক্টোবর'৯৪	২,৩৭৯	১২,১৪৩	১৯,৩৫৫	৯০,৪২৬	
২৭.	নভেম্বর'৯৪	৪,৮০৭	২৪,৯১৩	২৪,১৬২	১,১৫,৩৩৯	
২৮.	ডিসেম্বর'৯৪	৩,৭৭৬	১৯,৫০৫	২৭,৯৩৮	১,৩৪,৮৪৪	
২৯.	জানুয়ারি'৯৫	৩,৫২৭	১৭,৯৬৫	৩১,৪৬৫	১,৫২,৮০৯	
৩০.	ফেব্রুয়ারি'৯৫	২,৭৯৩	১৪,৩৯৯	৩৪,২৫৮	১,৬৭,২০৮	
৩১.	মার্চ'৯৫	৩,০৭৪	১৬,১৫৬	৩৭,৩৩২	১,৮৩,৩৬৪	
৩২.	এপ্রিল'৯৫	১,৪৪৬	৭,৩৪৯	৩৮,৭৭৮	১,৯০,৭১৩	
৩৩.	মে'৯৫	২০৮	১,১২৪	৩৮,৯৮৬	১,৯১,৮৩৭	

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	মাস/বৎসর	পরিবার	লোক সংখ্যা	পরিবার সংখ্যা	মোট লোক সংখ্যা	মন্তব্য
৩৪.	জুন'৯৫	১১৯	৬৫৯	৩৯,১০৫	১,৯২,৪৯৬	
৩৫.	জুলাই'৯৫	২৭	১২৯	৩৯,১৩২	১,৯২,৬২৫	
৩৬.	আগস্ট'৯৫	৩২	১৮৫	৩৯,১৬৪	১,৯২,৮১০	
৩৭.	সেপ্টেম্বর'৯৫	৮২	৪১২	৩৯,২৪৬	১,৯৩,২২২	
৩৮.	অক্টোবর'৯৫	১৭৩	৯৩২	৩৯,৪১৯	১,৯৪,১৫৪	
৩৯.	নভেম্বর'৯৫	১৬৬	৮৮২	৩৯,৫৮৫	১,৯৫,০৩৬	
৪০.	ডিসেম্বর'৯৫	২৩৪	১,৩১২	৩৯,৮১৯	১,৯৬,৩৪৮	
৪১.	জানুয়ারি'৯৬	৮৮	৪৮৫	৩৯,৯০৭	১,৯৬,৮৩৩	
৪২.	ফেব্রুয়ারি'৯৬	২৯	১৫২	৩৯,৯৩৬	১,৯৬,৯৮৫	
৪৩.	মার্চ'৯৬	১৫	৭৬	৩৯,৯৫১	১,৯৭,০৬১	
৪৪.	এপ্রিল'৯৬	৬৯	৩১৮	৪০,০২০	১,৯৭,৩৭৯	
৪৫.	মে'৯৬	৪৩৮	২,৩২৮	৪০,৪৫৮	১,৯৯,৭০৭	
৪৬.	জুন'৯৬	৩৮৮	১,৯৮২	৪০,৮৪৬	২,০১,৬৮৯	
৪৭.	জুলাই'৯৬	২৩৫	১,৩০০	৪১,০৮১	২,০২,৯৮৯	
৪৮.	আগস্ট'৯৬	২২৬	১,৩০৬	৪১,৩০৭	২,০৪,২৯৫	
৪৯.	সেপ্টেম্বর'৯৬	২৬৪	১,৪৯৮	৪১,৫৭১	২,০৫,৭৯৩	
৫০.	অক্টোবর'৯৬	১,০৫২	৫,৬৬৪	৪২,৬২৩	২,১১,৪৫৭	
৫১.	নভেম্বর'৯৬	৮৬৩	৪,৬৯৩	৪৩,৪৮৬	২,১৬,১৫০	
৫২.	ডিসেম্বর'৯৬	৬০১	৩,২৪৩	৪৪,০৮৭	২,১৯,৩৯৩	
৫৩.	জানুয়ারি'৯৭	৬৬৫	৩,৪৮৫	৪৪,৭৫২	২,২২,৮৭৮	
৫৪.	ফেব্রুয়ারি'৯৭	৬৪৪	৩,২৫৭	৪৫,৩৯৬	২,২৬,১৩৫	
৫৫.	মার্চ'৯৭	৪৮৯	২,৬৮৪	৪৫,৮৮৫	২,২৮,৮১৯	
৫৬.	এপ্রিল'৯৭	৪২	২৪৬	৪৫,৯২৭	২,২৯,০৬৫	
৫৭.	মে'৯৭	৭৫	৪০১	৪৬,০০২	২,২৯,৪৬৬	
৫৮.	জুন'৯৭	৮	৪৬	৪৬,০১০	২,২৯,৫১২	
৫৯.	জুলাই'৯৭	১১	৬০	৪৬,০২১	২,২৯,৫৭২	
৬০.	আগস্ট'৯৭	৪	১৯	৪৬,০২৫	২,২৯,৫৯১	
৬১.	সেপ্টেম্বর'৯৭	৫	২৯	৪৬,০৩০	২,২৯,৬২০	
৬২.	অক্টোবর'৯৭	৬	৩৪	৪৬,০৩৬	২,২৯,৬৫৪	
৬৩.	নভেম্বর'৯৭	৯	৫৭	৪৬,০৪৫	২,২৯,৭১১	
৬৪.	ডিসেম্বর'৯৭	৯	৫৫	৪৬,০৫৪	২,২৯,৭৬৬	

প্রতি একদিন পরপর ৫ হাজার শরণার্থী স্বদেশে প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে ৬ মাসের মধ্যে প্রত্যাবাসন কাজ সমাপ্ত করার কথা থাকলেও বিভিন্ন কারণে জুন ২০০০ পর্যন্ত তা শেষ হয়নি। সারণিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রত্যাবাসন কর্মসূচি শুরু হলেও ঐ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ৫,৯৬২ জন শরণার্থী

www.pathagar.com

স্বদেশে ফিরে গেছে। ১৯৯৩ ও ৯৪ সালে প্রত্যাবাসিত হয়েছে যথাক্রমে ৪৬,১২৯ ও ৮২,৭৫৩ জন। অনুরূপভাবে ১৯৯৫, ৯৬ ও ৯৭ সালে যথাক্রমে ৬১,৫০৪; ২৩,০৮৫; ১০,৩৭৩ জন হারে প্রথম থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত মোট ২,২৯,৭৬৬ জন শরণার্থী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে।

সারণিতে আরও লক্ষণীয় যে, ১৯৯৪ সালের শেষ নাগাদ প্রত্যাবাসিত শরণার্থী সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮'শ ৪৪ জন ও ১৯৯৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩৮ জন রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুকে স্বদেশে প্রেরণ করা হলেও বাংলাদেশে অবস্থানরত স্বদেশে ফেরার জন্য মিয়ানমার সরকারের অনুমতির অপেক্ষায় ৫৭ হাজার ৪৯ জন শরণার্থী রয়েছে। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর নাগাদ ২ লক্ষ ২২ হাজার ৮ শ ৭৮ জন শরণার্থী প্রত্যাবাসন করে এবং ৮ জানুয়ারি'৯৭ বাংলাদেশ-মিয়ানমার ২১ তম উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অবশিষ্ট ৩৩ হাজার ৭'শ ৯ জনের প্রত্যাবাসন কাজ ৩১ মার্চ '৯৭ এর মধ্যে শেষ করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু জুলাই '৯৭ এর মধ্যে ২ লাখ ২৯ হাজার ৪ শ ৬৬ জন শরণার্থী স্বদেশে ফিরে গেলেও দীর্ঘদিন যাবৎ প্রত্যাবাসনে বন্ধাত্ব দেখা দেয়।[৮৯] মিয়ানমার আসিয়ানের সদস্যভুক্তির ফলে সংশ্লিষ্ট সকলেই আশাবাদী ছিল যে মিয়ানমার তার সীমিত গণ্ডি থেকে বেড়িয়ে এসে মুক্তবিশ্বে পদার্পনের সুযোগ পেয়ে মুক্ত বিশ্বের মুক্তবাজারে প্রবেশ করে এসব দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক কাজে জড়িত হয়ে পড়বে; যা সে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন সূচিত করবে এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটিয়ে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করবে। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি।[৯০]

এদিকে ১৯৯৭ সালের ২২ জুলাই পর্যন্ত ৪৯৫ ব্যাচে ৪৮ হাজার ২টি পরিবারের ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৪শ ৬৬ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীর প্রত্যাবাসন সম্পন্ন হলেও মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের সাথে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার অজুহাতে একতরফাভাবে ২২ জুলাই'৯৭ শরণার্থী প্রত্যাবাসন বন্ধ করে দেয়।[৯১] বাংলাদেশ সরকার শরণার্থী প্রত্যাবাসন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্নমুখী তৎপরতা বজায় রাখলেও মিয়ানমারের পক্ষ থেকে কোন ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। অতঃপর ১৯৯৮ সালের ১২ নভেম্বর ইয়াংগুনে অনুষ্ঠিত দু'দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের এক বৈঠকে রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা হয় এবং উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশ সরকার শরণার্থী প্রত্যাবাসনে চাপ প্রয়োগ করলেও মিয়ানমার সরকার প্রত্যাবাসনে ধীরগতি বহাল রাখে। বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ মিয়ানমারের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী উ অহন গিয়াও কে শুকনো মৌসুমের (এপ্রিল-মে'৯৯) মধ্যেই শরণার্থী প্রত্যাবাসন সমাপ্ত করতে অনুরোধ করেন। জবাবে তিনি বলেন-মিয়ানমার ইতোমধ্যেই ২ লাখের বেশি শরণার্থী গ্রহণ করেছে; এখন যা অবশিষ্ট রয়েছে তা নিয়ে উভয় দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়ার অবকাশ নেই।[৯২] মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের এমন দায়িত্বহীন মন্তব্যে বাংলাদেশের কুটনৈতিক মহলে শরণার্থী প্রত্যাবাসনে ব্যাপক সংশয় দেখা দেয়।

www.pathagar.com

দীর্ঘ ১৬ মাস ৩ দিন পর মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের শর্ত মোতাবেক ১৯৯৮ সালের ২৫ নভেম্বর থেকে প্রতি সপ্তাহে ১টি করে ব্যাচে ৫০ জন হারে শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও ২২ এপ্রিল ২০০০ পর্যন্ত মাত্র ৪০০ জন শরণার্থী স্বদেশে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়েছে।[৯৩] শরণার্থী প্রত্যাবাসন দ্রুততর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মিয়ানমার সরকারের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখলেও কোন আশাব্যঞ্জক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি।

শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থানরত প্রায় ২১ হাজারের মধ্যে ৭ হাজার শরণার্থী ছাড়পত্র প্রাপ্ত হলেও অন্য ১৪ হাজারের ব্যাপারে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ নিরব ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তাদেরকে মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে আসছে। ২০০০ সালের ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের সাত সদস্যের এক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল মিয়ানমারের রাজধানী ইয়াংগুন সফরে গিয়ে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের সাথে দু'দিন ব্যাপী আলোচনা করলেও তারা অবশিষ্ট ১৪ হাজার শরণার্থীকে তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেনি। অতঃপর বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের বারংবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিষয়টি তাদের দেশের সরকারকে জানাবে বলে আশ্বাস প্রদান করে। কিন্তু তাদের এ আচরণ অবশিষ্ট ১৪ হাজার শরণার্থীকে ফেরত না নেবারই স্পষ্ট নিদর্শন বহন করে।

এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার আর্থিক সহায়তায় UNHCR রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভরণ-পোষণ ও প্রত্যাবাসন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলেও বর্তমানে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নেবার উপক্রম হয়[৯৪] এবং ইতোমধ্যেই UNHCR তার কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনে। কার্যক্রম গুটিয়ে নেবার পিছনে UNHCR দু'টি কারণ উল্লেখ করে;

প্রথমত, বাংলাদেশ সরকারের নির্লিপ্ততা, অর্থাৎ UNHCR এর কর্মকর্তাদের অভিযোগ যে, রোহিঙ্গাদেরকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বের সাথে নিচ্ছেন না। এমন কি দীর্ঘদিন যাবত এব্যাপারে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে কোন ফলপ্রসু আলোচনাও হয়নি।[৯৫]

দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব অর্থাৎ শরণার্থী প্রত্যাবাসন হতাশা ব্যঞ্জক ধীরগতি হবার কারণে দাতাদেশগুলো অর্থনৈতিক সাহায্য দানে আগ্রহী হচ্ছে না। তারা এখন পূর্ব তিমুর, কসভো এবং হাইতির প্রতি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।[৯৬]

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ২০০০ সালে ২১ হাজার শরণার্থীর জন্য ২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার বাজেট অনুমোদন করলেও UNHCR কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, পরবর্তী বছরে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বাজেট অনুমোদন করা কষ্টসাধ্য হবে।[৯৭] প্রত্যাবাসনের এমন পরিস্থিতিতে UNHCR অবশিষ্ট শরণার্থীদেরকে বাংলাদেশে পুনর্বাসনের জন্য অভিমত ব্যক্ত করেছে। এক্ষেত্রে ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে মৌখিক এবং এপ্রিল মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে তারা অবশিষ্ট রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশে পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তাব পেশ

www.pathagar.com

করে। বাংলাদেশ সরকার বরাবরই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।[৯৮] কিন্তু UNHCR বাংলাদেশ সরকারের এ সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করতে পারেনি।

UNHCR এর কার্যক্রম গুটিয়ে নেয়া প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধতন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে UNHCR রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কার্যক্রম গুটিয়ে নেবার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে এখনো কিছু অবহিত করেনি। প্রত্যাবাসনে হতাশা ব্যঞ্জক তৎপরতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমার সরকারের সাথে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ এক্ষেত্রে উল্লেখ করেন যে, রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবাসনে কোনরূপ শক্তি প্রয়োগ করা হবে না, তবে তাদের সকলকেই স্বদেশে ফিরে যেতে হবে।[৯৯] রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে পুনর্বাসন করার প্রসঙ্গে মন্ত্রণালয়ের উক্ত কর্মকর্তা জানান যে, রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক; তাদেরকে মিয়ানমারেই ফিরে যেতে হবে, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পুনর্বাসনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।[১০০]

মন্থর গতিতে হলেও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া চলমান ছিল ১৯৯২ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত। এরপরে প্রকারান্তরে এ গতি থেমেই গিয়েছে। ২০০৩ সালে মোট তিন হাজার একশো শরণার্থী মিয়ানমারে পাঠনো সম্ভব হয়। ২০০৪ সালে এ সংখ্যা কমে দাঁড়ায় নয়শত দশ জনে। ২০০৫ সালে এসে মাত্র ৯২জনকে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করা হয়।[১০১] এরপরে একেবারে বন্ধাত্ব নেমে আসে। ২০০৫ সাল থেকে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে অনেক আলোচনা পর্যালোচনা হলেও তা খাতা কলমেই থেকে গেছে। ২০০৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ-মিয়ানমার পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে আবারো নিবন্ধিত ও মিয়ানমার কর্তৃক বাছাইকৃত ৯ হাজার শরণার্থীকে প্রত্যাবাসনে মিয়ানমার সম্মত হয়।[১০২] মূলত মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ এ ৯ হাজার শরণার্থীকে বাছাই করেছিল প্রায় ১০ বছর আগে। দীর্ঘ সময়ে তাঁরা স্বদেশে ফিরে যেতে পারেনি। এ মিটিংয়ে ঐ সব শরণার্থীদেরকেই ফেরত নিতে সম্মত হয় মিয়ানমার।[১০৩] কিন্তু উক্ত সময়ে বাছাই করা ৯ হাজার শরণার্থী ফেরত নেয়ার ঘোষণার মধ্যেও অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিগত দশ বছরের তাদের অনেকেই বিয়ে-শাদী করেছে, অনেক সন্তানের জন্ম হয়েছে। তাদেরকে এ গণনার মধ্যেই রাখা হয়নি। তাহলে সেইসব স্ত্রী-সন্তানদের কি হবে? তাদেরকে রেখে কি প্রত্যাবাসন সম্ভব? এ ঘোষণাও যে শুভংকরের ফাঁকি, তা আর বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না বলে বিশ্লেষকগণ মনে করছেন।

সময় যতো গড়াতে থাকে প্রত্যাবাসনের বিষয়ে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিশ্লেষক মহলের ধারণাই সত্যে পরিণত হওয়ার দিতে এগিয়ে যায়। এ নিয়ে দেশী-বিদেশী গণমাধ্যমে উঠে আসে শরণার্থী প্রত্যাবাসন বিষয়ে নানা অভিযোগ। বাংলাদেশ সরকারের খাদ্যমন্ত্রী এ সব অভিযোগ নাকোচ করে দেন।[১০৪] অভিযোগ নাকোচ করলেও বাস্তবতা হচ্ছে প্রত্যাবাসনের জন্য বাছাই করা শরণার্থীদের

www.pathagar.com

মিয়ানমার তো গ্রহণ করেই নি বরং প্রতিনিয়ত বহুমুখি নির্যাতনের মাধ্যমে মিয়ানমার থেকে আরো রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে।[১০৫] ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসের রির্পোট অনুয়ায়ী প্রায় সত্তর হাজার রোহিঙ্গা নতুনভাবে উখিয়ার কুতুপালং ও টেকনাফের লেদা ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় আশ্রয় নেয়।[১০৬] মিয়ানমারের সেনাসদস্যরা আগত রোহিঙ্গাদের বসতবাড়ি ও আবাদীজমি দখল করে নিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এমতবাস্থায় নতুন করে শরণার্থী প্রত্যাবাসন আদৌ কি সম্ভব? শরণার্থীসহ বিশ্লেষক মহলের কাছে এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হতেই পারে।

প্রত্যাবাসনের জন্য বাছাইকৃত ৯ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেও পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করা যায়নি। মিডিয়াকর্মীগণ বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদেরকে এ বিষয়ে প্রায়শই প্রশ্ন করে থাকেন। চট্টগ্রামে একটি অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, মিয়ানমারের আসন্ন নির্বাচনের পরে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে বাছাইকৃত ৯ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠনো হবে।[১০৭] মূলত মিয়ামারে রাজনৈতিক অস্থিরতার অভিযোগ উত্থাপন করে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে বলেও অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

এদিকে ২০১১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে আরো নতুন করে প্রায় লক্ষাধিক রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ ঘটে। সব মিলিয়ে শরণার্থী ক্যাম্পের বাইরে প্রায় চার লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বিচ্ছিন্নভাবে বসতি গড়ে তুলেছে। এ সব রোহিঙ্গাকে শরণার্থীর মর্যাদা দেয়ার জন্য দাতা দেশ ও সংস্থার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে চাপ প্রয়োগ করে।[১০৮] এর অংশ হিসেবে ককসবাজারের টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় এমজিডি'র মোড়কে বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বরাবরে চিঠিও ইস্যু করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়, শরণার্থী শিবিরের বাইরে থাকা মিয়ানমারের এসব নাগরিকেরাও শরণার্থীর মতো একই সুবিধা নিয়ে বাংলাদেশে অবস্থান করুক। বিষয়টি নিয়ে তারা বেশ স্পষ্টভাবে মতামত প্রকাশের পাশাপাশি বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য মাননীয় প্রধানন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এর নির্বাহী পরিচালক এ্যান্টনি লেক এবং জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক কমিশনের (ইউএনএইচসিআর) এর হাইকমিশনার অ্যানন্তোনিও গুতেরেস চিঠিতে এ প্রকল্প গ্রহণের অনুরোধ জানান। চিঠিতে তারা উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া দুই উপজেলা ককসবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে ইউএনজেআই প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এমজিডির প্রতি আপনার অঙ্গিকারের ধারাবাহিকতা রাখবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।[১০৯]

উল্লেখ্য, রোহিঙ্গাদের জন্য বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে দুই বছর আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রায় ৩০ মিলিয়ন ইউরোর প্রস্তাব দেয়া হয়। এতে সাড়া না পেয়ে গত বছর অর্থাৎ ২০১০ সালের মাঝামাঝি একই ধরনের প্রস্তাব দেয়

www.pathagar.com

জাতিসংঘ। অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ জাতিসংঘের চারটি সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগে এ প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়।[১১০] কিন্তু গত ২০১০ সালের ২৭ অক্টোবর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনির সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে জানানো হয়, সরকার এ মুহূর্তে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারকে রাজি করানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে প্রায় ২৮ হাজার রোহিঙ্গার প্রত্যাবাসনের জন্য মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে ৯ হাজার রোহিঙ্গাকে দেশে ফিরিয়ে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও গত এক বছরে তা বাস্তবায়ন করেনি মিয়ানমার। তাই কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করলে মিয়ানামারের নাগরিকেরা এদেশে আসতে আরো বেশি উৎসাহিত হবে, যা সরকার কোনভাবেই চাইতে পারে না।[১১১] ফলে ঐ প্রস্তাবনার আর কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

মিয়ানমারের সাথে বিভিন্ন উপায়ে আলাপ-আলোচনার পরও প্রতিশ্রুত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফেরত নিতে কালক্ষেপণ করে যাচ্ছে। এমন কি ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মিয়ানমার সফরেও শুধু আশ্বাস এবং আলোচনার বাণী শুনিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যায় মিয়ানমার।[১১২] অথচ প্রধানমন্ত্রী তাঁর দুই দিনের মিয়ানমার সফরে সে দেশের প্রেসিডেন্ট থান শোয়ে'র সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসনের বিষয়টি জোরালোভাবে উপস্থাপন করেন। সেখানে থান শোয়ে শুধু ইতিবাচক আশ্বাস ছাড়া নির্দিষ্ট কোন তারিখ কিংবা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরুর কোন ফলপ্রসু কর্মসূচির কথা বলেননি। ফলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়টি অস্পষ্টই থেকে যায়। এ ঘটনাকে কোন বিশ্লেষক মিয়ানমারের সামরিক জান্তার একগুয়েমি ও সময়ক্ষেপণ নীতি হিসেবে উল্লেখ করলেও কোন কোন বিশ্লেষক বাংলাদেশের কূটনৈতিক ব্যর্থতার প্রতিও ইঙ্গিত করেন।

১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সই হওয়া দ্বিপক্ষীয় চুক্তির আওতায় রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার সমাজের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে নির্যাতনের মুখে পালিয়ে আসা দুই লাখ ৩৬ হাজার ৫৯৯ জন রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নিলেও ২০০৫ সাল থেকে তা পুরোপুরি বন্ধ রেখেছে। এরপর থেকে মিয়ানমার রাখাইন রাজ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে, নির্যাতন-হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে। যুক্তরাজ্যের দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে মিয়ানমারে চলমান ঘটনাবলিকে 'গণহত্যা' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এই গণহত্যার নীলনকশা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে বেশ আগে থেকেই। এখানে 'রোহিঙ্গা' ও 'মুসলমান' দুটি ইস্যুই গুরুত্ব পেয়েছে। মিয়ানমার বলেছে, যারা মিয়ানমার ছেড়ে যাচ্ছে তারা নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে না পারলে ফিরতে পারবে না। রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়নে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সেলর অং সান সু চি বলেছেন, তাঁর সরকার নাগরিকদের রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। এর প্রতিক্রিয়ায় কুইন মারি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের ইন্টারন্যাশনাল স্টেট

www.pathagar.com

ক্রাইম ইনিশিয়েটিভের (আইএসসিআই) পরিচালক অধ্যাপক পেনি গ্রিন বলেছেন, সু চি খুব ভালোভাবেই জানেন যে মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দেয়নি।[১১৩]

মিয়ানমার যে রোহিঙ্গাদের ওপর 'প্রতিশোধ' নিচ্ছে তা দেশটির সেনাপ্রধান সিনিয়র জেনারেল মিন অং লিংয়ের বক্তব্যেই স্পষ্ট। তিনি সম্প্রতি বলেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অসমাপ্ত কাজটিই এখন করছে মিয়ানমার।[১১৪] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৎকালীন আরাকানের (বর্তমানে রাখাইন রাজ্য) রাখাইন সম্প্রদায় জাপানিদের পক্ষ নিলেও রোহিঙ্গারা ছিল মিত্র বাহিনীর পক্ষে। ২০১৫ সালের জুন মাসে যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা ম্যাগাজিন দ্য ইকোনমিস্টে প্রকাশিত এক বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধে বর্তমান বিশ্বে রোহিঙ্গাদের সবচেয়ে নিপীড়িত গোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। সেখানে আরো বলা হয়েছিল, মিয়ানমারের সংখ্যালঘু মুসলমান জনগোষ্ঠীর ওপর কোনো হামলার বিচার হয় না। তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, বসতি থেকে তাড়ানো হচ্ছে। পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে।[১১৫]

এ দিকে, মিয়ানমারকে তার রোহিঙ্গা মুসলমান জনগোষ্ঠীকে পূর্ণ নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকার দিতে হবে বলে দাবি জানিয়েছেন ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ওআইসি'র মহাসচিব ড. ইউসেফ বিন আহমাদ আল-ওথাইমিন। একই সঙ্গে তিনি রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে মিয়ানমারের কাছে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ প্রত্যাশা করেছেন। ২০১৭ সালের ৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তিনি সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে মিয়ানমারকে রোডম্যাপ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমরা আপনাদের দেশে (মিয়ানমার) আসতে ও আপনাদের সঙ্গে বসতে অত্যন্ত আগ্রহী। আপনারা (মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ) তাদের (রোহিঙ্গা) মৌলিক মানবাধিকার অস্বীকার করতে পারেন না।' ওআইসি মহাসচিব সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের মুসলমান ও মিয়ানমারের বৌদ্ধ নেতাদের মধ্যে আন্তধর্মীয় সংলাপের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'এ সংলাপ নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি ও রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করবে।'[১১৬] তিনি বৃহস্পতিবারে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ'র সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। বিষয়টি জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে তুলে ধরার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন ওথাইমিন।

৪.৩ রোহিঙ্গা সমস্যা ২০১৬-১৭ ও বাংলাদেশ সরকার

রাখাইনে নির্বিচারে গণহত্যার প্রেক্ষিতে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়। মিয়ানমারের রাজধানী নেইপিদো'তে এই সমঝোতা স্মারকে বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী ও মিয়ানমারের পক্ষে মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সেলর দফতরের মন্ত্রী কিয়াও তিন্ত সোয়ে

www.pathagar.com

সই করেন। সম্পাদিত এমওইউ অনুযায়ী আগামী দুই মাসের মধ্যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন কার্যক্রম শুরু এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে দুই দেশের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে ১০ জন ও মিয়ানমারের পক্ষে দেশটির সম-মর্যাদার কর্মকর্তার নেতৃত্বে ১০ জন প্রতিনিধি থাকার কথা বলা হয়। ১৯৯২ সালের বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের দেওয়া যৌথ ঘোষণার প্রত্যাবাসন নীতি ও দিকনির্দেশনা অনুসরণ করার কথাও উল্লেখ করা হয়। এর ভিত্তিতে উভয় দেশ রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে প্রত্যাবাসন শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মিয়ানমারের রাজধানী নেইপিদো'তে স্থানীয় সময় দুপুর ২টায় সম্পাদিত এমওইউ'কে 'অ্যারেঞ্জমেন্ট অন রিটার্ন অফ ডিসপ্লেসড পারসনস ফ্রম রাখাইন স্টেট' বা রাখাইন রাজ্যের বাস্তুচ্যুত মানুষদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১১৭]

সমঝোতা স্মারক প্রসঙ্গে বিশ্লেষকগণের মতামত হচ্ছে– এটি আসলে চুক্তিও নয়, স্মারকও নয়। বিবিসির ভাষ্যে এটাকে বলা হয় অ্যারেঞ্জমেন্ট বা ব্যবস্থাপত্র। কূটনীতির পরিভাষায় এ ধরনের ব্যবস্থাপত্রের কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। সমঝোতা স্মারক সাধারণত দু'পক্ষের স্বাক্ষরে সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে দু'টি দেশ পৃথক পৃথকভাবে তাদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছে। এতে রোহিঙ্গাদের নাম উল্লেখ না করে রাখাইন রাজ্যের অধিবাসী যারা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, তাদের ফিরিয়ে নেয়ার সমঝোতার কথা বলা হয়। এতে যৌথ ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে সম্মতির কথা উল্লেখ করা হয়। কবে নাগাদ এ কার্যক্রম শুরু হবে বা কখন এটি শেষ হবে তার কোনো উল্লেখ বিবৃতিতে নেই।[১১৮] ইতোপূর্বে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে ১৯৭৮, ১৯৮২ বিশেষত ১৯৯২ সালে মিয়ানমারের সাথে এ ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু খুব বেশি ফলপ্রসু হয়নি। তাছাড়া মিয়ানমারের রাজধানী নেইপিডোতে যেদিন এই চুক্তি সই হয়েছে সেদিনও এক হাজারের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসেছে। এই সমঝোতার আওতায় শেষ পর্যন্ত কত রোহিঙ্গা নিজেদের ভিটেমাটিতে ফিরে যেতে পারবে তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। ২০১৬ সালের অক্টোবরের ৯ তারিখ থেকে ২০১৭ সালের অক্টোবর মধ্যে বাংলাদেশে কমপক্ষে সাত লাখ রোহিঙ্গা নাগরিক এ দেশে এসেছে। আগে থেকে আরো তিন লাখ রোহিঙ্গা অবস্থান করছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গার বোঝা এখন বাংলাদেশের কাঁধে।[১১৯]

আগের মতো মিয়ানমার তাদের একই কথার উপর প্রতিষ্ঠিত। চুক্তি কিংবা যে কোন ধরনের সমঝোতা স্মারক, বক্তৃতা বিবৃতিতে 'রোহিঙ্গা' শব্দের ব্যবহার করবে না। এবারের ব্যবস্থপত্রেও তারা একই অবস্থানে রয়েছে। ১. রোহিঙ্গা শব্দের উল্লেখ করা যাবে না। ২. নাম পরিচয় যাচাই-বাছাই করার পর নাগরিকত্ব নির্ধারিত হবে। ৩. জাতিসংঘ বা কোনো তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি তারা মানবে না। ৪. প্রত্যাবাসনে কোনো সময়সীমা তারা মানতে রাজি নয়। ৫. প্রত্যাবাসনের পরে তাদের নিজ বাড়িঘরে

www.pathagar.com

প্রত্যাবর্তনের কোনো নিশ্চয়তা দিতে চায় না তারা। ৬. যে জীবন-মরণের সমস্যা নিয়ে রোহিঙ্গাদের এ দেশে আগমন, সেই জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতেও মিয়ানমার সরকার রাজি নয়।[১২০] রাখাইনে জাতিগত নির্মূল অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশের নাগরিক ও বাঙালি হিসেবে চিহ্নিত করছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও মিয়ানমার রোহিঙ্গা সমস্যাকে বাংলাদেশের সাথে একটি দ্বিপক্ষীয় সমস্যা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে আসছে। মিয়ানমার এই অবস্থান থেকে সরে আসেনি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পক্ষভুক্ত না করে মিয়ানমার ও বাংলাদেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে সামরিক বাহিনী রোহিঙ্গাদের নির্যাতন সাময়িকভাবে বন্ধ করলেও রাখাইন স্টেটের প্রতিহিংসা পরায়ণ মগরা প্রতিদিন রোহিঙ্গাদের নির্যাতন করছে। এখনো যারা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে, তারা 'মগ দস্যুদের' আক্রমণের শিকার হয়েই বাংলাদেশে এসেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে রোহিঙ্গারা আহত হয়ে, জখম হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছে।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন চুক্তির বাস্তবতা সম্পর্কে প্রথম আলো প্রত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে মং জার্নি অত্যন্ত শক্তভাবেই উল্লেখ করেন, ১৯৬২ সালে সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় আসার পর মিয়ানমার তার বৃহত্তম জাতীয় সংকট মোকাবিলায় তিনজন বেসামরিক কূটনীতিককে নিয়োগ দিয়েছে। কিউতিন স অং সান সু চির নিজ দপ্তরের মন্ত্রী এবং তাঁর মূল অনুঘটক। আপনারা তাঁকে বিশ্বাস করলে ঠকবেন। ২০০৮ সালের মে মাসে বন্যাদুর্গত লোকজন যখন চরম সংকটে, তখন তাঁকে সরকারের পক্ষে ওকালতি করতেই শশব্যস্ত দেখা গেছে। এরপর আছেন থং তুন, তিনি বর্তমানে সু চির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের উপদেষ্টা। ইতোপূর্বে আধা অবসরে যাওয়া জেনারেল থান শোয়ের দোভাষীর কাজ করেছেন। আর আছেন উইন ম্রা। তিনি মিয়ানমারের বর্তমান মানবাধিকার কমিশনের প্রধান। আনান কমিশনের অন্যতম সদস্য এই ভদ্রলোকের কর্ণকুহরে এখন পর্যন্ত রোহিঙ্গা শব্দটিই প্রবেশ করেনি। বিশ্বে বর্তমানে মিয়ানমারের যে ৩০ জনের বেশি রাষ্ট্রদূত কর্মরত রয়েছেন, তাঁরা কেউ সাবেক কর্নেল, কেউ সাবেক ব্রিগেডিয়ার। তাঁরা পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। গত সপ্তাহে থং তুনকে নিরাপত্তা পরিষদে পাঠানো হয়েছিল। নিউইয়র্কে তিনি কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশনসের মতো মার্কিন স্টাবলিশমেন্ট কাজে লাগিয়ে অপপ্রচার চালিয়েছেন। আমি মনে করি, ওই তিনজন বেসামরিক কূটনীতিকের সারা জীবন কেটেছে আন্তর্জাতিক ফোরামে সামরিক বাহিনীর পক্ষে নির্লজ্জ দালালি করে। তাঁরা প্রত্যেকে ধূর্ত এবং মুসলিমবিদ্বেষী বর্ণবাদী। তাঁদের কারও হৃদয়ে এক তোলা পরিমাণও নীতিবোধ কিংবা মানবিক অনুভূতি নেই। সু চি এসব ব্যক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাঁদের আমি বিষাক্ত সাপ হিসেবে চিহ্নিত করতে দ্বিধাবোধ করি না। বাংলাদেশকে প্রত্যাবাসনের যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তা একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। মনে রাখতে হবে, তাঁদের চূড়ান্ত স্ট্র্যাটেজিক স্কিম হচ্ছে রোহিঙ্গাদের জাতিসত্ত্বা, তার ইতিহাস, পরিচিতি ও আইনগত

www.pathagar.com

অবস্থান ধ্বংস করা। আপনাদের মনে যদি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ দানা বাঁধে, তাহলে গত ২৫ বছরের জাতিসংঘের ডকুমেন্টগুলো, মানবাধিকারের নথিপত্র এবং ১৯৭৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রেস ক্লিপিংগুলো পাঠ করুন।[১২১]

নিরাপত্তাসহ সব বিষয়ে বাংলাদেশের নিজস্ব বক্তব্য রয়েছে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ রহস্যজনক কারণে শক্ত অবস্থানে যেতে পারছে না। **প্রথমত,** রোহিঙ্গা শব্দটির কথাই ধরা যাক। এ শব্দটির সাথে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জাতিপরিচয় জড়িত। বর্তমানে অথবা অতীতে কোনো সরকারই রোহিঙ্গা শব্দটির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পারেনি। বাংলাদেশে এবং গোটা পৃথিবীতে জনমত সৃষ্টি হয়েছে যে, রোহিঙ্গাদের বা বাংলাদেশে আসা রাখাইন প্রদেশের অধিবাসীদের নাগরিকত্ব না দিয়ে ফেরত পাঠানো যাবে না। কফি আনান কমিশনেও রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের তথাকথিত যৌথ বিবৃতিতে নাগরিকত্ব দেয়ার কোনো আকার-ইঙ্গিত নেই। এমন কি যে কফি আনান কমিশনের বিষয়ে মিয়ানমার দৃশ্যত নমনীয়তা দেখিয়েছে, যৌথ বিবৃতিতে তার কোনো কথাই উল্লেখ নেই। **দ্বিতীয়ত,** বাংলাদেশ চাচ্ছে ১৯৭৮, ১৯৯২ এবং তৎপরবর্তীকালে যেসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের সবাইকে ফেরত নেয়া হোক।[১২২] কিন্তু মিয়ানমার ২০১৬ সালের অক্টোবরের পর থেকে এ পর্যন্ত আসা রোহিঙ্গাদের উল্লেখ করছে। **তৃতীয়ত,** মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের পরিচয় নির্ধারণ এবং প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘ বা অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির বিষয়ে একমত নয়। তবে তারা জাতিসংঘ উদ্বাস্তুসংক্রান্ত হাইকমিশন- ইউএনএইচসিআর যেহেতু প্রত্যাবাসনে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দেয়, সেটা গ্রহণ করতে রাজি আছে। **চতুর্থত,** প্রত্যাবাসন কবে থেকে শুরু হবে আর কবে শেষ হবে সে বিষয়ে কোনো সময়সীমা মানতে তারা রাজি নয়। ১৯৯২ সালে স্বাক্ষরিত এ রকম চুক্তির পরে তারা টালবাহানা করে ১৯৯৪ সালের জুন মাসের পর আর তেমন কোন লোককেই ফেরত নেয়নি। **পঞ্চমত,** প্রত্যাবাসনের পরে তাদের নিজ ঘরবাড়িতে ফিরিয়ে নেয়ার নিশ্চয়তা দিতে তারা রাজি নয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিষয়টি উত্থাপিত হলে তারা তাদের বাড়িঘর বিধ্বস্ত হওয়ার যুক্তি দেয়। বাংলাদেশ সরকার উল্লেখ করে, মিয়ানমার রাজি হলে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন ত্রাণসংস্থা ওইসব বিধ্বস্ত বাড়িঘর পুনঃনির্ধারণ ও পুনঃনির্মাণ করে দেবে। কিন্তু তাতে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ রাজি হয়নি। তারা এসব রোহিঙ্গাকে নামকাওয়াস্তে ফেরত নিয়ে ট্রানজিট ক্যাম্পে রাখতে চায়। তথাকথিত নিরাপত্তার নামে এখনো রাখাইন রাজ্যে এ রকম নিরাপত্তা ক্যাম্পে অসংখ্য রোহিঙ্গা ধুকে ধুকে মরছে।[১২৩] **ষষ্ঠত,** রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের পর তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নিরাপত্তার দুটো দিক রয়েছে। মিয়ানমার সরকারকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, তারা সেনাবাহিনীসহ কোনো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিপীড়নের শিকার হবে না। তারা

www.pathagar.com

প্রতিবেশী কর্তৃক প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলবে না। বাংলাদেশ সরকার তথা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি এ নিশ্চয়তা না দিতে পারে তাহলে আবারো রোহিঙ্গারা তাদের জীবনের নিশ্চয়তার জন্য বাংলাদেশের দিকেই ধাবিত হবে।

সমঝোতা স্মারকে বলা হয়েছে যে, যাদের কাছে মিয়ানমার সরকারের দেয়া পরিচয়পত্র বা সে দেশে অবস্থানের কাগজপত্র আছে তাদের কেবল ফিরিয়ে নেয়া হবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এক দশকের বেশি সময় ধরে রোহিঙ্গাদের কোনো পরিচয়পত্র দেয়া হয়নি।[১২৪] বেশির ভাগ রোহিঙ্গা চলে এসেছে জীবন বাঁচানোর তাগিদে। তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। বাবার সামনে ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে। অনেক শিশুকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। নারীরা শিকার হয়েছেন গণধর্ষণের। এমন পরিস্থিতিতে কেউ পরিচয়পত্র বা কেনাকাটার রসিদ নিয়ে পালিয়ে আসবে না। চুক্তি অনুযায়ী যাদের ফেরত নেয়া হলে তাদের বাড়িঘরে ফিরে যাওয়ার সুযোগ থাকছে না। তাদের রাখা হবে মিয়ানমার সরকারের তৈরি করা ক্যাম্পে। যাকে বন্দিশিবির ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এমন পরিস্থিতিতে খুব কম রোহিঙ্গা খোলা কারাগারে ঢোকার জন্য যেতে চাইবে।

এবারের সমঝোতায় মিয়ানমারের দাবি অনুযায়ী ১৯৯২ সালের চুক্তির আলোকে রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে যে সমঝোতা হয় তার অধীনে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ১৩ বছরে মাত্র দুই লাখ ৩৬ হাজার রোহিঙ্গাকে ফেরত নিয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ১ লাখ ২০ হাজার রোহিঙ্গাকে বন্দিশিবিরে রাখা হয়েছে। ১৯৯২ সালের চুক্তি নিয়ে মিয়ানমার বেশি আগ্রহী। কারণ এই চুক্তিতে রোহিঙ্গাদের নাগরিক মর্যাদা দেয়ার বিষয়টির উল্লেখ ছিল না। রোহিঙ্গাদের অধিকারসহ মিয়ানমারের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মৌলিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতের উল্লেখ ছিল না। বাংলাদেশ সব সময় বলে এসেছে '৯২ সালের পরিস্থিতি আর এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে সময় রোহিঙ্গারা তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসে। তাদের ফেরত পাঠানো ছিল মুখ্য। মিয়ানমার সরকার তাদের নাগরিক মর্যাদা হরণ করবে এমন ধারণা তখন ছিল না। রোহিঙ্গারা '৯২ সালের পর দেশটিতে আরো বেশি নিপীড়নের শিকার হয়েছে। ফলে তারা আবারো এ দেশে পালিয়ে এসেছে। এ কারণে রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সব সময় যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে এ দেশে আশ্রয় নেয়া সব রোহিঙ্গাকে ফেরত নেয়া; নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রত্যাবাসন শেষ করা; অস্থায়ী শিবির নয়, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বাড়িঘর নির্মাণের ব্যবস্থাকরণসময়ে রোহিঙ্গাদের তাদের বাড়ি বা আদিনিবাসের কাছাকাছি কোথাও অস্থায়ীভাবে রাখার ব্যবস্থা করা। কিন্তু সই হওয়া চুক্তিতে এ বিষয়গুলো নেই। বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি। এবারের চুক্তিতে ফেরত নেয়া রোহিঙ্গাদের প্রথমে অস্থায়ী পুনর্বাসন ক্যাম্পে রাখার কথা বলা হয়েছে। এরপর তাদের ফেলে আসা ঘরবাড়ি বা অন্য কোথাও পুনর্বাসন করা হবে। মিয়ানমারের আইন

www.pathagar.com

অনুযায়ী, পুড়িয়ে দেয়া ঘরবাড়ি সরকারি সম্পদ। এই অস্থায়ী ক্যাম্প বা বন্দিশিবির থেকে তারা আর নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। একইভাবে তারা তাদের সম্পত্তির অধিকার ফিরে পাবে কি না তাও স্পষ্ট নয়।[১২৫]

মিয়ানমার তাদের স্বার্থেই বিষয়টিকে দ্বিপক্ষীয়ভাবে সমাধানের চেষ্টা করছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকগণসহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ সরকারকে মিয়ানমারের একতরফা চুক্তির ফাঁদে পা না দেয়ার জন্য বারবার সতর্ক করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার সব তরফের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে কী কারণে মিয়ানমারের সাথে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার সূত্রপাত করল- তা একটি অজ্ঞাত বিষয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বেড়ে যাওয়ায় তারা তাড়াহুড়া করে একটি চুক্তিতে উপনীত হতে চায়। এমতাবস্থায় রোহিঙ্গাদের স্বার্থ নিশ্চিত না করে কোনো চুক্তি হলে তা স্থায়িত্ব অর্জন করবে না। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে সমঝোতাপত্র বা ব্যবস্থাপত্রের জন্য মিয়ানমার গেলেন তার আগে যথার্থ হোমওয়ার্ক বা কূটনৈতিক যোগাযোগ করা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেননা ওই যৌথ বিবৃতিতে তার চেয়ে নতুন কিছু দেখা যায়নি।

বিশ্লেষকগণ মত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের মানুষের দুর্ভাগ্য, তাদের কথিত বন্ধুদের এই দুঃসময়ে বাংলাদেশের পাশে পায়নি। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বলেছিলেন, 'পড়শি পহেলে, লেকেন বাংলাদেশ সাবসে পহেলে।'[১২৬] বাংলাদেশে এসে তিনি আমাদের খুশি করার জন্য অনেক ভালো ভালো কথা বলে গেছেন। কিন্তু যখন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের থার্ড কমিটিতে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে অব্যাহত সামরিক তৎপরতা বন্ধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার দাবি করা হয়, তখন ভারত এবং তার পক্ষপুট নেপাল, ভুটান ভোটদানে বিরত থাকে। তার মানে হলো তারা বাংলাদেশের স্বার্থে ভোটদানে ব্যর্থ হয়। যে রাশিয়া থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কিনলো বাংলাদেশ, তারাও বাংলাদেশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। থার্ড কমিটিসহ অন্যান্য ফোরামে বাংলাদেশের তথাকথিত বন্ধু চীন ভারত ও রাশিয়ার সমর্থন না পাওয়ায় সঙ্গতভাবেই বর্তমান সরকারের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলা যায়। এমন কি বাংলাদেশ জাপানের মতো নিরূপদ্রব মানবতাকামী দেশকে তার পক্ষে আনতে ব্যর্থ হয়। প্রতিবেশী নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কা ভোটদানে বিরত থাকায় সহজেই বোঝা যায়, বাংলাদেশের কর্তাব্যক্তিরা 'পড়শি পহেলে' এ কথাও বোঝেন না। অপর দিকে যে প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক হিমালয় পর্বত অতিক্রম করেছে বলে দাবি করা হয়, তাদের উচ্চারণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে বাংলাদেশ 'সবসে পিছে'।[১২৭]

আঞ্চলিক বলয়ে মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ যেন চীনের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের পক্ষপুটে চলে না যায়– অপর দিকে আঞ্চলিক সমঝোতার কথা বলে চীন মিয়ানমারের ওপর পাশ্চাত্যের চাপ কমাতে চায়। সেজন্য চীন বিষয়টি আঞ্চলিক পর্যায়ে মীমাংসা

www.pathagar.com

করার জন্য উভয় দেশের ওপর চাপ দিয়েছে। চীনের এ ভূমিকা কতটা বাংলাদেশের জন্য, আর কতটা মিয়ানমারকে আশু বিপদ থেকে রক্ষার জন্য- তা সহজেই বোঝা গেছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রশক্তি মিয়ানমারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে চাইলেও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদসহ অন্যান্য ফোরামে ব্রিটেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন মার্কিনীদের সমান্তরাল ভূমিকা রেখেছে। দীর্ঘকাল মিয়ানমার যখন সমগ্র পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা একা পথ চলছিল, তখন মহাচীনই ছিল তাদের বিশ্বস্ত সাথী। ২০১৪ সালের পর পাশ্চাত্যের চাপে যখন গণতন্ত্রায়ন শুরু হয় তখন পাশ্চাত্যের দুয়ার ধীরে ধীরে খুলে যায় মিয়ানমারের জন্য। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মিয়ানমার সফর করেন। তখন তিনিও রোহিঙ্গাদের বিষয়ে ভালো ভূমিকা রাখেন। এখনো মিয়ানমার নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্য চীনের ওপর নির্ভরশীল। এ প্রেক্ষিতে চীন সফর করেছেন মিয়ানমারের সেনাপ্রধান সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইয়াং । চীনের সামরিক কমিশনের প্রধান জেনারেল লি ঝৌচেংয়ের আমন্ত্রণে ২০১৭ সালের ২১ নভেম্বর মঙ্গলবার বেইজিংয়ের উদ্দেশে নেইপিদো ছাড়েন তিনি। তার সঙ্গে ছিলেন সামরিক বাহিনীর আরও কিছু শীর্ষ কর্মকর্তা। রাখাইনে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর নিধনযজ্ঞের পেছনের মূল হোতা হিসেবে জেনারেল হ্লাইয়াংকে দায়ী করা হয়ে থাকে। আর এই নিধনযজ্ঞের শুরু থেকেই মিয়ানমারের সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে তাদের পাশে রয়েছে চীন। হ্লাইয়াংয়ের চীন সফরকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করছে মিয়ানমারের সংবাদমাধ্যম।[১২৮] চীন অতীতের সাম্যবাদের ভূমিকা বাদ দিয়ে এখন 'ওয়ানবেল্ট ওয়ান রোড' নামের বাণিজ্যবাদ নিয়ে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। মিয়ানমারের বিপুল খনিজ সম্পদ ও বিনিয়োগে এখনো চীনের প্রাধান্য রয়েছে। সুতরাং চীন বাংলাদেশের দিকে তাকাবে নাকি মিয়ানমারের স্বার্থ রক্ষা করবে- তা সহজেই বোঝা যায়। ইতোমধ্যে চীন নিরাপত্তা পরিষদসহ সর্বত্র বাংলাদেশের বিপক্ষে ভোট দিয়ে প্রমাণ করেছে- মানবিকতা শুধু তাদের কথার কথা, আসল কথা অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের থার্ড কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবটি গরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হলেও ১০টি দেশ প্রকাশ্যে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। এই দেশগুলো হচ্ছে- চীন, ভেনিজুয়েলা, রাশিয়া, জিম্বাবুয়ে, সিরিয়া, বেলারুশ, বুরুন্ডি, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম ও লাওস। আরো ২৬টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। কৌশল করে আরো ২২টি দেশ অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকে। অপর দিকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিতে যে মুসলিম বিশ্ব অবহেলিত, তারাই এ প্রস্তাবটি উত্থাপন করে। সাধারণভাবে এ ধরনের মানবিক প্রস্তাবের বিপক্ষে এতগুলো রাষ্ট্রের ভোট দেয়ার কথা নয়। বিশ্ব সংস্থার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের ওই নেতিবাচক অবস্থান নিশ্চয়ই বাংলাদেশের কূটনৈতিক সফলতার প্রমাণ বহন করে না।

নেইপিডোর যৌথ বিবৃতি বস্তুত একটি অকার্যকর কূটনৈতিক প্রয়াস। এতে মিয়ানমারের সদিচ্ছার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। রোহিঙ্গাদের স্বদেশে ফিরে যেতে

www.pathagar.com

দ্বিপক্ষীয় কোনো সমঝোতা সুফল বয়ে আনবে না। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে এই চুক্তি সমস্যা সমাধানে কার্যকর না হওয়ার আশংকা অনেক বেশি। এটা মিয়ানমারের সময় ক্ষেপণের একটি কৌশল মাত্র। কারণ এখানে ফেরত নেয়ার সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি। বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের ফাইনাল ভেরিফিকেশন মিয়ানমারের হাতেই। রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়ার সাথে তাদের নাগরিকত্ব, নিরাপত্তা এবং সম্মানের বিষয়টি জড়িত। কিন্তু চুক্তিতে এই বিষয়গুলোর উল্লেখ নেই।[১২৯] তাই মিয়ানমারের ওপর কোনো আস্থা রাখা ঠিক হবে না বলে বিশ্লেষকগণ মতামত ব্যক্ত করেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. এবনে গোলাম সামাদ মন্তব্য করেন, মিয়ানমার কৌশলী অবস্থান নেবে একথাটা বাংলাদেশের বেশিরভাগ চিন্তাশীল মানুষ আগে থেকেই অনুমান করেছিল। অথচ বাংলাদেশের সরকার কেন এটা অনুমান করে নি, কেন বিষয়টি মাথায় রাখে নি এটা তাদের ব্যর্থতা এবং অদক্ষতা। মিয়ানমার সরকার আন্তর্জাতিকমহলের সমালোচনার কারণে রোহিঙ্গা বিষয়ে একটা পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের সেই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ সরকারকে এবং আন্তর্জাতিকমহলকে আপাতত আশ্বস্ত করা এবং সময়ক্ষেপণের রাস্তা বের করা। আর সেই কাজটা তারা সাফল্যের সাথে করেছে। মিয়ানমার সরকার আসলে সময় ক্ষেপণের জন্যই এটি করছে। আর এ কথাটি মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে আলোচনার সময় অর্থাৎ কয়েক দিন আগে ঢাকায় মিয়ানমার সরকারের স্টেট কাউন্সিলর অফিসের মন্ত্রী মহোদয় এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে ঘন্টা দেড়েকের আলোচনা হয়। সে সময় ১৯৯২ সালের চুক্তির বিষয়টি আসে নি। যদি আসত তাহলে দুই মন্ত্রীর প্রেস ব্রিফিংয়ে আমরা সেটা দেখতে পেতাম।[১৩০]

তিনি আরো উল্লেখ করেন, মানুষ কেবল বাংলাদেশ থেকে আরাকানে যায়নি। আরাকান থেকেও বহু মানুষ এসেছে বাংলাদেশে। বোদপায়া ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে যখন আরাকান দখল করেন, তখন চাকমা ও মারমাদের পূর্বপুরুষ আসে বাংলাদেশে পালিয়ে। চাকমা ও মারমাদের বাংলাদেশ থেকে বিতাড়নে কোনো উদ্যোগ বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেনি এবং করবেও না। সে এ ক্ষেত্রে সাধারণ আন্তর্জাতিক প্রথাকেই অনুসরণ করতে ইচ্ছুক। এ কারণে সে মারমাদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে মারমা ভাষাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। চাকমাদের কোনো নিজস্ব ভাষা এখন আর নেই। তাই বাংলা ভাষাতেই হচ্ছে তাদের প্রাথমিক শিক্ষা। অর্থাৎ বাংলা ভাষাতেই তারা শিখছে পড়তে, লিখতে ও গুনতে। কেবল তাই নয়, চাকমা কবিরা বাংলা ভাষাতেই কবিতা লিখেছেন এবং লিখছেন।[১৩১] রোহিঙ্গারা তাদের মতো সাম্প্রতিক কালের কোন জনগোষ্ঠী নয়। তাহলে মিয়ানমার কেন তাদের প্রতি এ আচরণ করবে?

রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়ার ক্ষেত্রে মিয়ামারের ইমিগ্রেশন, পুলিশ ও সীমান্তরক্ষা বাহিনী জড়িত। এই তিনটিই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হচ্ছেন একজন

www.pathagar.com

জেনারেল। মিয়ানমারে ক্ষমতার মূল চাবিকাঠি সামরিক বাহিনীর হাতে। কিন্তু চুক্তি সইয়ের আগে বা সইয়ের সময় মিয়ানমার সেনাপ্রধান বা সেনাকর্মকর্তাদের সাথে বাংলাদেশ পক্ষের কোনো আলোচনা হয়নি। দেশটির সেনাবাহিনী এই চুক্তিকে আদৌ আমলে নেবে কি না তাও দেখার বিষয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরের সময় দেশটির সেনাপ্রধান চীন সফরে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে চীনের সাথে রোহিঙ্গা ইস্যুতে আরো নিবিড় যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততার প্রয়োজন হবে। এ ক্ষেত্রে চীনকে শেষ পর্যন্ত কতটা কাছে পাওয়া যাবে বা চীন কতটা পাশে থাকবে তাও এক চ্যালেঞ্জ।[১৩২] কারণ চীনের সাথে বাংলাদেশের আরো অনেক স্বার্থসংশ্লিষ্ট দিক রয়েছে, যেগুলোতে সমান্তরাল অবস্থানের প্রয়োজন হবে। স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রেখেই সমস্যা সমাধানে সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার তাৎপর্য মিয়ানমারের মতো অস্বাভাবিক সরকারের পক্ষে কতটা অনুধাবন সম্ভব তা প্রশ্নসাপেক্ষ। অতীত প্রমাণ করেছে, তারা সৎ প্রতিবেশীমূলক সম্পর্কের সম্মান ধারণ করে না। উভয় দেশের মধ্যে যে আস্থার সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণে মিয়ানমারের কোনো উদ্যোগ দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাছাড়া দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরের পর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মিয়ানমার এখন জোরালোভাবে এই দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করবে যে রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে বাংলাদেশের সাথে আলোচনা শুরু হয়েছে। ফলে জাতিসংঘ, বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এবং পশ্চিমা দেশগুলোর চাপ কমতে থাকবে। আসলে এই চুক্তির মাধ্যমে মিয়ানমার পুরোপুরিভাবে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এখন রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আরো কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে।[১৩৩] এমতাবস্থায় জাতিসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোর মাধ্যমে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ওপর চাপ অব্যাহত রাখার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সুতরাং বাংলাদেশকে অব্যাহত চাপ প্রয়োগ কূটনীতি বা 'কোয়ার্সিভ ডিপ্লোমেসির' কার্যকর প্রয়োগে সমাধানের পথে এগোতে হবে। এ মানবিক ইস্যুতে পৃথিবীব্যাপী যে সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছে তা কাজে লাগিয়ে রোহিঙ্গাদের সম্মানজনক প্রত্যাবাসন হবে– এটাই সকলের কাম্য।

এদিকে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পরও রোহিঙ্গা আসা বন্ধ হয়নি। রাখাইনে সহিংসতা বন্ধের খবরে বাংলাদেশের উখিয়া ও টেকনাফ সীমান্তে কড়াকড়ি নীতি আরোপ করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। তবুও সীমান্তরক্ষী বাহিনীসহ প্রশাসনের বাধা বিপত্তি না মেনেই নানা কৌশলে এ দেশে পালিয়ে আসে রোহিঙ্গারা। ২০১৭ সালের ২৭ নভেম্বর রোববার মিয়ানমারের ধাওনখালী চর থেকে নৌকায় চেপে সাবরাং ইউনিয়নের হারিয়াখালী পয়েন্ট দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে বুছিদং সিন্দিপ্রাং এলাকার ১১৭ জন রোহিঙ্গা। ২৮ নভেম্বর মঙ্গলবার রাখাইনের আরও ২৩৩ জন রোহিঙ্গা কক্সবাজারের টেকনাফে এসেছে। তারা বলছে, দেশটির নেত্রী অং সান সু চির কথায় তাদের ভরসা নেই। আর ওই দেশের সেনাবাহিনী না চাইলে কোনো রোহিঙ্গা ফিরতে পারবে না। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, টেকনাফের বিভিন্ন সীমান্ত পয়েন্ট

www.pathagar.com

দিয়ে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আসা অব্যাহত রয়েছে। ২৭ নভেম্বর সোমবার রাত থেকে ২৮ তারিখ সকাল পর্যন্ত ৫৪টি পরিবারের ২৩৩ জন রোহিঙ্গা টেকনাফে পৌঁছায়। নতুন আসা ২৩৩ জন রোহিঙ্গাকে প্রথমে সাবরাং ইউনিয়নের হারিয়াখালীতে সেনাবাহিনীর ত্রাণকেন্দ্রে নেওয়া হয়। সেখানে মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ দিয়ে তাদের টেকনাফের নয়াপাড়া রোহিঙ্গা শিবিরে পাঠানো হয়েছে।[১৩৪] রাখাইনের হরমুড়া পাড়ার বাসিন্দা রোহিঙ্গা নারী কুলসুমা খাতুন বলেন, 'মগ ও সেনারা মাসদেড়েক আগে খুব অত্যাচার চালিয়েছিল। এমন কি সেনারা রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের হত্যা, ধর্ষণসহ বহু ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের নির্যাতনে অনেক রোহিঙ্গা এ দেশে পালিয়ে এলেও আমরা এত দিন সেখানে পালিয়ে ছিলাম।[১৩৫]

রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে সদ্য স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ব্যাপারে নতুন আসা রোহিঙ্গাদের প্রতিক্রিয়া হলো, মিয়ানমার সরকারের ওপর তাদের ন্যূনতম আস্থা নেই। অং সান সু চির কথার সঙ্গে কাজের মিল নেই। আবার মিয়ানমার এখনো সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। সেনাবাহিনী না চাইলে রোহিঙ্গারা ফিরতে পারবে না। তা ছাড়া মিয়ানমার সরকার আগেও অনেকবার চুক্তি করে তা পালনে গড়িমসি করেছে। এরপরও সুযোগ সৃষ্টি হলে এই রোহিঙ্গারা নিজেদের ভিটায় ফিরতে চায়। রোহিঙ্গা নারী হামিদ বেগম বলেন, রাখাইনে তাঁদের ঘরবাড়ি, জায়গা-জমি সব আছে। ফিরতে পারলে খুশি হবেন। তিনি বলেন, দেশের জন্য মন কাঁদছে। আজ না হোক কাল, আমরা নিজ ভূমিতে ফিরে যাবই।[১৩৬] এ রকমভাবে প্রায় সকল রোহিঙ্গাই প্রত্যাশা করে নিজবাড়িতে ফিরে যেতে। কিন্তু আশা কবে প্রতিফলিত হবে তা কারোই জানা নেই।

বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের পরিবারভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত না হওয়া, রোহিঙ্গাদের পরিচয় যাচাই-বাছাই সম্পন্ন না হওয়া এবং ট্রানজিট ক্যাম্প তৈরি না হওয়ার কারণে মিয়ানমারের সাথে সই হওয়া চুক্তি অনুযায়ী ২০১৮ সালের ২৩ জানুয়ারি মঙ্গলবার থেকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু করার কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩ জানুয়ারি থেকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু করতে চেয়েছিল নেইপিডো। কিন্তু এসব প্রক্রিয়া শেষ করে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু হতে আরো কয়েক মাস সময় প্রয়োজন হবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেছেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য ইউএনএইচসিআরের সাথে চুক্তি করবে বাংলাদেশ। আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নকে এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব করেছি। রোহিঙ্গাদের জোর করে ফেরত পাঠানো হবে না। মিয়ানমারের সাথে এমওইউ সই, জেডব্লিউজি গঠন ও ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছা, মর্যাদাসম্পন্ন ও টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে চেয়েছে। চুক্তিতে এ জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান আছে। এর মধ্যে রয়েছে কফি আনান কমিশনের প্রতিবেদন বাস্তবায়নে মিয়ানমারের প্রতিশ্রুতি, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা

www.pathagar.com

জানিয়ে রোহিঙ্গাদের প্রতি কোনো ধরনের বৈষম্য না করা এবং রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করা।[১৩৭] হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস বলেছেন, বার্মিজ সেনাদের দ্বারা হত্যাকাণ্ড, গণধর্ষণ এবং গ্রাম পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনার কারণে দেশ ছাড়তে বাধ্য হওয়া রোহিঙ্গাদের আবার সেই একই সেনাদের তত্ত্বাবধানে ক্যাম্পে ফেরত পাঠানো উচিত হবে না। তিনি মনে করেন, এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াটি লোক দেখানো কর্মসূচি; যার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও কার্যকর প্রত্যাবাসনের জন্য মিয়ানমার যে আসলে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না- সে বিষয়টি গোপন করা হচ্ছে। বিবিসি বাংলার উদ্ধৃতি দিয়ে দৈনিক নয়াদিগন্ত জানায়, রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে বাংলাদেশ মিয়ানমারের সাথে যে চুক্তি করেছে, তার বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের ১৯ জানুয়ারি শুক্রবার সকাল আটটায় কক্সবাজারের কুতুপালং শরণার্থী শিবিরের ই ব্লকে একশোর মতো শরণার্থী বিক্ষোভ করেছে। এই বিক্ষোভের সংগঠকদের একজন মহিবুল্লাহ বিবিসি বাংলাকে বলেন, বর্তমান অবস্থায় আমরা মিয়ানমারে ফেরত যেতে প্রস্তুত নই। রাখাইনে আমাদের জন্য একটি নিরাপদ অঞ্চল গড়ে তুলতে হবে। রোহিঙ্গা হিসেবে আমাদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের ওপর যারা অবিচার করেছে তাদের বিচার করতে হবে। তাহলে আমরা ফেরত যেতে পারি।[১৩৮]

অধ্যায়ের সমাপনীতে বলা যায়, বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে মিয়ানমার সরকার ১৯৭৮ সালে আগত রেজিস্ট্রিকৃত রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে স্বল্প সময়ে স্বদেশে ফিরে নিলেও ১৯৯১ সালে আগতদের ক্ষেত্রে খুব বেশি কালক্ষেপণ করে। বিশেষকরে ২০১৭ সালে স্বাক্ষরিত যৌথ ঘোষণার ব্যাপারে বিশ্লেষক মহল মনে করেন এ চুক্তি মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের সাথে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও শরণার্থী আগমনের সূচনা লগ্ন থেকেই বাংলাদেশ সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্বসহ বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে মিয়ানমার সরকার শরণার্থীদের ফেরত নেয়া শুরু করলেও বিভিন্ন অজুহাতে ছাড়পত্র প্রদানে বিলম্ব করে। "সর্বশেষ শরণার্থীকেও স্বদেশে ফেরত নিতে হবে" এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলাদেশ সরকার সমস্যাটিকে আন্তর্জাতিকীকরণ করে এবং শরণার্থী প্রত্যাবাসনে UNHCR-কে সম্পৃক্ত করে। কিন্তু UNHCR স্বল্প সময়েই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করলেও মিয়ানমারের অনীহার কারণে এ সমস্যা দীর্ঘদিন যাবৎ ঝুলতে থাকে।[১৩৯]

রোহিঙ্গা সমস্যার এ প্রেক্ষাপটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে -

প্রথমত, রোহিঙ্গারা শত শত বছর ধরে মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশে বসবাস করছে এবং জন্মসূত্রেই তারা মিয়ানমারের অধিবাসী। মিয়ানমার সরকার কর্তৃক তাদের মৌলিক অধিকারহরণ অন্যায়, অবৈধ এবং স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, স্বদেশের জনগণ বা বাসিন্দা হিসেবে রোহিঙ্গাদের স্বাধীনভাবে মৌলিক অধিকার সহকারে সম্মান ও জানমালের নিরাপত্তাসহ মানবাধিকারের স্বীকৃতি নিয়ে জীবন ধারণের অধিকার রয়েছে। বিভিন্ন নির্যাতনের মাধ্যমে তাদেরকে নিজস্ব বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে অন্য দেশে তাড়িয়ে দেয়া মানবাধিকারের চরম লংঘন।

তৃতীয়ত, মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদেরকে মানবিক কারণে আন্তর্জাতিক বিধি মোতাবেক সাময়িকভাবে বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়া হয়।

চতুর্থত, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আগমনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মত একটি ছোট অথচ জনবহুল রাষ্ট্রের উপর ভয়ানক চাপ পড়েছে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে; এর স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন।

পঞ্চমত, মিয়ানমার সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের প্রেক্ষিতে দ্বি-পাক্ষিকভাবে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান বিলম্বিত হবার কারণে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক বিশ্ব এতে সম্পৃক্ত হয়েছে। ফলে সমস্যাটি এখন আর মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ কিংবা দ্বি-রাষ্ট্রিক নয়, বরং এটি এখন আন্তর্জাতিক সমস্যা।

ষষ্টত, বাংলাদেশে আশ্রিত সকল শরণার্থীকেই মিয়ানমারে ফেরত নিতে হবে; এব্যাপারে কোন দ্বি-মতের অবকাশ নেই এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখা জরুরী।

বাংলাদেশ আন্তরিকভাবে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে কাজ করলেও চুক্তিসমূহে রোহিঙ্গা ও সিটিজেন শব্দের প্রয়োগে সক্ষম হচ্ছে না। অথচ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের বিষয়টি নিয়ে ভীষণভাবে উদগ্রীব। তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে উৎকণ্ঠাও প্রকাশ পেয়েছে। ২০১৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় সকাল পৌনে ছয়টায় জাতিসংঘের ৭২তম অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে পাঁচটি প্রস্তাবনা পেশ করেছেন। বক্তব্যের সূচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে আমি কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করছি। **প্রথমত**, অনতিবিলম্বে এবং চিরতরে মিয়ানমারে সহিংসতা ও 'জাতিগত নিধন' নিঃশর্তে বন্ধ করা। **দ্বিতীয়ত**, অনতিবিলম্বে মিয়ানমারে জাতিসংঘ মহাসচিবের নিজস্ব একটি অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করা। **তৃতীয়ত**, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করা এবং এ লক্ষ্যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষা বলয় 'সেইফ জোন' গড়ে তোলা। **চতুর্থত**, রাখাইন রাজ্য থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত সব রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে তাদের নিজ ঘরবাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। **পঞ্চমত**, নিঃশর্তভাবে কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালা পরিপূর্ণরূপে ও দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।[১৪০]

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবনাগুলো মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। বিশ্লেষকগণও নানা রকমের অভিমত ব্যক্ত করেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক আলী রিয়াজ বিবিসি বাংলার সাথে এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবের বিষয়ে বলেন, এ প্রস্তাবগুলোর ইতিবাচক দিক হচ্ছে, প্রস্তাবগুলো স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপিত হওয়া। তবে এর বাস্তবায়ন নির্ভর করবে বৈশ্বিক রাজনীতির উপর।[১৪১] এসব যৌক্তিক দাবি পূরণ হলে সমস্যা সমাধানের পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু দু'দেশের স্বাক্ষরিত যৌথ ব্যবস্থাপত্রে এ প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। সুতরাং জাতিসংঘের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে অবিলম্বে শরণার্থী প্রত্যাবাসন বিষয়ে মিয়ানমার সরকারের সাথে আলোচনার ধারা আরো অগ্রগতির মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং UNHCR-কে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের শেষ পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানানো এখন সময়ের দাবি।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

---

১ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ও ৮ জুলাই, ১৯৭৮ (বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক ও বর্মী উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. উ তিন অহন এর মধ্যকার বৈঠকে বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য) ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯১; *দৈনিক বাংলা*, ১৩ নভেম্বর, ১৯৯১; *New Straits Times*, 30 Sept., 1992.
উল্লেখ্য, টেকনাফের দমদমিয়া ও মরিচ্যা উদ্বাস্তু শিবির সফর শেষে ঢাকায় ফিরে নিজস্ব অফিসে সংবাদিকদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন"রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা সব দিক দিয়েই মিয়ানমারের নাগরিক। নৃশংসতা থেকে বাঁচতে তাদেরকে তাদের দেশ থেকে পালাতে হয়েছে।" (*দৈনিক বাংলা*, ১৪ মার্চ, ১৯৯২; *The Star*, 16 March, 1992.)।

২ *The Bangladesh Observer*, 8, 14 May, 1978; *The Bangladesh Times*, 21 May, 1978; *People View*, 6 May, 1978; *Bangkok post*, 28 April, 1978; *Far Eastern Economic Review*, 19 May, 1978; *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ নভেঃ, ১৯৯১।

৩ "Brief on Myanmar Refugee problem in Bangladesh." *Ministry of Foreign Affairs*, South East Asia Myanmar Section, Segunbagicha, Dhaka, File No. 102.

৪ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ নভেঃ ১৯৯১; *The Bangladesh Observer*, 29 April, 1978; *The Daily Life*, 29 May, 1978.
উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালে আগত শরণার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যায়, অসুস্থতায়, পথে, ক্যাম্পে, অনাহারে-অর্ধাহারে প্রায় ৪০ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী মৃত্যুবরণ করে; যাদের মধ্যে বেশির ভাগই শিশু-নারী ও বৃদ্ধ ছিল। (দ্রঃ কাজী মু. নিজামুল হক, শতাব্দীর শিকার : বর্মী মুসলমান, *দৈনিক সংগ্রাম*, ২২ আগস্ট, ১৯৭৯)।

৫ *Saudi Gazette*, 7 June, 1978; *দৈনিক আজাদ*, ৮ মে, ১৯৭৮; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ মে, ১৯৭৮।

৬ *The Bangladesh Observer*, 7 June, 1978. *দৈনিক ইত্তেফাক*, জুলাই, ১৯৭৮।

৭ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ জুলাই, ১৯৭৮; *World Times*, 22 June, 1978.

৮ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ জুলাই, ১৯৭৮।

৯ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ জুলাই, ১৯৭৮।

১০ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ও ৯ জুলাই, ১৯৭৮।

www.pathagar.com

১১ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ জুলাই, ১৯৭৮; *The Bangladesh Observer*, 11 July, 1978; *Far Eastern Economic Review*, 21 July, 1978; *World Times*, 27 July, 1978; *Asiaweek*, 28 July, 1978.

১২ Ibid.উল্লেখ্য, সমঝোতা স্মারক (Agreed Minutes) স্বাক্ষরের পূর্বে বর্মী প্রতিনিধিদল বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বার্মার প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল নে উইনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। পররাষ্ট্রসচিব তোবারক হোসেন ছাড়াও স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিব সালাহ উদ্দিন, বার্মার নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জহিরউদ্দিন, সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল এম আতিকুর রহমান ও পররাষ্ট্র দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ।

১৩ "AGREED MINUTES SIGNED BETWEEN THE GOVERNMENT OF BURMA (MYANMAR) AND THE GOVENMENT OF BANGLADESH ON REPATRIATION OF THE BURMESE REFUGEES, 1978." *Ministry of Foreign Affairs*, South East Asia, Myanmar Section (এখন থেকে SEA, M.Sec., ব্যবহৃত হবে) File No. 130, Repretation Agreement.

১৪ *Bangla Academy English-Bengali Distionary*, Zillur Rahman Siddiqui (ed.), Bangla Academy, Dhaka, 1997, p. 137.

১৫ A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Fifth Ed. (New York : Oxford University Press, 1995), p. 201.

১৬ *Bangla Academy English-Bengali Dictionary*, p. 656; *Oxford*, p. 997.

১৭ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ জুলাই ১৯৭৮।

১৮ *দৈনিক কিষাণ*, ৩০ এপ্রিল, ১৯৮১; *দৈনিক আজাদ*, ৩০ এপ্রিল, ১৯৮১; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ নভেঃ ১৯৮৬; *দৈনিক আজকের কাগজ*, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৩।

১৯ *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৩ নভেম্বর, ১৯৯১।

২০ *দৈনিক আজকের কাগজ*, ৮ অক্টোবর, ১৯৯১।

২১ *দৈনিক আজকের কাগজ*, ৮ অক্টোবর, ১৯৯১; *The New Nation*, 8 January, 1992.

২২ *দৈনিক মিল্লাত*, ১৮ অক্টোবর, ১৯৯১।

২৩ *Gulf News*, 27 Nov., 1991; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ নভেম্বর, ১৯৯১; *দৈনিক মিল্লাত*, ৪ নভেম্বর, ১৯৯১; *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ নভেম্বর, ১৯৯১; *দৈনিক ইনকিলাব* ৪ নভেম্বর, ১৯৯১।

২৪ *দৈনিক বাংলা*, ১৩ নভেম্বর, ১৯৯১।

২৫ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M. Sec., File No. 602, Foreign Minister's visit to Myanmar; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ নভেম্বর, ১৯৯১; *দৈনিক বাংলা*, ২৩ নভেম্বর, ১৯৯১; *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ নভেম্বর, ১৯৯১; *দৈনিক আজকের কাগজ*, ২৩ নভেম্বর, ১৯৯১।

উল্লেখ্য, বৈঠকের পূর্বে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমারের আইন শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা কমিটি (SLORC) চেয়ারম্যান সিনিয়র জেনারেল স মং'য়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালে তিনিও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্য এবং জনগণের সমৃদ্ধি কামনা করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন অতিরিক্ত পররাষ্ট্রসচিব এ এইচ মাহমুদ আলী, অতিরিক্ত স্বরাষ্ট্রসচিব আব্দুল হামিদ চৌধুরী এবং মিয়ানমারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ, পক্ষান্তরে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিয়ানমারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট জেনারেল স মং এর ফার্স্ট সেক্রেটারী জেনারেল খিন নইন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী উ অহন গিয়াও, বাণিজ্যমন্ত্রী ডি ও এবেল, বাংলাদেশে নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত উমো মিন্ট।

২৬ *দৈনিক বাংলা*, ২৫ নভেম্বর, ১৯৯১ ও *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৬ নভেম্বর, ১৯৯১।

২৭ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M. Sec., File No. 119, Relief for Myanmar Refugees; *দৈনিক সংগ্রাম*, ২১ জানুয়ারি, ১৯৯২।

www.pathagar.com

২৮ *RRRC*, Cox-Bazar, 1992.

২৯ Philip Gain (ed.), *SHESHU REPORT, 1*, Rohingya Rifugee Issue (Dhaka : SHESHU – An Alternative Media Approach, 1992), p. 31.

৩০ *ত্রাণ মন্ত্রণালয়*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৩১ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M. Sec., File No. 119, Relief for Myanmar Refugees.

৩২ *Ibid.*

৩৩ *Ibid.*

৩৪ *দৈনিক আজকের কাগজ*, ২৪ জানুয়ারি, ১৯৯২।

৩৫ *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৪ জানুয়ারি, ১৯৯২।

৩৬ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯২; *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯২।

৩৭ *দৈনিক আজকের কাগজ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।

৩৮ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২১ নভেম্বর, ১৯৯২।

৩৯ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M. Sec., File No. 119, Relief for Myanmar Refugees; *দৈনিক বাংলা*, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।

৪০ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ মার্চ, ১৯৯২; *The New Nation*, 3 March, 1992; *The Star*, 14 March, 1992; *The Telegraph*, 10 March, 1992.

৪১ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ মার্চ, ১৯৯২; *The Telegraph*, 10 March, 1992; *The Morning Sun*, March 13, 1992; *The Star*, 14 March, 1992.

৪২ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ মার্চ, ১৯৯২।

৪৩ তদেব। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র যাবার পথে লন্ডনে বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন "এ সকল শরণার্থী ১৯৭৮ সালেও এসেছিল। পরে বার্মা তাদের ফেরৎ নিয়েছিল। এখন যারা এসেছে তাদের নিকট পরিচয় পত্র ও নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট রয়েছে। সেগুলো কূটনীতিক, সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার প্রতিনিধিরাও দেখছেন।" (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ মার্চ, ১৯৯২।)

৪৪ *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১৪ মার্চ, ১৯৯২।

৪৫ *The Dayly Life*, 22 March, 1992; *The New Nation*, 22 March, 1992; *দৈনিক বাংলা*, ২৮ মার্চ, ১৯৯২; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ মার্চ, ১৯৯২।

৪৬ তদেব। উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী ছিলেন-পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান, তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হুমায়ুন কবির।

৪৭ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ এপ্রিল, ১৯৯২।

৪৮ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M. Sec., File No. 118, UNHCR Affairs.; *The Daily Star*, 18 April, 1992; *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৮ এপ্রিল, ১৯৯২; *দৈনিক বাংলা*, ২৮ মার্চ, ১৯৯২; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ ও ৪ এপ্রিল, ১৯৯২; *দৈনিক সংবাদ*, ২ এপ্রিল, ১৯৯২।

৪৯ তদেব।

৫০ *দৈনিক বাংলা*, ২৪ এপ্রিল, ১৯৯২।

৫১ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ এপ্রিল, ১৯৯২; *দৈনিক বাংলা*, ২৩ এপ্রিল, ১৯৯২।

৫২ *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২৬ ও ২৭ এপ্রিল, ১৯৯২; *দৈনিক সংবাদ*, ২৬ এপ্রিল, ১৯৯২।

৫৩ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M. Sec., File No. 603, visit of Myanmar Foreign Minister U Ohn Gyaw; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ এপ্রিল, ১৯৯২।

৫৪ *দৈনিক আজকের কাগজ*, ৩০ এপ্রিল, ১৯৯২; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ এপ্রিল, ১৯৯২। উল্লেখ্য, এ স্বাক্ষর ও আলোচনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে মিয়ানমারের প্রতিনিধি দলের ১৪ সদস্যের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী

www.pathagar.com

উ অহন গিয়াও ছাড়াও দলের বিকল্প নেতা হিসেবে তথ্যমন্ত্রী জেনারেল মিও থান্ট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক বিভাগের ডিরেকটর জেনারেল উ আই, শরণার্থী বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল উ মং অং এবং ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন বিভাগের ডিরেকটর জেনারেল উ স থীন উপস্থিত ছিলেন। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এস. এম. মোস্তাফিজুর রহমান ছাড়াও বিকল্প নেতা হিসেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী, ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খান, পররাষ্ট্র সচিব রিয়াজ রহমান, স্বরাষ্ট্র সচিব লুৎফুল্লাহিল মজিদ, অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব ফারুক সোবহান, অতিরিক্ত ত্রাণ সচিব এম এ হাকিম এবং মিয়ানমারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন। সফরকালে মিয়ানমার পররাষ্ট্রমন্ত্রী উ অহন গিয়াও তথ্যমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাউ থান্ট (Myo Thant) সহ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন। মিয়ানমার তথ্যমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাউ থান্ট বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার সাথে এবং উ অহন গিয়াও বাংলাদেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। UNHCR এর প্রধান মি. দারিয়াশ বন্দর (Mr. Darioush Bayander) মিয়ানমার পররাষ্ট্রমন্ত্রী উ অহন গিয়াও এর সাথে মিলিত হন। (*Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M. Sec., File No. 603, visit of Myanmar Foreign Minister U Ohn Gyaw; *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৫ এপ্রিল, ১৯৯২; *দৈনিক বাংলা*, ২৩ এপ্রিল, ১৯৯২; *দৈনিক ইত্তেফাক* ২৮ এপ্রিল, ১৯৯২; *দৈনিক সংবাদ*, ২৬ এপ্রিল, ১৯৯২।)

৫৫ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M.Sec., File No. 130, Repatriation Agreement.

৫৬ *Ibid.*

৫৭ *Ibid.*; 9 June, 1992; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ এপ্রিল, ১৯৯২।

৫৮ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ এপ্রিল, ১৯৯২ ও *The Daily Star*, 30 April, 1992.

৫৯ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ এপ্রিল, ১৯৯২; *দৈনিক আজকের কাগজ*, ৩০ এপ্রিল, ১৯৯২; *Holiday*, 9 June, 1992.

৬০ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M.Sec., File No. 118, UNHCR Affairs & File No. 104, Press Report; *দৈনিক সংবাদ*, ৮ এপ্রিল, ১৯৯২; *The Morning Sun*, 8 May, 1992; *Holiday*, 19 June, 1992.

৬১ *দৈনিক জনতা*, ৯ এপ্রিল, ১৯৯২; *The Morning Sun*, 8 May, 1992.

৬২ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M.Sec., File No. 116 (B), Senior Official Meeting; *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৭ মে, ১৯৯২; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ মে, ১৯৯২।

৬৩ *Ministry of Foreign Affairs*, Ibid.; *দৈনিক সংবাদ*, ২৮ জুন, ১৯৯২।

৬৪ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ আগস্ট, ১৯৯২।

৬৫ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M.Sec., File No. 104, Press Report; *দৈনিক বাংলা বাজার*, ৮ আগস্ট, ১৯৯২।

৬৬ *দৈনিক দিনকাল*, ১ অক্টোবর, ১৯৯২।

৬৭ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M.Sec., File No. 601, VIP visit between two countries; *দৈনিক বাংলা*, ২৩ আগস্ট, ১৯৯২।

৬৮ *দৈনিক দিনকাল*, ৩ অক্টোঃ, ১৯৯২।

৬৯ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M.Sec., File No. 116 (B), Senior Official Meeting; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ অক্টোবর, ১৯৯২।

৭০ *New Straits Times*, 9 November, 1992; *দৈনিক বাংলা বাজার*, ২০ নভেম্বর, ১৯৯২।

৭১ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M.Sec., File No. 116 (B), Senior Official Meeting.

www.pathagar.com

৭২ *দৈনিক বাংলা বাজার*, ২৪, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯২; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২; *দৈনিক আজকের কাগজ*, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯২; *দৈনিক সংগ্রাম*, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯২।

৭৩ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M.Sec., File No. 115, Internal Ministrial Meeting.

৭৪ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M.Sec., File No. 118, UNHCR Affairs; *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ জানুঃ, ১৯৯৩; *দৈনিক সংবাদ*, ১৪ জানুঃ, ১৯৯৩; *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২৪ জানুয়ারি, ১৯৯৩।

৭৫ *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২৪ জানুয়ারি, ১৯৯৩; *দৈনিক দিনকাল*, ১১ মার্চ, ১৯৯৩।

৭৬ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M.Sec., File No. 118, UNHCR Affairs; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ মে, ১৯৯৩।

৭৭ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ ও ১৬ মে, ১৯৯৩।

৭৮ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M.Sec., File No. 605, Myanmar Home Ministers Visit.

৭৯ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ মে, ১৯৯৩।

৮০ *শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার এর কার্যালয়*, কক্সবাজার; *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ৯ নভেম্বর, ১৯৯৩।

৮১ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M.Sec., File No. 118, UNHCR Affairs.

৮২ *Ibid.*

৮৩ *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ৯ নভেম্বর, ১৯৯৩; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২, ৪ ও ৯ নভেম্বর, ১৯৯৩; *দৈনিক আজকের কাগজ*, ২০ নভেম্বর, ১৯৯৩।

৮৪ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৯ নভেম্বর, ১৯৯৩।

৮৫ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৩।

৮৬ *দৈনিক বাংলা বাজার*, ৩০ এপ্রিল, ১৯৯৪।

৮৭ *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২১ জানুয়ারি, ১৯৯৫।

৮৮ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M.Sec., File No. 408, Repatriation of Myanmar Nationals; রকিব উদ্দিন আহমেদ, উপ-সচিব, *শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার এর কার্যালয়*, কক্সবাজার।

৮৯ *Ministry of Foreign Affairs*, SEA, M.Sec., File No. 408, Repatriation of Myanmar Nationals; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ এপ্রিল, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।

৯০ *দৈনিক ইনকিলাব*, ৫ আগস্ট, ১৯৯৭; *দৈনিক আজকের কাগজ*, ৩১ জুলাই, ১৯৯৭।

৯১ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১ জুলাই, ১৯৯৯।

৯২ *দৈনিক মুক্তকণ্ঠ*, ২৬ নভেম্বর, ১৯৯৮।

৯৩ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১ জুলাই, ১৯৯৯; *দৈনিক সংবাদ*, ২ জানুয়ারি, ১৯৯৯; *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১৮ জানুয়ারি, ২০০০।

৯৪ *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১১ জুলাই, ১৯৯৯।

৯৫ *দৈনিক ইনকিলাব*, ১২ জুলাই, ১৯৯৯; *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১১ জুলাই, ১৯৯৯।

৯৬ *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১১ জুলাই, ১৯৯৯; *দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ জানুয়ারি, ২০০০।

৯৭ *দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ জানুয়ারি, ২০০০।

৯৮ *দৈনিক আজকের কাগজ*, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৮।

৯৯ *দৈনিক মুক্তকণ্ঠ*, ২২ মার্চ, ১৯৯৮; *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১১ জুলাই, ১৯৯৯।

১০০ *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১৯ জুলাই, ১৯৯৯।

১০১ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১০।

www.pathagar.com

১০২ উল্লেখ্য, ঢাকায় অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশের ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব মিজারুল কায়েস এবং মিয়ানমারের ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন মিয়ানমারের উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্রসচিব মং মিন্ত। [*দৈনিক সংগ্রাম*, ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৯।]

১০৩ *দৈনিক সমকাল*, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯।

১০৪ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, খাদ্যমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক বলেন ' রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যায় বিদেশী গণমাধ্যম বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে' *দৈনিক আমার দেশ*, ১৯ মার্চ, ২০১০।

১০৫ *প্রথম আলো*, ২২ এপ্রিল, ২০১০।

১০৬ *দৈনিক সমকাল*, ১০ নভেম্বর, ২০০৯।

১০৭ *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০।

১০৮ *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২৬ এপ্রিল, ২০১১।

১০৯ *প্রথম আলো*, ২১ এপ্রিল, ২০১১।

১১০ *দৈনিক যুগান্তর*, ২৯ এপ্রিল, ২০১১।

১১১ *প্রথম আলো*, ২১ এপ্রিল, ২০১১।

১১২ *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ৮ ডিসেম্বর, ২০১১।

১১৩ *কালের কণ্ঠ*, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

১১৪ *তদেব*।

১১৫ *তদেব*।

১১৬ *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ৪ আগস্ট, ২০১৭। উল্লেখ্য, বিশ্বের ৫৭টি মুসলিম দেশের জোট ওআইসির মহাসচিব চার দিনের সফরে ২ আগস্ট বুধবার রাতে ঢাকায় এসেছেন। ২০১৬ সালের নভেম্বরে মহাসচিবের দায়িত্ব নেওয়ার পর বাংলাদেশে এটিই তাঁর প্রথম সফর। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ২০১৭ সালের ৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার দুপুরে সাক্ষাতের পর ওথাইমিন সাংবাদিকদের বলেন, 'রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তাদের মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের পরিচয় ও স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। তাদের অবশ্যই পূর্ণ নাগরিকত্ব ও নিজেদের দেশে ফেরার সুযোগ দিতে হবে।'

১১৭ উল্লেখ্য, এমওইউ স্বাক্ষরের আগে সকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ আলী ও মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সেলর অং সান সু চি'র সঙ্গে তার দফতরে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মাহমুদ আলী সাংবাদিকদের বলেন, আমরা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রথম ধাপ অতিক্রম করলাম। এখন দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু করবো। বুধবার দিনভর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিব মিয়ানমারের মন্ত্রী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এমওইউ নিয়ে আলোচনা ও দর কষাকষি করেন। এ নিয়ে এক পর্যায়ে টানাপোড়েনেরও সৃষ্টি হয়। কয়েকটি ইস্যুতে সরাসরি আপত্তি ও দ্বিমত আসে। বাংলাদেশের প্রস্তাব ছিল দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা চুক্তিতে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার সম্পৃক্ততা এবং প্রত্যাবাসন শেষ করার সময়সীমা নির্ধারণ করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দুটি প্রস্তাব এমওইউ'তে স্থান পায়নি। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার ভিত্তি ও নীতি ১৯৯২ সালের যৌথ ঘোষণাকে অনুসরণ করার কথা মিয়ানমার বারবার বলে আসছিলো। বাংলাদেশ এর বিরোধিতা করে। তবে শেষ পর্যন্ত মিয়ানমারের ইচ্ছা অনুযায়ী এমওইউ'তে ১৯৯২ সালের যৌথ ঘোষণার নীতি ও দিক-নির্দেশনা তথা রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ও কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে প্রত্যাবাসন শুরুর বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিলো, ১৯৯২ সালের পরিস্থিতি ও ২০১৭ সালের বাস্তবতা এক নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিপরীত। তাই তখনকার নীতি বর্তমানে অনুসরণ করা যায় না। কিন্তু মিয়ানমার ১৯৯২ সালের ফর্মুলায় অনড় থাকায় তার ভিত্তিতেই এমওইউ সই হয়। এছাড়া রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া যাতে প্রলম্বিত না হয় সেজন্য বাংলাদেশ নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল। তাও এমওইউ'তে নেই। অন্যদিকে মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সেলর

www.pathagar.com

দফতরের পক্ষ থেকে ঐ দিন সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ১৯৯২ সালে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের যৌথ ঘোষণা অনুযায়ী রাখাইন রাজ্যের বাস্তুচ্যুত লোকদের পদ্ধতিগতভাবে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করা হবে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও মানবাধিকার কাউন্সিলের প্রস্তাব পাস কাটিয়ে ওআইসি-সহ পশ্চিমা দেশগুলো এই সমস্যাকে আন্তর্জাতিক ইস্যু হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদও এই ইস্যুতে প্রেসিডেন্সিয়াল বিবৃতি দিয়েছে। কিন্তু মিয়ানমারের নীতিগত অবস্থান হচ্ছে, দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যেকোনো ইস্যুর উদ্ভব হলে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে তার নিষ্পত্তি করতে হবে। নতুন এই এমওইউ'তে দুই দেশ সমানভাবে লাভবান হবে। যা বন্ধুত্ব ও সুপ্রতিবেশীমূলক সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। এটি মিয়ানমারের দৃঢ় নীতির প্রতিফলন। [*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ নভেম্বর, ২০১৭।]

১১৮ ড. আবদুল লতিফ মাসুম, "রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে সংশয়," উপসম্পাদকীয় *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৪ নভেম্বর ২০১৭।

১১৯ আলফাজ আনাম, "রোহিঙ্গাদের ফেরাতে নতুন চ্যালেঞ্জ" উপসম্পাদকীয়, *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৮ নভেম্বর, ২০১৭।

১২০ ড. আবদুল লতিফ মাসুম, "রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে সংশয়," উপসম্পাদকীয় *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৪ নভেম্বর, ২০১৭।

১২১ উল্লেখ্য, ড. মং জার্নি মিয়ানমারের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে পাশ্চাত্যে সবচেয়ে সোচ্চার ব্যক্তিদের অন্যতম। জন্ম ১৯৬৩ সালে মিয়ানমারের মান্দালয়ে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং উইসকনসিন-মেডিসন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৮ সালে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছেন। শিক্ষকতা করেছেন লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস, অক্সফোর্ড ও হার্ভার্ডে। ১৯৯৫ সালে তিনি প্রবাসী বর্মি ভিন্নমতাবলম্বীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন ফ্রি বার্মা কোয়ালিশন। ৩০ বছর ধরে মিয়ানমারের মানবাধিকারের প্রবক্তা হওয়ার কারণে বর্মি সরকার ও তাদের সমর্থক মিডিয়ার কাছে তিনি 'রাষ্ট্রদ্রোহী', এমনকি তাঁকে 'জাতীয় বিশ্বাসঘাতক' হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর কুয়ালালামপুরের পুলম্যান হোটেলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে এবং পরে ই-মেইল যোগাযোগের ভিত্তিতে এই সাক্ষাৎকার তৈরি করছেন সাংবাদিক মিজানুর রহমান খান। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: ড. মং জানির বিশেষ সাক্ষাৎকার, 'রোহিঙ্গা গণহত্যার নীলনকশা তৈরি হয় ১৯৬৬ সালে' *প্রথম আলো*, অনলাইন ভার্সন, ১৫ অক্টোবর, ২০১৭। অথবা দ্রষ্টব্য: http://www.amadershomoy.biz/unicode/2017/10/16/345045.htm

১২২ উল্লেখ্য, মিয়ানমারের সাথে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এটা এক্ষেত্রে তৃতীয় উদ্যোগ। এর আগে ১৯৭৮ সালে দুই দেশ চুক্তি করেছিল। সেই চুক্তির অধীনে দুই লাখ ৪০ হাজার রোহিঙ্গা ছয় মাসের মধ্যে ফেরত যায়। পরে ১৯৯২ সালে দুই দেশের মধ্যে আরেকটি সমঝোতা হয়, যার অধীনে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দুই লাখ ৩৬ হাজার রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফেরত যায়। [*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ নভেম্বর, ২০১৭।]

১২৩ ড. আবদুল লতিফ মাসুম, "রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে সংশয়," উপসম্পাদকীয়, *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৪ নভেম্বর, ২০১৭।

১২৪ আলফাজ আনাম, "রোহিঙ্গাদের ফেরাতে নতুন চ্যালেঞ্জ" উপসম্পাদকীয়, *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৮ নভেম্বর, ২০১৭।

১২৫ আলফাজ আনাম, "রোহিঙ্গাদের ফেরাতে নতুন চ্যালেঞ্জ" উপসম্পাদকীয়, *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৮ নভেম্বর, ২০১৭।

১২৬ *সমকাল*, ২২ অক্টোবর, ২০১৭।

www.pathagar.com

১২৭ ড. আবদুল লতিফ মাসুম, "রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে সংশয়," উপসম্পাদকীয় *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৪ নভেম্বর ২০১৭।

১২৮ *যুগান্তর*, ২৩ নভেম্বর, ২০১৭।

১২৯ ড. আবদুল লতিফ মাসুম, "রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে সংশয়," উপসম্পাদকীয় *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৪ নভেম্বর, ২০১৭।

১৩০ রেডিও তেহরানে দেয়া সাক্ষাৎকারে বিশিষ্ট নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও ন্যাশনাল সলিডারিটি ফর দ্যা রোহিঙ্গা মোর্চার আহ্বায়ক মেজর জেনারেল (অব) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক। http://parstoday.com/bn/news/bangladesh-i47622

১৩১ এবনে গোলাম সামাদ, 'মিয়ানমারের মিথ্যাচার' উপসম্পাদকীয় *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২০ অক্টোবর ২০১৭।

১৩২ আলফাজ আনাম, "রোহিঙ্গাদের ফেরাতে নতুন চ্যালেঞ্জ" উপসম্পাদকীয়, *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৮ নভেম্বর ২০১৭।

১৩৩ আলফাজ আনাম, "রোহিঙ্গাদের ফেরাতে নতুন চ্যালেঞ্জ" উপসম্পাদকীয়, *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৮ নভেম্বর ২০১৭।

১৩৪ *প্রথম আলো*, ২৯ নভেম্বর, ২০১৭।

১৩৫ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৮ নভেম্বর, ২০১৭।

১৩৬ *প্রথম আলো*, ২৯ নভেম্বর, ২০১৭।

১৩৭ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, অনলাইন, ২৩ জানুয়ারি ২০১৮। উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে বাংলাদেশের শরণার্থী প্রত্যাবাসন বিষয়ক কমিশনার আবুল কালাম আজাদ বলেছেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে প্রকৃত প্রত্যাবাসন শুরু হতে আরো সময় লাগবে। তিনি বলেন, ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর মিয়ানমারের রাজধানী নেইপিডোতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সইয়ের মাধ্যমে রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ রূপরেখা বাস্তবায়নের জন্য ১৯ ডিসেম্বর ঢাকায় যৌথ কার্যকরী গ্রুপ (জেডব্লিউজি) গঠন করা হয়েছে। আর মাঠপর্যায়ে সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে ১৬ জানুয়ারি নেইপিডোতে ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট সই করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। এখন আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছি। প্রত্যাবাসনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এটি সম্পন্ন হলে প্রকৃত প্রত্যাবাসন কাজে হাত দেয়া যাবে। [বিস্তারিত জানার জন্য, https://www.theguardian.com/world/2018/jan/22/rohingya-muslims-repatriation-back-to-myanmar-postponed]

১৩৮ *দৈনিক নয়া দিগন্ত* অনলাইন, ১৯ জানুয়ারি ২০১৮।

১৩৯ *দৈনিক সংবাদ*, ১৫ আগস্ট, ১৯৯৭; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ আগস্ট, ১৯৯৭; *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৪ আগস্ট, ১৯৯৭।

১৪০ *দৈনিক যুগান্তর*, অনলাইন সংস্করণ, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭; *এনটিভি*, অনলাইন, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

১৪১ *বিবিসি বাংলা*, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

পত্র-পত্রিকায় রোহিঙ্গা সমস্যার প্রতিফলন

বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতা, মোবাইল সংস্কৃতির বিস্তৃতি, নানা ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রভৃতি বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। তদুপরি দীর্ঘকালব্যাপী একটি দেশ, একটি জনগোষ্ঠী অথবা সে দেশের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশে সংবাদপত্র সব চেয়ে উৎকৃষ্টতম ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতেই প্রতিফলিত হয় দেশের সরকার এবং সাংবাদিক-লেখক-বুদ্ধিজীবীসহ দেশের সব চেয়ে সচেতন জনগোষ্ঠীর মতামত। আরাকানে রোহিঙ্গাদের উপর মিয়ানমার সরকারের নিষ্ঠুর নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, জবরদস্তি শ্রম, নিজস্ব বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদকরণসহ মানবাধিকার লংঘনের চরম পর্যায়ে রোহিঙ্গারা স্বদেশভূমি ত্যাগ করে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকেই আশ্রয়দাতার ভূমিকা পালন করতে হয়। মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নির্যাতন ও গণহত্যা, বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণ, এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সম্পৃক্ততা প্রভৃতি বিষয়সমূহ বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের পত্র-পত্রিকার প্রতিফলিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপস্থাপন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। তবে এ বিষয়ে অবতারণা করার ক্ষেত্রেও বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫.১ মিয়ানমারে নাগরিক নির্যাতন ও রোহিঙ্গা

দীর্ঘদিন যাবৎ সামরিক জান্তা কর্তৃক শাসিত হবার কারণে গোটা মিয়ানমারেই বিভিন্ন শ্রেণির জনগণ কমবেশি নির্যাতিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী অং সান সুচিসহ National League for Democracy (NLD) ও National Democracy League for Human Rights (NDLHR) এর নেতা-কর্মীবৃন্দ এবং শান, কাচিন, কারেনসহ বিভিন্ন রাজ্যে স্বাধীনতাকামী জনগণ SLORC জান্তার কাছে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল থেকে জিম্মি।[১] এ অবস্থায় অং সান সুচির হাতে গণতন্ত্রের বিজয় হলে দেশের সকল জনগোষ্ঠী বিশেষত সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভাগ্যে মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দেবে- এমন প্রত্যাশা ছিল খোদ রোহিঙ্গাসহ গোটা বিশ্ববাসীর। কিন্তু গণতান্ত্রিক সংগ্রামের শান্তিপ্রতীক (!) নেত্রী নোবেল বিজয়ী অংসান সুচির হাতে গণতন্ত্রয়ানের সূচনা হলেও রোহিঙ্গাদের সংকট সমাধানের কোন সম্ভাবনা তো তৈরি হয়ইনি বরং তার সমর্থিত সরকারের হাতেই রোহিঙ্গাদের উপর এ যাবতকালের সবচেয়ে ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে।

৫.১ ক) রোহিঙ্গা বসতি উচ্ছেদ ও মগ প্রত্যাবসন

কোন ব্যক্তিকে তার বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে অমার্জনীয় অপরাধ হলেও আরাকানের মগসেনা ও স্থানীয় মগজনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের সাথে সরকারি পরিকল্পনার ভিত্তিতে নির্বিঘ্নে এধরনের অমানবিক আচরণ করে চলছে।

www.pathagar.com

তারা রোহিঙ্গা জনবসতিকে উচ্ছেদ করে মিয়ানমারের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মগদের এনে সে স্থানে পুনর্বাসন করছে এবং পুনর্বাসিত মগ পরিবারের ভরণ-পোষণের খরচ যোগানোর দায়িত্বও রোহিঙ্গাদের উপর বর্তায়। বিভিন্ন ইস্যুতে নানারকম লোমহর্ষক নির্যাতন-নিষ্পেষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করে বার্মার অন্যান্য অঞ্চল থেকে মগদের এনে আরাকানে বসতি স্থাপন করানোর মধ্যদিয়ে মুসলিম জাতিসত্তার বিনাশ সাধন করে মগদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বানানোর জন্য মিয়ানমার সরকার অত্যন্ত তৎপর। ফলে সরকারি পৃষ্টপোষকতায় লালিত ও প্রত্যাবাসিত মগরা বেপরোয়াভাবে প্রশাসনের সহায়তায় রোহিঙ্গদের উপর বিভিন্নমুখী নির্যাতন চালায়।

মিয়ানমার সমাজতন্ত্রী সামরিক জান্তা ১৯৯২ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে আরাকানের পার্বত্যগঞ্জ মংডু টাউনশিপের ৭/৮ মাইল উত্তরে ১০টি এবং ২৪ মাইল দক্ষিণে পাঁচটি রোহিঙ্গা পল্লীকে বাস্তব অর্থে 'মগের মুল্লুকে' পরিণত করে। ১৯৯২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সেখানকার কয়েকটি গ্রাম থেকে পালিয়ে আসা আবদুল কাইউম, রফিক, মোহাম্মদ আলী প্রমুখের মত সচ্ছল অবস্থা সম্পন্ন কৃষক-গৃহস্থী কক্সবাজারের মরিচ্যাপালংয়ে সাংবাদিকদের কাছে বিবরণ দিয়েছে যে, মধ্য জানুয়ারি থেকে এ যাবৎ মগসেনা, লুনথিন, গোয়েন্দা পুলিশ ও মগমাস্তানদের তদারকিতে দক্ষিণ মংডুর ৫টি গ্রাম যথা- আংডাং, বসরাপাড়া, চকপেংডু, কোয়েন্চ, ও কুল্লুমে ৫৬টি মগপরিবারকে অন্যস্থানে থেকে এনে বসতি স্থাপন করেছে। শুধুমাত্র মগবসতি স্থাপন করেই শেষ নয় বরং প্রত্যাবাসিত মগদের জন্য স্থানীয় রোহিঙ্গাদের নিজেদের মধ্য থেকে সংগ্রহ করে প্রতিদিন দু'বেলায় ৭০ কেজি করে চাল, ২০ কেজি গরু, খাসি, বা মুরগির গোশত এবং প্রয়োজনীয় তরিতরকারীসহ আহার্য দ্রব্য সামগ্রীর যোগান দিতে হয়। এ ছাড়া উল্লেখিত ৫টি গ্রামের প্রতিটি রোহিঙ্গা পরিবার পিছু ১০০ কিয়াট হারে মাসিক চাঁদা দিতে হয়। এমন কি মগদের বসতবাড়ী নির্মাণের সময় কারিগর-মিস্ত্রি ও কাজের মেয়ে পর্যন্ত রোহিঙ্গাদেরই যোগাতে হয়েছিল। একই প্রক্রিয়ায় উক্ত পাঁচটি গ্রামে পর্যায়ক্রমে ২২৫ একরে আরো ৭০০ মগ পরিবার বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এসময় মংডুর উত্তরে ১০টি মুসলিম পল্লীতে মগবসতি স্থাপন, ক্যাম্প নির্মাণ, রাস্তাঘাট উন্নয়ন ও সামরিক রসদপত্র বহনের জন্য সেনাবাহিনীর নির্দেশে সেখানে দৈনিক ১০০ জন মিস্ত্রি-কারিগর, ৩০০ জন কুলি এবং ৪০ জন মহিলাকে খাটানো হয়। মগনামাপাড়া, প্যখালি, নাইংচং, জান্নন্যা, করইতলী, টেরিপাড়া, কাউয়ারবিল, নাকবিল, কুলারবিল, ও জৈদন্যাখালী নামক এ ১০ টি মুসলিম পল্লীর প্রত্যেকটি থেকে মিস্ত্রি, কুলি ও মহিলা যথাক্রমে ১০,৩০ ও ৪ জন করে সরবরাহের এক নির্দেশের প্রেক্ষিতে রোহিঙ্গা নর-নারীরা এমন অমানবিক শ্রমে বাধ্য হয়। তাছাড়া এ সব গ্রাম থেকে বর্মীবাহিনীকে চাল, অর্থ; খাদ্য-সামগ্রী নিয়মিতভাবে যোগান দেয়া বাধ্যতামূলক।[২]

আরাকানের রোহিঙ্গা বসতিপূর্ণ এলাকাসমূহে ১৯৯২ সালের ২০ মে'র মধ্যে অন্তত ১ লক্ষ সংখ্যালঘু (মগ, মুরস, চাক) বৌদ্ধকে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে। এদেরকে

www.pathagar.com

পার্বত্য আরাকানসহ মিয়ানমারের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সরকারি পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়; তারা নগদ অর্থ, খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান, চাষের জমি ও হালের বলদ, ব্যবসা-বাণিজ্যে নিরাপত্তা এবং সরকারি-বেসরকারি চাকরিসহ সর্বক্ষেত্রে সরকারের আনুকূল্য পেয়ে থাকে।[৩]

আরাকানে রোহিঙ্গাদের উচ্ছেদ করে মগদের পুনর্বাসনই শুধু নয় বরং মিয়ানমার সরকার তাদের সকল অপকর্ম সমর্থনপূর্বক রোহিঙ্গা উচ্ছেদে যে কোন ধরনের কর্মসূচিতে উৎসাহিত করে থাকে। তারা সরকারি সহায়তায় পাড়ায় পাড়ায় শান্তি কমিটি গঠনের নামে ক্যাডার বা সন্ত্রাসীবাহিনী তৈরি করে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন চালায়। আরাকানে রোহিঙ্গা উচ্ছেদে মগসন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দল হিসেবে কাজ করে থাকে। আমিনুল হক চৌধুরী সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন-

> বার্মার সামরিক জান্তা আরাকান এলাকায় আইন শৃংখলা রক্ষার নামে মগ যুবকদের লইয়া পাড়ায় পাড়ায় শান্তিকমিটি গঠন করিয়াছে। এখন এই সব কমিটির মাধ্যমে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালানো হইতেছে। গতকাল (১২ মার্চ, ১৯৯২) শুক্রবার কথিত শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান মেজর এঁকো আগামী ২০ দিনের মধ্যে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার সমস্ত কবরস্থান ও মাদ্রাসা দখল করিবার জন্য শান্তিকমিটির প্রতি এক নির্দেশ দিয়াছে। এইসব এলাকায় মগসম্প্রদায়ের ঘর-বাড়ী ও মন্দির নির্মাণের জন্য বলা হইয়াছে।...[৪]

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সরাসরি মদদ পেয়ে শত শত মগযুবক প্রকাশ্য দিবালোকে ধারালো অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরাফেরা করে। তাদের ভয়ে রোহিঙ্গারা কেউ বাড়ি থেকে বের হতে সাহস পায় না। ঐ সব মগযুবক প্রতিনিয়ত বাড়ি ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে অত্যাচার করে। মহিলারাও তাদের অত্যাচারের শিকার হয়। তারা আকিয়াব জেলার জালিয়াপড়া গ্রামের ২টি জামে মসজিদে শুক্রবারে জুমার নামাজ পড়তে দেয় নি। মিয়ানমারের সামরিক জান্তা 'রোহিঙ্গারা কেউ মিয়ানমারের নাগরিক নয়' বলে প্রকাশ্যে মাইক যোগে প্রচার করে।[৫]

সাংবাদিক শফিউল আলম প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন :

> এদিকে বর্মী জান্তার 'অপারেশন পীথায়া' অভিযানের আওতায় মুসলিম আরাকানে মগ-বৌদ্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধির নীলনকশা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলতি বছরের মধ্যে কেবল মংডু ও বুচিদং এলাকায় ৪ হাজার গুচ্ছগ্রাম স্টাইলের বসতি নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে ২ শতাধিক বসতি নির্মিত হয়েছে। সেখানে আরাকানের গহীন পার্বত্য অঞ্চলসহ অন্য প্রদেশের অধিবাসী মগ, ম্রস, খুই, চাক ও মার্মাদের ঠাঁই হয়েছে। জানা গেছে, আরাকানে আনীত এসব সংখ্যালঘু বৌদ্ধের কর্মসংস্থানের জন্য টংবাজারের কাছে একটি কাগজ কল স্থাপনের পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে দীর্ঘ অবহেলিত

www.pathagar.com

মুসলিম আরাকানে এটি হবে প্রথম শিল্প প্রতিষ্ঠান। একই সাথে পুনর্বাসিত বৌদ্ধদের জন্য ব্যাপকভাবে জমি বরাদ্দ, চিকিৎসাসহ সব রকম সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে। মুসলিম রোহিঙ্গা পরিবারগুলো থেকে অত্যাবশ্যকীয় চাঁদা, ধান-চাল প্রভৃতি উসুল করে নব বসতি গড়া হচ্ছে। আরাকানে বিশেষ করে মংডু, বুচিদং, রাসিদং, ও আকিয়াব মহকুমায় সরকারি উদ্যোগে মুসলিম উচ্ছেদ এবং মগবৌদ্ধ পুনর্বাসনের ব্যাপক তৎপরতার মুখে রোহিঙ্গারা দেশান্তরী হচ্ছে।[৬]

উপরোদ্ধৃত রোহিঙ্গা বসতি উচ্ছেদ ও মগ প্রত্যাবাসনের চিত্র ১৯৯১-৯২ সালের মাঝামাঝি সময়ের। ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে এক সেনা অফিসারের আদেশে বুচিদং এলাকার এক মাইল পূর্বে কিনথামা পালেটং গ্রামে ৫৫৩ নং সেনা রেজিমেন্ট তৈরির জন্য রোহিঙ্গাদের ৪৫০টি বাড়ি ধ্বংস এবং বসতবাড়ী ও কৃষি খামারের ২০০ একর জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উক্ত বাজেয়াপ্তকৃত জমিতে ৬০ × ২৪ ফুট মাপের কয়েকটি সেনা ছাউনি নির্মাণ করা হবে; এতে নানরাগণ, পিনসে, মাওগিতাউং, কিথেমা ও পাওংবাইন এলাকার প্রতিটি পরিবারকে ৫০০ নোজ করে বাঁশ যোগান দিতে আদেশ করা হয়েছে। সেইসাথে সেনা ছাউনি নির্মাণের জন্য রোহিঙ্গাদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে।[৭] এসব চিত্র থেকে অনুমান করা যায় যে, মিয়ানমার সরকার আরাকান থেকে মুসলিম জাতিসত্ত্বা বিনাশে কতখানি তৎপর।

মিয়ানমার সীমান্তে বাঁধনির্মাণ ও কাঁটা তারের বেড়া তৈরিকে ঘিরে ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে নতুন করে রোহিঙ্গা নির্যাতন শুরু হয়। নানা অজুহাতে রোহিঙ্গাদের উপর অমানবিক নির্যাতন করে সেনাসদস্য ও স্থানীয় মগরা। এ প্রেক্ষিতে মাত্র চার মাসে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের ১৩টি পয়েন্ট দিয়ে প্রায় ত্রিশ হাজার রোহিঙ্গা তাদের বসতবাড়ি ছেড়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করে তারা রোহিঙ্গাদের উচ্ছেদকৃত বাড়িঘরে মগদের পুনর্বাসন করে। বিশেষত মাত্র মাত্র চার মাসের মধ্যে আরাকানের মংডু এলাকায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আনা প্রায় দশ হাজার মগকে রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত বসতবাড়িতে পুনর্বাসন করা হয়।[৮] এসব বসতিপূর্ণ গ্রামগুলোকে 'মডেল ভিলেজ' নামকরণ করা হয়। মাত্র কয়েকমাসে শুধুমাত্র মংডুতেই ৪০টি মডেল ভিলেজ তৈরির কাজ প্রায় সমাপ্ত করা কথাও জানা যায়।[৯] মিয়ানমারের সামরিক জান্তা পরিকল্পিতভাবে এ্যাকশন প্লানের আওতায় এ সব গ্রামগুলোতে রোহিঙ্গাদের তাড়িয়ে দিয়ে মগদের পুনর্বাসন করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।[১০] এ অভিযোগের সত্যতা মিলেছে ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের বক্তব্যে। টেকনাফের জালিয়াপাড়া দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী আরাকানের মংডু শহরের মেরুল্যা ও মনিপাড়ার অধিবাসী পঞ্চাশ বছর বয়সী আবদুল জলিল, খলিলুর রহমান, ফাতেমা বেগম, মায়মুনা খাতুন জানায়, সামরিক জান্তা তাদের ঘরবাড়ি দখল করে বসবাস করছে। কোন কোন বাড়িতে মগদেরকে উঠিয়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

আবাদী জমিজমা সব দখল করে নিয়েছে। নিরূপায় হয়ে তারা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে।[১১] মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের বুচিদং থানার তৈতইপুক গ্রামের ছিদ্দিক আহমদের ছেলে আলী আহমদ (৬০) আট বছর থেকে বাংলাদেশে আশ্রিত জীবন যাপন করছেন। তিনি জানান, আরাকানের নিজগ্রামে জন্মথেকে ৫২ বছর কাটিয়েছি। বসতবাড়িসহ ও ১০ কানি জমিও দখল করে নেয় সেনাসদস্য ও মগরা।[১২] সুখের সংসার ছেড়ে বাংলাদেশে এসেছেন জীবন বাঁচাতে। বর্তমানে টেকনাফ সদরের কেরুনতলী অঞ্চলে পাহাড়ের পাদদেশে একটি খড়ের ঘরে বসবাস করেন। তবুও এখানেই তিনি পরম সুখ অনুভব করেন। নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার কথা বললে তিনি জানান, আরাকানে জীবনের নিরাপত্তা এবং বাড়িঘর ও জমিজমা ফেরত পেলেই তিনি নিজ দেশে ফিরে যাবেন।

রোহিঙ্গা বিষয়ের একটি প্রবন্ধে মুহাম্মদ খায়রুল বাশার উল্লেখ করেন, এখনও রোহিঙ্গারা বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত সংখ্যালঘু। ২০১২ সালে মিয়ানমারের কয়েক লক্ষ সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গাদেরকে তাদের বাড়িঘর ও ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে পারেনি, তাদেরকে স্থানীয়ভাবে শরণার্থী ক্যাম্পে রাখা হয়। এভাবে ১ লাখ ৪০ হাজার রোহিঙ্গাকে দারিদ্র্যপীড়িত ও জঘন্য পরিবেশে রাখা হয়। এটা মূলত উন্মুক্ত কারাগার। সেখানে তারা ভোট দিতে পারে না। তাদের ছেলেমেয়েদের স্থানীয় স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়। স্কুলের দরজা তাদের জন্য বন্ধ। রোহিঙ্গাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। ২০১৫ সালেই মিয়ানমার থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হাজার হাজার রোহিঙ্গা নৌকায় করে আন্দামান সাগর পাড়ি দিয়েছে। তারা থাইল্যান্ড অথবা ইন্দোনেশিয়ায় আশ্রয় লাভের আশায় সাগর পাড়ি দিয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়।[১৩] এমতাবস্থায় নারী-শিশুসহ হাজারো রোহিঙ্গা সম্প্রতি মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় করে মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের দিকে পাড়ি জমায়। মানব পাচারকারীদের শিকার হওয়া ছাড়াও নির্যাতন ও দমনপীড়নের কারণে তারা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। ২০১৬-১৭ সালে গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিয়ে মুসলিম শূণ্য করে ফেলেছে। সেইসাথে রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর থেকে শুরু করে স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি স্থানীয় মগ-বৌদ্ধরা দখল করে ফেলেছে।

৫.১ খ) বাধ্যতামূলক শ্রম, যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা, অগ্নিসংযোগ

শ্রমের মূল্য পাওয়া শ্রমিকের অধিকার এবং শ্রম বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও তার স্বাধীনতা রয়েছে। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রম আইন রয়েছে। কিন্তু মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশে রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে এর বিপরীত অবস্থা বিরাজমান। সেখানে রোহিঙ্গা শ্রমিকের শ্রম বিনিয়োগে যেমন স্বাধীনতা নেই, তেমনি শ্রমের মজুরি পাবার নিশ্চয়তাও অকল্পনীয়। সেখানে তারা রোহিঙ্গা যুবক-যুবতীদেরকে কৃতদাস-দাসীর মত ব্যবহার করে, কিন্তু শ্রমের মজুরি দেয় না।[১৪] তারা রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেনাক্যাম্প তৈরি,

www.pathagar.com

যুদ্ধ বিমানঘাটি নির্মাণ, মাটিকাটা, যুদ্ধাস্ত্র ও রসদ বহনসহ বিভিন্ন কাজের জন্য তাদের বসতবাড়ী থেকে ধরে এনে বন্দী শিবিরের মত দিনের পর দিন খাটানো হয়। ১৯৯২ সালে মিয়ানমার সামরিক জান্তা পার্বত্য আরাকানের কিয়ত্ত থেকে পলেওয়া পর্যন্ত ৬০ কিলোমিটার ব্যাপী গিরিপথ তৈরির জন্য প্রায় ১০ হাজার রোহিঙ্গা যুবককে নির্দয়ভাবে খাটায় এবং আরও প্রায় সমসংখ্যক যুবককে আরাকানে রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, সেনাক্যাম্প তৈরি, যুদ্ধ বিমান ঘাটি নির্মাণ, মাটিকাটা, যুদ্ধাস্ত্র ও রসদ বহনের কাজে বাধ্য করা হয়।[১৫] রোহিঙ্গাদের কেউ শ্রম দানে অস্বীকৃতি জানালে কিংবা মজুরি দাবি করলে মগসেনারা তাদের উপর অবর্ণনীয় পাশবিক নির্যাতন চালায়। কেউ কেউ এতে প্রতিবাদ করলে গাছের সাথে বেঁধে শরীরে গরম পানি ঢেলে দেয়, নাকের ভিতর উত্তপ্ত লোহার রড ঢুকিয়ে দেয়।।[১৬] এসব শ্রমিককে কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়েও খাবার দেয়া হয় না বরং কঠোর শ্রমদানে অপারগ হলে অনেকের চোখ উপড়ে নেয়, নখের ভিতর সূঁচ ঢুকিয়ে দেয় এবং কাউকে দেহের জোড়ায় আঘাত করে বিকলাঙ্গ করে ফেলে রাখে।[১৭] সাংবাদিক হোসাইন দিদার-এর প্রতিবেদনেও জবরদস্তি শ্রমের বর্ণনা পাওয়া যায়–

> ... রামুর ঘুর্নিয়া পালং এ আশ্রয় গ্রহণকারী অন্ততঃ অর্ধশত রোহিঙ্গা জানান (কাজ শেষে) মজুরি না দিলে বিচারও চাওয়া যায় না। অফিসাররা বলে, তোমাদের বাড়ি বার্মায় না; বাংলাদেশে। তোমরা বাংলাদেশে চলে যাও। স্লোর্ক সদস্যরা বলে, বাংলাদেশে না গেলে আল্লাহর কাছে যাও তোমাদের আল্লাহ উপরে; উপরে যাও। আমাদের আল্লাহ জমিনে, বার্মা আমাদের। তার পরেও ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে আসতে হয়; ধরা পড়লে নিশ্চিত জেল।[১৮]

আরাকানে রোহিঙ্গাদের নির্যাতনের আরেক কৌশল জবরদস্তিমূলক বেগার শ্রম গ্রহণ। ২০০৯ সালে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বিডিআরের বারবার প্রতিবাদ ও পতাকা বৈঠক সত্ত্বেও আবারো আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি উপেক্ষা করে নোম্যান্সল্যান্ডে বাঁধ নির্মাণ ও কাঁটা তারের বেড়া তৈরি করে। এ কর্মকাণ্ডে চীনের আর্থিক সহায়তা থাকলেও বাঁধ ও কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে রোহিঙ্গা যুবকদেরকে বিনাপারিশ্রমিকে জোরপূর্বক কাজে লাগায়।[১৯] কোনভাবে প্রতিবাদ করলেই নাসাকা বাহিনী নানাভাবে অমানবিক নির্যাতন করে থাকে। প্রতিবাদের কারণে মাত্র কয়েকদিনে অর্ধশতাধিক যুবককে গ্রেফতারপূর্বক অমানবিক নির্যাতন করার খবর পাওয়া গেছে। সেইসাথে সেই সব পরিবারের যুবতি মেয়েদের ধরে নিয়ে গণধর্ষণের মতো অনৈতিক কাজ করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। মাত্র কয়েকদিনে শতাধিক মহিলা গণধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে।[২০] এ ঘটনার পরে মংডু থেকে শতাধিক রোহিঙ্গা বাড়িঘর ছেড়ে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয়।[২১]

জবরদস্তি শ্রমের বিষয়টি শুধুমাত্র বাঁধ নির্মাণ কিংবা কাঁটা তারের বেড়া তৈরিতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিভিন্ন সরকারি অবকাঠামো নির্মাণ, বনাঞ্চলের গাছ কাটা,

www.pathagar.com

সেনাসদস্যদের জমির ধানকাটা, সেনা ব্যারাকের খাদ্য সরবরাহসহ নানা ধরনের কর্মকাণ্ডে বাধ্যতামূলকভাবে কাজে লাগায়।[২২] ২০১০ সালে আরাকানের মংডু থেকে বাংলাদেশে আশ্রয়নেয়া আবদুল মাজেদ, কালা মিয়া, মনিরউল্যাহ জানায়, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী রোহিঙ্গাদের উপর অমানবিক নির্যাতন করে। জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ব্যারাকে কাজ করায়, পারিশ্রমিক দেয় না। কিছু বললেই জুলুম করে।[২৩] উপরোদ্ধৃত বিবরণ নিঃসন্দেহে অমানবিক নির্যাতনের একটি করুণ চিত্র; যা আন্তর্জাতিক শ্রমনীতির চরম লংঘন।

একজন নাগরিক স্বদেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বিনা বাধায় যাতায়াত করবে এটাই স্বাভাবিক। দেশের রাজধানী শহর সকল উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু হেতু সেখানকার প্রতি সকল সচেতন জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি কাজের জন্য রাজধানী শহর সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করার সুযোগ না থাকা এক শাসরুদ্ধকর ব্যাপার। এ ধরনের রাষ্ট্রকে কারাগার হিসেবেই আখ্যা দেয়া যায়। মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা এমন অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে স্বদেশের নিজস্ব গ্রামে-আপন বাড়িতে অবস্থান করেও মূলত কয়েদীর মতো জীবন যাপন করে। তাদেরকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে, এক থানা হতে অন্য থানায়, কিংবা অন্য শহরে যাতায়াত করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাখা হয়। দেশের রাজধানী ইয়াঙ্গুন দূরের কথা বিনা বাধায় আকিয়াব যাবারও উপায় নেই। এক থানা থেকে অন্য থানায় যেতে হলেও পাস নিতে হয়।[২৪] অর্থাৎ আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আকিয়াব শহরে যেতে হলে প্রশাসন কর্তৃক সত্যায়িত ছবিসহ দু'টি প্রত্যায়নপত্র সংগ্রহ করতে হয় এবং এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতেও 'Village Exit Form' পূরণ করা বাধ্যতামূলক।[২৫] ১৯৯১ সাল থেকে নিজেদের কৃষি জমিতে চাষাবাদ করা, নদীতে মাছ ধরা, হাট-বাজার করা, স্কুল-কলেজে যাওয়া, মসজিদে নামাজ আদায় করা এমন কি বাড়ির সম্মুখস্থ পুকুরে গোসল করতে যাবার ক্ষেত্রেও মগসেনারা নিষেধাজ্ঞা জারি করে।[২৬] যাতায়াতের ক্ষেত্রে দেশের একটি জনগোষ্ঠীর কোন লোককে কোথাও না যেতে দেবার কি অর্থ হতে পারে? এটা কেবল অমানবিক আচরণই নয় বরং ন্যূনতম মানবাধিকারেরও চরম লংঘন।[২৭]

মিয়ানমার সরকার আরাকানের রোহিঙ্গা পরিবারে পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে এক অমানবিক বিভৎস পরিবেশের সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নিকট অভিযোগ পেশ করতে গেলে পাল্টা নিজেদেরকেই অসহনীয় নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়। কেরোসিন তেলের হ্যারিকেনই (বাতি) তাদের সম্বল। বিদ্যুৎ ও পানির অভাবে বিশেষত শহর এলাকার রোহিঙ্গা পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়।[২৮] দৈনিক মিল্লাত পত্রিকার সম্পাদকীয় ভাষ্য অনুসারে, "মিয়ানমার সরকার আরাকানের ১৭ টি শহরে রোহিঙ্গাদের বাড়িতে পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে কাউকে ঘরের বাইরে বের হতে দেয়নি, নিজ ঘরেই বিনা বিচারে তারা

www.pathagar.com

গৃহবন্দী।"[২৯] মিয়ানমারের প্রদেশসমূহের মধ্যে আরাকান সবচেয়ে অনুন্নত প্রদেশ। বিশেষ করে সরকারের নির্যাতনের ফলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিকভাবে সব'চে বেশি নিগৃহীত। সরকারি প্রশাসন রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকাসমূহে পানি-বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রাকে আরো দুঃসহ করে তোলে।

নির্যাতনের বিভিন্ন অপকৌশল প্রয়োগ করেও যখন রোহিঙ্গাদেরকে বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করা কষ্টকর হয় তখনই মগসেনারা রোহিঙ্গাদের বসতবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। মিয়ানমার সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী মগসেনারা নির্দিষ্ট এলাকার মগদের পুনর্বাসনের জন্য রোহিঙ্গাদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে নিজস্ব বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ সাধনের মাধ্যমে আরাকানে মগপল্লী গড়ে তোলে। এছাড়া সেনাছাউনী নির্মাণের নাম করে রোহিঙ্গাদের বসতবাড়ীতে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়। ১৯৯২ সালের ২৯ জানুয়ারি আরাকানের আলীডং পাহাড় সংলগ্ন কাওয়ারবিলপাড়ার রোহিঙ্গাদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করলে সকাল ১০ থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত আগুনের লেলিহান শিখা এবং ধোঁয়া বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে দেখা যায়।[৩০] ২০১৬-১৭ সালে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলমানদের কয়েশ হাজার গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ স্যাটেলাইট তথ্যের বরাত দিয়ে এ সব তথ্য জানায়। ২০১৬ সালের অক্টোবরের সেনা অভিযানে অতীতের সকল সময়ের চেয়ে আগুনের বিস্তৃতি অনেক বেশি।[৩১]

৫.১ গ) সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, মুক্তিপণ ও চাঁদা আদায়

মিয়ানমার সরকারের সকল নির্যাতন রোহিঙ্গাদেরকে নিরবে সহ্য করতে হয়, প্রতিবাদ করার কোন সুযোগ নেই। এ সব নির্যাতনের প্রতিবাদ করার দুঃসাহস যাতে কেউ না দেখাতে পারে এজন্য তারা নতুন কৌশল হিসেবে সরকারি ফরমান বলে প্রতিবাদকারীদের ব্যাংক একাউন্ট ফ্রীজ করাসহ স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে।[৩২] যাতে তারা অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে এ লক্ষ্যেই মূলত সরকার এ নীতির প্রবর্তন করে। বেশকিছু গ্রামে রোহিঙ্গাদের বসতি, মসজিদ, মাদ্রাসা ও কবরস্থানে মগসেনা ও লুনথিন বাহিনীর প্রায় সাড়ে ৩'শ স্থায়ী-অস্থায়ী ঘাঁটি বসেছে। ১৯৯১ সালের ২১শে ডিসেম্বর রেজুপাড়া বিডিআর ক্যাম্পে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর হামলার পর আরাকান প্রদেশে সামরিক জান্তা ও তাদের প্ররোচিত মগদের উৎপীড়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় ইতোমধ্যে রোহিঙ্গাদের সহায় সম্পদের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমান দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ কোটি কিয়াট।[৩৩] সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ নীতির কারণে বিত্তশালী রোহিঙ্গারা উপায়ান্তর না দেখে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমায়। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই বিত্তশালী রোহিঙ্গারা দেশান্তরীত হয় এবং আরাকানে রোহিঙ্গাদের অর্থনৈতিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে।

www.pathagar.com

মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে নির্যাতন থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং জোরপূর্বক চাঁদা আদায় মগসেনাদের অত্যাচারের আর এক কৌশল। জোরপূর্বক চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে রোহিঙ্গা পরিবারগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেয়াই তাদের লক্ষ্য। মগসেনারা রোহিঙ্গা অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে হামলা করে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ধরে এনে ক্রীতদাসের মত খাটানোর পর পুরুষদের গুলি করে এবং নারীদের উপর ধর্ষণ চালিয়ে হত্যা করে। তবে অনেকেই জীবন বাঁচাতে একজন পুরুষের জন্য ৫ থেকে ১০ হাজার কীয়ট (মিয়ানমারের মুদ্রা) পর্যন্ত এবং একজন নারীর জন্য ৫ জন পুরুষ শ্রমিক মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে প্রাণে বেঁচে যায়। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত মাত্র ৪ মাসে রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে নগদ প্রায় আড়াই কোটি কিয়াট মুক্তিপণ ও চাঁদা আদায় করে।[৩৪] বুচিদং টাউনশীপের ৩ মাইল উত্তরে চোফেরাং গ্রামের হামিদ হোসেন (৩০) ইয়াঙ্গুন হাসপাতালে চোখের গুরুতর অপারেশন সেরে গ্রামের বাড়িতে ফিরে এলে সেনারা তার বাড়িতে হানাদিয়ে দোষারোপ করে বলে যে, সে ইয়াঙ্গুন যাবার নাম করে থাই সীমান্তে গেরিলাদের সাথে শলা-পরামর্শ করেছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনী অসুস্থ হামিদকে ধরে নিয়ে যেতে উদ্দত হলে তার আত্মীয় স্বজন ক্ষমা প্রার্থনা করে ২০ হাজার কীয়ট নগদ মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পায়। টংবাজার এলাকার অদূরে কাউনবাজার গ্রামের মৌলভী মোজাফফরের কাছে মগসেনারা মোটা অংকের মুক্তিপণ দাবি করলে তিনি মাত্র পরিশোধ না করতে পারায় সৈন্যরা তাকে টংবাজার ক্যাম্পে ধরে নিয়ে একমাস আটক রাখে এবং অবর্ণনীয় নির্যাতনের পর তার দাড়ি উপরে ফেলে।[৩৫] এছাড়া তারা আরাকানের ময়দানবিল ও হাইস্যুরাতা এলাকার প্রতিটি রোহিঙ্গা পরিবারকে ৫'শ কিয়াট মাশুল এবং একজন করে যুবক কুলি হিসেবে সেনাবাহিনীর নিকটস্থ ক্যাম্পে পৌছানোর ফরমান জারি করেছে।[৩৬] সরকারি মদদে প্রকাশ্যভাবে বিনা বাধায় মগসেনারা এসকল অপকর্ম চালানোর ফলে স্থানীয় মগ অধিবাসী এবং নতুনভাবে প্রত্যাবাসিত মগগোষ্ঠীও রোহিঙ্গাদের নিকট থেকে চাঁদা আদায়ে উৎসাহিত হয়। রোহিঙ্গাদের নিকট থেকে মাত্র চার মাসে আড়াই কোটি কিয়াট মুক্তিপণ ও চাঁদা আদায় হওয়াটাই প্রমাণ করে যে, প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা চাঁদা ও মুক্তিপণ আদায় করা হয় এবং এতে রোহিঙ্গাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন শোচনীয় হয়ে পড়ে, তেমনি জীবন যাত্রাও বিপর্যস্ত হতে থাকে। ২০১৬-১৭ সালে এসে এ মাত্রা এতোটাই অসহনীয় হয়ে পড়ে যে, মগেরা 'মগের মুলুকের' মতোই যখন তখন ইচ্ছে মতো জোরপূর্বক টাকা-সম্পদ নিয়ে যায়।

৫.১. ঘ) আরাকানী শিশু ও অমানবিকতা : রোহিঙ্গা শিশুদের হাসতে দাও[৩৭]

আয়লান। একজন শিশু, একটি ইতিহাস। জীবিত থেকে নয়, মরেই ইতিহাস গড়েছিল সে। ২০১৫ সালের পড়ন্ত বিকেলে। ভূমধ্যসাগরের তুরস্কের উপকূলে ভেসে আসে তার মৃতদেহ। যুদ্ধকবলিত সিরিয়া থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ইউরোপের পথে পরিবারসহ যাচ্ছিল শিশুটি। পথে নৌকা ডুবে সলিলসমাধি ঘটে তার। এরপর

www.pathagar.com

সৈকতের বালুতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা আয়লান হয়ে ওঠে বিশ্বমিডিয়ার চাঞ্চল্যকর খবর। ফেসবুক, টুইটারসহ ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্টিং মিডিয়ায় ঝড় তোলে সে। সাহিত্যিক-সাংবাদিক কলমের কালি ছুঁড়তে থাকেন তার শোকে। শহর পেরিয়ে সে ঝড় বয়ে চলে গাঁও-গেরামের মোড়ে মোড়ে, ছোটখাটো দোকানের চায়ের কাপেও। জীবন্ত কোটি আয়লানের চেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা মৃত আয়লান হয়ে ওঠে অনেক বেশি শক্তিশালী। ইউরোপ শরণার্থী হিসেবে গ্রহণ করতে থাকে সিরিয়া সংকটে পড়া হাজারো মানুষকে। ভূমধ্যসাগরের সৈকতে পড়ে থাকা আয়লান বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছিল, মানবতা আজ সাগরতীরেই ভাসছে। আয়লান ভাসছে আজও। তবে একা নয়, শতশত আয়লান। হাজারো স্বপ্নচোখ। ভূমধ্যসাগরে নয়, নাফ নদীতে। প্রতিদিন জড়ো হচ্ছে আয়লানের শতশত বন্ধু, খেলার সাথী। ঝড় উঠছে আজও। মিডিয়াতেও চলছে প্রতিবাদ। সে ঝড়ের বাতাস এখনো হয় তো স্পর্শ করেনি সূচির নির্দয় প্রাণে, সামরিক জান্তার মানবনিধন মিশনে কিংবা মগ-বৌদ্ধদের গেরুয়া পোষাকে।

২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে মিয়ানমারের রাখাইন স্টেটে আবারো চলছে রোহিঙ্গা গণহত্যা। পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে বাড়িঘর, পুড়িয়ে মারা হচ্ছে মানুষ। নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করছে সেনাবাহিনী। ধারালো অস্ত্র দিয়ে অমানবিকভাবে হত্যা করে চলেছে মগ-বৌদ্ধরা। নারী-পুরুষ, কিশোর-বৃদ্ধ থেকে শুরু করে এ নির্মম গণহত্যার শিকার হচ্ছে অবুঝ শিশুরাও। প্রাণ বাঁচাতে আয়লানদের মতোই নৌকায় চেপে সাগর ও নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে আসছে রাখাইনের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী। পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। জলপথের ঝুঁকির এ যাত্রায় প্রতিনিয়ত নৌকাডুবির ঘটনায় সাগরতীরে ভেসে আসছে একের পর এক রোহিঙ্গা শিশু। দেখা মিলেছে অসংখ্য রোহিঙ্গা শিশুর বেওয়ারিশ লাশ। সবাই মারা গেছে নৌকাডুবিতে। নাফের তীরে এসব ফুটফুটে চেহারার নিষ্পাপ শিশুর অপ্রত্যাশিত মৃতদেহ যেন স্থবির করে দিচ্ছে গোটা পৃথিবীকে।

মিয়ানমারে থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের নৌকাডুবি ঘটেছে অসংখ্য। ২০১৭ সালের ৩০ আগস্ট রাত ১২টার দিকে শাহপরী দ্বীপের পাশে নৌকাডুবিতে ১৯ রোহিঙ্গা নারী-শিশুর লাশ ভেসে ওঠে। সেদিন গভীর রাতে সাগরের ঢেউয়ে ভেসে আসে ১০ শিশুর মৃতদেহ। একেবারে কোলের শিশু থেকে সাত-আট বছর বয়সী শিশুর মৃতদেহও ভেসে এসেছিল নদীর কিনারায়। মর্মান্তিক এ দৃশ্যে হতবাক পৃথিবী। এরপরও থামেনি সেই মৃত্যুর মিছিল। রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আসা থামেনি, নৌকাডুবিও ঘটছে প্রতিনিয়ত। প্রতিটি ভোরেই নাফ নদী অথবা সৈকতে মিলছে কোনো না কোনো রোহিঙ্গা শিশুর মৃতদেহ। প্রতিটি শিশুর লাশের দৃশ্য যেন পুরো দুনিয়ার আকাশ-বাতাস ভারী করে তুলছে। প্রতিনিয়ত বালুচরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকছে অসংখ্য আয়লান।

রোহিঙ্গা শিশুদের ভেসে আসা লাশ দেখে যে কারো হৃদয় কেঁপে উঠবে। নাফ নদীর এ পাড়ের মানুষগুলোর সঙ্গে রোহিঙ্গা শিশুরা অপরিচিত, অনাত্মীয়। তবু এই রোহিঙ্গা শিশুর লাশ দেখে এপাড়ের বহু মানুষের চোখের পানি গড়িয়ে মিশেছে নাফের

www.pathagar.com

ঢেউয়ে, সাগরের নোনা পানিতে। আরাকানের সোনালি ইতিহাসের নির্মাতা এ সব মানুষ এখন রাষ্ট্রহীন, পরিচয়হীন। বিশ্ববাসীর কাছে এতোটাই মূল্যহীন এই শিশুরা! আজও বন্ধ হচ্ছেনা গণহত্যা, বন্ধ হচ্ছে না লাশের মিছিল।

কয়েক দিন আগের কথা। একটি খাবার হোটেলের সামনে গলাগলি করে দাঁড়িয়ে আছে দুটি শিশু। মোহাই এবং ইয়াজ। তারা দুইভাই। বড়ভাইয়ের বয়স ১২ ও ছোটভাইয়ের ৮ বছর। দৃষ্টি হোটেলের ভেতরে। তীব্র ক্ষুধার ছাপ চোখে মুখে। হোটেলটির সাইনবোর্ড না থাকলেও খাবারের খ্যাতি এলাকার সবার মুখে মুখে। তাই ভিড় লেগেই থাকে। খাবার কেনার টাকা নেই। তাই ওরা হোটেলে ঢোকার সাহস পাচ্ছে না। কারও কাছে চাইবে সেই সাহসও নেই। বড় ঘরের সন্তান। কখনো হাত পাতেনি কারো কাছে। লজ্জা আর পেটের ক্ষুধায় ম্রিয়মান হয়ে যাচ্ছিল ওদের চেহারা। টেকনাফ শহরে এমন দৃশ্য এখন চোখ সওয়া। অনেক রোহিঙ্গা শিশু-কিশোর এখন টেকনাফের পথে পথে ঘুরছে। খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকছে। মোহাই-ইয়াজও সে রোহিঙ্গা দলের প্রতিনিধি। পেটে ক্ষুধার তীব্র জ্বালা থাকলেও চোখের লজ্জা আর হৃদয়ের সংকোচ তাদের বেধে রেখেছিল হোটেলের বাইরে।

মোহাই-ইয়াজ সকালেই নৌকায় করে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মংগদু থেকে শাহপরীর দ্বীপে এসে নেমেছে। তারপর সেখান থেকে ট্রাকে করে এসেছে টেকনাফ শহরে। স্থানীয় কিছু স্বেচ্ছাসেবক ছোট ছোট ট্রাকে করে বিনা ভাড়ায় এপারে আসা রোহিঙ্গাদের শাহপরীর দ্বীপ থেকে টেকনাফ শহরে আনার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু নাফ নদী পার হতে জনপ্রতি বাংলাদেশি মুদ্রায় দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা লাগে। মোহাই-ইয়াজও নাফ নদী পার হয়েছে। তবে বিনা ভাড়ায়। দুনিয়ায় ওদের আর কেউ নেই। নৌকায় তারা অন্যদের মালামাল উঠা-নামায় সাহায্য করেছে। তাদের দুঃখের কথা শুনে ভাড়া নেয়নি নৌকার মাঝি।

মংগডুর মংনিপড়া গ্রামের উত্তরপাড়ায় ছিল মোহাইদের বাড়ি। সেগুন কাঠে বানানো সুন্দর ছিমছাম ঘর। দাদার পাবিরাবিক সমৃদ্ধি আর ঐতিহ্যের স্মৃতি নিয়ে মাথা উঁচুকরে দাঁড়িয়ে ছিল বাড়িটি। সুখের সংসারে মা-বাবা এবং একটি বোনসহ ওরা দুইভাই। ঈদের পরের দিন বিকেলে বাড়ির পাশের মাঠে প্রতিদিনের মতো খেলতে গিয়েছিল দুইভাই। বাড়িতে ছিলেন মা-বাবা আর বোন। ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দেয় মিয়ানমারের সেনাসদস্যরা। বসতবাড়ির সাথে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তাদের বাবা মা বোন। পুরো গ্রামটিই জ্বালিয়ে দিয়েছিল সেদিন। দুইভাই ভয়ে পালিয়ে জীবন বাঁচায় পাহাড়ের জঙ্গলে। তিনদিন না খেয়ে অন্যদের সাথে পাহাড়িয়া পথে, খাল-বিলের কাদাপানি পেরিয়ে নৌকায় পা রাখে ওরা। সকালে শাহপরীর দ্বীপে এলে এক প্যাকেট বিস্কুট পেয়েছিল। সেটাই খেয়েছে দুইভাই। মোহাই-ইয়াজের কান্না ছড়িয়ে পড়ে উপস্থিত সকলের চোখে-মুখে।

www.pathagar.com

শুধুমাত্র মোহাই-ইয়াজ নয়। হাজার হাজার শিশু এখন অবিভাবকহীন। তারা বাংলাদেশে এসেছে বাবা-মা কিংবা আত্নীয়-স্বজন ছাড়াই। আপনজনকে হারিয়ে অন্য কোনো পরিবারের সাথেই বাংলাদেশে আসছে তারা। নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে এদের পরিবারের সকলকে। দু'লাখেরও বেশি শিশু-কিশোর এসেছে বাংলাদেশে। এদের অধিকাংশের বয়স দশ-বারো বছরের নিচে। তাদের প্রায় অর্ধেকের সাথেই বাবা কিংবা বড়ভাই নেই। মা কিংবা দাদির সাথে আসছে তারা। গণহত্যার ভয়াবহতার তেমন কোন বিবরণই দিতে পারে না এসব শিশু। তাদের অভিভাবকদের ভাগ্যে কী ঘটেছে সেটি তারা প্রকাশ করতে পারে না। ভয়াবহতার স্মৃতি বুকে ধরে চেয়ে থাকে ফ্যাল্‌ফ্যাল করে। চোখের কোণায় ঝরে পড়ে কষ্টের নোনা জল। সে জলও শুকিয়ে গেছে অনেকের। মানসিক রোগ কিংবা ট্রমা থেকে তারা কি কখনো বেরিয়ে স্বাভাবিক হতে পারবে? হায়রে পৃথিবী! হায়রে সভ্যতা! নাফের পানিতে ভাসছে মানবতা![৩৮]

ইদ্‌রিস। বারো বছরের চঞ্চল শিশু। কৈশোরের নতুন হাওয়ায় পাল তোলা এক স্বপ্নতরী। মুসলিম পরিবারের সন্তান হবার কারণে স্কুলে ভর্তির সুযোগ পায় নি। গ্রামের মক্তবে পড়ে সে। মংডুর উত্তর পাশের হোয়াইছং গ্রামে বসবাস তাদের। কয়েকদিন থেকে মক্তবও বন্ধ হয়েছে সেনাবাহিনীর ভয়ে। বিকেলের অবসরে খেলতে যায় বাড়ির পাশের মাঠে। চঞ্চলা মাঠে খেলার হৈ হুল্লোর। হঠাৎ গুলির শব্দ। আঁতকে ওঠে সবাই। আতংকে ছুটাছুটি চারিদিকে। এলোপাথারি গুলিতে রক্তাক্ত শরীরে টলে পড়ে অনেকেই। কেউ কেউ স্পট ডেড। কেউ আবার আহত অবস্থায় পালিয়ে জীবন বাঁচায়। মাথায় গুলির আঘাত পেয়ে দেড়ঘন্টা মাঠেই পড়ে থাকে ইদরিস । অনেক রক্তক্ষরণ হলেও মহান আল্লাহ অশেষ কৃপায় প্রাণে বেঁচে ছিল। আহত অবস্থায় অনেক কষ্টে পরিবারের সদস্যদের কাঁধে বাংলাদেশে এসেছে সে। তার বন্ধু শফিসহ বেশ কয়েকজন মারা গেছে খেলার মাঠেই। ছলোছলো চোখে কাতর কণ্ঠে সে বলে- আমরা বুঝে উঠার আগেই অনেকগুলো গুলি এসেছে, আমি গুলি লেগে মাঠেই পড়ে গেছি, আমার বন্ধু শফি মরে গেছে মাঠেই।

সিনেমা কিংবা নাটকের কোন দৃশ্য নয় এটা। ডাকাত কিংবা সন্ত্রাসী কোন গ্রুপের কাজও নয়। সভ্যসমাজের সেনাবাহিনীর স্বেচ্ছাচারী আচরণ। স্বেচ্ছাচারীতা বললেও ভুল হবে। একটি জনগোষ্ঠীকে জাতিগত নির্মূলের জন্যই এ ধরনের নৃশংস গণহত্যা। মিয়ানমারের 'রাখাইন স্টেট' নামে পরিচিত আরাকান রাজ্যে এ ধরনের ঘটনা নিত্যদিনের। শুধুমাত্র মুসলমান হবার অপরাধে সেখানকার রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর নির্মূলে মরিয়া হয়ে উঠেছে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ। এ অভিযানের কোন শেষ নেই। প্রতিনিয়ত গণহত্যার শিকার হচ্ছে আরাকানের যুবক, তরুণ থেকে শুরু করে নারী-শিশু ও বৃদ্ধ। জীবন বাঁচাতে পাহাড়ি জঙ্গলময় পথ এবং খাল-নদী পেরিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে বাংলাদেশে।

মিয়ানমারের পূর্ব নাম বার্মা। আরাকানের নামও এখন 'রাখাইন স্টেট'। মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার জন্যই আরাকানকে রাখাইন স্টেট নাম দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

আর রাতারাতি মগরাও পরিচিত হচ্ছে রাখাইন নামে। এখানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা গুলি করে নির্বিচারে। বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে সব শেষ করে দেয়। মগদস্যুদের মতো রাখাইনরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে দিনে দুপুরে খুন করে সবাইকে। যুবতী নারীদের তুলে নিয়ে যায়। শ্লীলতাহানী শেষে হত্যা করে। তরুণ-কিশোরদের প্রতি ওদের রাগ বেশি। অনেক কষ্ট দিয়ে হত্যা করে তাদের। অবুঝ শিশু এবং নারীরাও রেহায় পায় না তাদের হাত থেকে। রোহিঙ্গাদের পক্ষে সেখানে কেউ নেই পাশে দাঁড়াবার।

'মগের মুল্লুক' শব্দটির সাথে পরিচয় আমাদের সকলের। আরাকানী মগ-বৌদ্ধদের মাত্রাহীন জুলুম-নির্যাতনের প্রেক্ষিতে এ বাগ্‌ধারাটি আজও প্রচলিত। মধ্যযুগের সে ইতিহাসকে পিছনে ফেলে আরো একধাপ এগিয়ে গেছে মিয়ানমারের সেনাকর্তৃপক্ষ। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অং সান সুচিও সেনাবাহিনীর করতলে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। অন্ধভাবে সমর্থন করে যাচ্ছেন তাদের অপকর্ম। সেই সুযোগে গৌতম বুদ্ধের আদর্শধারী গেরুয়া পোষাকে আবৃত মগ-বৌদ্ধরাও ধারালো অস্ত্র হাতে নেমে পড়েছে রোহিঙ্গাদের পাড়ায় পাড়ায়। তাদের ধর্মে জীব হত্যা মহাপাপ হলেও রোহিঙ্গা মুসলমানদের হত্যা করলে কিংবা রোহিঙ্গা নারীদের শ্লীলতাহানি করলে কোন পাপ নেই। হায়রে ধর্মীয় দর্শন! হায়রে শান্তির ফেরিওয়ালা!

রাখাইন রাজ্যে জন্ম নেয়া, বেড়ে ওঠা শিশুদের চোখে কোন রঙিন স্বপ্ন নেই। ফ্যাকাশে চোখে তারা মৃত্যুর প্রহর গুণছে। বাসযোগ্য পৃথিবীর পরিবর্তে তারা উপহার পাচ্ছে লাশের মিছিল। লাশের ধ্বংসস্তূপ ও মৃত্যু উপত্যকা থেকে ইদরিসের মতো পালিয়ে এসেছে অসংখ্য শিশু। পিতা-মাতার সঙ্গে কিংবা অভিভাবকহীন হয়ে বাংলাদেশে আসা লাখো রোহিঙ্গা শিশু এখন জীবন-মৃত্যুর ঝুঁকিতে। বাংলাদেশের মানুষ তাদের থাকার জায়গা দিয়েছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করছে শারীরিক-মানসিক চিকিৎসা দেয়ার। পরম মমতায় তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের মানুষ। কিন্তু এতে কি ফিরে আসবে শিশুদের জন্য একটা বাসযোগ্য পৃথিবী! আশ্রয় শিবিরে এখন ওদের বসবাস। মানবিক বিপর্যয়ের এক নিদারুন ঝড় বয়ে যাচ্ছে তাদের উপর দিয়ে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকার ঠেলে শিশুরা আলোর পথে বেরিয়ে আসতে পারবে তো?

মিয়ানমারে নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গার সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ। এর মধ্যে শিশুর সংখ্যাই প্রায় আড়াই লাখ। এসব শিশুর ৬০ ভাগই স্বাস্থ্যঝুঁকিতে। শিশু-কিশোররা এখন নানা ধরনের রোগব্যাধিতে আক্রান্ত। এদের কেউ বাবা-মা'র সঙ্গে এসেছে। কারও মা-বাবাকে চোখের সামনেই হত্যা করেছে মিয়ানমারের মগ-সেনারা। অনেকেই বাবা-মা হারিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেশ ছেড়েছে। অভিভাবক ছাড়াই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা এসব রোহিঙ্গা শিশুই সবচেয়ে বেশি কষ্টে আছে। রোদ-বৃষ্টিতে ভিজে কিংবা অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে উখিয়া-টেকনাফের বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। সর্দি-কাশি, জ্বর, ডায়রিয়া, নিউমুনিয়া, আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে মৃত্যুর মুখোমুখি।

www.pathagar.com

যেসব শিশুর মা আছে তারাও চরম কষ্টে পড়েছেন। অভুক্ত শিশুদের মুখে দু'মুঠো খাবার তুলে দিতে দৌড়াচ্ছেন ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রে। পাশাপাশি অসুস্থ শিশুদের নিয়ে লাইন দিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসা ক্যাম্পে। উখিয়ার বালুখালী, কুতুপালং, পালংখালী পানবাজারসহ বিভিন্ন চিকিৎসা ক্যাম্পে রোহিঙ্গা মায়েরা সন্তান কোলে নিয়ে ভিড় করছেন চিকিৎসার জন্য। প্রেসক্রিপশন কিংবা ওষুধ পেলেও অনেক মা'ই বুঝতে পারছেন না ব্যবস্থাপত্র। কীভাবে ওষুধ খাওয়াবেন সেই নিয়ম বুঝছেন না। তাই তারা যাকেই দেখতে পাচ্ছেন ক্যাম্পে তাদের কাছ থেকে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করছেন ওষুধ খাওয়ানোর নিয়ম-কানুন।

কুতুপালং শরণার্থী শিবির এলাকায় একটি মিসিং সেন্টার খোলা হয়েছে। ইউএনএইচসিআরের সহযোগিতায় এই সেন্টার খোলা হয়। প্রতিনিয়ত সেন্টারের সামনে করুণ পরিবেশ। মিসিং সেন্টারে প্রতিদিনই জমা হচ্ছে পিতা-মাতা হারানো শিশু। স্বজন ফিরে পাওয়ার কান্নার রোল সেখানে। সন্তান হারানো পিতা-মাতাদের ভিড় যেমন আছে এখানে তেমনি পিতা-মাতা হারানো শিশু। তাদের খুঁজে পাওয়ার পর এখানে জমা রাখা হয়। কিছুক্ষণ পরপর মাইকে ঘোষণা দেয়া হয় শিশুর খোঁজ পাওয়ার কথা। উখিয়া-টেকনাফের রাস্তায় রাস্তায় কিংবা ক্যাম্পে ক্যাম্পে নিষ্পাপ ও কোমল-কচি শিশুমুখের ছড়াছড়ি। এসব শিশু এক অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকেই যাত্রা শুরু করেছে। কেউ জানে না তাদের এই যাত্রা কোথায় গিয়ে শেষ হবে।

রুমানা। বার বছরের কিশোরী। আবদুর রহিম। সাত বছরের শিশু। ভাইবোন তারা। মিসিং সেন্টারে কাঁদছে এতিমের মতো। সত্যিই যে ওরা এতিম হয়ে গেছে চিরদিনের মতো। মগরা বাবাকে মেরে ফেলেছে আগেই। পালিয়ে আসার সময় পথেই মারা যায় তাদের আহত মা। আহত ভাইটিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেও পারেনি। একদিকে ক্ষুধা তৃষ্ণা অন্যদিকে আহত শরীরের রক্তক্ষরণে সেও মারা যায় রাস্তাতেই। সাথে আসা প্রতিবেশীদেরও হারিয়ে ফেলেছে তারা। অন্যদের সাথে কোনমতে প্রাণে বেঁচে নাফনদী পেরিয়ে এসেছে। কে বা কারা তাদের মিসিং সেন্টারে রেখে গেছে। চোখে মুখে শুধু হাহাকার। কান্নার দাগ যেন শুকনো নদীর স্মৃতিচিহ্নের মতো দাগ হয়ে আছে চোখের নিচে। কে তাদের ভালোবাসবে! বড় হবার স্বপ্ন তো দূরের কথা, বেঁচে থাকার কল্পনাই এখন তাদের বড় চ্যালেঞ্জ। অত্যাচারের ভয়াবহতা। বাবার হত্যা। আহত মা এবং ভাইয়ের মৃত্যু। জঙ্গলে তাদের লাশ ফেলে আসা। সব যেন দুঃস্বপ্ন হয়ে তাড়া করছে তাদের। গোটা জীবন হয়তো তাড়িয়ে বেড়াবে এ ভয়াবহ স্মৃতি।

নয়ন। আট বছরের শিশু। সে মাটিতে গা এলিয়ে ছিন্নকাপড়ে নীরব হয়ে আছে মিসিং সেন্টারে। এই সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত নাজির আহমদ জানান, শিশুটির গায়ে খুব জ্বর। তাকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হবে। সে কিছু বলতে পারে না। সব সময় আতঙ্কিত। বাবা মা সবাইকে মেরে ফেলেছে মগরা। বাড়িঘরও পুড়িয়ে দিয়েছে তারা। পথঘাট চেনে না। অন্য কোন এক প্রতিবেশী তাকে এখানে রেখে গেছে। এমন

www.pathagar.com

মানসিক চাপ নিয়ে বেঁচে আছে অসংখ্য শিশু। মানসিক চাপ কমাতে ইতোমধ্যে শিশুদের খেলাধুলা ও গল্প বলার মাধ্যমে বিনোদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিভিন্ন সংগঠন। এ পর্যন্ত কুতুপালং, লেদা ও শ্যামলাপুরে স্থায়ী তিনটিসহ ছয়টি শিশুবান্ধব কেন্দ্র এবং কিশোরী ক্লাব স্থাপন করেছে তারা। কিন্তু এসবের মাধ্যমে কতজন শিশুকেই বা ফিরানোর যাবে জীবনের স্বাভাবিক পথে!

নূরভার বেগম। আরাকানের তামবাজার বৈদ্যপাড়ায় তার বাড়ি। স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখের সংসার ছিল তার। সন্ধ্যার আলো নিভতেই তাঁদের ঘরবাড়িতে আগুন দেয় সেনাবাহিনী। চোখের সামনেই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে তাদের বাড়িঘর। সেনাসদস্যদের ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে দুর্গম পাহাড়ে লুকিয়ে রাত কাটায় তারা। এরপর পায়ে হেঁটে পাহাড়, টিলা, খালনদী পেরিয়ে আট দিন পরে টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে উখিয়ায় আসেন। পুরো নয়টি দিন কেটেছে অনাহারে-অর্ধাহারে। এমতাবস্থায় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন নূরভার। তার চার বছরের শিশুকন্যা ফাতেমা। সর্দি-কাশি ও জ্বরে ছটফট করছে মেয়েটিও। মেয়ের পাশে মাটিতে পড়ে আছেন মা নূরভার বেগম। দাঁড়ানোর শক্তি নেই তার। পাহাড়ি পথে হেঁটেছে, খাল-পানি পার হয়েছে। রাত্রি কেটেছে পাহাড়ের জঙ্গলে। বৃষ্টিতে ভিজে রোদে পুড়ে কোন রকমে জীবন নিয়ে এসেছে বাংলাদেশে। তার চোখে কি আর কোন দিন হেসে উঠবে সুখের সংসারের মিষ্টি আলো? জাতীয়-আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমসহ প্রতিটি মিডিয়ায় শিশু-কিশোর কিংবা বৃদ্ধ-নারীসহ অসহায় মানুষের ছবি এখন অহরহ। ফেসবুক, টুইটারসহ অনলাইন জুড়ে নির্যাতনের বিভৎস চিত্র। রোহিঙ্গা শিশু কিশোরদের উপর নির্মম অত্যাচারের এ সব দৃশ্য দেখে কোন মানুষ সুস্থ থাকতে পারে না।

মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার ও উখিয়ায় পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে শিশুদের সংখ্যা প্রায় দুই লাখ। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী এই সংখ্যা মোট রোহিঙ্গার ৬০ শতাংশ। শারীরিক ও মানকিভাবে বিপর্যস্ত বিপুল এই রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য জরুরিভিত্তিতে সেবা নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক বিশেষ সংস্থা ইউনিসেফ। ২০১৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সংস্থাটির শিশু নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান জিন লিবি এক বিবৃতিতে জানান, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও সীমান্ত পুলিশের গুলি থেকে বাঁচতে পালিয়ে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে প্রায় দুই লাখের বেশি শিশু। যা মোট রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ। রোহিঙ্গা শরণার্থী বিষয়ে পাওয়া প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী এই হিসাব করা হয়েছে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়।[৩৯]

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে দেশটির সেনাবাহিনী হত্যাকাণ্ড শুরু করলে প্রাণ বাঁচাতে লাখ-লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। যারা এসেছে, তাদের কারও বাবা-মা, কারও ভাই-বোন, কারও সন্তানকে হত্যা করেছে দেশটির সেনাবাহিনী। পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মধ্যে এমন শিশুও রয়েছে, যারা বাবা-মা দু'জনকেই

www.pathagar.com

হারিয়েছে। ২০১৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বুধবার দিনব্যাপী টেকনাফের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে কথা হয় এমনই কয়েকজন শিশুর সঙ্গে। তারা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্মমতার বর্ণনা দেয়।[৪০] তাদের অন্যতম জাকারিয়া ওরফে জকারিয়া। বয়স তের বছর। জাকারিয়ার বাবার নাম নূর আহমেদ। মা সকিনা খাতুন। মংডুর সরোয়ার দিঘি এলাকায় তাদের বাড়ি। বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাংলাদেশে এসেছে। তার এক বোন আছে। তবে বোন এখন কোথায়, তা জানে না সে। ঠিক কতদিন আগে তাদের বাড়ি-ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছিল, তা সে বলতে পারে না। তবে কোনও এক শুক্রবারে আগুন দেওয়া হয়েছে জানিয়েছে জাকারিয়া বলে, 'সেনাবাহিনী আমাদের গ্রামের সব পুরুষকে ধরে নিয়ে যায়। বাড়িতে আগুন দেয়। বাবাকেও সবার সঙ্গে ধরে নিয়ে গেছে। সেনাবাহিনী যখন আগুন দেয়, তখন মা ঘরেই ছিলেন। প্রাণ বাঁচাতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে পালিয়ে এসেছি।'

মোহাম্মদ জুবায়ের। মাত্র সাত বছর বয়সী এই শিশুর কেউ বেঁচে নেই। তার বাবার নাম হাশিম উল্লাহ। মা নূর জাহান। মংডুর হাসুয়াত এলাকায় পরিবারের সঙ্গে সে থাকতো। খালা হামিদা খাতুনের সঙ্গে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে। জুবায়ের বলে, সেনা বাহিনী আমাদের ঘরে আগুন দিয়েছে। আমার বাবা-মাকে গুলি করে মেরেছে। আমি খালা-খালুর সঙ্গে পালিয়ে এসেছি।' আসমত আরা নামের আট বছরের এই শশুটির বাবা-মাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মংডুর নামাপাড়া এলাকা থেকে বড় বোন ও ভাইয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ পালিয়ে এসেছে সে। তার মায়ের নাম তৈয়বা, বাবা কালা মিয়া। এখন আছে দাদির সঙ্গে। নাফ নদী পার হয়ে মঙ্গলবার তারা টেকনাফে আসে। আসমত আরা বলে, 'সেনাবাহিনী গ্রামে আগুন দেয়। এরপর গুলি করতে থাকে। গুলির শব্দে সবাই পালিয়ে যায় গ্রাম থেকে। সেনাবাহিনী অনেক মানুষকে হত্যা করেছে। সেনাবাহিনীর হামলার আমার বাবা-মাকে আর পাইনি।' জান্নাত আরা নামের আট বছরের এই শিশুটিও বাবা-মা ছাড়া বাংলাদেশে এসেছে। তার মায়ের নাম শামসুন নাহার। বাবা বশির আহমেদ। মংডুর নয়াপাড়া এলাকায় তাদের বাড়ি। তার এক বড় বোন আছে। তবে পরিবারের কেউ বেঁচে আছে কিনা, সে জানে না। বর্তমানে তার খালা রশিদা বেগমের সঙ্গে আছে। জান্নাত আরা বলে, 'মিলিটারি বাড়িতে আগুন দেওয়ার পর সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলেছে।' এগারো বছরের শিশু মোহাম্মদ ফয়সাল। মংডুর সৈয়দ দিয়া এলাকায় বাবা-মায়ের সঙ্গেই থাকতো। তার বাবার নাম মোহাম্মদ সৈয়দ, মা রমিজা খাতুন। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর হামলার পর তার মা-বাবাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। দাদি আমেনা খাতুনের সঙ্গেই আছে তার তিন ভাইবোন। তার দুই বোনের নাম মোস্তাকিনা (৭) ও হালিমা (৩)। ফয়সাল জানায়, 'বাবা আমাকে অনেক আদর করতেন। আমাদের অনেক গরু ছিল। সেনাবাহিনী একদিন সকালে বাড়িতে আগুন দেয়। গুলি করে। তারপর আর বাবাকে দেখিনি। বাবার কী হয়েছে, তাও জানি না।' মালেক হোসেন নামের সাত বছরের এই শিশুটির

www.pathagar.com

আট বছর বয়সী এক বোন আছে। তার নাম আসমত আরা। দাদি ফিরোজা বেগমের সঙ্গে তারা পালিয়ে এসেছে। তারা দুই ভাইবোন ও দাদি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। শিশুটি বলে, 'বাড়ি ঘরে আগুন দিয়েছে মিলিটারি। পুড়িয়ে দিয়েছে সব। বাবা-মা মারা গেছেন। তাই পালিয়ে এসেছি।' চৌদ্দ বছরের মাইসারা বেগমও তার ছোটভাই মোরশিদাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। তার বাবা-মাকে মিয়ানমার সেনাবাহিনী হত্যা করেছে বলে জানা সে। মংডুর দক্ষিণ পাড়ায় তাদের বাড়ি। শিশুটি বলে, 'গত সপ্তাহে আমাদের বাড়িতে আগুন দিয়েছে সেনাবাহিনী। আগুনে সব পুড়ে গেছে। সেনাবাহিনী প্রথমে গুলি করেছে, পরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে ছোট ভাইকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

২০১৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর উখিয়ার কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের দেখতে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোহিঙ্গা এক শিশু প্রধানমন্ত্রীকে তার পরিবারের ওপর সে দেশের সেনাবাহিনীর নির্যাতনের কথা শোনায়। শিশুটি জানায়, তাদের জোর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে আগুন দেয়া হয়। তার বাবাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। নিষ্ঠুর নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি সে নিজেও। তার নাকে আঘাত করে থেঁতলে দেয়া হয়। শিশুটির কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অশ্রুসিক্ত নয়নে ওই শিশুকে বুকে জড়িয়ে নেন। তাকে সান্ত্বনা দেন। নির্যাতিত নারী ও শিশুদের কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী তাদের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা দেয়ার আশ্বাস দেন।[৪১]

রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে 'সমাধান শিক্ষা উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের' শিক্ষিকা হাফেজা নুর আয়েশা শিশু-কিশোরীদের কুরআন শিক্ষা দিয়ে থাকেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাত থেকে দশ বছরের নুর ছেহেনা, আসমা, আনোয়ারা হোছনা, উম্মে ছাকিলা, নূর কলিমা, ছেহেরা, সাজেদা, হুমায়রা ও নূরে জান্নাত-এর সাথে ২০১৮ সালের ২০ জানুয়ারিতে কথা হয়। তারা মিয়ানমারে ফিরে যাবে কি না জানতে চাইলে সবাই এক বাক্যে বলে, আমরা এখানে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছি। ওখানে তা পারি না। এখানে সবাই আমাদের আদর করে। আর মিয়ানমারে আমাদের জুলুম করে। জুলুম বন্ধ হলে ফিরে যাবো। এখানে কেমন লাগছে জানতে চাইলে তারা বলে, 'খুব ভালো'। ১২ বছরের শিশু নূরে জান্নাত জানায়, চোখের সামনে বার্মিজ মিলিটারি আমার বান্ধবী হালিমাকে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে। আমাদের মতো অনেক শিশুকে মেরে ফেলা হয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে যারা, তাদের হাতে আমরা কিভাবে নিরাপদ থাকব আপনারাই বলুন। আমাদের কি আমাদের দেশে হেসে খেলে থাকতে ইচ্ছে করে না?

উল্লেখ্য, কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফের ১২টি অস্থায়ী শিবিরে জরিপ চালিয়ে প্রাথমিকভাবে প্রায় সাড়ে ৩৬ হাজার রোহিঙ্গা এতিম শিশুকে শনাক্ত করেছে সমাজসেবা অধিদপ্তর। কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফের ১২টি অস্থায়ী ক্যাম্পে সমাজসেবা অধিদপ্তরের 'রোহিঙ্গা এতিম শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের' জরিপের প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে। জরিপে মিয়ানমারের রাখাইনে নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে

www.pathagar.com

আসা রোহিঙ্গাদের মধ্যে ৩৬ হাজার ৩৭৩ জন এতিম শিশুকে শনাক্ত করা হয়েছে। ২০১৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এ জরিপের প্রাথমিক কাজ ঐ সালের ১০ নভেম্বর শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ও রোহিঙ্গা এতিম শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আল আমিন জামিলী। এই কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিক কাজ শেষ হলেও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ অব্যাহত থাকায় জরিপের কাজ চলমান থাকবে। এর ফলে এতিম শিশুর সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। তবে এ পর্যন্ত প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে তথ্য-উপাত্ত নথিবদ্ধ করার কাজ চলছে। আল আমিন জামিলী আরো জানান, শূন্য থেকে ১৭ বছর পর্যন্ত রোহিঙ্গা এতিম শিশুদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।[৪২] শনাক্ত করা এতিম শিশুদের মধ্যে কারো মা আছে, বাবা নেই। কারো বাবা-মা কেউ নেই। আবার মা-বাবা থাকার পরও পরিত্যক্ত শিশুদের এতিম বলে গণ্য করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এসব রোহিঙ্গা এতিম শিশুর সুরক্ষার মাধ্যমে সেবা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসেছে আট লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা। বহু কষ্টে তাদের ঠাঁই মিলছে পাহাড় ও সমতলে। এর মধ্যে বেশি কষ্টে দিনযাপন করছে রোহিঙ্গা নারী ও শিশুরা। কয়েক দিনের বৃষ্টির ফলে ঠাঁই পাওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীরা নানা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। এখানে শিশু-কিশোরদের রোগ বালাই অনেক বেশি। পাহাড়ে ত্রিপল দিয়ে গড়ে তোলা বসতিতে বৃষ্টির পানি ও ঢলে বেহাল অবস্থা। যৎসামান্য খাদ্যও ভিজে নষ্ট। খাদ্যের অভাবে দিশেহারা। ভিজে কাদামাটির উপর নির্ঘুম রাত কাটায় তারা। রাতে বেশি দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে নারী ও শিশুরা। দিনেও তাদের কষ্টের সীমা থাকে না। তবু তারা বাঁচতে চায়। হাসতে চায় সুন্দর জীবনের আলোয়। স্বপ্ন দেখতে চায় স্বাধীন বসভিটের। হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত আরাকানে তারা ফিরে যেতে চায় নিরাপত্তার সাথে। বিশ্ববিবেক! স্বপ্নগুলো উড়ে যাচ্ছে ঘরপোড়া ধোঁয়ার সাথে। ওদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে এগিয়ে আসো। আবার শুরু হোক সুখের স্বপ্ন। হেসে খেলে বেড়ে উঠুক নিজের বসতবাড়িতে। সবাই মিলে আওয়াজ তুলি 'রোহিঙ্গা শিশুদের হাসতে দাও'।

৫.১ ঙ) গ্রেফতার-অপহরণ, লুণ্ঠন, অমানবিক নির্যাতন ও হত্যা

মিয়ানমারের শ্লোর্ক (SLORC) কর্মকর্তা, সামরিক গোয়েন্দা, সেনাবাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী, পুলিশ ও ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা বিনা অভিযোগে অতর্কিতভাবে দিনে রাতে অভিযান চালিয়ে হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করে এবং নগদ অর্থ, স্বর্ণ- রৌপ্যসহ লক্ষ লক্ষ কীয়ট মূল্যের সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। ১৯৯১ সালের ১৭ জুলাই এক রাতে তারা আরাকানের বিভিন্ন শহর-গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৫ শতাধিক রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করে এবং লক্ষাধিক কীয়ট মূল্যের সম্পদ লুট করে।[৪৩] ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তার সদস্যরা ১৯৯১ সালের ২০ ডিসেম্বর হতে ১৯৯২ সালের ১১ জানুয়ারি মাত্র ২২ দিনে আরাকান থেকে প্রায় ২১ হাজার রোহিঙ্গাযুবক এবং পাঁচ হাজার

www.pathagar.com

যুবতীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এছাড়া অন্যান্য বয়সী রোহিঙ্গাদের উপরও তাদের অত্যাচার-নিপীড়ন অব্যাহত রাখে। মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী আরাকান অঞ্চলে মগসেনারা সাদা পোষাকে সজ্জিত হয়ে বাংকারে অবস্থান করে এবং মহল্লা ও সীমান্ত এলাকাসমূহে নিয়মিত টহল দেয়। এ সময় তারা রোহিঙ্গাদের ঘরে ঢুকে যুবক-যুবতীদের অপহরণ করে অজানাস্থানে নিয়ে যায় এবং পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাসহ অন্যান্যদের হাত-পা বেঁধে অমানবিক নির্যাতনের মাধ্যমে স্বদেশ ছেড়ে চলে আসার জন্য বাধ্য করে।[৪৪] গ্রেফতারকৃত রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন চালানোর লক্ষ্যে সার বহনকারী কার্গো নৌকায় করে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আকিয়াব শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। যাত্রাপথে নৌকার ডেকে বিষাক্ত সারের দূর্গন্ধে আকিয়াব নেবার পথে অনেকেই মারা যায়। অবশিষ্ট অসুস্থ রোহিঙ্গা বন্দীদেরকে ছোট কুঠরিতে গাদাগদী অবস্থায় রেখে ইলেকট্রিক শক ও বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে বেত্রাঘাত করা হয়। শুধু তাই নয়, কাউকে পিন পুঁতে রাখা বোর্ডের ওপর দিয়ে হাটতে বাধ্য করা হয়, অনেকের গায়ে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরা হয় এবং কাউকে শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। অসুস্থ আধমরা রোহিঙ্গা যুবকরা যখন নামাজ পড়তে বসে তখন নির্যাতনকারীরা তাদের পেছন থেকে পেটাতে থাকে এবং কুটিল হাসি হেসে বলে - "কোথায় তোদের আল্লাহ? তাকে এসে তোদের রক্ষা করতে বল।"[৪৫]

মিয়ানমারের কারাগারসমূহে অসংখ্য রোহিঙ্গাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সামরিক জান্তা গ্রেফতারকৃত হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে জেলে পুরে জেলখানায় গাদাগাদী করে রেখেও জায়গা না পেয়ে অবশেষে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৮টি খাদ্য গুদামে প্রায় ২৮'শ রোহিঙ্গাকে তালাবদ্ধ করে রাখে। ফলে ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে মাত্র ৫ দিনের ব্যবধানে ক্ষুধা অনাহার ও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এক হাজার রোহিঙ্গার মৃত্যু ঘটে।[৪৬] ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে উত্তেজনাকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এসময় বিপদকালে আত্মরক্ষার জন্য গ্রেফতারকৃত কারাবন্দী রোহিঙ্গা যুবকদের মধ্য থেকে প্রায় ১৫ হাজার যুবককে কারাগার হতে এনে মানববর্ম হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সীমান্তের দুই কিলোমিটার দূরে বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করা হয়।[৪৭] মিয়ানমার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষনের জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক প্রেরিত নিরপেক্ষ জাপানী বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ইয়েজো ইকোতা মিয়ানমার সফর শেষে কারাগারের বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, মিয়ানমারে মোট আটাশটি কারাগারের মধ্যে ইনসেন কারাগারটিই শুধুমাত্র তাকে দেখতে অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাতে কয়েদিদের কোন সুযোগ সুবিধাতো নেই বরং কয়েদীদের সংখ্যা কারাগারের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে ৪ গুণ বেশি; আর এটাই ছিল তাকে দেখানোর মত সুব্যবস্থা সম্পন্ন কারাগার।[৪৮] এতেই অনুমান করা যায় যে, অন্যান্য কারাগারগুলো কতটা নিম্নমানের এবং সেখানে রোহিঙ্গাদের উপর কেমন অমানবিক আচরণ করা হয়।

www.pathagar.com

মিয়ানমারের সামরিক জান্তা একদিকে পাশবিক নির্যাতনের তাণ্ডবতা চালিয়ে রোহিঙ্গাদের দেশ ত্যাগে বাধ্য করে অন্যদিকে পথিমধ্যে দেশত্যাগী রোহিঙ্গাদের উপর আক্রমন করে সর্বস্ব লুট, গ্রেফতার ও হত্যার পথ বেছে নেয়। জান্তার ভয়ে পাহাড়ি দূর্গম পথ মাড়িয়ে, জেলে নৌকায় নাফ নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসার সময় তারা রোহিঙ্গাদের উপর বিভিন্ন কায়দায় আক্রমন চালায়। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে (বুধবার) আকিয়াব জেলার কিয়ত্ত ক্যাম্পপাড়া ও নাইয়ারপাড়া হতে ৭০টি পরিবারের ৪ শতাধিক নারী পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ ২টি ফিসিং ট্রলারে বাংলাদেশে পালিয়ে আসার সময় আকিয়াব শহরের ৫/৬ মাইল দূরে পুছখালি নদীতে টহলরত নৌ-বাহিনীর সদস্যরা গানবোট হতে শরণার্থী বোঝাই নৌকা দু'টিকে লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করলে ১টি নৌকা সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যায় এবং অপর নৌকার যাত্রীরা কোনমতে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে আশ্রয় নেয়। পরের দিন নারী ও শিশুর ১৭টি ভাসমান লাশ উক্ত নদীর কিনার হতে উদ্ধার করে নিকটবর্তী শীলখালী গ্রামের কবরস্থানে দাফন করা হয়। একই দিনে মিয়ানমারের লুনথিন বাহিনী নাফ নদী হতে ৩টি নৌকার ২ শতাধিক যাত্রীকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে মংডু ক্যাম্পে নিয়ে যায়।[৪৯]

এছাড়া সেনাবাহিনীর গ্রেফতার, নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞের কারণে যে সকল রোহিঙ্গা পরিবার ঘর-বাড়ি ছেড়ে সহায় সম্পদের মায়া ত্যাগ করে জীবন বাঁচানোর জন্য বন-জঙ্গল ও পাহাড়ে আশ্রয় নেয় তারাও মগসেনাদের হাত থেকে রেহায় পায় না। মগসেনারা গভীর অরণ্যে ঢুকে রোহিঙ্গাদের খুঁজে খুঁজে বের করে অমানবিক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে। এমন কি তারা শিশুদেরকে মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিয়ে তাদের সামনেই নির্মমভাবে মেরে ফেলে।[৫০] বিশ্বে যখন শিশু অধিকার রক্ষার জন্য ব্যাপক প্রচারণা ও তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে, তখন মিয়ানমার সরকার শিশু যুবক-যুবতীসহ গোটা জনগোষ্ঠীর উপর নির্বিঘ্নে এমন অমানবিক আচরণ করছে।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিম নির্যাতন থামছেই না। চরম নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গারা। তাদের উপর চালানো হচ্ছে বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড এবং জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে তাদের বাড়িঘর। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় রাখাইন প্রদেশে ২০১৬ সালের ১৩ নভেম্বর রবিবার অন্তত ৯ জন রোহিঙ্গাকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে দেশটির সেনাবাহিনী।[৫১] শুধু মংডুর একটি গ্রাম থেকে শতাধিক নারী-পুরুষ ও শিশু নিখোঁজ হয়। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমান সমর্থিত রোহিঙ্গা ভিশন নামে একটি ওয়েবসাইটে পোস্ট করা এক ভিডিওচিত্রে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, আগুনে পোড়া কয়েকটি মরদেহ এবং এগুলোকে ঘিরে তাদের স্বজনরা আর্তনাদ করছে। ভিডিওতে রাখাইন প্রদেশের মংডুর উত্তরাঞ্চলীয় একটি গ্রামে আগুনে পোড়া ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তিনটি মৃতদেহও দেখানো হয়। ভিডিওতে একটি মৃতদেহের পাশে বসে দুই মহিলাকে কাঁদতে দেখা যায়। এক মহিলা মৃতদেহটির মুখে হাত বোলাচ্ছিলেন এবং বিলাপ করছিলেন। পাশেই ছিল

www.pathagar.com

আরো একটি মৃতদেহ। ভিডিওচিত্রটিতে একজন ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন, সম্ভবত ভিডিওটিও তিনিই ধারণ করছিলেন। তাকে দেখা যায়নি। তিনি বলছিলেন, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ১৩ নভেম্বর এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ৯ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। একই সঙ্গে এখনো ওই গ্রামের ৯০ জন নিখোঁজ। ইউএনএইচসিআরের মুখপাত্র আদ্রিয়ান এডওয়ার্ডস শুক্রবার জেনেভায় বলেছেন, রাখাইনে জরুরি ভিত্তিতে খাবার, আশ্রয়, ওষুধ ও চিকিৎসা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ৪৩০টি বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে। অনেকে জীবন্ত দগ্ধ হয়েছেন।[৫২] একই সময় রাখাইন রাজ্যের কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়ন চালাতে মুসলিম বিরোধী একটি মিলিশিয়া গ্রুপকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ করছে এমন খবর প্রচারের পর প্রাণভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে রোহিঙ্গারা। ১১ নভেম্বর শুক্রবার নাফ নদী পার হয়ে অবৈধভাবে কক্সবাজারের টেকনাফে প্রবেশের চেষ্টাকালে ১২৫ রোহিঙ্গাকে আটকের পর মিয়ানমারে ফেরত পাঠায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদস্যরা।

মিয়ানমারের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর চালানো নির্মম নির্যাতনের সবরকম পদ্ধতি আর মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে দেশটির সেনাবাহিনী ও পুলিশ। কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে চালানো এসব নির্যাতনের ছিটেফোঁটা খবর প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে। কিন্তু রোহিঙ্গা নির্যাতনের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে পারেনি কোন গণমাধ্যমই। তবে একটি ঘটনার খবর সারা বিশ্বের মানুষকে হতবাক করে দিয়েছে। একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম মিয়ানমারের রাথেডং অঞ্চলের ছুট পিয়িন গ্রাম থেকে পালিয়ে আসা প্রত্যক্ষদর্শীদের মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে, ওই এলাকায় প্রায় ২শ' রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ ও শিশুকে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী এবং স্থানীয় আদিবাসীদের হাতে নিহত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ছোট ছোট এসব রোহিঙ্গা শিশুকে মাথা কেটে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আর রোহিঙ্গা পুরুষদের দলবেঁধে একটি বাঁশের তৈরি ঝুপড়ির ভেতর আটকে তাতে আগুন দিয়ে সবাইকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।[৫৩] শিউরে উঠার মতো ঘটনা। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, আমরা আগেও নানাভাবে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনের কথা জেনেছি। বিশেষ করে সেখান থেকে প্রাণ ভয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মুখেই শুনেছি রাতের আঁধারে কিভাবে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। কিভাবে হিংস্র হায়েনার মতো রোহিঙ্গা নারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী আর সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা। যদিও মিয়ানমার দাবি করছে, আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির (আরসা) নামে রোহিঙ্গা জঙ্গিরা রাখাইনে ৩০টি পুলিশ ও সেনা চৌকিতে পরিকল্পিত হামলা চালিয়ে অনেককে হত্যা করেছে। তারই পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে তারা জঙ্গি দমন করছে। কিন্তু জঙ্গি দমনের নামে আমরা কি দেখছি? ছোট ছোট এসব শিশু কি জঙ্গি? এই শিশুরাও কি সেনা চৌকিতে হামলা

www.pathagar.com

চালিয়েছে? আমরা মনে করি, এসব হাস্যকর অজুহাত দিয়ে নিজেদের অপরাধ ঢাকতে পারবে না মিয়ানমার সরকার। যদি জঙ্গি দমনেই অভিযান চালানো হবে, সেখানে কেন নিষ্পাপ শিশুদের মাথা কেটে রাস্তায় ফেলে রাখা হবে? পলায়নরত নিরস্ত্র নারীদের ওপর কেন গুলি চালানো হবে? আমরা চাই মিয়ানমারের নিরাপত্তার বাহিনীর এই নৃশংসতা বন্ধে আন্তর্জাতিকভাবে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া হোক। এর সঙ্গে জড়িতদের বিচারের মুখোমুখি করা হোক।

৮০ বছরের মাকে কাঁধে নিয়ে ৬৫ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে বাংলাদেশে পৌছান জাফর। চার পাশে শুধুই গোলাগুলি আর ভারি অস্ত্রের গগণবিদারি গর্জন। যতদূর দেখা যায়, ততদূর শুধু আগুনের লেলিহান শিখা আর আকাশ অন্ধকার করা কালো ধোঁয়া। মিয়ানমারের সরকারি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ আর নির্যাতন থেকে বাঁচতে যে যেদিকে পারছে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে রোহিঙ্গারা। রাখাইন রাজ্যের বলিবাজার গ্রামের জাফর আলমের বাড়িতে অসুস্থ মা। কী করবেন, কোথায় যাবেন, সেটাই তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। কোনো উপায় না দেখে সব সহায় সম্পদ ফেলে মা আছিয়া খাতুনকে কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ি ছাড়েন জাফর। প্রাণের ভয়ে কয়েক দিন রাখাইন রাজ্যের এদিক ওদিক ছুটে একপর্যায়ে অন্যদের সঙ্গে বাংলাদেশে ঢোকার সুযোগ পান জাফর। অবশেষে বাংলাদেশে পৌছান তিনি। তাদের ঠাঁই হয় উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। জাফরের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। নিজের মাকে নিয়ে দেশ ছেড়ে আসার দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার কথা জানান জাফর আলম। তার মায়ের বয়স ৮০ পেরিয়ে গেছে। অসুস্থতার কারণে কথা বলতে পারেন না খুব একটা। মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসার ব্যাপারে জাফর বলেন, আঁকা-বাঁকা পথ, বেশির ভাগ এলাকায় যানবাহন নেই। যতটুকু রাস্তায় যানবাহন চলাচল করত, তাও এখন বন্ধ করে দিয়েছে সেনাবাহিনী। এ ছাড়াও পথে পথে চেকপোস্ট। এ কারণে বিকল্প পথ হিসেবে পাহাড়-জঙ্গল পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে আমাদের। এজন্য সময় লেগেছে পাঁচদিন।' জাফর বলেন, 'এতদিনের এই দৌড়ঝাঁপের কারণে আমার মা আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অনাহারে অর্ধাহারে কোনো মতে নো-ম্যানসল্যান্ডে পৌছি। আমাদের আপাতত ঠিকানা হয়েছে কুতুপালং অনিবন্ধিত ক্যাম্পের বস্তিতে। সব মিলিয়ে আমার মায়ের অবস্থা ভালো না। নিজেকে নিয়ে নয়- মাকে নিয়ে আমি খুব চিন্তায় আছি।'[৫৪] এমন পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে আরও হাজার হাজার রোহিঙ্গাদের।

মিয়ানমারের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর দেশটির সেনাবাহিনী গণহত্যা চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ২০১৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর বুধবার দেশটির টিএমসি টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেন তিনি। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তার দেশ চলমান গণহত্যা ও জাতিগোষ্ঠী নিশ্চিহ্নকরণের নিন্দা জানাতে কাজ করবে বলেও জানান তিনি।[৫৫] ২০১৬ সালের ২৫ আগস্ট সহিংসতা শুরুর পর এই প্রথম বিষয়টিকে

www.pathagar.com

। হিসেবে উল্লেখ করলেন ম্যাক্রোঁ। তবে এর আগেও বিষয়টির সমালোচনা ়ন তিনি। দ্য ডেইলি সান পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ্গ সন্ত্রাসীদের নৃশংসতার শিকার হয়ে এরইমধ্যে ৪ লাখ ২০ হাজারের বেশি .হিঙ্গা পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট বলেন, আমরা অবশ্যই মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর চলমান সহিংসতার নিন্দা করছি। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সহিংসতা বন্ধ এবং মানবিক সাহায্য পৌঁছানোর সুযোগ তৈরি করারও আহ্বান জানান তিনি। ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেন, জাতিসংঘ যেহেতু বিষয়টির নিন্দা জানিয়েছে সেহেতু সংস্থাটির অধীনে সঙ্কট নিরসনে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।[৫৬] মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান সহিংসতা এবং রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের ঘটনায় দেশটির ওপর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন সংস্থাটির মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান জেইদ রাদ আল হুসেইন।

৫.১ চ) নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ

মান-সম্মান, ইজ্জত-সম্ভ্রম ও জানমালের নিরাপত্তা নিয়ে স্বদেশে বসবাস করা প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার হলেও রোহিঙ্গারা এসব বিষয়ের নিশ্চয়তা নিয়ে জীবন-যাপন করতে পারে না। রোহিঙ্গাদের যুবতী-মহিলারা এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার। মগসেনারা রাতের অন্ধকারে আরাকানের বিভিন্ন গ্রামে প্রবেশ করে ঘরের দরজা ভেঙ্গে রোহিঙ্গা-যুবতী ও গৃহবধুদেরকে তাদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, শ্বশুড়-শাশুড়ী এমন কি স্বামীর সামনেই পৈশাচিক কায়দায় ধর্ষণ করে। কাউকে অপহরণ করে গভীর জঙ্গলে কিংবা সেনাক্যাম্পে নিয়ে দল বেঁধে গণধর্ষণ করে। এতে কেউ জীবনে বেঁচে গেলেও অধিকাংশই মৃত্যুবরণ করে। আত্মীয়-স্বজনদের কেউ বাধা দেবার চেষ্টা করলে তাকেও হত্যা করা হয় কিংবা অমানবিক নির্যাতন চালান হয়।

মিয়ানমার সরকার ১৯৯১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে আরাকান এলাকায় নজিরবিহীন সৈন্য সমাবেশ ঘটায় এবং সৈন্যদের অত্যাচারে সেখানকার রোহিঙ্গা পরিবারগুলো সর্বদা তটস্থ থাকে। তারা যখন তখন মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। ফলে আরাকানে রোহিঙ্গাদের প্রতিটি বাড়িতে মেয়েরা অন্ধকার প্রকোষ্টে লুকিয়ে থেকে দিন যাপন করে। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে মিয়ানমার সেনাক্যাম্প থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আগত রহিমা (২৫) ফাতেমা (২৪) ও হাজেরা (২২) জানায়, মগসেনাদের পৈশাচিক বর্বরতার শিকার হয়ে অনেক রোহিঙ্গা যুবতী সেনা ক্যাম্পে প্রাণ হারিয়েছে। রহিমা জানায়, মগসেনারা তিন কন্যা ও স্বামীর সামনে তাকে ধর্ষণ করে চলে যাবার সময় তার স্বামীকে গুলী করে। তারা ফাতেমা (দুই কন্যার জননী) এবং হাজেরাকে (এক সন্তানের জননী) ঘর থেকে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে ৮/১০ জন উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। দু'জনের স্বামী তাদের আনার জন্য ক্যাম্পে গেলে তাদেরকেও গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কিছু দিন পর হাজেরার স্বামী পালাতে পারলেও ফাতেমার স্বামীর

www.pathagar.com

খবর নেই। তারা আরো জানায়, ক্যাম্পে শতাধিক নারী দেখেছে; তাদের পাশবিক অত্যাচার, নির্যাতন ও জুলুম চলছে। অনুরূপভাবে মগসেনারা ইমামুদ্দীন গ্রামে স্বামীকে বেঁধে রেখে তার সামনেই স্ত্রী জোহরা বেগম ও তার ১২ বছ শিশুকন্যাকে উপর্যুপরী ধর্ষণ করে এবং ঘরের আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়।[৫৭]

নাফ নদী পেরিয়ে ১৯৯২ সালের ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশে এসে কাঁদতে কাঁদতে আরাকানের বুচিদং থানার থাইমংখালী গ্রামের ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা রোহিঙ্গা মুসলিম বধু গুলচেহের বেগম (২০) ১৪ মাসের শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করার কাহিনী বর্ণনা করে। সে জানায়, একমাস আগে পাড়ার অন্যান্য যুবকদের সাথে তার স্বামী সৈয়দ করিমকেও মগসেনারা জোর করে ধরে নিয়ে যায়। অন্যরা দু'এক সপ্তাহ পরে শ্রম শিবির থেকে ফিরে এলেও তার স্বামী আর ফিরে আসেনি। ফিরে আসা যুবকদের কাছেই জানতে পারে যে, মগসেনাদের সাথে কথা কাটাকাটির কারণে তাকে ওরা গুলি করে মেরে ফেলে। এ অবস্থায় ৫০ বছরের বৃদ্ধ খোদেজা বেগম ও কোলের শিশুকে নিয়ে সে কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। চারদিকে মগসেনাদের অত্যাচার ও নিপীড়নের খবরে সারা গ্রাম ভীত সন্ত্রস্ত ছিলো। এমতাবস্থায় সে রাতের খাবার খেয়ে কোলের শিশু কন্যাকে বুকের দুধ খাইয়ে ঘুমিয়ে দেয় এবং মা খোদেজা বেগম এ দূর্বিসহ অবস্থা থেকে মেয়ে ও পরিবারের মুক্তি কামনায় আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করেন। তখন রাত ক'টা বাজে তারা বলতে পারে না। হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে বুটের আওয়াজ এসে তাদের ছনের ঘরের দোরগোড়ায় থামে। বুটের প্রচণ্ড লাথিতে দরজা ভেঙ্গে ৮-৯ জন মগসেনা ঘরে প্রবেশ করে এবং তার উপর নগ্ন হামলা চালায়। এতে কোলের শিশু-পুতুলী চিৎকার করে ওঠে। সেনাদের পা ধরে অনুগ্রহ কামনা করলেও পাশবিক উল্লাসে তারা মা'র সামনেই তাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। একদিকে ভয়ার্ত শিশু কন্যার কান্না অন্যদিকে তার নারী জীবনের সর্বস্ব হারানোর আর্তচিৎকারে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গেলেও মগসেনাদের ভয়ে সাহায্যের জন্য পাশের বাড়ির একজন লোকও আসতে পারেনি। তারা অন্তঃসত্ত্বা যুবতীর উপর পাশবিক অত্যাচারে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি।[৫৮]

অনুরূপভাবে আরাকানের মংডু টাউনশীপের রিয়াজুদ্দীনপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নূরুল আলম (৩৭) এর শ্যালিকা সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী লায়লা বেগম (১২) সাহেব বাজার হাইস্কুল থেকে ঘরে ফিরছিল; সে পথ দিয়ে ৫ জনের একটি সেনাদল টহলে বের হয়। তারা সুন্দরী কিশোরী লায়লাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে ধরে নিয়ে যায় এবং দিনের বেলা সবার চোখের সামনেই উপর্যুপরী ধর্ষণের পর নির্মমভাবে হত্যা করে। চেয়ারম্যান এ ঘটনার বিচারের জন্য পার্শ্ববর্তী মগসেনাদের ২০০ ব্যাটালিয়ানের রানী ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন লাই উং এর কাছে গেলে ক্যাপ্টেন একেবারে সংক্ষেপে চেয়ারম্যানের অভিযোগের জবাব দেয় - 'চেয়ারম্যানের স্ত্রীর পরিণতিও অনুরূপ হবে।'[৫৯]

www.pathagar.com

ধর্ষণের মত নোংরা আচরণ রোহিঙ্গাদের সাথে নতুন কোন ঘটনা নয়। ১৯৭৮ প্রকাশিত 'দৈনিক আজাদ' বকসু মিয়া নামক শতায়ু বৃদ্ধের বরাত দিয়ে ...হিঙ্গাদের উপর ভয়াবহ নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনা প্রকাশ করে : "বর্মীসেনারা সত্তর বছর বয়স্কা বৃদ্ধাকে পর্যন্ত ধর্ষণ করিয়াছে। যুবতীদেরকে কোন কোন ঘরে তিন চার মাস আবদ্ধ রাখিয়া একটানা ধর্ষণ করার লোমহর্ষক নজীর বর্মা সরকার স্থাপন করিয়াছে।"[৬০]

শুধু ধর্ষণই নয়, মগসেনারা ধর্ষিতা মহিলার প্রতি বিবেকবর্জিত নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায়। মহধং এলাকার অন্তঃসত্ত্বা ফাতেমা বিবি (২০) কে পাশবিক অত্যাচারের মাধ্যমে ধর্ষণের পর গুপ্তাংঙ্গসহ সর্বত্র কাচি দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করা হলে রক্তাক্ত দেহ নিয়ে কোন প্রকারে সে বাঁচার তাগিদে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয়।[৬১] এভাবে ধর্ষণের পর স্তন কেটে, গলায় ফাসি দিয়ে কিংবা গুলি করে অসংখ্য নারীকে বর্বরচিতভাবে হত্যা করেছে; আর কেউবা পঙ্গু জীবন নিয়ে বেঁচে আছে।[৬২] এতিম হিসেবে বাংলাদেশে আগত উম্মেকুলসুম (৯) ও নূর হোসেন (৭) এর মত অনেক শিশুকেই বোনের ইজ্জত বাঁচাতে সেনাদের হাতে মা আব্বা ও ভাইকে হারাতে হয়েছে।[৬৩]

মগসেনাদের নারী নির্যাতন, হত্যা, অপহরণ-গ্রেফতার ও সম্মিলিত বাহিনীর পিয়াথায়া অপারেশনের নামে অত্যাচার চরম আকার ধারণ করে। ২৫-২৬ জানুয়ারি'৯২ মাত্র দু'দিনে মগসেনা ও সশস্ত্র জোয়ানরা আরাকানের মংডু এবং বুচিদং এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে কমপক্ষে শতাধিক যুবতী গৃহবধুকে তাদের মাতা-পিতা, ভাই-বোন, শশুর-শাশুরী ও স্বামীর সামনে হাত-পা বেঁধে ধর্ষণ করে এবং সহস্রাধিক মহিলাকে গ্রেফতার করে অজানা স্থানে নিয়ে যায়। আরাকানে রোহিঙ্গা নারীদের উপর মগসেনা ও মগগোষ্ঠীর এ অত্যাচারের প্রধান কারণ হলো তারা মুসলমান। রোহিঙ্গারা যাতে আরাকান ত্যাগে বাধ্য হয় তারই একটি পরিকল্পিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে তারা এমনভাবে নারী নির্যাতনে মেতে ওঠে। মুসলিম জাতিসত্ত্বা বিনষ্ট করে মগ প্রভাব বৃদ্ধি করাই তাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে মগসেনারা মুসলিম নারীগর্ভে মগসন্তান ধারণ ও লালন করার জন্য ধর্ষিতা মহিলাদের সমাজতান্ত্রিক মাতৃকল্যাণ সদনে বন্দী করে রাখে। অপরদিকে গর্ভবর্তী মুসলিম রমণীদের গর্ভ নষ্ট করে দেবার জন্য মগসেনারা ভ্রাম্যমাণ এম. আর. এবং ডি.এন্ড সি. প্রকল্প চালু করে।[৬৪] মগসেনাদের অত্যাচার এত ভয়াবহ যে, আরাকানে মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার ফলে গভীর রাতে নারী কণ্ঠের আর্তনাদ-চিৎকার তান্ত্রু খালের এপার থেকেও শোনা যায়।[৬৫]

আরাকানের রাচিদং থানার রাজার বিলপাড়া গ্রামের অধিবাসী গুলবানু (৮০) দুই মেয়ে ফাতেমা ও মদীনা, জামাতা কেফায়েতুল্লাহ ও আবদুশ শুকুর এবং ৪ জন নাতি-নাতনী নিয়ে একই আঙ্গিনায় বসবাস করতেন। ১৯৭৮ সালের ড্রাগন অপারেশনে বর্মী সেনারা তার স্বামীকে হত্যা করে এবং জমি-জমা বাজেয়াপ্তকরণসহ অনেক জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। তবুও নিজের অবশিষ্ট ১০ কানি জমিতে চাষবাস করে তাদের

www.pathagar.com

সংসার চলে। কিন্তু মগসেনারা ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি ১ জবরদস্তি শ্রমের জন্য তার দুই জামাতাকে ধরে নিয়ে যায়। গ্রামের শেষ প্রান্তে জ পরিচিত জনের কিশোরী কন্যাকে মগসেনারা ধরে নিয়ে গেলে সে ঘটনা দেখার ৬ গুলবানু সেখানে যান। এদিকে মগসেনারা তার বাড়িতে এসে কন্যা ফাতেমা ও মদীনাকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি ফিরে এসে দেখলেন ফাতেমার আট বছর, তিন বছর ও ছয় মাসের শিশু কন্যা যথাক্রমে নুরে সাফা, আমেনা এবং হানিফাসহ মদীনার দু'বছরের আবদুল মজিদ উঠানে কান্নারত। প্রতিবেশীরা জানায়, মগসেনারা ফাতেমা ও মদীনাকে ধরে নিয়ে গেছে এবং তাদের আর্তচিৎকার ও বাঁচার করুণ আকুতি সত্ত্বেও কেউ বন্দুকের সামনে আসতে সাহস পায় নি। তারা দু'বোনকে ক্যাম্পে নিয়ে একটানা চার দিন উপর্যুপরি পাশবিক নির্যাতন ও গণধর্ষণ চালায়। খাবার হিসেবে শুধু বিস্কুট এবং পানি দিয়েছে। চারদিন পর কোন এক সুযোগে তারা সেনা ছাউনি থেকে পালিয়ে আসে। এক সপ্তাহ পরে দু'জামাতা আধমরা জীবন নিয়ে ফিরে এলেও তাদের সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং খাদ্যাভাব ও শারীরিক নির্যাতনের ফলে চালিকা শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। বাড়ি ফিরে স্ত্রীদের ইজ্জতহানির ঘটনা শুনে অশ্রু ফেলা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না। একদিন পর স্বদেশ ছেড়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নিলেও ঐদিন সন্ধ্যা রাতে চারজন মগসেনা আবারও দরজা ভেঙ্গে দু'মেয়েকে ঘর থেকে টেনে বের করে উঠোনে নিয়ে আসে। আহত জামাতা দু'জন কোন প্রতিবাদ করার সাহস পায় নি। কিন্তু আশি বছরের বৃদ্ধা মা গুলবানু সহ্য করতে না পেরে ধারালো টাকফাল (দা জাতীয় অস্ত্র) হাতে তুলে নেন এবং কোন পরিণতি চিন্তা না করে একজন সৈনিকের গলায় কোপ বসিয়ে দেন। সে ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করে এবং অন্যজন ভয়ে তার সাথীকে ফেলে পালিয়ে যায়। উঠোনে পরে থাকা রক্ত মাটি চাপা দিয়ে লাশটি নদীতে ভাসিয়ে সে রাতেই তারা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। নিঃসন্দেহে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের এটি একটি ভয়াল চিত্র। এ ঘটনায় মগসেনারা রোহিঙ্গাদের উপর কতটুকু নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করছে তার একটি স্পষ্ট নজির পাওয়া যায়। উপরোক্ত চিত্র প্রমাণ করে যে, নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেলে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে একজন বৃদ্ধা মাতাও হয়ে ওঠেন বিদ্রোহী; যুদ্ধাংদেহী। এ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সাংবাদিক পাঠকের নিকট প্রশ্ন রাখেন, "গুলবানু কি খুনি না বীর মাতা?"[৬৬] বাস্তবিক পক্ষে তাঁকে বীর মাতা বলাই যুক্তিযুক্ত।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে অভিযানকালে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী, পুলিশ, বর্ডার গার্ড ও বৌদ্ধ যুবকরা সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা নারী ও মেয়েদের ওপর যৌন সহিংসতা চালিয়েছে বলে জানায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। সংস্থাটি তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, ২০১৬ সালের ৯ অক্টোবরের পর থেকে মাত্র কয়েকদিনে রাখাইনের মংডু জেলার অন্তত নয়টি গ্রামে নারী ও কিশোরীদের ধর্ষণ, গণধর্ষণ, আগ্রাসী দেহ তল্লাশি ও যৌন হামলার ঘটনা ঘটে।

www.pathagar.com

বাহিনী, পুলিশ, বর্ডার গার্ড ও স্থানীয় বৌদ্ধ যুবকরা এসব অভিযানে অংশ নেয় ; ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, নিপীড়নের মুখে ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়া ১৮ জন রোহিঙ্গা নারীর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর গবেষকেরা। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১৭ সালের জানুয়ারির মধ্যে তাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। তাদের মধ্যে ১১ জনই রাখাইনে যৌন হামলার শিকার হওয়ার কথা জানান। ১৭ জন নারী ও পুরুষ তাদের কাছের স্বজনদেরকে যৌন সহিংসতার শিকার হতে দেখেছেন। ওই ১৭ জনের মধ্যে আবার যৌন সহিংসতার শিকার হওয়া কয়েকজন নারীও রয়েছেন। সব মিলিয়ে সংগঠনটি ২৮টি ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন সহিংসতার ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। 'সন্তান প্রসবের মাত্র কয়েকদিন আগে আমাকে ধর্ষণ করা হয়। আমার তখন নয় মাস চলছিল। তারা জানত আমি গর্ভবতী, কিন্তু তাতেও দমেনি তারা,' ছোট্ট একটি কন্যা শিশুকে কোলে নিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিনিধিকে কথাগুলো বলছিলেন রোহিঙ্গা মুসলিম নারী আয়মার বাগন। ২০১৬ সালে নতুন করে শুরু হওয়া মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সেনাবাহিনীর অভিযানের সময় ধর্ষণের শিকার হওয়া রোহিঙ্গা নারীরা যে নতুন সামাজিক সমস্যায় পড়েছেন- এই বক্তব্য সেদিকেই ইঙ্গিত করে। সেনা অভিযানের সময় পুরুষশূন্য হয়েপড়া গ্রামগুলোতে ধর্ষণের শিকার হওয়া নারীদের অনেককেই পরিত্যাগ করেছেন তাদের স্বামীরা। বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিনিধির বরাতে সংবাদমাধ্যম বিবিসি বাংলার এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে রোহিঙ্গা নারীদের এমন দুর্দশার চিত্র। সরকারি লোকজনের চোখ এড়িয়ে ধর্ষণের শিকার এসব রোহিঙ্গা নারীর সঙ্গে কথা বলেন এএফপির ওই প্রতিনিধি। আয়মার বাগন নামে মুসলিম রোহিঙ্গা নারী ওই সাংবাদিককে বলেছেন, সেনাসদস্যদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর তিনি স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে গিয়েছেন।[৬৭] রাখাইনের কায়ার গং টং নামে একটি গ্রামের বাসিন্দা ২০ বছর বয়সী আয়মার এখন অন্যের সাহায্যে জীবন-ধারণে বাধ্য হয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত ছবিগুলোতে দেখা যায়, কিভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলমানদের। খুঁটির সঙ্গে বাঁধা এক কিশোরের ছবি দেখেছি। একজন লোক তার চুলের মুঠি ধরে এক হাতে পেছনে টানছে, অপর হাতে তার গলায় ছুরি চালিয়ে ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। তারপর সে মাথা উপস্থিত জনতাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে। দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ছবিতে আমরা দেখেছি ধর্ষিতা এক অর্ধনগ্ন যুবতী রক্তাক্ত মৃত পড়ে আছে। পাশেই মৃত মায়ের শরীরের ওপর কাঁদছে তার দুগ্ধপোষ্য শিশু। এভাবে শিশুকেও হত্যা করছে হাজারে হাজারে। এক যুবকের ছবি দেখেছি, ডোবায় ফেলে রাখা হয়েছে। তার গলায় রশি বাঁধা। সে রশি ধরে টানছে এক পিশাচ; চার পাশে অন্য পিশাচেরা উল্লাস করছে। সেভাবেই যুবকটির মৃত্যু হয়েছে। আমরা দেখেছি, প্রথমে কেটে ফেলা হয়েছে দুই পা। তারপর দুই হাত। তারপর ধড় মস্তক বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং এর মধ্যে প্রবল উল্লাস লক্ষ করা গেছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গারা যে নির্যাতনের বর্ণনা দিয়েছেন, তা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়।

www.pathagar.com

মিয়ানমারে কি কোনো মানুষের বসবাস নেই? সেটি কি তবে পিশাচের দেশ? সু সরকার বলেছে, তারা 'মাত্র' ৪০০ লোককে হত্যা করেছে। ৪০০ নরহত্যা তার ক 'মাত্র' হয়ে উঠেছে।[৬৮]

বিশিষ্ট কলামিষ্ট ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী সরেজমিনে ককসবাজারের শরণার্থী অঞ্চল পরিদর্শন শেষে একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেন, আরাকান থেকে আগত অধিকাংশ নারীর হাতে ধরা দু-তিনটি শিশু। কোলে একটি, গর্ভেও সন্তান আছে। ড্যাবের মহাসচিব ডা. জাহিদের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানালেন, রাখাইনের পরিস্থিতি এমন যে, একটি মেয়ে ১১-১২ বছরের বয়সী হলেই রাখাইন সেনারা প্রতি রাতেই তাদের ধর্ষণ করে। এই ধর্ষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের দ্রুত বিয়ে দেয়া হয় এবং তারা সব সময় গর্ভবতী থাকে, যাতে ধর্ষকদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।[৬৯] একজন মা তার মৃত সন্তানের মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এরকম দৃশ্য সহ্য করা কঠিন। কিন্তু এখন আমরা সবাই জানি খবরের কাগজের এরকম একটা ছবির পিছনে এর চাইতেও ভয়ংকর নির্মম আরও হাজারটি কাহিনি আছে। রোহিঙ্গাদের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, মেয়েদের ধর্ষণ, গণধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে, নারী-পুরুষ-শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।[৭০] এই ভয়ংকর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্যে একজন দুইজন নয়, আট লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এত অল্প সময়ে এত বেশি শরণার্থী আর কোথাও প্রাণ বাঁচানোর জন্যে হাজির হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের ওপর মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর চালানো ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের ঘটনায় দেশটির সরকারের কাছ থেকে ছয় মাসের মধ্যে রিপোর্ট চেয়েছে জাতিসংঘ। ২০১৭ সালের ২৮ নভেম্বর মঙ্গলবার জাতিসংঘের নারী অধিকারবিষয়ক একটি পর্যবেক্ষক প্যানেল মিয়ানমার সরকারের প্রতি এ আহ্বান জানায়। নারীবৈষম্য বিলোপ সনদের (সিডও) পক্ষ থেকে মিয়ানমারে আগস্ট থেকে চলা সহিংসতায় নিহত নারী ও কিশোরীদের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে।[৭১] মঙ্গলবার ২৩ জন স্বাধীনধারার বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত জাতিসংঘের পর্যবেক প্যানেল রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের ওপর সংঘটিত ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের বিস্তারিত জানতে চেয়েছে। মিয়ানমার সরকারের প্রতি তারা আহ্বান জানিয়েছে, দেশটির সেনাবাহিনী কেন ও কিভাবে এ ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাদের হামলায় কত কিশোরী ও নারী নিহত হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ জানাতে হবে। সেইসাথে এসব অপরাধে জড়িত সেনাসদস্যসহ অন্যান্য অপরাধীকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে কি না এবং হয়ে থাকলে তাদের বিচারপ্রক্রিয়া কতদূর অগ্রসর হয়েছে তাও জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। প্যানেলটি আগামী ছয় মাসের মধ্যে মিয়ানমারের কাছ থেকে রোহিঙ্গা নারীদের ওপর নিপীড়নের বিষয়ে রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর তা জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের কাছে হস্তান্তর করার কথা জানায়।[৭২]

www.pathagar.com

ছ) ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান এবং মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্যের ধ্বংস সাধন

,র্জাতিক বিধি মোতাবেক প্রত্যেক ব্যক্তিরই ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার কলেও আরাকানের মগজনগোষ্ঠীর নিকট রোহিঙ্গাদের ধর্মীয় জীবনও জিম্মি। তারা রোহিঙ্গাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পালনেও বাধা প্রদান করে। মসজিদে নামাজ আদায়, মহিলাদের পর্দা পালন, ঈদের নামাজ আদায়, এমন কি মক্তবের কুরআন হাদিস চর্চার পথও রুদ্ধ করে দেয়। মসজিদে নামাজ পড়তে গেলে মুসল্লীদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করা হয়, বোরখা পরিহিত মহিলাদেরকে বিভিন্নভাবে নাজেহাল করা হয়। ঈদের নামাজ আদায়েও তাদের নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে। ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে মংডুর শিকদারপাড়া মসজিদে ঈদের নামাজ আদায়ের সময় মগসেনারা ব্রাশ ফায়ার করে ৪ শতাধিক মুসল্লীকে নিহত এবং সহস্রাধিককে আহত করে।[৭৩] শুধু সাধারণ মুসল্লীই নয়, আলেম সমাজও রেহাই পায়নি মগ ও বর্মী সেনাদের হাত থেকে। স্থানীয় বৌদ্ধরা তাদের ধর্মীয় উৎসব পালনের নামে বিশৃংখলা সৃষ্টির লক্ষ্যে রোহিঙ্গাদের একটি মসজিদে প্রবেশ করলে ইমাম সাহেব তাদের বাঁধা প্রদান করে। ফলে তারা তাঁকে মারপিট করে বন্দুকের নলের মুখে রেখে মসজিদের অভ্যন্তরেই মাথা ন্যাড়া করে দেয়।[৭৪]

আরাকানে রোহিঙ্গা দলন-পীড়ন, নিধন, ও বিতাড়নের পাশাপাশি মসজিদ, মাদ্রাসা, ইসলামি প্রতিষ্ঠানাদি এবং ঐতিহ্যের নামনিশানা মুছে ফেলার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। আরাকান অঞ্চলের অনেক মসজিদ তারা ধ্বংস করেছে; বিশেষত উচ্ছেদকৃত মুসলিম জনবসতি এলাকার মসজিদসমূহকে ধ্বংস করে সেনাক্যাম্প নির্মাণ এবং গোয়ালে রূপান্তরীত করেছে। মসজিদ পাঠাগারে রক্ষিত হাজার হাজার পবিত্র কুরআন, হাদিস ও ইসলামি বইপত্র রাস্তায় ফেলে কিংবা পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়। রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসন চলাকালেও ১৯৯৭ সালের মার্চ/এপ্রিল মাসের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আরাকান প্রদেশে ২৫ টি মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। ম্রোহংয়ের ৬'শ বছরের প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ সিন্ধিখান মসজিদটিও তাদের হাত রেখে রেহাই পায়নি।[৭৫]

মিয়ানমারের শাসকগোষ্ঠী আরাকান থেকে রোহিঙ্গাদের অস্তিত্ব নির্মূল করার জন্য শুধু বর্বরোচিত নির্যাতনই করছে না; বরং তাদেরকে আরাকানের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত রয়েছে। ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে 'আরাকানে কোন মুসলমান জনবসতি ছিলনা' বলে প্রচার করে বিশ্ববাসীর চোখ ফাঁকি দেবার চেষ্টা করা হয় এবং মিয়ানমারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়) পাঠ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থাবলি থেকেও রোহিঙ্গাদের ইতিহাস বাদ দেয়া হয়েছে। তারা পুরো প্রশাসন ও প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে রোহিঙ্গাদের বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস চালায়; যাতে দেশের লোক এবং বিশ্ববাসীর মনে এ ধারণা জন্মে যে, রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক নয়। অবশেষে তারা ১৯৮২ সালে 'বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব আইন' পাশ করে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বহীন ও বিদেশী জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার প্রয়াস চালিয়েছে এবং আরাকানের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর তালিকা থেকে রোহিঙ্গাদের

www.pathagar.com

নাম বাদ দিয়েছে।[৭৬] ২০১২ সালে যেমন বেশকিছু মসজিদ-মাদরাসা ধ্বংস করা হয়ে তেমনি ২০১৬-১৭ সালে এ মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। রোহিঙ্গাদের ঘরবাড়ির চে মসজিদ-মাদরাসার প্রতিই মগবৌদ্ধদের আক্রোশ বেশি বলে ভিডিও চিত্রসমূহের ছবিতে অনুমিত হয়েছে।

৫.১ জ) নির্বাচিত রোহিঙ্গা চেয়ারম্যান-মেম্বারদের অবস্থা

নির্বাচিত চেয়ারম্যান-মেম্বারগণ স্ব-স্ব এলাকায় অত্যন্ত সম্মানীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তারা দেশের সচেতন-দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিত্বকারী জনগোষ্ঠীও বটে। কিন্তু মগসেনা ও উচ্ছৃঙ্খল মগদের হাতে আরাকানের নির্বাচিত রোহিঙ্গা চেয়ারম্যান-মেম্বারগণও রেহায় পায় নি। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান দূরের কথা, তারা নিজেরাই পাশবিক নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের শিকার। তাদেরকে বর্মী সেনাদের মর্জি মত জীবন চালাতে হয়। মোটা অংকের চাঁদা প্রদান, রোহিঙ্গা নারী সরবরাহ, সেনা ক্যাম্পে নিয়মিত খাদ্যদ্রব্য প্রদান এবং বাধ্যতামূলক শ্রমে বিনা পারিশ্রমিকে লোক সরবরাহ করার জন্য মগসেনারা তাদের উপর বিভিন্ন সময় চাপ প্রয়োগ করে থাকে। এমন কি তাদের নিজ পরিবারের সুন্দরী যুবতী মহিলারাও মগসেনাদের হাত থেকে নিরাপত্তা পায় না। এ কাজে চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হবার কারণে মংডু এলাকার কুর্মা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সৈয়দুল আমীনকে চেয়ারম্যান পদ থেকে বরখাস্ত করে এবং ৫ জন যুবতী সরবরাহে ব্যর্থ হবার কারণে বলিবাজার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাব্বির আহমদকে বেদম প্রহার করে। অপর একজন চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইয়াকুবকে তিন পুত্রসহ এবং সিকান্দার আলী নামক এক মেম্বারের ৪ পুত্রসহ সবাইকে গ্রেফতার করে জেলে নিক্ষেপ করে।[৭৭] মগ সেনাদের চাহিদা মাফিক কুলি ও রোহিঙ্গা যুবতী সরবরাহে ব্যর্থ হবার কারণে সামরিক জান্তার মনোনীত সেনারা বলীবাজার থানার তুলাতুলি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নবী হোসেন (৪৫) কে প্রকাশ্য দিবালোকে আম গাছের সাথে পেরাক মেরে তার নাক ও কান কেটে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে।[৭৮] একই অপরাধে ২ সন্তানের জননী ফাতেমা বেগমের স্বামী মোঃ কাছিম চেয়ারম্যানকে স্বস্ত্রীক ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাতেমাকে (৩৫) ২ দিন আটক রেখে সেনা অফিসাররা পালাক্রমে ধর্ষণ করে। ফাতেমা কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গেলেও কাছিম চেয়ারম্যানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।[৭৯]

সামরিক জান্তা মনোনীত আরাকানের মংডু টাউনশীপের আওতাধীন রিয়াজুদ্দীনপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নূরুল আলমও পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেন। তার পিতাও দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চেয়ারম্যানের ঐতিহ্যবাহী বিশাল বাড়িতে ৮০ জন সেনার সমন্বয়ে সেনাক্যাম্প বসানো হয়েছে। এ সকল সেনার জন্য তাকে প্রতিদিন একমণ চাউল, ৬০টি মুরগী অথবা ২টি খাসী ও ২ সের তেল সরবরাহ করতে হতো। সরবরাহ বন্ধ হলে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যু অনিবার্য; এ ভয়ে নিজের ঘর থেকে এবং

www.pathagar.com

গ্রামের অন্যান্যদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে নিয়মিতভাবে তাদেরকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করতেন। এত কিছুর পরেও অকৃতজ্ঞ মগসেনারা তার ১২ বছরের শ্যালিকাকে নিষ্ঠুরভাবে ধর্ষণপূর্বক হত্যা করে এবং তার স্ত্রীর নিরাপত্তার ব্যাপারেও হুমকি দেয়। অতঃপর বৃদ্ধা মা ও সাত ভাইয়ের সন্তান-সন্ততি মিলে যৌথ পরিবারের ৩২ জন সদস্য নিয়ে ১৯৯২ সালের ২৫ জানুয়ারি রাতের আঁধারে সমস্ত সম্পত্তি ও বসতবাড়ী ফেলে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে।[৮০] এছাড়া ১৯৮৮ সালের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের পর হতে প্রায় ক্ষেত্রেই নির্বাচিত রোহিঙ্গা চেয়ারম্যানদের বাদ দিয়ে মগদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়।[৮১]

উল্লেখ্য যে, ১৯৯১-৯২ সালে মিয়ানমার সরকার পিয়েথায়া বা মগ ভাষায় প্রিথয়া অভিযানের মাধ্যমে আরাকানে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। প্রিথয়া শব্দের অর্থ হলো শান্তির দেশ বা সুন্দর দেশ।[৮২] মূলত অপারেশন পিয়েথায়া ও মিং নং এর আওতায় সামরিক জান্তা রোহিঙ্গা মুক্ত আরাকান প্রতিষ্ঠার নীল নক্শা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গাদের রক্তের উপর শান্তি ও সুন্দর দেশ গড়তে চায়।[৮৩]

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর অসহায় মুহূর্তে শত্রুকেও সাহায্য করা মানবিক দায়িত্ব হয়ে পড়ে। অথচ মিয়ানমার সরকার ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল প্রলয়ংকারী ঘুর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের মত বার্মার আরাকান প্রদেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে ঘুর্নিঝড়ের ২০ দিন পরও রোহিঙ্গাদের জানমালের খোঁজ খবর, পুনর্বাসন কিংবা ত্রাণ কার্যক্রমসহ কোন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করেনি। বরং স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ মগদের পুর্নবাসন করে তাদের সহযোগিতা নিয়েই বিধ্বস্ত রোহিঙ্গাদের উপর বিভিন্নমুখী নির্যাতন চালিয়েছে।[৮৪] রোহিঙ্গাদের প্রতি মিয়ানমার সরকারের এ নির্মম আচরণকে কেন্দ্র করে দৈনিক মিল্লাত পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে -

> শতাব্দীর ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড়ে যখন বাংলাদেশের উপকূলীয় জনপদে লাখ লাখ মানুষ পরিণত হয়েছে লাশে, বিধ্বস্ত ভিটায় যখন স্বজন হারানোর হাহাকার, সেই সময় আরাকানের পাহাড়ে পাহাড়ে অসহায় অবলম্বনহীন হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান পল্লীতে শোনা যাচ্ছে মর্মবিদারী ক্রন্দনধ্বনি, পাহাড়ে-পাহাড়ে, অরণ্যে-অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেই ক্রন্দন। কিন্তু সভ্য পৃথিবীর মানবতার কাছে পৌঁছছে না সেই আহাজারি। বার্মিজ সামরিক জান্তা তাদের উপর চালাচ্ছে অকথ্য নির্যাতন। ঘূর্ণিঝড় সেই নির্যাতিত জনপদে চাপিয়ে দিয়েছে ধ্বংস ও মৃত্যুর বিভীষিকা। দ্বিমূখী নির্যাতনে আজ লীন হয়ে গেছে রোহিঙ্গা মুসলমান। তারা প্রাণ বাঁচানোর জন্য একান্ত বাধ্য হয়ে ছুটে আসছে বাংলাদেশের দিকে।
>
> গত ২৯ এপ্রিলের (১৯৯১) প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের পেরিয়ে আঘাত হেনেছিলো রোহিঙ্গা জনপদে। মারত্মকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে তাদের বসবাটী। প্রাণহানি ঘটেছে অজস্র। কিন্তু ঘূর্নিঝড়ের ২০/২৫ দিন

www.pathagar.com

পরও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি তাদের দিকে। সামরিক জান্তা গত কয়েক দশক ধরে রোহিঙ্গাদের উৎখাত ও বিনাশ করার জন্য চালিয়েছে নানা প্রকার ঘৃণ্য অপতৎপরতা, বারবার সামরিক জান্তা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে রোহিঙ্গা জনপদ। নিজস্ব ভিটেমাটি থেকে তাদের উৎখাত করে বারবার ঠেলে দিয়েছে বাংলাদেশের দিকে। রোহিঙ্গাদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরোজা। জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে অসংখ্য মসজিদ। কোন কোন মসজিদকে পরিণত করা হয়েছে গুদাম ঘরে। পাইকারী হারে হত্যা করা হয়েছে রোহিঙ্গা যুবকদের। জেলে পচিয়ে মারা হয়েছে অসংখ্য মানুষ। রোহিঙ্গা নারীদের বর্বরভাবে পাশবিক উপায়ে ধর্ষণ করা হয়েছে। প্রধান প্রধান শহরে রোহিঙ্গারা যাতে যেতে না পারে তার জন্য জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় (৭৮ সালে) বার্মার শাসকদের নির্যাতনের মাত্রা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, হাজার হাজার রোহিঙ্গা নারী পুরুষ শিশু দূর্গম পার্বত্যভূমি অতিক্রম করে নাফ নদী সাতরিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল ভ্রাতৃপ্রতিম বাংলাদেশে। সে সময় দু'পক্ষের সরকারি আলাপ- আলোচনার ভিত্তিতে আবার রোহিঙ্গারা ফিরে গিয়েছিল নিজ নিজ ভিটে-মাটিতে। রোহিঙ্গারা খুব দুরিদ্র মুসলমান। অন্যান্য বার্মিজদের মতো তারাও ভালোবাসে তাদের মাতৃভূমিকে। আবার তারা অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যদিয়ে গড়ে তোলে আপন আবাস, কিন্তু সমস্যা যে শেষ হয়নি; তা বোঝা গিয়েছিলো ক'দিন পরেই। সামান্য বিরতি দিয়ে বার্মিজ সমর শাসকরা আবার শুরু করে নির্যাতন। সেই নির্যাতন এখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এই নির্যাতনের মুখে দিশেহারা হতভাগ্য রোহিঙ্গাদের উপর নেমে আসে সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবলীলা। রোহিঙ্গাদের ভিটেমাটি ধ্বংস হয়েছে ঝড়ে; স্বজন হারিয়েছে। কিন্তু এই রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরও তারা বার্মা সরকারের কাছ থেকে পায়নি এক কণা ত্রানসামগ্রী, পায়নি সামান্য সহমর্মিতা, রোহিঙ্গাদের প্রতিবেশী মগ কিংবা রাখাইন সম্প্রদায়ের যারা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য বার্মা সরকার পাঠিয়েছে উদ্ধারকারী দল, পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী। তাদের পুনর্বাসনের জন্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। অথচ পাশাপাশি রোহিঙ্গারা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। ত্রাণ-সাহায্যের বদলে বার্মার সমর নায়করা রোহিঙ্গাদের উপর বৃদ্ধি করেছে আরো নির্যাতন। অর্থনৈতিকভাবে রোহিঙ্গাদের ধ্বংস করার জন্য নিয়েছে নানা প্রকার হীন পদক্ষেপ। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন রোহিঙ্গাদের চোখের পানিতে পাহাড়ের মাটি ভিজে যাচ্ছে। ক্ষুধায় কাতর রোহিঙ্গাদের আহাজারিতে গাছের পাতাও যেন আজ ঝরে পড়ছে। তবুও সামান্য মানবিক আচরণ তারা পায়নি শাসকদের কাছ থেকে। বাধ্য হয়ে ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে দূর্গম গিরি সংকট অতিক্রম করে নাফ নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে আসছে হাজার হাজার

www.pathagar.com

কংকালসার মানুষ। বাংলাদেশের কাছে তারা একমুঠো ভাত চায়; একটু আশ্রয় চায়। ... এই অসহায় আদম সন্তানের মধ্যে নারী শিশুই বেশি। তাদের পশ্চাতে নির্যাতনের ভয়াল স্মৃতি, সম্মুখে ঘূর্নিঝড় ও জ্বলোচ্ছাস পীড়িত বাংলাদেশ।...[৮৫]

নির্যাতনের খবর যাতে বিশ্ববিবেক না জানতে পারে এ জন্য মিয়ানমারের সামরিক জান্তা রোহিঙ্গাদের পালানোর পথে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বসিয়ে বর্ডার সীল করে, এমন কি বাংলাদেশের সীমান্ত শহর টেকনাফ দিয়ে ৮ ঘন্টার জন্য মিয়ানমারে যাওয়া আসার ট্রানজিট পাশও বন্ধ করে দেয়। জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জ্যাঁ এলিয়াসনসহ আরাকান সফরকারী বিদেশী বিশেষজ্ঞরা সরেজমিনে রোহিঙ্গাদের অবস্থা দেখার জন্য এলেও মিয়ানমার সামরিক জান্তার ছলচাতুরীর কারণে তারা সঠিকভাবে অবস্থা পরিদর্শন করতে ব্যর্থ হন। জাতিসংঘের বিশেষ দূত এলিয়াসন বার্মা সফরকালে আকিয়াব, মংডু ও বুচিদং এলাকাসমূহে রোহিঙ্গাদের সাথে কথা বলতে চাইলে আগে থেকেই রোহিঙ্গাদের পোষাক-আশাকে ঠিক করে রাখা মগদের এনে হাজির করা হয়। তিনি অবস্থা বুঝতে পেরে সরাসরি গ্রামে প্রবেশ করতে চাইলে তাকে সুকৌশলে বারণ করা হয়।[৮৬]

মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা নির্যাতনের করুণ চিত্রকে গোপন রাখার নিমিত্তে বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করলেও তারা সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি চিঠি আরাকান থেকে পাচার হয়ে থাইল্যান্ডে পৌছেছে। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে রেঙ্গুন ভিত্তিক বিদেশী কুটনীতিকরা যখন একটি তথ্যানুসন্ধান সফরে আরাকান গিয়েছিলেন তখন একজন গ্রামবাসী গোপনে জনৈক কুটনৈতিকের হাতে ঐ চিঠিটি তুলে দেন।[৮৭]

চিঠিতে বলা হয়, মগসেনারা মুসলমান গ্রামবাসীদেরকে তাদের কুলি হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করছে। যারা তাদের আদেশ মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে তাদেরকে গুলী করে হত্যা করা হচ্ছে। মুসলমান মা-বোনদের উপর যৌন নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এছাড়া মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামসমূহে আগুন লাগিয়ে বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। মুসলমানদেরকে তাদের জমি থেকে উৎখাত করে ঐ সব জমি মগদেরকে দিয়ে দেয়া হচ্ছে। মুসলমানদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে ঐ অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেয়া। চিঠির লেখক অভিমত প্রকাশ করেন, মিয়ানমারের মুসলমানদের অবস্থা ফাঁদে পড়া পাখির মতো। মগসেনারা মুসলমানদের সাথে পশুর মতো আচরণ করছে। পশ্চিমা কুটনৈতিকদের মধ্যে যারা চিঠিটি দেখেছেন তারা মুটামুটি নিশ্চিত যে, মগসেনাদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হয়েছে তার সবই সত্য। একজন পশ্চিমা কুটনীতিক বলেন, আরাকান অঞ্চল সফরকারী কুটনীতিকদের রির্পোটের সাথে চিঠির বিবরণের মিল রয়েছে। এ চিঠি এটাই প্রমাণ করে যে, রেঙ্গুন কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত নির্যাতন অভিযান চালাচ্ছে এবং তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে।[৮৮]

www.pathagar.com

আরাকান সফরকারী একজন পশ্চিমা কূটনীতিক তাঁর গোপন রির্পোটে লিখেছেন, সাদা পোশাক পরিহিত সেনা গোয়েন্দা কর্মকর্তারা গ্রামবাসীদেরকে তাদের সাথে কথা বলতে দেয়নি। রেঙ্গুন কর্তৃপক্ষই পশ্চিমা কূটনীতিকদের আরাকান সফরের ব্যবস্থা করেছিলো। কিন্তু গ্রামবাসীরা কূটনীতিকদের কাছে আসল তথ্য ফাঁস করে দিতে পারে এ আশংকায় সেনাগোয়েন্দা কর্মকর্তা তাদেরকে কূটনীতিকদের কাছে যেতে বাধা প্রদান করে। তারা গ্রামবাসীদের মারধর করে এবং রিভলবার উচিয়ে ভয় দেখায়। এ দৃশ্য দেখে কূটনীতিকরা তাড়াতাড়ি করে ঐ এলাকা ত্যাগ করেন। ঐ কূটনীতিকদের রির্পোটের উপসংহারে বলা হয়, আরাকান সফরকারী কূটনীতিকরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, রেঙ্গুন কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গাদের উপর ব্যাপক নির্যাতন চালাচ্ছে এবং সেখানে অস্বাভাবিক অশান্তি অবস্থা বিরাজ করছে।[৮৯]

মিয়ানমারের সামরিক জান্তা রোহিঙ্গাদেরকে নির্যাতনের নিমিত্তে নাগরিকত্ব ইস্যু ছাড়া আর কোন অভিযোগ না পেলেও সীমান্ত চোরাচালানীর জন্য দায়ী করে। অথচ একাজে জড়িতদের প্রায় সকলেই মগ। তারা একদিকে রোহিঙ্গা উচ্ছেদে তৎপর অন্যদিকে চোরাচালানীতে নিয়োজিত থেকে প্রচুর অর্থের মালিক হচ্ছে।[৯০]

টেকনাফ বাজার, শাহাপরীর দ্বীপ, বদরমোকাম, সাবরং, জাইল্ল্যারদিয়া, তোতারদিয়া, হ্নিলা (নীলা), বালুখালী, তমব্রু ও গর্জনিয়ায় প্রতিদিন মগ ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্যে উভয় দেশের মুদ্রা বিনিময়ের হাট বসায়। বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন এ্যালুমিনিয়াম, ঔষুধ, মোটর পার্টস, কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল, কার্পেট, বেবীফুড, গুঁড়োদুধ, খেজুর, আয়রন, সিমেন্ট, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, বাংলাদেশে আমদানীকৃত বিদেশীপণ্যসহ কোটি কোটি টাকার পণ্য মিয়ানমারে পাচার হয়। মগ ব্যবসায়ীরা শুধু হুণ্ডি ব্যবসার জন্য বাংলাদেশে আসে না, তারা আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ও চোরাচালানীদের তথ্য সরবরাহের কাজও করে থাকে। ফলে টেকনাফ ফ্রি পোর্টে পরিণত হয়েছে। অথচ বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ৩টি ট্রানজিট খুলে দিয়ে ট্রানজিট ভিসার মাধ্যমে উভয় দেশের জনগণকে অবাধ যাতায়াতের সুযোগ দেয়া হলেও ট্রানজিট ভিসা নিয়ে বেশি লোক যাতায়াত করে না।[৯১]

মগসেনা ও প্রত্যাবাসিত মগ কর্তৃক হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ, বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও কবরস্থানের ধ্বংসসাধন এবং নারী নির্যাতন বিশ্ব বিবেকের কাছে বিস্ময়কর হলেও সামরিক জান্তা যে এসব ঠাণ্ডা মাথায় রোহিঙ্গামুক্ত আরাকান গড়ার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে করছে তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই। দৈনিক মিল্লাত পত্রিকায় প্রতিফলিত মন্তব্যই এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য- "বর্মীসরকার আরাকান প্রদেশে বার্মীজ জোন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খুন, লুট, ধর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড, জবরদস্তি শ্রম প্রভৃতি অমানবিক নির্যাতনের মাধ্যমে আরাকানকে কসাইখানায় পরিণত করেছে।"[৯২]

রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে রাখাইন রাজ্যে ক্ষোভের কারণ তারা তাদের বিদেশি হিসেবে গণ্য করে। আবার ধর্মীয় পরিচয়ে তারা মুসলমান। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের

www.pathagar.com

প্রতিবেদন অনুযায়ী, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বৌদ্ধ সমাজের জন্য হুমকি মনে করা হয়। মিয়ানমারের বৃহত্তর সমাজের জোরালো বিশ্বাস, রাখাইন রাজ্যের বৌদ্ধরা যদি তাদের দেশের পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা না করত তাহলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ 'বেঙ্গলি'দের চাপে মিয়ানমার তথা বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অনেক আগেই মুসলমান হয়ে যেত।[৯৩] এটি বিশ্বাসযোগ্য হোক আর নাই হোক, বাস্তবতা হলো, রোহিঙ্গা মুসলমানদের নাগরিকত্ব ও অন্যান্য অধিকার না দেওয়ার পক্ষেই দেশটিতে গণদাবি আছে। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ছাড়া অন্য জনগোষ্ঠীর মুসলমানদের ব্যাপারেও দিন দিন এ ধারণা জন্মাচ্ছে। তাদেরও মিয়ানমারে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দেখা হচ্ছে। এ কারণে ২০১৫ সালের নির্বাচনে মিয়ানমারে বড় রাজনৈতিক দলগুলো একজনও মুসলমান প্রার্থী দেয়নি। পুরো মিয়ানমারেই মুসলমান ভোটারদের বেশির ভাগ ভোট দেওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের ওই প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, মিয়ানমারে মুসলমানদের ওই সমাজের ক্যান্সার হিসেবে গণ্য করা হয়। মাবাথার ব্যাপক চাপে ২০১৫ সালের মে থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে মিয়ানমারে চারটি আইন প্রণয়ন করা হয়। সেগুলো মুসলমানদের বিশেষ করে রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা মুসলমানদের দিকে দৃষ্টি দিয়েই করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। আইন চারটির মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নারীদের বিশেষ বিয়ে আইন দ্বারা বৌদ্ধ নয় এমন কোনো পুরুষকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন আইনে আগ্রহী ব্যক্তিদের ন্যূনতম ১৮ বছর বয়সী হওয়া, ধর্ম পরিবর্তন ও নিবন্ধন বোর্ডের মুখোমুখি হয়ে সাক্ষাৎকার প্রদানসহ বেশ কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। এ ছাড়া বহু বিয়ে আইন দ্বারা এ ধরনের চর্চা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৯৪] রোহিঙ্গাদের ভোটাধিকার বন্ধ করার কারণে বর্তমানে আরাকানে রোহিঙ্গাদের মাঝে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নেই বললেই চলে।

৫.২ রোহিঙ্গাদের শরণার্থী জীবন ও বাংলাদেশ

অসহনীয় নির্যাতনের মুখে শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর তাগিদেই রোহিঙ্গারা স্বীয় পৈত্রিক বসতবাড়ী, জমাজমি ও ধন সম্পদের মায়া ত্যাগ করে হাড়ি-পাতিল, পোটলা-পুটলি, বাক্স প্রভৃতি হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়ে বাংলাদেশে পাড়ি জমায়। এদের মধ্যে রয়েছে নারী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু, সব বয়সী মানুষ; যাদের চোখে মুখে ভয় আতংক, উৎকণ্ঠা হতাশা আর অনিশ্চয়তার সুস্পষ্ট ছাপ। টেকনাফ, উখিয়া ও রামুর পথে প্রান্তরে উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের আগমন ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু হয়ে ৯১ সালে এর ব্যাপকতা বেড়ে গণহারে দেশত্যাগ শুরু হয়।[৯৫] ২০১৬-১৭ সালে এটি জনস্রোতে পরিণত হয়ে পড়ে।

কিছু সংখ্যক শরণার্থী ১৯৮৪ সালে এদেশে এলেও ব্যাপকভাবে আসে ১৯৯১-৯২ সালের রোহিঙ্গা উচ্ছেদ অপারেশনে। তাদেরকে ২১ টি ক্যাম্পে পুনর্বাসন করা হলেও

www.pathagar.com

দেশের পার্বত্য জেলা বান্দরবন ও সমুদ্রবেষ্ঠিত কক্‌সবাজার জেলার সর্বত্র সামাজিকভাবে স্থায়ী আবাস গড়ার জন্য দু'টি জেলার ৬টি থানায় ৮০ হাজার শরণার্থীর ৭৫% বসতবাড়ী তৈরি করে বসবাস শুরু করে। এরমধ্যে কক্‌সবাজার সদরের বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় ১২ হাজার, রামু থানায় ১০ হাজার, টেকনাফ থানায় ৬ হাজার, নাইক্ষ্যংছড়িতে ১০ হাজার, বান্দরবান জেলার বিভিন্ন এলাকায় ১১ হাজার এবং মহিষখালী থানার চরাঞ্চলে প্রায় ১৫ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী মাছ ধরার কাজে জড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় শরণার্থীরা গাছ কাটার দিনমজুর, জ্বালানী সংগ্রহ কেউবা বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সীমান্ত এলাকায় চোরাচালানীতে জড়িয়ে পড়ে। ফলে জমি দখল, গাছ কাটা, স্বল্প মূল্যে দিন মজুরি দেয়া, মাছ শিকার ও চোরাচালানী কারবারের জন্য প্রতিনিয়ত চকোরিয়া, মহিশখালীর গোরকঘাটা ও বড় মহিশখালী, কক্‌সবাজার সদরের বৈদ্যনাথখোলা, শিয়ালা পাহাড়, ঘোনারপাড়া, কলাতলী, হিমছড়িসহ বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে সংঘর্ষ বাঁধে। এ কারণে কক্‌সবাজার, উখিয়া, রামু থানাসহ বিভিন্ন স্থানে মিছিল ও প্রতিবাদ সভাও অনুষ্ঠিত হয়। তারা রোহিঙ্গাদের স্বদেশে প্রত্যাবাসন ও শরণার্থী শিবিরে অবস্থান করার দাবি জানায়। কক্‌সবাজার সদরে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ে এ বিষয়ে একজন কর্মকর্তাকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, আশ্রয় শিবিরগুলোর বাইরে এ পর্যন্ত ৩৭ হাজার শরণার্থী রয়েছে বলে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে। এদের ত্রান দেয়া হয় কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, 'হয়তো কেউ কেউ ত্রাণ পায়'। আশ্রয় শিবিরের বাইরের শরণার্থীদের শিবিরের আওতায় আনা হচ্ছেনা কেন? এর জবাবে তিনি জানান, শিবিরের বাইরে যারা আছে তারা ভ্রাম্যমান। আজ এখানে কাল ওখানে। ওদের শিবিরে আনার চেষ্টা করা হয়েছে ওরা আসেনা।[৯৬] ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশন অফিস, কক্‌সবাজার সূত্রে জানা যায় যে, ক্যাম্পে অবস্থানরত শরণার্থী ছাড়াও প্রায় দেড় লাখ রোহিঙ্গা কক্‌সবাজার ও বান্দরবান জেলার বিভিন্ন থানার লোকালয়, পাহাড়-সমতল এবং কক্‌সবাজার পৌর এলাকাসহ সমুদ্র সৈকতে অবৈধ বসতি গড়ে তুলছে।[৯৭]

এছাড়া শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত শরণার্থীদের শিবিরের বাইরে যাবার অনুমতি না থাকলেও গোপনীয়ভাবে টেকনাফের বিভিন্ন স্থানে বেড়ীবাঁধ নির্মাণসহ বিভিন্ন কাজে মাত্র ২৫/৩০ টাকা মজুরিতে তারা কাজে নামে, ফলে ঠিকাদাররা লাভবান হলেও স্থানীয় মজুররা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।[৯৮] এসব কারণে বিভিন্নর স্থানে "বর্মাইয়া হঠাও" বা "রোহিঙ্গা হঠাও" নামে বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। রোহিঙ্গাদের স্বদেশে প্রত্যাবাসনসহ জোরপূর্বক ওপারে পাঠানোর চেষ্টা করলেও ওপারের সীমান্ত প্রহরীরা প্রেরিত রোহিঙ্গাদের গুলি করে মেরে ফেলে বলে এক অমানবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়।[৯৯]

"বৃহত্তর চট্টগ্রামে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলছে" শীর্ষক দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত মহসিন চৌধুরী প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন-

www.pathagar.com

> চট্টগ্রামের দক্ষিণ অংশ, বান্দরবন ও কক্সবাজারে পালিয়ে আসা বর্মী শরণার্থীদের দাপটে বাঙালী অধিবাসীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে চলছে। মিশে যাওয়া শরণার্থীরা দেশের কোটি কোটি টাকার বনজ সম্পদ ধ্বংস করে আবাসন গড়ে তুলছে। বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে রোঁয়াইপাড়া (রোহিঙ্গাপাড়া)। ৬ লাখেরও অধিক রোহিঙ্গার অবাধ বিচরণে বাঙালী বর্মী মুখোমুখি হলে সম্প্রীতি বিনষ্ট হতে পারে।
>
> সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আরাকান মুসলিমরা এদেশে আসতে শুরু করে ১৯৪২ সাল থেকে। দৈহিক কাঠামোগতভাবে টেকনাফ কক্সবাজার এলাকার বাঙালীদের সাথে মিল থাকায় এরা এদেশে অবাধে বিচরণ করতে পারে। শুধুমাত্র ভাষাগতভাবে কিছুটা অমিল রয়েছে। বার্মায় আরাকানের রাখাইন ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে সম্প্রীতি বিনষ্ঠ করে বর্মী জান্তা রোহিঙ্গা দমন অভিযান শুরু করে। বিয়াল্লিশের কাটাকাটি (গণহত্যা), ১৯৭৮ সালের ড্রাগন অপারেশন'৭৯ সালের প্যালোন ও অন্যান্য অভিযানের মাধ্যমে রোহিঙ্গা দমন করে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে শরণার্থী বানানো হয়। রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে নির্যাতিত হয়ে এদেশে পাড়ি দেয়। শরণার্থী হিসেবে তারা প্রথম দিকে এলেও সুযোগ বুঝে বিভিন্নস্থানে কর্মস্থল সৃষ্টি করে আবাসন সৃষ্টি করে। আত্মীয়তার সম্পর্কে তাদের দল ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হচ্ছে। গত ৫০ বছরে অন্ততঃ ১০/১২ লাখ বসতি স্থাপন করেছে। এর মধ্যে লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশী পাসর্পোটে পাড়ি জমিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরবে। যেসব রোহিঙ্গা বর্তমানে বাংলাদেশের দক্ষিণাংশে স্থায়ী আবাসন তৈরি করে বাঙালী সমাজের সাথে মিশে গেছে তারা তাদের আত্মীয় স্বজনদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে। এতে দেশের বনজসম্পদ ক্রমান্বয়ে উজার হচ্ছে। বান্দরবান ও পাহাড়ি কক্সবাজার এলাকায় প্রতিনিয়ত এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। দীর্ঘদিন থেকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া, সাতকানিয়া, চন্দনাইশ, পটিয়া, ও আনোয়ারায় গড়ে উঠেছে রোহিঙ্গাদের আবাসন। বিশাল এসব পাড়া রোঁয়াই পাড়া নামে স্থানীভাবে পরিচিত। বাঙালী অধিবাসীদের সাথে তাদের সমাজ ব্যবস্থায় অমিল। সামাজিকভাবে বিভিন্ন এলাকায় দ্বন্ধ রয়েছে। বিশেষ করে গ্রাম্য রাজনীতিতে এটি বেশ প্রভাবিত। গত '৯১তে আসা ৩ লাখ রোহিঙ্গার মধ্যে দু'লাখের কাছাকাছি প্রত্যাবাসিত হলেও বাকি রোহিঙ্গা বিভিন্নভাবে আবাস গড়ে তুলছে। ...তারা বৈধ কোন নাগরিক না হলেও স্থায়ী বাসিন্দার বিভিন্ন ভূয়া কাগজপত্র সংগ্রহ করে সরকারি বেসরকারি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে ব্যবসা-বাণিজ্য করছে।[১০০]

বাংলাদেশ-মিয়ানমার কর্তৃক ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে Joint Statement বা যৌথঘোষণা স্বাক্ষরিত হবার মাধ্যমে শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলেও প্রত্যাবাসিত রোহিঙ্গাদের অনেকেই ভাল সুযোগ সুবিধা না পেয়ে নতুনদের

www.pathagar.com

সাথে নিয়ে পুনরায় মিম্মাংখালী, চৌধুরীপাড়া, দমদমিয়া, দ্রাদিমুড়া, জালিয়াপাড়া, নাইক্ষ্যংপাড়া, মগপাড়া ও নয়াপাড়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকছে। স্থানীয় অনেক চেয়ারম্যান মেম্বার নিজেদের ভোটার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য নতুন করে আসা অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিয়ে ভোটার আইডি কার্ড করে দিয়েছে। ফলে তারা স্থানীয়ভাবে জমি কিনে স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলছে। এভাবে বিভিন্ন ইস্যুতে নির্যাতনের মুখে প্রতিবছর হাজার হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসে স্থায়ী আবাসন গড়ে তুললে দারিদ্র ও জনসংখ্যার ভারে নুয়েপড়া বাংলাদেশের উপর যেমন অর্থনৈতিক চাপ পড়বে তেমনী জনসংখ্যার ভারে দাঁড়ানোর মত অবস্থা থাকবে না। রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে এবং এতদিনে দক্ষিণাঞ্চলের বাঙালীরা হয়তো সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে নিজ দেশে পরবাসী জীবন যাপনে বাধ্য হবে।[১০১] সুতরাং রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিকভাবে আরো জোরালো পদক্ষেপ নেয়া জরুরী এবং তারা যাতে বাংলাদেশে এসে স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলতে না পারে সে ব্যাপারে প্রশাসনকে আরো সজাগ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রোহিঙ্গা নির্যাতনের করুণ চিত্র বিশ্ব বিবেককে আলোড়িত করায় তারা বিভিন্নভাবে বার্মা সরকারের বর্বতার নিন্দা জানিয়ে রোহিঙ্গাদেরকে স্বদেশে পুনর্বাসন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। ১৯৭৮ সালে আগত শরণার্থীদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে অষ্ট্রেলীয় সংসদীয় প্রতিনিধিদলের নেতা সিনেটর ফ্রেডারিক মিচেল চ্যামিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা রোহিঙ্গা সমস্যাকে গুরুতর বলে অভিহিত করে শীঘ্রই পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করার জন্য বার্মার প্রতি চাপ প্রয়োগ করে। অষ্ট্রেলীয় সংসদীয় প্রতিনিধিদলের নেতা উল্লেখ করেন, সফরকারী প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে শরণার্থীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে যে, শরণার্থীরা বংশ পরম্পরায় বার্মার নাগরিক; এ ব্যাপারে তাদের আইনানুগ প্রমাণপত্রও রয়েছে।[১০২]

রোহিঙ্গারা নির্যাতনের মুখে ১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণের ঘটনার উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাই কমিশনার (UNHCR) এর চার সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতা ডি সুজা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, ইসলামি সম্মেলন সংস্থার অংগ সংগঠন ইসলামি সংহতি তহবিলের স্থানীয় কাউন্সিলের সভাপতি নাসার বিন আব্দুল্লাহ বিন হামাদান আল জাযারী, ওআইসির মহাসচিব হামিদ আল গাবিদ, মালয়েশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নাজির রাজ্জাক, সৌদি আরব, তুরস্ক, লিবিয়া, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, চীন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এমনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, ভয়েস অব আমেরিকা সম্পাদীয়, জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বুট্রোস ঘালির বিশেষ দূত জাতিসংঘ আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জ্যাঁ কে এলিয়াসন ও মার্কিন মানবাধিকার গ্রুপসহ ৩৪ টি দেশের ঢাকাস্থ কুটনৈতিক মিশনের প্রধানগণ এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংস্থা বিবৃতি এবং মতামত প্রকাশ করে বার্মার উপর চাপ সৃষ্টি করে।[১০৩] হামাদান ইসলামি সংহতি তহবিলের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলকে নিয়ে কক্সবাজার রোহিঙ্গা

www.pathagar.com

উদ্বাস্তু শিবিরসমূহ পরিদর্শন শেষে ঢাকায় ফিরে দৈনিক ইনকিলাবকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন- রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের অবস্থা দেখে আমরা খুবই বিচলিত হয়েছি এবং কষ্ট পেয়েছি। আমরা দেখেছি তারা তাদের বসতবাড়ী ছেড়ে সহায়-সম্পত্তির কোন কিছু নিতে না পেরে নাম মাত্র কাপড় ও যৎসামান্য জিনিসপত্র নিয়ে এদেশে পাড়ি জমিয়েছে। তবে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে সঠিক দায়িত্ব পালনের জন্য।[১০৪]

লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা *এমনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল* রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন ও সন্ত্রাস চালানো বন্ধ করার জন্য মিয়ানমার ক্ষমতাসীন সামরিক পরিষদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সংস্থার একটি তথ্যানুসন্ধানী দল বাংলাদেশে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের সাথে কথা বলে এবং তাদের উপর হত্যা-নির্যাতনের মাধ্যমে মানবাধিকার লংঘনের রির্পোটের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে এমনেষ্টি মন্তব্য করে, এটা পরিস্কার যে মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় আরাকান প্রদেশের রোহিঙ্গারা মিয়ানমার সেনাদের লক্ষ্য। সেখানে গ্রাম ঘেরাও করে ব্যাপক হারে রোহিঙ্গাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে শ্রম দিতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং তাদের দিয়ে কুলিগিরি করানো হচ্ছে। তাদেরকে অনাহারে অর্ধাহারে রেখে নির্যাতন চালানো হচ্ছে; এমন কি শারীরিক দূর্বলতার কারণে বোঝা বহনে অক্ষম হবার কারণে অনেককে পিটিয়ে মেরে ফেলছে। বাড়িতে বাড়িতে রোহিঙ্গা মহিলাদের উপর গণধর্ষণ চলছে এবং কাউকে সেনাশিবিরে আটকে রেখে উপযুপরি ধর্ষণ করেছে। সৈন্যরা মুসলমান গ্রামে ঢুকে মসজিদ দখল করে ধর্মীয় গ্রন্থাদি পুড়িয়ে ফেলে এবং খাদ্য-শস্য লুট করে নিয়ে সেনাবাহিনী লিখিত আদেশ দিয়ে জমি-জমা অধিগ্রহণ করার পর গোটা গ্রামের লোকজনকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়।[১০৫] অনুরূপ একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে মার্কিন মানবাধিকার গ্রুপ, যা 'এশিয়া ওয়াচ' প্রকাশ করেছে।[১০৬] আন্তর্জাতিক উদ্বেগ ও চাপের ফলে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করে।

বারবার পুশব্যাক করেও রোহিঙ্গাদের আগমন ঠেকানো যাচ্ছে না। ২০০৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে কাঁটাতারের বেড়া ও বাঁধ নির্মাণে সেনাসদস্য কর্তৃক বাধ্যতামূলক বেগার শ্রম এবং স্থানীয় মগদের নির্যাতন ও লুটপাটের প্রেক্ষিতে আবারো রোহিঙ্গারা আসতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষা বাহিনী বারবার তাদের পুশব্যাক করে থাকে। এ প্রেক্ষিতে প্রায় কয়েক হাজার রোহিঙ্গা মিয়ানমার সীমান্তে এসে মানবেতর জীবন যাপন করে।[১০৭] পুশব্যাক সত্ত্বেও চোখের আড়াল দিয়ে যে সব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে তার সংখ্যাও ত্রিশ হাজারের কম নয়।[১০৮] মাত্র কয়েকমাসে বারো'শ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করলেও রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আসা বন্ধ হয়নি।[১০৯] কাঁটা তারের বেড়া থাকলেও নাসাকা বাহিনী জোর করে তা পার করে দেয় বাংলাদেশে আসার জন্য। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষা বাহিনী যে সব রোহিঙ্গাকে পুশব্যাক করে তাদের পক্ষে কাঁটা তারের বেড়া পার হয়ে

www.pathagar.com

নিজেদের এলাকায় যাওয়ার কোন সুযোগ দেয় না নাসাকা বাহিনীর সদস্যরা। ফলে তারা আবারও অরক্ষিত পয়েন্ট দিয়ে অতি গোপনে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। এভাবে ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসের রির্পোট অনুয়ায়ী প্রায় সত্তর হাজার রোহিঙ্গা নতুনভাবে উখিয়ার কুতুপালং ও টেকনাফের লেদা ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় আশ্রয় নেয়।[১১০] সরকারের শীর্ষমহল থেকে কোন নির্দেশনা না থাকায় স্থানীয় প্রশাসন তাদের নিয়ে ভীষণ হিমিসিম অবস্থায় পড়ে। তারা না পারেন তাদের ক্যাম্পের শরণার্থী হিসেবে বৈধতা দিতে না পারেন অবৈধ হিসেবে মিয়ানমারে পুশব্যাক করতে।

বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কড়াকড়ি আরোপের পরও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকানো যাচ্ছে না। উখিয়া ও টেকনাফের দুটি শরণার্থী শিবিরে প্রায় ২৫ হাজার রোহিঙ্গা থাকলেও ককসবাজারের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রায় ৪ লাখ রোহিঙ্গা।[১১১] হ্নীলা অঞ্চলের মেম্বার পাড়া, নাটমোড়পাড়া, চৌধুরীপাড়া, লেদা, জাদিমুড়া, দমদমিয়া, ওয়ারবাং, মৌলভীবাজার, হোয়াইক্যং ইউনিয়নের নয়াবাজার, কানজরপাড়া, মিনাবাজার, ঝিমংখালী, লম্বাবিল, উলুবনিয়া, টেকনাফের কেরুনতলী, নাইট্যংপাড়া, জালিয়াপাড়া, নজির পাড়া, সাবরং ইউনিয়নের নয়াপাড়া, শাহপরী দ্বীপের জালিয়াপাড়া মিস্ত্রিপাড়া প্রভৃতি সীমান্ত দিয়ে প্রতিনিয়ত প্রবেশ করে রোহিঙ্গারা। প্রতিদিনই ত্রিশ থেকে চল্লিশজন কিংবা তারো বেশি রোহিঙ্গা আরাকান থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করে থাকে।[১১২] মিয়ানমারের সামরিক জান্তা কর্তৃক বাড়িঘর ও জমিজমা দখলের ঘটনায় ২০১০ সালের এপ্রিলের মধ্যে কয়েক হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

২০১০ সালের শেষ দিকে এসে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বন্ধে আরো বেশি কড়াকড়ি আরোপ করে বাংলাদেশ সরকার।[১১৩] ককসবাজারসহ চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় নতুন করে রোহিঙ্গা অনুসন্ধানের জন্য সার্ভে করার ঘোষণাও দেয়া হয়। এমন কি রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তাদানকারী বেসরকারী সংস্থাসমূহের উপর নজরদারী বাড়ানোরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেইসাথে এ বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ এবং রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনিকে প্রধান করে ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি'ও গঠন করা হয়।[১১৪] রোহিঙ্গারা যাতে গোপনে বাংলাদেশী পাসপোর্ট সংগ্রহ করে দেশের বাইরে যেতে না পারে সে বিষয়ে আরো বেশি নজরদারী বাড়াতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে রেড এলার্ট জারির অনুরোধ জানানো হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে।

এতো কড়াকড়ি আরোপ করার পরেও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ যেন থামানোই যাচ্ছে না। বাংলাদেশ-মিয়ানমারের বিভিন্ন সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ চলতেই থাকে। ২০১১ সালের মার্চ মাসে মাত্র ১ সপ্তাহে ককসবাজারের উখিয়া, টেকনাফ ও নাইক্ষ্যংছড়ির বিভিন্ন গোপনীয় পয়েন্ট দিয়ে প্রায় ২ হাজার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করে।[১১৫] তাদের অনেকেই উখিয়া ও টেকনাফের দুটি শরণার্থী শিবিরের পার্শ্ববর্তী

www.pathagar.com

এলাকার বস্তিতে আশ্রয় নেয়। অবশিষ্টরা শরণার্থী ক্যাম্প সংলগ্ন সরকারি বনবাগানে আশ্রয় নেয়। আশ্রিত বুচিদং এলাকা থেকে আগত আমিন ও সখিনা খাতুন জানায়, মগদের নির্যাতনের চেয়ে এদেশে না খেয়ে থাকাটাই অনেক ভালো। তাই আমরা এখানে চলে এসেছি।

মিয়ানমারের সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসক ২০১১ সালে আকস্মিকভাবে রোহিঙ্গাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন ও দমনপীড়ন শুরু করলে রোহিঙ্গাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বৌদ্ধভিক্ষুদের রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয়। তারা মুসলিম রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের ক্ষেপিয়ে তোলে। পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়া হয়। বর্মি সেনাবাহিনী ও পুলিশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উত্তেজনা বন্ধ করার পরিবর্তে ভিক্ষুদের সাথে নিয়ে রোহিঙ্গাদের ওপর হামলা চালায়। তাদের বাড়িঘর ও মসজিদে অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে কমপক্ষে ২০০ রোহিঙ্গা মুসলিমকে ২০১৩ সালে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।[১১৬]

মিয়ানমারের রাজধানী ইয়াঙ্গুন থেকে সংবাদ সংস্থা এপির পাঠানো এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গণতন্ত্রে রূপান্তরিত সামরিক জান্তা ২০১১ সাল থেকে এ পর্যন্ত হাজার হাজার সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাকে হত্যা করেছে। মুসলমানেরা 'সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র করছে' বলে গুজব ছড়িয়ে তাদের ওপর চালানো হচ্ছে নির্মম নির্যাতন। সংখ্যাগুরু বৌদ্ধদের ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে। বৌদ্ধরা 'দেশ রক্ষার' নামে রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, জায়গাজমি দখল করে নিচ্ছে। এ সবই করা হচ্ছে মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে।[১১৭] আসলে নিয়ানমারে কয়েক বছর ধরে যা চলছে তা স্রেফ 'গণহত্যা'। সেখানে সংখ্যাগুরুদের স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হচ্ছে সংখ্যালঘুরা। গণতন্ত্রের আবরণে সামরিক সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশনের' মূল্য দিতে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলমানেরা।

দেশত্যাগে বাধ্য রোহিঙ্গা মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার কিছু চিত্র ২০১৪ সালে আলজাজিরা টেলিভিশনে ধারাবাহিকভাবে প্রচার হয়েছিল। সেসব প্রামাণ্য চিত্রে দেখানো হয়েছে খাদ্য আর পানির অভাবে কিভাবে সাগরের পানিতে ডুবে মরেছে তারা। সাগরে ভাসমান ওই লোকগুলোর নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য পর্যন্ত নেই। একমাত্র মৃত্যুই যেন তাদের শেষ পরিণতি। এভাবে দেশ থেকে বিতাড়ন করে দেয়াও তো এক ধরনের গণহত্যা।[১১৮] আলজাজিরার প্রামাণ্যচিত্রের একটি চরিত্র মুহিবুল্লাহ, যিনি ১৭ দিন একটি ভাঙাচোরা নৌকায় সাগরে ভেসেছেন। মানবপাচারকারীরা তাকে তুলে দিয়েছিল ওই নৌকায়। অবশেষে থাই উপকূলে অন্যদের সাথে তাকেও নামিয়ে দেয়া হয়। সেখান থেকে ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হয় গভীর জঙ্গলের এক শরণার্থী শিবিরে। সেখানে শুরু হয় দুর্দশার নতুন অধ্যায়। অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায় বহু গুণ। মুহিবুল্লাহ বলেন, দুই হাজার ডলার মুক্তিপণের দাবিতে দালালেরা তার ওপর টানা দুই

www.pathagar.com

মাস অমানুষিক নির্যাতন করেছে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'ওই নির্যাতনের কথা কাউকে বলার মতো নয়'।[১১৯] এখন মানবাধিকার গ্রুপগুলো দৈনিক এ ধরনের করুণ চিত্র প্রকাশ করছে। কিন্তু এগুলো যথাযথ মিডিয়া কাভারেজ পায় না। ফলে রোহিঙ্গা ইস্যুটি বিশ্বসম্প্রদায়ের কাছে বড় কোনো বিষয় হয়ে দেখা দিচ্ছে না।[১২০] তা ছাড়া বড় কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়া শুধু 'মানবাধিকার' বিষয়টি এখন তেমন কোনো গুরুত্ব পায় না।

রাষ্ট্রীয়ভাবে অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার রোহিঙ্গাদের ওপর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় হামলার খড়গ নামে ২০১২ সালে। ওই বছর স্থানীয় একটি দ্বন্দ্বের ঘটনাকে পুঁজি করে উগ্র বৌদ্ধভিক্ষুদের নেতৃত্বে শুরু হয় রোহিঙ্গাবিরোধী দাঙ্গা। ভয়াবহ সেই দাঙ্গায় নিহত হয় ৭৮ রোহিঙ্গা। ১ লাখ ৪০ হাজার রোহিঙ্গা ঘরবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়। জাতিসংঘের নির্মিত আশ্রয়শিবিরে নিজ জন্মভূমিতেই উদ্বাস্তু হিসেবে বসবাস শুরু করতে বাধ্য হয় তারা। বাংলাদেশেও আশ্রয় পায় বড় একটি অংশ। জুন মাসে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করে সরকার। কিন্তু সেনাবাহিনী আসার পর রোহিঙ্গাদের দুরবস্থা আরো বেড়ে যায়। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর প্রশ্রয়ে নতুন করে হামলা শুরু হয় রোহিঙ্গাদের ওপর। একতরফাভাবে রোহিঙ্গাদের গ্রেফতার করতে থাকে রাষ্ট্রীয় বাহিনী। ২০১২ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় আদমশুমারিতে রোহিঙ্গাদের অন্তর্ভুক্ত না করে তাদেরকে 'রাষ্ট্রহীন বাঙালি মুসলমান' হিসেবে আখ্যায়িত করে জান্তা সরকার। আর ২০১৪ সালে 'রোহিঙ্গা' শব্দটিকে অস্বীকার করে এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে বাঙালি হিসেবে নিবন্ধিত করা শুরু হয়। এর মাধ্যমে মূলত স্থানীয়ভাবে রোহিঙ্গা নির্যাতন কার্যক্রমকেই স্বীকৃতি দেয় মিয়ানমার সরকার।[১২১]

যুগ যুগ ধরে মুসলিম নিধনের ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের ৩ জুন থেকে পূর্ব পরিকল্পিত ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা শুরু করে সন্ত্রাসী রাখাইন বৌদ্ধরা। রোহিঙ্গাদের হাতে বৌদ্ধ মহিলা নির্যাতনের অজুহাতে তারা এ গণহত্যার সূচনা করে। শুরুতেই মগরা ১০ জন রোহিঙ্গা মুসলিমকে হত্যা করে। দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য রাখাইনের তুয়ানগোকিতে এ হামলার ঘটনা ঘটে।[১২২] এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মুসলিম রোহিঙ্গারা জুমুয়াবার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ শুরু করলে ভয়াবহ দাঙ্গা বেঁধে যায়। মূলত মিয়ানমারের আকিয়াব শহরের রামবী গ্রামের এক রাখাইন শিক্ষিকা কর্তৃক ছাত্র পিঠানোকে কেন্দ্র করে অভিভাবক ও শিক্ষকদের গালিগালাজ ও উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, এতে এক শিক্ষিকা মারা যায়। এরই জের ধরে আকিয়াব শহর থেকে গাড়িযোগে একদল রোহিঙ্গা মুসলিম ইয়াঙ্গুন যাওয়ার পথে ৩ জুন টংগু নামক স্থানে পৌছলে রাখাইন যুবকেরা গাড়ির হেলপারসহ ১০ রোহিঙ্গা মুসলিমকে পিটিয়ে হত্যা করে। ড্রাইভার কৌশলে পালিয়ে গিয়ে টংবু ইমিগ্রেশনকে অবহিত করে। অথচ ধর্ষণ কিংবা হত্যাকাণ্ডের সাথে এ সকল রোহিঙ্গাদের কোন সম্পর্কই নেই।[১২৩] নির্মম এ

www.pathagar.com

হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ও বিচারের দাবিতে ৫ জুন বাদ যোহর ও আছরের নামায শেষে মুসলমানরা ইয়াঙ্গুন শহরে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এ ঘটনায় মুসলিম অধ্যুষিত পুরো আরাকান রাজ্যে ব্যাপক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় ইয়াঙ্গনে শীর্ষ মুসলিম নেতারা বৈঠক করে। ৮ জুন শুক্রবারে জুমুয়ার নামাযে মুসলমানদের জমায়েত করে শান্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৮ জুন পুরো আরাকানে জুমুয়ার নামাযে মুসল্লীরা সমবেত হতে থাকে। মংডু শহরের মসজিদে জুমুয়ার নামায চলাকালে মংডুয়ে বৌদ্ধদের ইউনাইটেড হোটেল থেকে মসজিদে ও মুসল্লীদের উপর পাথর নিক্ষেপ শুরু করে । অতঃপর রাখাইন বৌদ্ধরা সম্মিলিতভাবে মুসলিমদের উপর হামলা করে মুসলমানদের হত্যা করে। সেইসাথে মসজিদ-মাদরাসা, ঘর-বাড়ি পোড়ানো শুরু করে। সরকারি মদদে কারফিউ জারি করে সেনা, পুলিশ ও নাসাকা বাহিনীর উপস্থিতিতে রাখাইন বৌদ্ধরা মুসলমানদের গণহত্যা চালাতে থাকে।[১২৪]

যা হোক, ২০১২ সালের ৮ জুন জুময়ার নামাজের পরে রোহিঙ্গাদের বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে মংডু শহরের আশেপাশে ব্যাপক সেনামোতায়েন করে। মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট পরিস্থিতি সামাল দেয়ার নাম করে পুরো আরাকান প্রদেশে ১৪৪ ধারা জারি করে। রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওয়েব সাইট কালাদান প্রেস ডট কম'র উদ্ধৃতি দিয়ে আমার দেশ পত্রিকা জানায়, ১৪৪ ধারা মংডুতে কেবল রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু রাখাইনরা এটা মানছে না। তারা স্বাভাবিকভাবে সব জায়গায় চলাফেরা করে এবং আরাকানের সেনাসদস্য ও পুলিশবাহিনীর সহায়তায় প্রকাশ্যে রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর লুট করে নিয়ে যায়।[১২৫] এ আইনের সুযোগে তারা মুসলমানদেরকে ঘরে ঢুকিয়ে রেখে স্থানীয় মগকর্তৃক নির্যাতন করা হয়। সেইসাথে আরাকানের সেনাসদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোহিঙ্গাদের গ্রেফতার করে জঙ্গলে নিয়ে অমানবিক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্য করে। রোহিঙ্গা নারীদের তুলে নিয়ে পাহাড়-জঙ্গলে গিয়ে গণধর্ষণের মতো জঘন্য আচরণ করে। স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় অনেক বসতবাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে স্থানীয় মগরা।[১২৬] এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সীমান্তে আবারো উদ্বাস্তুদের ঢল নামে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টের বরাত দিয়ে গ্লোবাল ভয়েস উল্লেখ করেছে যে, সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা ও অন্য সব মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর লক্ষ্য করে সুনির্দিষ্ট আক্রমণ এবং অন্য ধরনের হামলার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সংঘর্ষ শুরু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত আকিয়াব বিমানবন্দর সংলগ্ন প্রাচীনতম শফি খান জামে মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হকসহ প্রায় তিন শতাধিক রোহিঙ্গা নাগরিক নিহত হয়েছে এবং ৫০ হাজারেও বেশি নাগরিক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। রোহিঙ্গারা যে সমস্ত সন্ত্রাসের মুখোমুখি হয়েছিল বিবিসি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের সংবাদ প্রকাশ করেছে। এদিকে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ প্রচার করে যে, রোহিঙ্গারা গণহারে আইন নিজের হাতে নিয়ে নেওয়ায় এই ধরনের হামলার ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশের নিজাম আহমেদ নামে জনৈক ব্যক্তির বরাত দিয়ে বলা হয় যে, মাত্র কয়েকদিনে কক্সবাজার জেলার

www.pathagar.com

কুতুপালাং এবং নয়াপাড়া নামক দুটি উদ্বাস্তু শিবিরে অনিবন্ধিত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৩০ হাজার পেরিয়ে গেছে।[১২৭]

২০১২ সালের ১০ জুলাই মিয়ানমার সরকার রাখাইন প্রদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা প্রসঙ্গে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বরাত দিয়ে বলা হয়– যে সমস্ত এলাকায় রোহিঙ্গারা সংখ্যায় অত্যন্ত বেশি, মিয়ানমার সীমান্ত রক্ষী বাহিনী নাসাকা, সামরিক বাহিনী এবং পুলিশ সেখানে ব্যাপকভাবে অভিযান চালায়। শত শত লোককে গ্রেফতার করা হয়, যাদের বেশির ভাগই পুরুষ এবং বালক। তাদের প্রায় কারো সাথে কোন ধরনের যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না এবং এদের অনেকে দুর্ব্যবহারের শিকার হচ্ছে। সেখানে প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় ৪০ জন করে কারাবন্দীকে তাদের কক্ষ থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড প্রহার করা হয়। উগ্রবাদী বৌদ্ধরা রাখাইন প্রদেশের অন্তত এক হাজার মুসলমান বালিকাকে ধর্ষণ করেছে। প্রায় তিন হাজার মৃতদেহকে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে।[১২৮] মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গারা অভিযোগ করেন যে, নিহত মুসলমানদের মাথা ন্যাড়া করে মংডুর তিনমাইল, চারমাইল, বাগঘোনা, বুমুপাড়া, নূরুল্লা পাড়া, হাইচচুরাতা, কাইন্দাপাড়া, সিকদারপাড়া, নলবনিয়া ও কালাব্রিজ এলাকায় পুঁতে রেখে রাখাইনদের লাশ বলে মিডিয়ায় প্রচার করে। ফলে এ সব খবরে অন্যান্য স্থানের মগেরা আরো বেশি আগ্রাসী ও হিংস্র হয়ে ওঠে।[১২৯] রাখাইন প্রদেশে ঘটনার শিকার মুহাম্মদ মুফিজ বলেন, রাখাইন প্রদেশে বাস করা এখন আমাদের এই রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য মৃত্যু নামক ভুতের মুখের গ্রাসে পরিণত হয়েছে এবং আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে কাতর হয়ে অনুরোধ করছি, যেন তারা আমাদের একই সাথে মিয়ানমার সরকার এবং রাখাইন জনগোষ্ঠীর হাত থেকে সময়মত রক্ষা করে, যারা আমাদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষের ভুমি থেকে উচ্ছেদ করার এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

জরুরী অবস্থা চলার কারণে রোহিঙ্গাদের জীবন যাপন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্যও তারা ঘরের বাইরে বের হতে পারে না। এর মধ্যেও স্থানীয় মগেরা সেনাসদস্যদের সহযোগিতায় রোহিঙ্গা বাড়িতে আক্রমন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ অব্যাহত রাখে। ২০১২ সালের ১২ জুন দুপুরে মংডু শহরের নিকটবর্তী কয়েকটি প্রভাবশালী রোহিঙ্গা মুসলমানের দ্বিতলা কাঠের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। সেইসাথে আকিয়াবের অবস্থা আরো ভয়াবহ। সেখানে নিহত রোহিঙ্গাদের লাশ কবর দেয়ার মতো কোন অবস্থাও বজায় নেই। নিহত রোহিঙ্গাদের লাশ গাড়িতে তুলে নিয়ে মাথা ন্যাড়া করে গেরুয়া পোষাক পরিয়ে রাখাইন লাশ হিসেবে প্রচার করা হয়।[১৩০] পাশাপাশি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কয়েকটি সংগঠন জনগণকে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে সংযুক্ত না হবার এবং তাদের কাছে যাতে কোন মানবিক সাহায্য না পৌছায়, তার জন্য আহবান জানিয়ে প্রচারপত্র বিলি করে।[১৩১] এতে একদিকে যেমন সংঘর্ষ ভয়াবহরূপে ছড়িয়ে পড়ে অন্যদিকে বিশ্বমিডিয়ায় প্রচারের কারণে জনমত রোহিঙ্গাদের বিপক্ষে চলে যাওয়ার পথ প্রসস্ত হয়।

www.pathagar.com

এ সব কারণে রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলমান জুলুম-নির্যাতন নতুন মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। মিয়ানমারের সরকারি বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় রাখাইন মগরা পরিকল্পিতভাবে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, সহায়-সম্বল দখল করে নেয় এবং নারী ও শিশুদের চরম নির্যাতন করে। রোহিঙ্গা বিরোধী পরিকল্পিত দাঙ্গায় প্রায় ১ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা মুসলিম নিহত হয়। আহত হয়েছে কয়েক হাজার। শত শত ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়।[১৩২] পুলিশ ও সেনাবাহিনী দাঙ্গা প্রতিরোধ না করে উল্টো রোহিঙ্গা মুসলিমদের ঘর-বাড়িতে আগুন লাগায়। পরিকল্পিত এ হত্যা-নির্যাতন সইতে না পেরে নৌকা ও ট্রলারে করে হাজার-হাজার রোহিঙ্গা মুসলিম বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত রেখা বরাবর নাফ নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, মিয়ানমার থেকে নতুন করে শরণার্থী আসুক তা আমরা চাইনা। অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকু বলেন, মিয়ানমারের সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তরক্ষী ও আইন শৃংখলা বাহিনী সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।[১৩৩] এ প্রেক্ষাপটে কক্সবাজারস্থ ১৭ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্ণেল খালেকুজ্জামান বলেন, সীমান্ত ও উপকূলীয় এলাকায় বিজিবির টহল জোরদার করা হয়েছে। উদ্বাস্তুবিষয়ক জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউনাইটেড নেশন হাই কমিশন ফর রিফিউজি (ইউএনএইচসিআর)-এর পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো সত্ত্বেও বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি তাদের অনেককেই ঠেকিয়ে দেয়।[১৩৪] উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে ইউএনএইচসিআর'র প্রতিনিধি ক্রেইগ স্যান্ডার্স বিবিসিকে বলেছেন, আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি তারা যেন যতটা সম্ভব সীমান্ত শিথিল রাখে এবং আশ্রয়পার্থীদের ঢুকতে দেয়।[১৩৫] ওয়াশিংটন ডিসিতে নিয়মিত প্রেসব্রিফিংয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড বলেন, 'আমরা এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন, বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আসতে বাধা দিচ্ছে এবং তাদের পুশব্যাক করছে।'[১৩৬] সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কঠোরতা সত্ত্বেও চোখ ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন দূর্গম পথে তারা বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে।

মিয়ানমারের এ সহিংসতায় বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত সকল রোহিঙ্গারাই সীমান্ত পাড় হবার সুযোগ যেমন পায় না তেমনি অনেকেই সংসারের মায়া ত্যাগ করে বাংলাদেশে আসতেও আগ্রহী নয়। তাই তারা পাহাড়-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে থাকে। মাত্র কয়েকদিনের সহিংসতায় প্রায় ৩০ হাজার মানুষ বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত হয়ে উদ্বাস্তুর মতো পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছে।[১৩৭] তাদের খাওয়া পরা কিংবা থাকারও কোন জায়গা নেই। মগবৌদ্ধরা খবর পেলে সে সব পাহাড়িয়া জঙ্গলেও হামলা চালিয়ে থাকে। এমতাবস্থায় অনেক আহত রোহিঙ্গাকে জঙ্গলেই ফেলে রেখে চলে যেতে হয়। এমন নির্মম পরিবেশে অনেকেরই

www.pathagar.com

মৃত্যু ঘটে। নির্যাতনের এমন খবর বিশ্বমিডিয়াতেও পৌঁছনো কঠিন। রুদ্ধদেশ হিসেবে সেখানকার প্রশাসন কর্তৃক পরিবেশিত খবরই বিশ্ববাসী জানতে পারে।[১৩৮]

এতো অপপ্রচার সত্বেও রোহিঙ্গাদের উপর চালানো নির্যাতনের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে প্রতিবাদ উচ্চারিত হতে থাকে। সহিংস দাঙ্গায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি প্রদান করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী রডহ্যাম ক্লিনটন।[১৩৯] আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি প্রদান করে। সংস্থারটির বরাত দিয়ে দৈনিক নয়াদিগন্ত পত্রিকায় রির্পোট করা হয়, রোহিঙ্গাদের উপর নতুন করে হামলার জন্য সংস্থাটি দেশের নিরাপত্তা বাহিনী এবং সেখানে বসবাসরত রাখাইন বৌদ্ধগোষ্ঠীকে দায়ী করে। ব্যাংককে অবস্থানরত অ্যামনেস্টি গবেষক বেনজামিন জাওয়াকি মন্তব্য করেন, গত ছয় সপ্তাহের সহিংসতা ছিল প্রধানত একতরফা। সাধারণভাবে মুসলমানেরা বিশেষভাবে রোহিঙ্গারা এ সহিংসতার শিকার। এ ক্ষেত্রে মিয়ানমারের সেনাসদস্য এবং স্থানীয় মগবৌদ্ধদের দায়ী করেন তিনি।[১৪০] অ্যামনেস্টি আরো অভিযোগ করে যে, পুলিশ-সেনাবাহিনীসহ নিরাপত্তাবাহিনী ঢালাওভাবে অভিযান চালিয়ে হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করে অজ্ঞাত স্থানে বন্দি করে রাখে।[১৪১] অন্যদিকে রিফিউজি ইন্টারন্যাশনাল, দি আরাকান প্রজেক্ট এবং দি ইকুয়াল রাইট ট্রাস্টসহ সুশীল সমাজের ৫৮ টি দলের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চালানো হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে। এ্যাংরি এশিয়ান জনৈক বুদ্ধিষ্টের লিখনীর বরাত দিয়ে গ্রোবাল ভয়েস উল্লেখ করেছে যে, আমি বার্মার রোহিঙ্গা মুসলমানদের অধিকারে বিশ্বাস করি যেমনটা আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের জুম্ম নাগরিক, যারা বৌদ্ধ, তাদের অধিকারে। আমি উভয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগঠিত সহিংসতার নিন্দা করি এবং আমি জাতিগত বিতাড়ন এবং নির্যাতনের ইতিহাসের নিন্দা করি, যা কিনা খুব সাধারণভাবে রাতারাতি মুছে ফেলা যাবে না। আমি আরো নিন্দা জানাই রাজনীতি এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের বিষয়কে বৌদ্ধ বনাম মুসলমানের সংঘাতের মত ধর্মীয় লড়াই-এর নামকরণের মত ঘটনার সাধারণীকরণ-এর প্রতি।[১৪২]

প্রতিবাদ হয়েছে বিশ্বজুড়ে। থাইল্যান্ডে রোহিঙ্গা মুসলমানরা সাহায্যের আহ্বানের জন্য জাতিসংঘের সামনে সমবেত হয়ে প্রতিবাদ জানায়। ২০১২ সালের ২৬ জুলাই জামাত-এ ইসলাম হিন্দসহ বেশ কিছু সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগঠন দিল্লিতে অবস্থিত মিয়ানমার দূতাবাসের সামনে অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে বিক্ষোভের আয়োজন করে। ২০১২ সালের ২৪ জুলাই তেহরানের জাতিসংঘ দূতাবাসের সামনে জড়ো হয়ে শত শত ইরানী নাগরিক রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর চালানো নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিন্দা জানায়। রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তানের তালেবানরা মিয়ানমারে হামলা চালানোরও হুমকি প্রদান করে। তালেবানরা পাকিস্তান সরকারে কাছে মিয়ানমারের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং ইসলামাবাদে অবস্থিত মিয়ানমার দূতাবাস বন্ধ করার দাবি জানায়। প্রাণঘাতী

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা মুসলমানদের খুনের ঘটনা বন্ধ করার দাবিতে ইন্দোনেশিয়ার রক্ষণশীল দলসমূহ জাকার্তা মিয়ানমার দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে।[১৪৩] এ সব প্রতিবাদের প্রতি মিয়ানমার আদৌ কোন গুরুত্ব দিচ্ছে বলে মনে হয় না।

সময় বেশি না গড়ালেও মিয়ানমারে রোহিঙ্গা হত্যাযজ্ঞ থেমে থাকেনি কোনভাবেই। মিয়ানমারের সিত কৌয়িন নামক বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামে মাত্র একশো মুসলমানের বাস। সেখানে ২০১৩ সালের ২৯ মার্চ শুক্রবার ৯৬৯ আন্দোলনকারী বৌদ্ধভিক্ষুরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদের বাড়িঘর, দোকানপাট এবং মসজিদসহ সমস্ত স্থাপনা ধ্বংস করে দেয়। আহত মুসলমানদের ২৫জনকে ধরে পাহাড়ের আড়ালে নিয়ে হত্যা করে লাশগুলো পুড়িয়ে দেয়। তাদের কেউ কেউ শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিলেও অনেকে প্রাণভয়ে সেখানেও যেতে পারেনি। পাহাড় জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে জীবন বাঁচায় তারা।[১৪৪] অতি অল্পসময়ে ছড়িয়ে পড়ে গণহত্যার ভয়াবহতা। অল্পকয়েক দিনেই ৩৭টি মসজিদসহ ১ হাজার ২২৭টি বসসতবাড়ি পুড়িয়ে ধ্বংস করে তারা। এ গণহত্যায় উগ্র বৌদ্ধদের পাশাপাশি সেনাবাহিনীও অংশ নেয়। আরাকানের সেনাক্যাম্পে আটক রেখে রোহিঙ্গা নারীদের যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।[১৪৫] এ গণহত্যার তদন্ত করতে এসে উগ্রবৌদ্ধদের হামলার শিকার হন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি টমাস ওজেয়া কুইন্টানা।[১৪৬] তবে গাড়ির নিরাপত্তাব্যবস্থা শক্তিশালী থাকার কারণে এ হামলায় তার কোন ক্ষতি হয়নি।

২০১৫ সালেও রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সরকারের চালানো গণহত্যার জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে আল জাজিরার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে। যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটি ল স্কুলের লয়েনস্টেইন ক্লিনিকের প্রতিবেদনটির পর্যালোচনায় এ তথ্য উঠে এসেছে। আল জাজিরা ও মানবাধিকার গ্রুপ ফর্টিফাই রাইটসের দেয়া নথি ও সাক্ষ্যসহ মিয়ানমার থেকে পাওয়া উপাত্তগুলোর সত্যতা নিরূপণে আট মাস ব্যয় করেছে লয়েনস্টেইন ক্লিনিক। দৈনিক জনকণ্ঠ প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, ক্লিনিক তার প্রতিবেদনের পর্যালোচনায় বলেছে, রোহিঙ্গাদের ওপর যে মাত্রায় নৃশংসতা হয়েছে এবং তাদের নিয়ে দেশটির রাজনীতিকরা যে ভাষায় কথা বলেছে, তা বিবেচনা করে আমরা মনে করি দেশটিতে যে, গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে, সে বিষয়টি কোনভাবেই এড়ানো যায় না। আল জাজিরার পাওয়া বিশেষ নথিতে দেখা গেছে, মিয়ানমার সরকার তার স্বার্থের জন্য মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা উস্কে দেয়ার সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সূত্রপাত করে, মুসলিমদের সম্পর্কে মিয়ানমারবাসীর মনে ভয়ের উদ্রেক করতে ঘৃণাত্মক বক্তব্য ব্যবহার করেছে এবং কট্টরপন্থী বৌদ্ধ গ্রুপগুলোর সমর্থন পেতে তাদের অর্থের প্রস্তাব দিয়েছে। আল জাজিরার পাওয়া প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য ও গোপন দলিলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, সেনা সমর্থিত ক্ষমতাসীন দল ইউনিয়ন সলিডারিটি এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডিপি) মুসলিমদের একঘরে এবং রোহিঙ্গাদের লক্ষ্যে পরিণত করার চেষ্টা

www.pathagar.com

করে। মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট কার্যালয় ও সরকারকে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে আল জাজিরা কয়েকবার অনুরোধ করলেও তারা কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। আইনী ও কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে 'জেনোসাইড এজেন্ডা' নামে নতুন তদন্ত প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়। এতে বলা হয়েছে, মিয়ানমার সরকারের এজেন্টরা মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা বাধাতে জড়িত ছিল। একটি সরকারি সেনা নথিতে ঘৃণাত্মক বক্তব্যের ব্যবহার দেখা গেছে। বক্তব্যে দাবি করা হয়েছে, মিয়ানমারকে মুসলিমরা গ্রাস করে ফেলবে বলে দেশবাসীর মনে ভয়ের উদ্রেক করে। ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের প্রফেসর ও ইন্টারন্যাশনাল স্টেট ক্রাইম ইনিশিয়েটিভের (আইএসসিআই) পরিচালক পেনি গ্রিন বলেছেন, প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন সরকারের নিজের পরিণতির জন্য ঘৃণাত্মক বক্তব্য প্রস্তুত করেন এবং এটি হলো বার্মার ভেতরে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে একঘরে, পৃথক ও হ্রাস করা। এটি একটি গণহত্যার প্রক্রিয়ার অংশ।[১৪৭]

মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের গভীর জঙ্গলে সম্প্রতি অভিবাসন প্রার্থীদের বেশ কিছু কবরের সন্ধান পাওয়ার পর সারা বিশ্বে হইচই পড়ে যায়। চোরাকারবারি তথা পাচারকারীরা মারধর করে তাদের সাথে থাকা টাকা-পয়সা লুট করে। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অত্যাচারিত হয়ে সাগরের বুকে ভাসতে থাকা এসব অসহায় রোহিঙ্গার দুঃখের কাহিনী ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে নতুন জীবনের আশায় একসময় ইইউরোপে পাড়ি দেয়া আফ্রিকানদের দুঃখের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।[১৪৮] রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে অন্যায় আর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায় বহু গুণ। শুরু হয় নানাভাবে রোহিঙ্গাদের উচ্ছেদ অভিযান। একের পর এক হামলা হয় রোহিঙ্গাদের বাড়িঘরে। প্রাণ বাঁচাতে দেশ ছাড়তে শুরু করে নিরীহ রোহিঙ্গারা। বাংলাদেশের সীমান্ত বন্ধ থাকায় নৌকায় চড়ে উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিতে শুরু করে তারা। উদ্দেশ্য পূর্ব এশিয়ার কোনো দেশে আশ্রয় নেয়া। জাতিসংঘের মতে, শুধু ২০১৫ সালে জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যেই ২৫ হাজার রোহিঙ্গা নৌকায় চড়ে দেশ ছাড়ে। সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা আর অজানায় পাড়ি দেয়া এসব মানুষের বড় একটি অংশ মাঝসমুদ্রেই খাদ্য আর পানির অভাবে মারা যায়। বেশ কিছু নৌকা কোথায় হারিয়ে গেছে আর খুঁজেই পাওয়া যায়নি। অসুস্থ অবস্থায় ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার নৌবাহিনী সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেছে কয়েক হাজার লোককে। যাদের মধ্যে তিন শতাধিক চিকিৎসাধীন অবস্থায়ই মারা গেছেন। বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় উঠলেও প্রাণ বাঁচাতে জন্মভূমি ছেড়ে পালানোর এই ধারা বন্ধ হয়নি রোহিঙ্গাদের। কারণ সংখ্যালঘুদের ওপর দমনপীড়নের জন্য কোনো প্রকার জবাবদিহিতাই করতে হচ্ছে না মিয়ানমারকে। সমুদ্র থেকে উদ্ধারকৃত রোহিঙ্গাদের বড় অংশটিকে আশ্রয় দিয়েছে ইন্দোনেশিয়া।[১৪৯] ২০১৫ সালে মিয়ানমারের বহুল প্রতীক্ষিত নির্বাচনের আগে বাতিল করা হয় রোহিঙ্গাদের ভোটাধিকার ও পরিচয়পত্র, যা ছিল তাদের নাগরিকত্বের সর্বশেষ অবলম্বন।

www.pathagar.com

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সুদীর্ঘকাল থেকে বংশপরম্পরায় বসবাস করে আসা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গত ২০১৬ সালের ২৫ আগস্ট অতর্কিত জঙ্গী হামলার মিথ্যা অভিযোগ তুলে গণহত্যা শুরু করে। বস্তুত রোহিঙ্গাদের ওপর আক্রমণের ১০ দিন আগেই মিয়ানমারের ২০টি রাজনৈতিক দল সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে খোলা চিঠিতে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছিল। ওইসব দল ঐকমত্য পোষণ করে যে, রাখাইনে রোহিঙ্গাদের সমূলে উৎখাত করতে হবে। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেনাবাহিনী ২৫ আগস্ট গভীর রাতে গ্রামে গ্রামে রোহিঙ্গাদের বাড়িঘরে আগুন দিয়ে নির্বিচারে মানুষ হত্যা শুরু করে। বৌদ্ধ যুবকরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে গণহত্যায় যোগ দেয়। তাদের বর্বরতা মানব ইতিহাসের এক জঘন্য ঘটনা হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।[১৫০] মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সেনাবাহিনীর বহুদিন ধরে চলমান সংঘর্ষ-সহিংসতা সঙ্কট সমাধানে ২০১৬ সালের আগস্টে গঠিত হয় অ্যাডভাইজরি কমিশন অন রাখাইন স্টেট। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে ওই কমিশন এক বছরের তদন্তের চূড়ান্ত প্রতিবেদন মিয়ানমারের ক্ষমতাসীন দলের প্রধান অং সান সু চির কাছে জমা দেয় চলতি বছরের ২৪ আগস্ট। ৬৩ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদন জমা দেয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই ২৪ আগস্ট দিবাগত রাতে ত্রিশটি পুলিশ ও সেনাচৌকিতে রহস্যজনক হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় নিহত হয় নিরাপত্তা বাহিনীর ১২ সদস্য। তারপরই হামলার জন্য রোহিঙ্গা জঙ্গিদের দায়ী করে জবাব হিসেবে সেনাবাহিনী পুরো অঞ্চলে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে।[১৫১] বিশ্লেষকদের দাবি, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী যে ইসলামি জঙ্গির ধুয়া তুলেছে, তা মিথ্যা কথা। দিনের পর দিন খুন, ধর্ষণ, উচ্ছেদ ও নির্যাতন চললেও তা প্রতিরোধ করার জন্য রোহিঙ্গা মুসলমানদের কোনো সামরিক প্লাটফরম নেই। আবার ৯ অক্টোবরের পর থেকে আরাকানে কোনো বিদেশী বা সাংবাদিকদেরও যেতে দিচ্ছে না মিয়ানমার বাহিনী। এ ছাড়া জঙ্গিরা সেনাবাহিনীর ওপর হামলা চালাচ্ছে- সেনাবাহিনীর এই দাবি একেবারে ধোঁকা। মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর ওপর যারা হামলা চালায়, তারা বৌদ্ধদের সামরিক সংগঠন আরাকান আর্মি, মুসলমানেরা নয়। সেনাবাহিনী এই আর্মি তৈরি করেছিল আরাকান থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্যই। এখন সেটা বুমেরাং হয়েছে। এই আর্মির কমান্ডার ইন চিফ তোয়ান ম্রাট নাইং এ কথা স্বীকার করেছেন। প্রতিবেশী বাংলাদেশ সরকারও এ পর্যন্ত মিয়ানমার সরকারের মানবাধিকার হত্যার কার্যকর কোনো প্রতিবাদ জানায় নি। অথচ মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে।[১৫২]

রাখাইনে রোহিঙ্গাদের গ্রামগুলোতে হেলিকপ্টার থেকে নির্বিচারে গুলি, মর্টার শেল নিক্ষেপ ও অগ্নিসংযোগ করছে দেশটির সেনাবাহিনী। আকাশ থেকে নিক্ষেপ করা গোলায় পুড়ছে রোহিঙ্গাদের বেঁচে থাকার শেষ আশ্রয়-আবাসস্থলও। প্রাণে বাঁচতে কাটাতারের বেড়া ভেদ করে নাফ নদের পাড়ে হাজার হাজার রোহিঙ্গার আর্তনাদ।

www.pathagar.com

সহায়-সম্বলহীন এই রোহিঙ্গারা জীবন বাঁচানোর তাগিদে ছুটছেন প্রতিবেশি বাংলাদেশের দিকে। দল বেধে ছোট্ট নৌকায় চেপে নাফ নদ পাড়ি দিতে গিয়ে ডুবে মরছে বাঁচার স্বপ্ন। টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপের নিকটবর্তী নাফনদে নৌকাডুবে বৃহস্পতিবারও ১৯ রোহিঙ্গা নারী ও শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বর্বরতায় নাফে ভাসছে রোহিঙ্গাদের মরদেহ, ডুবছে মানবতা। রাখাইনের মংডু থেকে পালিয়ে আসা এক রোহিঙ্গা বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেছেন, তার তিন ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে সেনাবাহিনী। চোখের সামনেই এক ছেলেকে গলাকেটে হত্যা করা হয়েছে। আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে তার বাড়ি-ঘরে। স্ত্রী ও এক সন্তানসহ নাফ নদ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে এসেছেন তিনি। মানবিক সহায়তা কর্মীরা রাখাইনের রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা, বুলেট ও আগুনের ভয়াবহ ক্ষত তুলে ধরছেন। রোহিঙ্গারা বলছেন, মিয়ানমার সেনাবাহিনীর হাতে নারী ও তরুণীরা গণধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। তাদের হাজার হাজার বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। স্যাটেলাইট ধারণকৃত ছবিতে রাখাইনের একশ কিলোমিটার এলাকার অন্তত ১০টি স্থানে অগ্নিসংযোগের চিত্র উঠে এসেছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। একই ধরনের চিত্র ২০১৬ সালের নভেম্বরেও দেখা যায় বলে সংস্থাটি দাবি করেছে। গত বছরের অক্টোবরে রাখাইনে সেনাবাহিনীর একই ধরনের রক্তক্ষয়ী অভিযানে ৮৭ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে।[১৫৩] ওই সময় জাতিসংঘের এক কর্মকর্তা বলেন, রাখাইনে জাতিগত নিধন অভিযান চালাচ্ছে মিয়ানমার সরকার; যা মানবতা বিরোধী অপরাধের শামিল।

বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গাদের অভিযোগ, আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। কোনো খাবার নেই। বাড়ির প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা সীমান্তরক্ষা বাহিনীর ভয়ে সব সময় পালিয়ে বেড়ায়। সরকারি বাহিনীর ধরপাকড় আর অত্যাচারের ভয় তো আছেই, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে নতুন আতঙ্ক। ধারালো অস্ত্রধারী একদল লোক বাড়ির পুরুষদের নিয়ে যাচ্ছে। যাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তারা জীবিত ফিরছে না। পক্ষান্তরে মিয়ানমার সরকার বলছে, 'আত্মরক্ষার স্বার্থে আইন অনুযায়ী সব কিছু করার অধিকার' তাদের আছে। জাতিসংঘ যদি রোহিঙ্গা নিপীড়নের অভিযোগ তদন্ত করে, তাহলে রাখাইন সংকট 'গুরুতর' হবে, এমন মন্তব্যও করেছে সরকারপক্ষ।[১৫৪] রাখাইনের উত্তরে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকা অবরুদ্ধ করে ফেলে ২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে টানা সময় ধরে গণহত্যা, ধর্ষণসহ সব ধরনের নিপীড়ন চালিয়েছে সরকারি বাহিনী, এমন অভিযোগ থাকলেও সরকারপক্ষের দাবি, এসবই রং চড়ানো খবর। দীর্ঘদিন ওই এলাকায় সাংবাদিক বা মানবাধিকারকর্মীদের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

'বাংলাদেশের মিয়ানমার সীমান্ত এলাকা জুড়ে এখন মানবতার হাহাকার। গণহত্যার ভয়াবহ স্মৃতি বহন করে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ জীবন বাঁচনোর জন্য দীর্ঘকষ্টের পথ পাড়ি দিয়ে আশ্রয় নিয়েছে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার নানা

www.pathagar.com

স্থানে। অবুঝ শিশু, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ এবং অসংখ্য আহত মানুষের কান্নায় ভারি হয়ে উঠেছে সেখানকার আকাশ বাতাস। অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা তো দূরের কথা ন্যূনতম মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও মিলছে না। মানবিক বিপর্যয়ে পতিত এ সব অসহায় নারী শিশু বৃদ্ধসহ নির্মমভাবে আহত মানুষের কষ্ট লাঘবে পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের মানুষ। সেইসাথে মুসলিমবিশ্বের নেতৃবৃন্দসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলকে নাড়া দিয়েছে এ অমানবিকতা। তবে বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশি ভারত ও চীনের ভূমিকা বিশ্ববাসীকে হতবাক করেছে। আরাকানে হাজার বছরের সোনালি ইতিহাসের নির্মাতা এ সব রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর এ নির্মম পরিণতি বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষকে আহত করেছে। মানবতাবোধের কবর দিয়ে এ ধরনের গণহত্যা চালিয়ে মিয়ানমার যে অপরাধ করে চলেছে তা আধুনিকবিশ্বকে হতবাক ও বিস্মিত করেছে। এ নিষ্ঠুরতার নিন্দা জানানোর ভাষা খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন।' ২০১৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যাঃ বিবেকের দায়বদ্ধতা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তরা এসব কথা বলেন।[১৫৫] বক্তাগণ আরো বলেন, দুঃস্বপ্নময় ভয়াবহ অঞ্চল এখন আরাকান। মিয়ানমারের 'রাখাইন স্টেট' নামের এ রাজ্যে মুসলমানদের জীবন আজ মগ-বৌদ্ধ, সেনাবাহিনী এবং গণতন্ত্রের নতুন ফেরিওয়ালা অং সান সুচির হাতের মুঠোয়! মানুষের মাংসে বারবিকিউ বানানো কিংবা নোংরা যৌন-লালসা চরিতার্থ করার সব উপকরণ যেন এখন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী। নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ আরাকানী জোয়ানদের মরণস্থল। রোহিঙ্গা মুসলমানদের পিতৃভূমি এ অঞ্চলটি আজ ইতিহাসের এক জঘন্যতম মৃত্যুপুরী। নানা অজুহাত এবং পুর্বপরিকল্পিত ইস্যু তৈরি করে সেখানকার রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর দমন-পীড়ন শুধু নয়, সরাসরি গণহত্যায় মেতে উঠেছে দেশটির সেনাবাহিনসহ স্থানীয় মগরা। তারা পুরো মুসলিম অধ্যুষিত আরাকানে আগুন জ্বালিয়ে রোহিঙ্গাদের বসতবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে। নির্বিচারে হত্যা করছে নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ অসংখ্য রোহিঙ্গা মুসলমানকে। বাড়ি থেকে রোহিঙ্গা মহিলাদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে অমানবিকভাবে ধর্ষণ ও হত্যা করা সেখানকার নিত্যদিনের খবর। নিজেদের সৃষ্ট ইস্যুতে গণহত্যা চালিয়ে রোহিঙ্গা সমাজে অনেকাংশে পুরুষ শুন্য করা হয়েছে। কেউ কেউ জীবন বাঁচানোর জন্যে দেশের অভ্যান্তরে বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করলেও রেহাই নেই। পালিয়ে যাওয়া রোহিঙ্গাদের দেখামাত্রই অমানবিক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে দেশটির সেনাবাহিনী। কোন ধরনের মিডিয়াকর্মীকে সে সব এলাকায় প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। সরকার, মগ-বৌদ্ধ এবং সেনাবাহিনীর বানানো খবরই প্রচারিত হয় সারা বিশ্বমিডিয়ায়। ইতিহাস নির্মাণ হচ্ছে তাদেরই ইচ্ছে মতো।[১৫৬]

বৌদ্ধদের প্রাধান্য থাকায় দেশটির প্রচারমাধ্যম তাদের নিয়ন্ত্রণে। ফলে এ দাঙ্গার যে খবরাখবর গণমাধ্যমে এসেছে তা খানিকটা একপেশে ও তথ্য গোপনের অপচেষ্টায় দুষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্লেষকরা। কারণ প্রকাশিত খবরে এ দাঙ্গার মূল ঘটনা আড়ালে

www.pathagar.com

চলে গেছে এবং দাঙ্গার প্রকৃত উৎসকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ধর্ষণের ঘটনাটি কেউ কেউ অস্বীকার করেছে। যাদের বিরুদ্ধে সম্ভ্রমহরণের অভিযোগ আনা হয়েছে তাদের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিন্তু প্রতিশোধ নেয়ার নেশায় উন্মাতাল হয়ে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের উপর হামলা চালায় বৌদ্ধ রাখাইনরা।[১৫৭] ধর্ষণের ঘটনাটি দুঃখজনক হলেও এর প্রতিশোধ এত নির্মম হতে হবে? আবার একই প্রশ্নে জর্জরিত রোহিঙ্গারাও। হামলার প্রতিবাদে তারা কেন সশস্ত্র সংঘাতের পথ বেছে নিয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরে বিশ্লেষক মহল মনে করেন, বহুদিনের জমানো ক্ষোভের বিস্ফোরণে জ্বলে উঠেছে রোহিঙ্গারা। প্রায় চার লাখ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী হিসেবে বাস করছে বাংলাদেশে। কিন্তু এরা কোনভাবেই বাংলাদেশী নাগরিক নয়, তা আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত। ফলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাদের চলে যেতে জোর তাগিদ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু মিয়ানমার সীমান্তের কাঁটাতার ডিঙিয়ে তারা নিজ দেশে ফিরতে পারছে না। এ অবস্থায় রোহিঙ্গাদের পরিচয় এসে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রহীন জাতিতে। তাছাড়া আরাকান অঞ্চলে তারা এক সময় ক্ষমতার অংশীদারিত্বের ভেতর দিয়ে জীবন যাপন করলেও তাদের জাতিসত্তা নির্মূলের কৌশল প্রণয়ন করেছে সরকার। নিজ দেশেই ফেরারি জীবনযাপন করে তারা। আর এ নির্মম অত্যাচার তাদের প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলেছে। তারপরেও রোহিঙ্গাদের আরো সহনশীল হওয়ার পরামর্শ অভিজ্ঞ মহলের।

"রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়ে মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সু চির ভূমিকা নিয়ে চিন্তা করলে আমরা বিস্মিত হই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে বর্তমানে রোহিঙ্গারাও সে সময়ের মধ্যে রয়েছেন। মিয়ানমারের সামরিক জান্তার গণহত্যায় সু চির সমর্থনের সাথে জুলফিকার আলি ভুট্টো এবং ইয়াহিয়া খানের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। এটা বর্বরতা এবং অমানবিকতা। আমাদের দাবি মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অমানবিক নিপীড়নের কারণে মিয়ানমারের সরকারের আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালতে বিচার করতে হবে।" মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর রাষ্ট্রীয় নিধনকে মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন উল্লেখ করে বক্তারা দেশটির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক আদালতে রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচার দাবি করেছেন।[১৫৮] বক্তারা বলেন, রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব, জাতীয়তা ও মৌলিক মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সহায়তা বৃদ্ধি প্রয়োজন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অন্যান্য সংস্থাকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে বলে মনে করছেন বিশিষ্টজনেরা। এ লক্ষ্যে মিয়ানমার সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ বৃদ্ধি করে রোহিঙ্গাদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ ও তাদের নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকেও এ গণহত্যা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।[১৫৯] এটা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই এসব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা।

www.pathagar.com

রোহিঙ্গা সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যা উল্লেখ করে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, তারা কোনো দোষ করেনি। বাস্তবিক তাদের নিয়ে কোনো সমস্যাও ছিল না। কারণ তারা স্বাধীনতা দাবি করেনি, বিদ্রোহীও ছিল না। তবুও তারা রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর হাতে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে। তারা সেখানে কোনো কথা বলতে পারছে না, শুধু শাসকের বশ্যতা স্বীকার করে যাচ্ছে তবুও নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে তাদের। এটাকে আমরা বলি গণহত্যা। এটা মানবতার একটা মারাত্মক নিষ্ঠুর দিক। চীন পুঁজিবাদের ভূমিকায় থেকে মিয়ানমারকে সমর্থন করছে। এমন কি রাশিয়া এবং আমাদের বড় বন্ধুদেশ ভারতও একইভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে অবস্থানকারী রোহিঙ্গাদের মাতৃভূমিতে তাদের নিজ নিজ ঘরবাড়িতে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বিশ্ববাসীর কাছে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, মিয়ানমার সরকার এদের ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে না, এটা পরিষ্কার। এটা পুঁজিবাদের ফ্যাসিবাদী রূপ। এটা বর্বরতা ও অমানবিকতা। রোহিঙ্গা ইস্যু কোনো দ্বিপক্ষীয় সমস্যা নয় বরং এটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। বিশ্বের যারা মানবাধিকারে বিশ্বাস করেন তাদের মানতেই হবে যে এটা কোনো আঞ্চলিক সমস্যা নয় বরং বৈশ্বিক সমস্যা।[১৬০]

রোহিঙ্গা সমস্যাকে মানবসভ্যতার সঙ্কট উল্লেখ করে ঢাবির ভিসি অধ্যাপক আখতারুজ্জামান বলেন, মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে রোহিঙ্গা সঙ্কট নিরসনে এগিয়ে আসার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। এটা শুধু বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ নয় বরং এটি সমগ্র বিশ্ব তথা মানবসভ্যতার সঙ্কট।[১৬১] তিনি রোহিঙ্গা মুসলিমদের নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে মিয়ানমার সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। পাশাপাশি মিয়ানমারে গণহত্যার সাথে জড়িত অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনারও দাবি জানান তিনি।

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে সরকারে কূটনৈতিক ব্যর্থতা রয়েছে মন্তব্য করে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিশ্বের সবাইকে আগে থেকেই সোচ্চার করা উচিত ছিল কিন্তু সেটি আমরা পারিনি।[১৬২] রোহিঙ্গা সঙ্কট নিরসনে আন্তর্জাতিকভাবে জনসমর্থন গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, রোহিঙ্গারা এখন যে মানবেতর জীবনযাপন করছে, কষ্ট করছে এটা অনেক বড় সঙ্কট। বাংলাদেশ বৌদ্ধকৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথেরো বলেন, মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর যে অমানবিক নির্যাতন করা হচ্ছে তার জন্য বৌদ্ধ হিসেবে আমরা অত্যন্ত লজ্জিত ও মর্মাহত। আমরা বিশ্ববাসীর সাথে একমত পোষণ করে রোহিঙ্গাদের সম্মানজনকভাবে তাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য সমগ্র বিশ্ব মানবতার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।[১৬৩] অনুষ্ঠানের রোহিঙ্গা নির্যাতনের প্রমাণস্বরূপ ১০ মিনিটের একটি ভিডিও ক্লিপ দেখানো হয় যেখানে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা তথা বিপন্ন মানবতার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। এ ছাড়া কসমস ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে রোহিঙ্গাদের ওপর 'আর্ট এগেইনস্ট জেনোসাইড' শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্যসতর্কতায় অনেকেই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক আলী রিয়াজ বলেন, মিয়ানমার থেকে শরণার্থী হিসেবে আগত শতকরা ৮৫ ভাগ শিশুই রোগাক্রান্ত। তাদের স্বাস্থ্যসেবার বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার।[১৬৪] ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণের পরে মাত্র কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অবস্থা পর্যবেক্ষণের পরে এ কথা সহজেই বলা যায় যে, রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে এসেও ভালো নেই। ২০১৭ সালে নবাগত রোহিঙ্গাদের প্রায় ৬০ শতাংশই শিশু, যার বিরাট একটা অংশ আবার মা-বাবাহীন বা এতিম। শিশুরা মারাত্মকভাবে ট্রমাটাইজড। এসব শিশুকে সাইকোলজিক্যাল ট্রমা থেকে উদ্ধার করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সীমিত।[১৬৫] শিশুদের শিক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধ ও আত্মপরিচয় দেয়ার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা শিক্ষাকার্যক্রম এবং একই সাথে বিনোদন প্রয়োজন। ক্যাম্পে অভিভাবকহীন শিশুদের অনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা হতাশা সৃষ্টি করে। তরুণীদের ইজ্জত-সম্ভ্রম সংরক্ষণের গ্যারান্টিও তেমন নেই। রাত হলে ক্যাম্পের অভ্যন্তরের জগৎ সবারই অজানা। শরণার্থী ক্যাম্প নিরাপত্তা ও সুরক্ষার কতগুলো আন্তর্জাতিক বহুলপরীক্ষিত নিয়মপদ্ধতি আছে। সেসব পদ্ধতির প্রয়োগ এখনো দৃশ্যমান করা যায়নি ক্যাম্পে।

মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয়ন প্রকল্পের জন্য প্রথমদিকে বাংলাদেশ সরকার সীমিত সামর্থ নিয়েই এগিয়ে আসে এবং বিশ্বসম্প্রদায়ের প্রতি সাহায্যের হাত সম্প্রসারণের আকুল আবেদন জানায়। শরণার্থীদের আগমনের সূচনা লগ্ন থেকে ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থ থেকে ত্রাণ সামগ্রী ও নগদ অর্থ ব্যয় করে। অতঃপর মার্চ ১৯৯২ থেকে UNHCR বা জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাই কমিশনার, বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি, ও ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে শরণার্থীদের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়কেন্দ্রসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাথে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯২ সালের জুলাই থেকে ১৯৯৩ সালের জুন পর্যন্ত UNHCR ২৬ কোটি ৪২ লাখ ৮৬ হাজার ২১৩ টাকা নগদ অর্থ, ১৮২২ রেলিস প্লাষ্টিক সিট, ২৬টি বিভিন্ন ধরনের গাড়ি, ২০টি মটর সাইকেল, ৪৫ হাজার পিচ কম্বল, ১০ ইউসি হাসপাতাল তার, ১০টি রাব হলফ, ১ সেট প্যাট ডিমিং মেশিন, ২৯ মেট্রিকটন ঔষুধ ও স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ করে।[১৬৬] UNHCR তাদের কার্যক্রমের সূচনালগ্ন থেকে মার্চ ২০০০ পর্যন্ত ৮ বছরে মোট ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করেছে।[১৬৭] এ সময় (১৯৯২ সালের জুলাই হতে ১৯৯৩ সালের জুন পর্যন্ত) বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির আওতায় ৪৪ হাজার ৭৭৬ মেট্রিকটন চাউল, ৩১১৯ মেট্রিক টন ডাল, ২২৩১ মে. টন লবন, ১৯০৮ মে. টন হুইট সয়া মিশ্র খাদ্য, ৯৬৪ মে. টন শুকনা মাছ এবং ৬১০ মে. টন চিনি সবরাহ করে। সৌদী আরব এ সময়ে ১৯৪৭ টি তাঁবু ও ১০৫ মে. টন চাল, চিনি, গুড়াদুধ, ও ভোজ্যতেল প্রদান করে। এছাড়াও এ সময়ের মধ্যে ফ্রান্স ৫০০ মে. টন খাদ্য, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ড যথাক্রমে ১৯ লাখ

www.pathagar.com

৫৫ হাজার ৪৩৫ টাকা ও ৩০ হাজার মার্কিন ডলার, দক্ষিণ কোরিয়া নগদ ৫০ হাজার ডলার, সুইডেন ৩ লাখ ডলার সমমূল্যের ক্রোনার এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে ৬ কোটি ২৩ লাখ ৮৩ হাজার ১৯৪ টাকা পাওয়া যায়।[১৬৮]

রোহিঙ্গা শরণার্থী আশ্রায়নে সরকারি ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সাহায্য সহযোগিতার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহও এগিয়ে এসেছে। শুরু থেকে মোট ৩১টি এনজিও সক্রিয় ছিল এগুলোর মধ্যে অক্সফার্ম, এমএসএফ ফ্রান্স, এমএসএফ হল্যান্ড, আইআইআরও কনসার্ন ও রাবেতা আলমে আল ইসলামীসহ বিভিন্ন এনজিও পানি-স্যানিটেশন, চিকিৎসা, ও ইসলামি শিক্ষার উপর সহায়তা প্রদান করে।[১৬৯] বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিকভাবে শরণার্থীদের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করে এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের নিকট এব্যাপারে সহযোগিতার জন্য আবেদন জানায়। ফলে অদ্যাবধি বিভিন্ন সংস্থা ও দাতা দেশের সহায়তায় UNHCR শরণার্থীদের ভরণ-পোষণ ও প্রত্যাবাসনের ব্যয় নির্বাহ করে আসছে। ২০১৬-১৭ সালের ভয়াবহ গণহত্যার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের ত্রাণতৎপরতায় বাংলাদেশের সর্বসাধারণ মানুষ এক অনবদ্য নজীর স্থাপন করেছে। গ্রাম-গঞ্জ থেকে খেটে খাওয়া মানুষেরাও চাউল, টাকা, গহনা সংগ্রহ করে তা বাজারে বিক্রি করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য নিয়ে হাজির হয়েছে রোহিঙ্গাদের পাশে। ছোটখাটো ক্লাব, সমিতি থেকে শুরু স্কুল-কলেজের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও তাদের টিফিনের পয়সা না খেয়ে দান করেছে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য। মহিলারা তাদের ব্যবহৃত সোনার গহনা খুলে দিয়েছে রোহিঙ্গা ভাইবোনদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। মসজিদের খুৎবাহ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনায় ইমাম ও ইসলামী চিন্তশীল ব্যক্তিগণ নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে।

৫.৩ রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ

রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকসহ বিভিন্ন মহলে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা, সেমিনার-আলোচনা সভা এবং জাতীয় সংসদে আলোচনার মধ্যদিয়ে সমাধানের পথ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়; যা এ দেশের পত্র-পত্রিকাসমূহে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করার পাশাপাশি নিজস্বভাবে এ ব্যাপারে সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় ছাপা হয়। সেইসাথে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বরত মন্ত্রী কিংবা এম.পি মহোদয়গণের বক্তৃতা বিবৃতিও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখতে গেলে রোহিঙ্গা সমস্যা ফিলিস্তিন সমস্যার চেয়েও পুরাতন।[১৭০] ইসলামের আবির্ভাবের পরেই আরাকানের বাণিজ্যিক কেন্দ্র আকিয়াবে আরব-মুসলিম বণিকদের গভীর যোগাযোগের সুবাদে আরাকান রাজ্য মুসলিম প্রভাবিত হলেও স্বাধীনতা উত্তর বার্মায় সামরিক জান্তা রোহিঙ্গাদেরকে কল্লা বা বিদেশী হিসেবে

www.pathagar.com

চিহ্নিত করে নজির বিহীন নির্যাতন চালিয়ে পূর্ব পুরুষের বসতবাড়ী থেকে উৎখাত করে। এ ঘটনা দু'একবার নয়, গত পঞ্চাশ বছরে অন্তত বিশ বার এমনভাবে তাদের উপর অত্যাচার চালানো হয়েছে।[১৭১] কিন্তু ফিলিস্তিন সমস্যা যেমন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাড়া জাগিয়েছে রোহিঙ্গা সমস্যা তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি, অথচ ফিলিস্তিন সমস্যা ও রোহিঙ্গা সমস্যা সমপর্যায়ভূক্ত। সম্প্রসারণবাদী ইহুদীরা ফিলিস্তিনীদের পৈতৃক বাস্তুভিটা থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করে যেমন মুসলিম জাতিসত্ত্বা বিনাশে তৎপর তেমনি মিয়ানমার সরকার ও মগরা আরাকান রাজ্যকে মুসলিম নিধন করার লক্ষ্যে পাশাবিক নির্যাতন ও নিপীড়ন অব্যাহত রেখেছে। মুসলিম নিধন প্রশ্নে ইহুদীবাদী ইসরাইল রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক মিয়ানমারের লক্ষ্য একই। কিন্তু ফিলিস্তিন প্রশ্নে অপর রাষ্ট্রগুলো যেমন সোচ্চার রোহিঙ্গা প্রশ্নে কোন মুসলিম রাষ্ট্রই অতটা সোচ্চার নয়। দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত আরাকানরাজ্য প্রাচীন হলেও মুসলিমবিশ্বে তার প্রচারণা নেই বললেই চলে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রুনাই-এসব মুসলিম দেশগুলোও আরাকান থেকে দূরে অবস্থিত বিধায় তারাও সম্ভবত রোহিঙ্গা প্রশ্নে অতটা ওয়াকিফহাল নয়।[১৭২] স্লোর্ক জান্তা কর্তৃক রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে চলছে তা নাৎসি বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। অবরুদ্ধ মিয়ানমারের রাজনৈতিক পরিস্থিতিসহ এ সব বিষয় আন্তর্জাতিক বিশ্ব কম বেশি অভিহিত রয়েছে অথচ মুসলিম বিশ্বসহ মানবাধিকারের ধারকবাহক আন্তর্জাতিক বিশ্ব রোহিঙ্গাদের এ সমস্যা সম্পর্কে নিরব। রোহিঙ্গাদের আহাজারী ও আর্ত-চিৎকার অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হয়েছে-যা নিঃসন্দেহে মানবতার প্রতি এক চরম পরিহাস। নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে শরণার্থীর ধাক্কা বাংলাদেশকেই সামাল দিতে হয় বলে বাংলাদেশ এ ব্যাপারে বেশ তৎপর, যদিও এ দরিদ্র দেশের জন্য বোধগম্য কারণেই বিষয়টি অত্যন্ত বিব্রতকর এবং বিরাট চাপ।[১৭৩] পাকিস্তান আমল থেকেই রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে বার্মা সরকারের সাথে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা চলে আসছে। স্বাধীনতাত্তোর ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের শাসনামলে ১০ হাজার উদ্বাস্তু বাংলাদেশে চলে এলে তিনি বার্মাকে চরমপত্র দেয়ায় এসব উদ্বাস্তুদের ফেরৎ নেয়া হয়।[১৭৪] ১৯৭৮ সালেও আন্তর্জাতিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে বর্মীসরকার আরাকান আঞ্চলের ১০ হাজারেরও বেশি মুসলমানকে বিদেশী বলে হত্যা করে এবং তাদের পূর্ব পুরুষের বসতবাড়ী থেকে উৎখাত করলে তিন লাখেরও অধিক রোহিঙ্গা প্রাণের মায়ায় বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়, ফলে বিশ্বের বিভিন্ন ফোরাম থেকে তীব্র নিন্দা করা হয়। তারা সুদীর্ঘ দিন যাবৎ নির্বাসিত ও শরণার্থী জীবন যাপনের পর বাংলাদেশ-বার্মা চুক্তিবদ্ধ হয় এবং তারই প্রেক্ষিতে রোহিঙ্গা মুসলমানেরা স্বদেশে প্রত্যাবাসিত হয়েছিল। রোহিঙ্গারা যে সেখানকার প্রকৃত নাগরিক এ কথা স্বীকার করে নিয়েছিল এবং তারা বার্মায় নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারবে এমন অঙ্গীকারও করেছিল বর্মী সরকার। বিশ্ববাসী মনে করেছিল যে, বর্মী সরকার তাদের অতীতের মুসলমান বিরোধীনীতি পরিত্যাগ করে সম্প্রীতিমূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে রোহিঙ্গা জাতিকে

www.pathagar.com

দমননীতির আওতার বাইরে রাখবে কিন্তু তারা সম্পাদিত চুক্তির সাথে শুধু অবমাননাকর আচরণই করেনি বরং আন্তর্জাতিক রীতিনীতির প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে।[১৭৫] তাই কোন প্রকারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সীমান্তের ওপারে পার করে দিতে পারলেই এ সমস্যার সমাধান হবে না। এ অবস্থায় কিছুদিন যেতে না যেতেই একই সমস্যার উদ্ভব হবে। এজন্য সমস্যার মূলে হাত দিয়ে পূর্ণাঙ্গ নাগরিক অধিকার ও স্থায়ী নিরাপত্তার গ্যারান্টি নিয়ে রোহিঙ্গারা যেন নিজ বাস্তুভিটায় মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।[১৭৬] কাজটি এককভাবে বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়, বাংলাদেশ সরকার ও বিরোধী দল মিলে জনগণকে এ ব্যাপারে আরও সচেতন করে আন্তর্জাতিক বিশ্বের কাছে আবেদন জানিয়ে বার্মার বিশ্ব নিন্দিত সরকারকে মানবাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কুয়েত উদ্ধারের মত বিশ্বশক্তি একত্রিত হওয়া প্রয়োজন। এসুযোগে মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্বশক্তি এক হওয়া দরকার, কেননা বার্মা মুসলিম নিধনে গত ৫০ বছর ধরে একটি Systematic Genocide চালিয়ে যাচ্ছে। সেমিনারে বক্তাগণ আরো বলেন, "আরাকানকে অঙ্গরাজ্য ঘোষণা দিয়ে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন পরিচালনা করে সংখ্যা গরিষ্ঠদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরপূর্বক রেঙ্গুন সরকারকে রোহিঙ্গাদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করতে হবে। চীনসহ সকল রাষ্ট্রকে অবিলম্বে রেঙ্গুন সরকারের নিকট অস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করতে হবে; কেননা সম্প্রতিকালে চীন মিয়ানমারের নিকট এক মিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র বিক্রি করেছে; যার অধিকাংশ রোহিঙ্গা নির্মূলে ব্যবহার করা হবে।" বার্মার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলি একটি গোল টেবিল বৈঠকে মিলিত হয়ে বার্মার বেআইনী সরকারের সকল অপকর্ম বন্ধের দাবি করতে হবে।[১৭৭] ড. আবদুল করিম বলেন, আগামীতে রোহিঙ্গাদের শক্তি সঞ্চয় করে অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে।[১৭৮]

কোন দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ন্যায্য নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বাংলাদেশে যে অগণিত রোহিঙ্গা মুসলমান উদ্বাস্তু হিসেবে প্রবেশ করছে তারা মিয়ানমারের বৈধ নাগরিক। এ সাধারণ মানুষগুলো বিদ্রোহীও নয়, গেরিলাও নয়, কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের বিভিন্নস্থানে তারা মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।[১৭৯] মজলুম রোহিঙ্গাদের সম্মানের সাথে নিজ দেশে পুনর্বাসন এবং তাদের অধিকার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ কেবল রাষ্ট্রীয় কতর্ব্য নয়, মানবিক দায়িত্বও বটে। এ দায়িত্ব যেমন বাংলাদেশের, তেমন ইসলামি বিশ্বের মুসলিম উম্মার এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ব সংস্থার।[১৮০]

তাই অস্থায়ী সমাধান নয়, রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান দরকার, এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কিংবা মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে বিষয়টি রাবেতা আলম আল ইসলামী, এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, ইসলামি সম্মেলন সংস্থা ও জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা

www.pathagar.com

জরুরী।[১৮১] দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মহল থেকে রোহিঙ্গা সমস্যাকে জাতিসংঘ ও ইসলামি সম্মেলন সংস্থাসহ বিশ্বের আন্তর্জাতিক ফোরামসমূহের মাধ্যমে সমাধানের জোর দাবি উঠলেও বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিকীকরণের পক্ষে না গিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বকে অবগত করেই মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বি-পক্ষীয় ভিত্তিতে সমাধান করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে।[১৮২] সমস্যাটি নেহায়েতই মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে রেঙ্গুন সরকারের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে তারা আন্তর্জাতিক বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পক্ষপাতি। তবে মিয়ানমারের নিকট থেকে আশানুরূপ অনুকূল সাড়া না পেলে বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামের মাধ্যমে সমাধান করা ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ থাকবে না বলে তারা মনে করেন।[১৮৩] ১৯৭৮ সালের সৃষ্ট সমস্যাটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব তোবারক হোসেন এবং বর্মী প্রতিনিধিদলের নেতা, উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী উ তিন অহন (Mr. U Tin Ohn) কর্তৃক ৯ জুলাই'৭৮ স্বাক্ষরিত দ্বি-পক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে সমাধান হয়েছিল।[১৮৪] ১৯৯২ সালে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান ব্যাপক তৎপরতা চালান এবং এ নিয়ে ২২ নভেম্বর'৯১ রেঙ্গুনে সেনাবাহিনী রেস্ট হাউস 'গগ্যা ইয়েইথ্যা-তে মিয়ানমারে ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বি-পক্ষীয় সর্বোচ্চ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে বার্মার পক্ষে প্রেসিডেন্ট জেনারেল স মং এর ফাষ্ট সেক্রেটারি জেনারেল খিন নইনথ, পররাষ্টমন্ত্রী উ অং জ, বিদেশ বিষয়ক ডি জি খুইয়া অং চ্যা ও বাংলাদেশে নিযুক্ত বার্মার রাষ্ট্রদূত উমো মিন্ট; অন্যদিকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব এ এইচ মাহমুদ আলি, অতিরিক্ত স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুল হামিদ চৌধুরী, এবং মিয়ানমারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন। মিয়ানমার সরকার আরাকানের স্বাধীনতাকামীদের কোন ধরনের ছাড় দিতে রাজি না বলে বৈঠকের আলোচনায় মনে হয়েছে।[১৮৫] বৈঠক চলাকালে সারাদিনব্যাপী রেঙ্গুন রেডিওতে বর্মীদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে প্রচার করা হয় যে, "মিয়ানমারকে বিভক্ত করার জন্য চার দিক থেকে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ মিয়ানমারের চেতনা নিয়ে সবাই এগিয়ে আসুন।" বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের রেঙ্গুন সফরকালে এ ধরনের খবর প্রচার রোহিঙ্গাদেরকে আশাহত করে।[১৮৬] অতঃপর বাংলাদেশ মিয়ানমারের সাথে দ্বি-পক্ষীয় কুটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি জাতিসংঘ, ওআইসিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট রোহিঙ্গা সমস্যার ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে কুটনৈতিকভাবে মিয়ানমার সরকারকে সমস্যা সমাধানে চাপ প্রয়োগের পরিবেশ তৈরি করে। আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাড়া পাবার সাথে সাথে মিয়ানমারও শরণার্থী প্রত্যাবাসনে নমনীয় হয় এবং এ লক্ষ্যে ২৩ এপ্রিল '৯২ ১৪ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল নিয়ে মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উ অহন গিয়াও (U ohn Gyaw) ৬ দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সাথে ২৪ এপ্রিল'৯২ বৈঠকে মিলিত হয়ে আশ্বাস দেন যে, সৌহার্দ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করাই হচ্ছে তার প্রতিনিধিদলের লক্ষ্য।[১৮৭]

www.pathagar.com

বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার প্রথম দিনের বৈঠকের পর্যালোচনা এবং ৬ দিনের এ দীর্ঘ সফরের সম্ভাব্যতা যাচাই করে জাতীয় দৈনিকসমূহে সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়। ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত দু-দেশের প্রতিনিধিদলের বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মিয়ানমার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সামান্যতম প্রমাণ থাকলেই ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতিসংঘের শরণার্থী কমিশনের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের ভূমিকাকে মিয়ানমার মেনে নিতে রাজি হয় নি। অথচ রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্যে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়-

(১) আসন্ন বর্ষার আগেই শরণার্থীদের ফিরে যাবার জন্যে দ্রুত বাংলাদেশ, মিয়ানমার এবং জাতিসংঘের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন;

(২) রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্ব স্ব জায়গায় পুনর্বাসনের জন্য মিয়ানমার এবং জাতিসংঘের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি এবং

(৩) ভবিষ্যতে যাতে একই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় সে জন্যে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ, জাতিসংঘ এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পর্যবেক্ষণ বা তদারকির ব্যাবস্থা করা।

ইতোপূর্বে ১৯৭৮-৭৯ সালের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বাংলাদেশ এই ধরনের প্রস্তাবের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। সে সময়ে আগত দুই লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে বার্মা ফিরিয়ে নিলেও তাদেরকে কোন রকম পরিচয়পত্র দেয়নি, তারা নিজস্ব এলাকার বাইরে যেতে পারেনি, তাদের সন্তানদের হাইস্কুল বা কলেজে পড়াশুনার অনুমতি দেয়া হয়নি। এবারও মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ একইভাবে শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশ সরকার শরণার্থীদের মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে সকল রকম স্বীকৃতি ব্যতিত ফেরৎ পাঠানোর চিন্তা করছে না। এবার বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সৃষ্ট সমস্যায় জাতিসংঘ সরাসরি যুক্ত রয়েছে বলে বিগত সময় থেকে (১৯৭৮-৭৯) বর্তমানের অবস্থা ভিন্ন রকম। জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ইয়ান এলিয়াসনের সফরকালে (২-৬ এপ্রিল, ১৯৯২) প্রদত্ত চাপের ফলেই মিয়ানমার শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে। এর আগে পর্যন্ত মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের অবস্থান ছিলো 'এ ব্যাপারে তাদের কিছু করণীয় নেই।' এমন কি ১৯৯২ সালের ১৯ মার্চ ইয়াঙ্গুনস্থ কুটনীতিকদের কাছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী উ অহন গীয়াও বলেন যে, বাংলাদেশ সফরের তার কোন কারণ নেই। জাতিসংঘের প্রতিনিধি মি. এলিয়াসন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তিনবার বৈঠকে বসেন। তারপর মিয়ানমারের আইন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা কাউন্সিলের (SLORC) সচিব মেজর জেনারেল খান নিউন্ত-এর সঙ্গে মি. এলিয়াসন বৈঠক করলে তাকে বাংলাদেশের সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনার সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় এবং এ কথাও তাকে অবহিত করা হয় যে, শরণার্থীদের মধ্যে যারা সামান্যতম প্রমাণ উপস্থিত করতে পারবেন, তাদেরকেই ফেরৎ নেয়া হবে। বাংলাদেশ সফরকালে মি.

www.pathagar.com

এলিয়াসন শরণার্থীদের দ্রুত ও নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ওপর জোর দিয়ে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি উদ্ভাবনের কথা বলেন এবং এ প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে মি. এলিয়াসন মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে ইঙ্গিত দেন যে, দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করা না হলে তাদের জন্যে এর বিকল্প হবে 'খুবই যন্ত্রণাদায়ক' এবং এ যন্ত্রণাদায়ক বিকল্প দুরিকরণে জাতিসংঘের তেমন কোন ভূমিকা থাকবে না। এভাবে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক চাপের মুখে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে সম্মত হলেও তারা জাতিসংঘকে এ প্রক্রিয়ার বাইরে রাখতে চায়। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবার বাংলাদেশ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মূল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হয় এবং জাতিসংঘকে জড়িত করতে সচেষ্ট থাকে।[১৮৮]

বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বিতীয় দিনের বৈঠক শেষে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের ফেরৎ পাঠানো এবং তাদের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের অংশগ্রহণ ও তদারকীর ব্যাপারে মিয়ানমার রাজি হয়নি। তবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের চাপে কোনভাবে জাতিসংঘের অংশ গ্রহণের বিষয়টি আলোচনায় নিতে সম্মত হয়। আলোচনা অনুসারে মিয়ানমার সকল রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হলেও শরণার্থীরা ফিরে গেলে তাদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে সে সম্পর্কে কোন আশাবাদ বা চুক্তি করতে প্রস্তুত না। তারা বলছে, সেটা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে আর এ ধরনের সমস্যা না হয় সেজন্য স্থায়ী সমাধানের নিমিত্তে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ভূমিকার উপর বিশেষভাবে জোর দেয়।[১৮৯]

৫.৪ প্রত্যাবাসন চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ সরকারের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আন্তর্জাতিক বিশ্বের সহযোগিতায় ১৯৯২ সালের ২৮ এপ্রিল মিয়ানমার তাদের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরৎ নেবার সম্মতি জ্ঞাপন করে এবং ঐদিন ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ও মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উ অহন গিয়াও-এর মধ্যে এ চুক্তি (Joint Statement বা যৌথঘোষণা) স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি সম্পাদনের তিন সপ্তাহ পর প্রত্যাবাসন কার্যক্রম শুরু হয়ে ছয় মাসের মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ শরণার্থী এ প্রত্যাবাসন কর্মসূচির অধীনে স্বদেশে ফিরে যেতে পারবে বলে চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়।[১৯০] চুক্তি স্বাক্ষরের পর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আয়োজিত যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় বলেন, স্থায়ী দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার স্বার্থেই এ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।[১৯১] বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন "মিয়ানমার সরকার সে দেশের নাগরিকদের বাংলাদেশে আসা বন্ধ করতে এবং যারা এসেছে তাদের স্বেচ্ছায় ফেরত নিতে সম্মত হয়েছে। প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে UNHCR এর সাহায্য নেবার ব্যাপারে আমরা নীতিগতভাবে একমত হয়েছি। তবে প্রত্যাবাসনের প্রাথমিক

www.pathagar.com

কাজগুলো দ্বি-পক্ষীয় ভিত্তিতে শুরু করা হবে।" এক প্রশ্নের জবাবে মিয়ানমারের পরারষ্ট্রমন্ত্রী উ অহন গিয়াও বলেন, "সংখ্যার প্রশ্নটি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, যারা বাংলাদেশে চলে এসেছে তারা স্বগৃহে ফিরবে। এ ক্ষেত্রে তেমন বড় ধরনের বাধা রয়েছে বলে মনে করি না। এমন কি যারা নিজ এলাকার হেডম্যানের নাম বলতে পারবে কিংবা যারা তাদের স্মরণ শক্তি থেকে রেফারেন্স দিতে পারবে তাদিগকেও ফেরত নেয়া হবে।" এক প্রশ্নের জবাবে তিনি রোহিঙ্গাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, "মূলত গুজবের উপর ভিত্তি করেই রোহিঙ্গারা দেশত্যাগ করেছে।" সীমান্তে অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সীমান্তে অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন করা হয়নি; বরং সীমান্তে নিয়ম অনুযায়ী শুধুমাত্র বর্ডার পুলিশ রয়েছে।[১৯২]

সাংবাদিক সম্মেলনে মিয়ানমার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ ধরনের বক্তব্য রোহিঙ্গা শরণার্থীসহ বাংলাদেশের পর্যবেক্ষক মহলকে ভাবিয়ে তোলে। প্রথমত, তিনি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সংখ্যাকে এড়িয়ে গেছেন; যার মাধ্যমে সকল উদ্বাস্তুকে মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে মেনে নেননি। দ্বিতীয়ত, বিশ্ববাসী অবগত যে, মিয়ানমার সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গারা নির্যাতিত হচ্ছে; অথচ তিনি বিনা দ্বিধায় এ সত্যটিকে অস্বীকার করে বলেছেন যে, রোহিঙ্গারা শুধু গুজবের উপর ভিত্তি করেই দেশ ত্যাগ করছে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে বাংলাদেশের পুলিশ ফাঁড়িতে হামলাসহ[১৯৩] প্রায় যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করার পরও তিনি অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন করার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ সরকারি আমলাদের সামনে মিয়ানমার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্ববাসীর নিকট নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

৫.৫ চুক্তির সমালোচনা

Joint Statement বা যৌথঘোষণা স্বাক্ষরিত হবার সাথে সাথেই আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের দু'টি সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট (আরিফ) ও রোহিঙ্গা সালিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) আলাদা আলাদাভাবে জানিয়েছে যে, আগে রোহিঙ্গাদের মৌলিক রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। রোহিঙ্গা মুসলমনরা মিয়ানমারের একটি অন্যতম জাতি একথা মিয়ানমার সরকারকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে হবে এবং স্বদেশে তাদের জীবন সম্পত্তি এবং মর্যাদার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। তা না হলে স্বদেশভূমি ছেড়ে আসা শরণার্থীরা সেখানে ফিরে যেতে পারেনা। আরিফের চেয়ারম্যান নূরুল ইসলামের সাথে 'দৈনিক জনতা'র পক্ষ থেকে ঐ তারিখ দিবাগত রাতে (২৮ এপ্রিল '৯২) যোগাযোগ করে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, "রোহিঙ্গারা বাধ্য হয়ে স্বদেশভূমি ছেড়ে এখানে এসেছে, এটা কোন সখের সফর নয়। আপনারা রোহিঙ্গাদের ঠেলে মৃত্যুর মুখোমুখি পাঠাতে যাবেন না। নিজেদের দেশে অবশ্যই রোহিঙ্গা মুসলমানরা ফিরে যাবে তবে তার আগে জাতিগত অধিকার এবং

www.pathagar.com

জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আমরা জাতি সংঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত অধিকার সনদের অধীনে প্রটেকশন চাই।" তিনি জানান, রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে মিয়ানমার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার সম্পাদিত চুক্তির ধারা উপধারা দেখবার সুযোগ তার হয়নি। রোহিঙ্গা মুসলমানরা অবশ্যই কাল বিলম্ব না করে নিজ দেশে ফিরে যেতে আগ্রহী কিন্তু কেউ দোজখে ফিরে যেতে চায় না; আরাকান এখন দোজখখানা; মিথ্যা ও কল্পনা প্রসঙ্গত অভিযোগ এনে রোহিঙ্গাদেরকে বার্মার জাতিসত্ত্বা হিসেবে স্বীকার করা হচ্ছে না। এ বিষয়গুলোর ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের ফেরৎ পাঠাতে চাইলে তারা যেতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে এবং গেলেও কিছুদিন পর আবার শরণার্থী হিসেবে ফিরে এলে অবাক হবার মত কোন কারণ থাকবেনা। সে রাতে আর এস ও'র চেয়ারম্যান ডা. মুহাম্মদ ইউনুছকে পাওয়া না গেলে তাঁর একজন মুখপাত্রের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বার বার আমরা 'বলিরপাঠা' হতে পারিনা। আমরা মিয়ানমারের অনেক জাতির মধ্যে অন্যতম একটি জাতি-এ সত্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হতে হবে।[১৯৪]

ঢাকায় যখন বাংলাদেশ-মিয়ানমার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবাসন নিয়ে কথা বার্তা বা চুক্তি সম্পাদনের কাজ করে তখন পূর্বের তুলনায় আরো ব্যাপকভাবে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু বাংলাদেশে এসে ভিড়ে ঠাসা আশ্রয় শিবিরগুলোতে জমায়েত হয়। সরকারি হিসেব মতে, চুক্তি সম্পাদনের পূর্ব থেকে শুরু করে সম্পাদন পর্যন্ত (বর্মী সরকারের বাংলাদেশ সফরকারী প্রতিনিধি দলের এদেশে অবস্থানকালীন সময়েও) প্রতিদিন গড়ে ২ হাজার করে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু এদেশে পাড়ি জমায়। অথচ রমজানের পরপরই জাতিসংঘের প্রতিনিধি বাংলাদেশ সফরে ছিলেন হেতু শুধুমাত্র সে সময়ই উদ্বাস্তু আগমন হ্রাস পেয়েছিল। এমতাবস্থায় রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবাসন নিয়ে বাংলাদেশ মিয়ানমার মধ্যে Joint Statement বা যৌথঘোষণা সম্পাদিত হলেও একটা আতংক রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের তাড়া করে ফিরছে। শিবিরে আশ্রিত উদ্বাস্তুরা আবারও অত্যাচার অনাচারের দূর্ভোগ পোহানোর জন্য গোলযোগপূর্ণ অবস্থায় তাদের বাড়িঘরে ফিরে যাবার চেয়ে উদ্বাস্তু হিসেবে এদেশে থাকাটাই শ্রেয় মনে করে। উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে দৈনিক জনতার পক্ষ থেকে নির্বিচার সাক্ষাৎকার নেবার সময় রোহিঙ্গারা উল্লেখ করে যে, তারা মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর মগদের খুন, নির্যাতন, ধর্ষণ এবং লুণ্ঠণের অবসান ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও নাগরিক মান-মর্যাদার গ্যারান্টি ছাড়া দেশে ফিরে যাবে না। ১৯৭৮ সালের মত দেশে ফিরে গিয়ে আবার উদ্বাস্তু হয়ে দেশ ত্যাগের আশংকা মুক্ত হবার লক্ষ্যে স্থায়ী সমাধান দাবি করে তারা আরো উল্লেখ করে, তাদের প্রতি মিয়ানমার সরকারের আচরণ লক্ষ্য করার জন্য আরাকানে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের কমপক্ষে ১০ বছর মোতায়েন রাখা উচিৎ।[১৯৫]

এদিকে বাংলাদেশ মিয়ানমার মধ্যকার সম্পাদিত এ Joint Statement বা যৌথঘোষণা ১৯৭৮ সালের Agreed Minuts বা সমঝোতা স্মারকের চেয়ে খারাপ

www.pathagar.com

মন্তব্য করে আরএসও এবং আরিফ নেতৃবৃন্দ এ এটাকে প্রত্যাখ্যান করেন। আর এস ও জেনারেল সেক্রেটারি সাইদুর রহমান বলেন "বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিতে রোহিঙ্গাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি। আমাদের দাবি ছিল চুক্তি গ্রহণকালে রোহিঙ্গা প্রতিনিধি ও জাতিসংঘ প্রতিনিধিসহ চারপক্ষের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবে এবং জাতিসংঘ ১০ বছর সেখানে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া অবলোকন করবে। তিনি আরো বলেন, "সারা দুনিয়া অবগত যে, বর্মী জান্তা রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে অথচ বর্মী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নির্যাতনকে অস্বীকার করে বলেছেন, তারা গুজবে দেশত্যাগ করছে। তা হলে এটাকি ধরে নেয়া যায়না যে, নির্যাতন অব্যাহত থাকবে? তিনি আরো জানান যে, চুক্তিতে জাতিসংঘের মধ্যস্ততাকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং তাতে রোহিঙ্গাদেরকে বার্মার নাগরিক হিসেবে সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি পর্যন্ত বর্মীপক্ষ দেয়নি। ইতোমধ্যে যারা বসতবাড়ী বিক্রি করে বা ফেলে রেখে অন্যদেশে পাড়ি জমিয়ে ছিল তাদেরকে মিয়ানমার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরাকানে পুনর্বাসনেও অস্বীকার করেছেন ।[১৯৬]

শুধু রোহিঙ্গারাই নয়, বাংলাদেশের চিন্তাশীল মহলেও চুক্তির ব্যাপারে নানা মতামত লক্ষ্য করা যায়। তাদের মতে, রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসনে বার্মার সঙ্গে বাংলাদেশের কার্যত কোন চুক্তি হয়নি; যদিও সরকারি পর্যায়ে এটাকে চুক্তি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ফলাওভাবে প্রচার করা হচ্ছে। যে ঘোষণাকে চুক্তি বলা হয়েছে তার মধ্যে প্রথমে এটাকে যৌথ ঘোষণা (Joint Statement) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন বিষয়ে দু'দেশ চুক্তি করলে সেটা পালনে সে বাধ্য থাকে। পক্ষান্তরে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর কেবলমাত্র যৌথঘোষণাকে চুক্তি বলে চালিয়ে দিয়ে সমস্যা সমাধান আদৌ সম্ভব হবে কি না এ নিয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। শরণার্থী প্রত্যাবাসনে একটি চুক্তিতে নিয়ে আসার জন্যে মিয়ানমারের উপর বাংলাদেশ যথেষ্ট চাপ সৃষ্টির পরও তাদেরকে রাজি করাতে পারেনি।[১৯৭] এমন কি ১৯৯২ সালের ২৭ এপ্রিল সোমবার রাতে এ নিয়ে বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে আলোচনা ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হলে বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত Joint Statement কথাতেই রাজি হয়ে যৌথঘোষণায় স্বাক্ষর করে।[১৯৮]

জাতিসংঘ ১৯৭৮-৭৯ সালে শরণার্থী প্রত্যাবাসনে ৭ মিলিয়ন ডলার সাহায্যে দিয়েছিলো, অথচ এবারের যৌথ ঘোষণায় জাতিসংঘকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। এ ছাড়াও যৌথ ঘোষণার রূপরেখার মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি আছে যেগুলো আগে থেকে না ভাবলে মিয়ানমার এর সুযোগ নিতে পারে। শরণার্থীদের সংখ্যা নিয়ে দু'দেশের মধ্যে কোন সমঝোতা হয়েছে এটা বোঝা যায়নি। এ ব্যাপারে দুই পক্ষের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী মনে হয়। বাংলাদেশে প্রায় সোয়া দুই লাখ শরণার্থী আশ্রয় নেয়ার কথা বলা হলেও বর্মী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণার্থীদের সংখ্যার ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু উল্লেখ না করে বলেছেন, যারা নিজেদের মিয়ানমারের অধিবাসী হিসেবে প্রমাণ করতে পারবে তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। এভাবে তিনি সংখ্যা এড়িয়ে গেছেন। এখানে আবাসিক পরিচয়

www.pathagar.com

পত্রের কথা বললেও রোহিঙ্গা উচ্ছেদ অভিযানের আগেই তাদের মধ্যে পঞ্চাশ অনুর্দ্ধ বয়সের সকলের কাছ থেকে আবাসিক পরিচয় পত্র ছিনিয়ে নেয়া হয়। ঘোষণার এসব কৌশলের সুযোগ নিয়ে শেষে মিয়ানমার শরণার্থী প্রত্যাবাসনে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে এমন আশংকা অনেকের।[১৯৯] তবে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং একটি সুপ্রতিবেশীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মিয়ানমার এ সমস্যা সমাধানে কোন জটিলতা সৃষ্টি করবে না এটা সকলের প্রত্যাশা।

মিয়ানমার থেকে শরণার্থী আগমন বন্ধ করার নিমিত্তে Joint Statement বা যৌথঘোষণা সম্পাদিত হলেও ২৮ এপ্রিল'৯২ এর পর সে শর্ত পালিত না হয়ে বরং গড়ে প্রতদিন দু'হাজার হারে মাত্র এক সপ্তাহে সাড়ে বার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ফলে সরকারি কর্মকর্তাগণ নবাগত শরণার্থীদের নাম রেজিষ্ট্রি করতে ব্যস্ত থাকায় শরণার্থী প্রত্যাবাসনের কাজ শুরু করার কথা ভাবার সময় নেই বলে কর্মকর্তারা মন্তব্য করেন। নবাগত শরণার্থীরা অভিযোগ করে যে, বিনা মজুরিতে বাধ্যতামূলক শ্রমসহ অন্যান্য নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনেচ্ছু শরণার্থীদের জন্য পুনর্বাসন শিবির খোলার নিমিত্তে টাকা পয়সা ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি দিয়ে সাহায্য করতে মিয়ানমারের সরকারি কর্মকর্তাগণ স্থানীয় রোহিঙ্গাদের উপর চাপ প্রয়োগ করছে।[২০০] যৌথঘোষণার পরও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বাংলাদেশে আগমনের ব্যাপারে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মি. ইউলিয়াম বি মাইলাম রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো পরিদর্শন শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্তব্য করেন, "রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত বাংলাদেশ-মিয়ানমার চুক্তিটিতে ভাল দিকের সাথে সাথে এর কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়টি যদি দ্বি-পাক্ষিকভাবে সমাধান না হয় এবং তা জাতিসংঘে উত্থাপিত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে তার ভূমিকা রাখবে।" তিনি আরো বলেন, তিন দিন পূর্বে আমি নিজেই রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আগমন দেখে এসেছি; এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, মিয়ানমার সরকার চুক্তিটিকে মর্যাদা দিচ্ছে না অথবা নিম্নপর্যায়ে চুক্তিটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবহেলা করা হচ্ছে।[২০১] উদ্বাস্তুদের তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করে ইউসিস কার্যালয়ে আয়োজিত এ প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যেই এ মানবিক সমস্যাটি আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ফলে দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে এর শান্তিপূর্ণ সমাধানের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।[২০২] তবে দ্বি-পাক্ষিকভাবে সমাধান না হলে বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামে নিয়ে যাবার সব দুয়ার বাংলাদেশের খোলা আছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।[২০৩]

৫.৬ শরণার্থী প্রত্যাবাসন

Joint Statement বা যৌথঘোষণার শর্তানুযায়ী ১৯৯২ সালের ১৫ মে হতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফেরৎ পাঠানোর কথা থাকলেও ঐ দিনে তা সম্ভব হয়নি। প্রত্যাবাসন শুরু করার জন্য বাংলাদেশ মোটামুটি প্রস্তুতি নিয়ে দশটি ক্যাম্পে ২০ জন

www.pathagar.com

অফিসার তদারকী করার প্রস্তাব সম্বলিত একটি তালিকা মিয়ানমারের কাছে পাঠালেও সামরিক সরকার তাদের কর্মকর্তাদের কোন তালিকা দেয়নি এবং শরণার্থীদের গ্রহণ করার জন্য যে পাঁচটি অভ্যার্থনা ক্যাম্প মিয়ানমারে স্থাপন করার কথা সে সম্পর্কেও কিছু জানায়নি।[২০৪] এদিকে রোহিঙ্গাদের মৌলিক রাজনৈতিক সমস্যার প্রশ্নে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হবার কারণে শরণার্থীরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে উৎসাহী হয়নি বরং এর বিরোধিতা করে কক্সবাজার ও টেকনাফ এর শরণার্থীরা প্রস্তাবিত প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া চালুর পূর্বে তাদের মৌলিক দাবি দাওয়ার ব্যাপারে মিয়ানমার সরকারের গ্যারান্টি চেয়ে প্রত্যাবাসনের বিরুদ্ধে মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করে। তাদের শর্ত ও দাবি-দাওয়াগুলো নিম্নরূপ-[২০৫]

১. রোহিঙ্গাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে
২. রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকাকে একটি সংখ্যাগরিষ্ট প্রদেশ ঘোষণা করতে হবে
৩. রোহিঙ্গাদেরকে একটি জাতি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে
৪. প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং এ প্রশ্নে শরণার্থীরা নিশ্চিত হলে প্রত্যাবাসন শুরু হবে
৫. মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে
৬. স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তাদের জীবন সম্পত্তি ও মর্যাদার নিশ্চয়তা বিধান এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে
৭. বিগত নির্বাচনে বিজয়ী অং সান সুচির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে
৮. অং সান সুচি তাদিগকে আমন্ত্রণ জানালে তারা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করবে
৯. রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় যে সকল অনাবাসী বসতি স্থাপন করেছে তাদিগকে বিতাড়িত করতে হবে এবং সরকারি ও অন্যান্য অফিস সরিয়ে নিতে হবে
১০. সরকারি চাকরিতে রোহিঙ্গাদের জন্য কোটা নির্ধারণ করতে হবে

বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদের দাবিসমূহের মধ্যে মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘে তদারকির ব্যবস্থাকরণ, মিয়ানমার সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধকরণসহ তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া জোরদার করার ক্ষেত্রে আন্তরিক থাকলেও মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের অনীহার কারণে পুরোপুরি সফল হতে পারেন নি। এমন কি প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারকে (UNHCR) সংযুক্তির প্রস্তাব করলেও মিয়ানমার সরকারের নিকট হতে এ ব্যাপারে তিনি কোন ম্যান্ডেট পাননি বলে মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এতে সম্মত হননি। কিন্তু বাংলাদেশের চাপের মুখে তিনি বলেন, প্রয়োজন হলে তাদেরকে পরে সংযুক্ত করা যাবে।[২০৬]

www.pathagar.com

বাংলাদেশ-মিয়ানমার ১৯৯২ সালের ২৮ এপ্রিল চুক্তি স্বাক্ষরের পর ৭ মে'৯২ পুনরায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবাসন, পুনর্বাসন এবং নতুনভাবে শরণার্থী আগমন বন্ধকরার প্রক্রিয়ায় সংকট নিরসন ও কৌশলগত চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও বাংলাদেশমুখী শরণার্থীদের প্রবাহ অব্যাহত থাকে।[২০৭] রোহিঙ্গারা যাতে আর মিয়ানমারে ফিরে না যায় এ জন্য মগ শান্তি কমিটি ও সেনাবাহিনী কর্তৃক রোহিঙ্গাদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, নারী ধর্ষণসহ বিভিন্ন নির্যাতনের পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও আরাকানে প্রত্যাবাসিত মগদের মাসোয়ারাভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে বাধ্য করা হয়। চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ রেখে ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রেখে রোহিঙ্গাদেরকে নিজ গৃহে জেলখানার কয়েদী বানিয়েছে। বুচিদংয়ের লাদাত পাজাচং, লামবাবিল, এলেরাংয়া, ম্রাকনায়া, পালাতাঙ্গা, তো-চি-এ্যাতকেট, মংডুর শিলখানি, ওয়ালিদাং, তাঞ্জুরু, আমতোলা, বোওলা তাইখং, ফাহেরসেদা, বাসারা, তামাস্থাপাড়া, পাদুসাবা প্রভৃতি গ্রামের রোহিঙ্গাদের ইতোপূর্বেই উচ্ছেদ করে পাহাড়ি এলাকা থেকে মগ ও সাবেক সেনা সদস্যদেরকে সেখানে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া আকিয়াবের সাক্কীপাড়া গ্রামে ১২, মেবনে ৫, কাবাকপিয়ায় ৪, মংডুতে ৬, আকিয়াবে ৬ ও বুচিদংয়ে ৩টিসহ গোটা আরাকানে কমপক্ষে ৮০টি মসজিদ ভেঙ্গে সেনাছাউনী, গুদামঘর থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার করে।[২০৮] ফলে মিয়ানমার সরকার জাতিসংঘের মধ্যস্থতার ঘোর বিরোধী বক্তব্য রাখলেও শরণার্থীরা এটি ছাড়া স্বদেশে প্রত্যাবাসন অস্বীকার করে এবং তারা আরো উল্লেখ করে যে, মিয়ানমার সামরিক সরকার তাদেরকে স্বদেশে ফিরে নিয়ে মগ-রোহিঙ্গা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দিবে, তারই অংশ হিসেবে নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে এবং এ কারণে শরণার্থী আগমন বন্ধ হয়নি।[২০৯] দু'দেশের মধ্যকার চুক্তির পরও মাত্র দেড় মাসে সরকারি হিসেব মতে চল্লিশ হাজার ও বেসরকারি হিসেব মতে ষাট হাজার নতুন রোহিঙ্গা শরণার্থী আগমন করে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকায় জাতিসংঘসহ পাশ্চিমাবিশ্ব তাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে শরণার্থীদের নিরাপদ ও স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে দু'দেশের মধ্যেই UNHCR এর তদারকী প্রয়োজন বলে দাবি করে।[২১০] এ প্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালের ১ জুন জাতিসংঘের মহাসচিব বুট্রোসঘালি বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে ২৮ এপ্রিল'৯২ সম্পাদিত চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে প্রত্যাবাসন তদারকিতে জাতিসংঘের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে মায়নমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উ অহন গিয়াও এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এএসএম মোস্তাফিজুর রহমানকে আলাদাভাবে চিঠি ইস্যু করলেও দীর্ঘদিন যাবৎ মিয়ানমার তার কোন উত্তর দেয় নি।[২১১]

রোহিঙ্গাদের দাবি, আন্তর্জাতিক চাপ ও বাংলাদেশের আগ্রহের উপর ভিত্তি করে অবশেষে ১২ মে '৯৩ ঢাকায় শরণার্থী সংক্রান্ত জাতিসংঘ হাইকমিশনার ড. সাদাকো ওগাতা এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব রিয়াজ রহমান এর মধ্যে শরণার্থীদের নিরাপদ

www.pathagar.com

ও স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন নিশ্চিতকল্পে পরস্পরকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে এক সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। ১৯৯৩ সালের মে মাসে মাইকেল প্রিস্টলির নেতৃত্বে UNHCR এর একটি মিশনসহ জুলাই'৯৩ জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাই কমিশনার ড. সাদাকো ওগাতার মিয়ানমার সফরের পর ইয়াঙ্গুন সরকার সে দেশে UNHCR এর উপস্থিতির ব্যাপারে সম্মতি জানিয়ে অবশেষে ৫ নভেম্বর '৯৩ UNHCR ও মিয়ানমার দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। বাংলাদেশে অবস্থানরত বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীর দ্রুত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত কল্পে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সরকারের সর্বাত্মক সহায়তায় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া পুরোপুরিভাবে UNHCR তদারকি করবে এটাই চুক্তির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনে যে সব শর্ত থাকে রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে তা রাখা হয়নি। কম্বোডিয়া, ফিলিস্তিন ও আফগানসহ নানা দেশে মর্যাদা নিয়ে শরণার্থীরা দেশে ফিরলেও রোহিঙ্গাদের ভীতি ও শংকা নিয়ে স্বদেশ ফিরতে হয়।[২১২] ফলে জাতিসংঘের অনুপস্থিতি রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যার্বতনে অনীহা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এমন কি তাদেরকে জোরপূর্বক স্বদেশে প্রেরণ করা হতে পারে এ ভয়ে প্রায় দশ হাজারের বেশি শরণার্থী ক্যাম্প থেকে পলায়ন করে।[২১৩] UNHCR এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন এত মন্থর ছিল যে, ২৮ মে'৯২ বাংলাদেশ মিয়ানমার দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির তিন সপ্তাহ পর হতে প্রতি ব্যাচে কমপক্ষে ৫ হাজার করে ছয় মাসের মধ্যেই আড়াই লক্ষ শরণার্থীর সকলেই স্বদেশে ফেরার কথা থাকলেও ১৫ নভেম্বর '৯৩ পর্যন্ত ১০৪ ব্যাচে মোট ৪৭ হাজার ৫'শ ৭৫ জন রোহিঙ্গা স্বেচ্ছায় স্বদেশে ফিরে গেছে।[২১৪] দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া তরান্বিত করতে বাংলাদেশের কর্মকর্তারা এ সময়ের মধ্যেই মিয়ানমার কর্মকর্তাদের সাথে ৫০টিরও বেশি বৈঠকে মিলিত হয়েছে।

উদ্বাস্তু জরিপে কিছুটা সমস্যা থাকলেও মূলত শরণার্থী প্রত্যাবাসনে বর্মী সরকারের অনীহা, প্রত্যাবসন প্রস্তুতির অভাব, সময়মত ছাড়পত্র না দেয়া এবং বর্মী নির্যাতনের ভয়াল আতংকই প্রত্যাবাসন কর্মসূচিকে মন্থর করে।[২১৫] এমন কি ৬ মাসের স্থলে ৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও ২০০০ সালের ২২ মার্চ পর্যন্ত দু'টি আশ্রয় শিবিরে ১৯,৮৫৯ জন শরণার্থী অবস্থান করছে। এর মধ্যে ১৪ হাজার শরণার্থীকে মিয়ানমার সরকার গ্রহণ করা তো দূরের কথা বরং আরাকানের অধিবাসী হিসেবেই স্বীকৃতি প্রদান করছে না।[২১৬]

২০১৬-১৭ সালে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর মিয়ানমারের রাজধানী নেইপিডোতে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সইয়ের মাধ্যমে রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ রূপরেখা বাস্তবায়নের জন্য ১৯ ডিসেম্বর ঢাকায় যৌথ কার্যকরী গ্রুপ (জেডব্লিউজি) গঠন করা হয়েছে। আর মাঠপর্যায়ে সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে ১৬ জানুয়ারি নেইপিডোতে ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট সই করা হয়েছে। বার্মা-বাংলাদেশ প্রত্যাবাসন এ পরিকল্পনা রোহিঙ্গাদের বিপন্ন করবে বলে মনে করছে যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের

www.pathagar.com

মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর পর তারা নির্যাতন, নিরাপত্তাহীনতা, খাদ্যাভাবে পড়তে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করেছে তারা। বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে দ্বিপক্ষীয় এই চুক্তিও স্থগিত করা উচিত বলে মনে করছে সংস্থাটি। যদিও বাংলাদেশের শরণার্থী প্রত্যাবাসন বিষয়ক কমিশনার আবুল কালাম আজাদ বিবিসিকে বলেছেন, যারা প্রত্যাবাসিত হবেন তারা সেখানে গিয়ে কি অবস্থায় থাকবেন। প্রত্যাবাসনের পর তারা কেমন থাকবেন, তাদের নিরাপত্তা কতদূর থাকবে সেটাও আমাদের দেখতে হবে। জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ এ কাজটা করবে। মিয়ানমারের দিক থেকেও তাদের প্রস্তুতির বিষয় আছে। উভয় দিক থেকে প্রস্তুতির বিষয়। তারা কিছু কাজ করেছে বলে জানিয়েছে। সেগুলোও দেখতে হবে আমাদের। কিন্তু হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর অন্যতম শীর্ষ কর্মকর্তা ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, ২০১২ সালে জাতিগত নিধনের শিকার হয়ে ঘরছাড়া ১ লক্ষ ২০ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা রাখাইন প্রদেশে তাদের অস্থায়ী ক্যাম্পে রয়েছে। ঘরছাড়া এসব মানুষদের জন্য মিয়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ কিংবা টেকসই প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে অতীতের রেকর্ড খুবই খারাপ। এ সব লক্ষণই বলছে বার্মিজ ক্যাম্পের যে সব পরিকল্পনা করা হয়েছে- সেগুলো হবে রোহিঙ্গাদের জন্য খোলা আকাশের নিচে কারাগার। তিনি আরও বলেন, ১ লক্ষ ২০ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা যে অস্থায়ী ক্যাম্পগুলোতে ৫ বছর ধরে দিনাতিপাত করছে, তার চেয়ে নতুন ক্যাম্পগুলো খুব একটা দারুণ কিছু হবে তেমনটি বিশ্বাস করার মতো কারণ খুব কমই আছে।[২১৭]

রাখাইনে সেনাবাহিনীর অত্যাচার, নিপীড়ন থেকে বাঁচতে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে লাখ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম। এখন তারা শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় পেয়ে সেই দুর্বিষহ স্মৃতি ভুলে গিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। তারা বলছেন, দু'দিন আগেও মগ সেনাদের নির্যাতন সইতে না পেরে রোহিঙ্গা মুসলিমরা এখানে পালিয়ে এসেছেন। ওখানে তারা বন্দুক তাক করে রেখেছে আমাদের মারার জন্যে। আমরা আর কত মার খাবো। আমাদের নিরাপত্তা দিন আমরা ফিরে যাবো। ২০১৮ সালের ২০ জানুয়ারি জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক বিশেষ দূত ইয়াং হিলির নেতৃত্বে বিশেষ প্রতিনিধিদল টেকনাফের বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্প এবং ২১ জানুয়ারি উখিয়ার কুতুপালং হিন্দু রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন করেছে। এরপর বালুখালী আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) গোল ঘরে অপেক্ষমাণ রোহিঙ্গাদের সাথে একান্তে কথা বলেন। আশ্বস্ত করেন সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই তাদেরকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হবে। এ সময় রোহিঙ্গারা ব্যানার নিয়ে স্বদেশে ফেরত যেতে বিভিন্ন দাবি পেশ করেন। রফিক উল্লাহ নামের এক রোহিঙ্গা বলেন, মিয়ানমারে নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। মিয়ানমার কারাগারে থাকা রোহিঙ্গাদের মুক্তি দিতে হবে। নিজেদের বাপ-দাদার বসতবাড়ি ফিরিয়ে দিতে হবে। চাকরি ও ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে নাগরিক সব সুযোগ-সুবিধা এবং স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম পালনের

www.pathagar.com

সুযোগ দিতে হবে। আমাদের ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে জাতিসংঘকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। থাইংখালী তাজনিমারখোলা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আশ্রিত হাইচ্ছুরতা মংডু এলাকার সাবেক চেয়ারম্যান ছৈয়দ উল্লাহ (৭৮) বলেন, মিয়ানমার সেনাবাহিনী আমাদের মা-বোনদের জুলুম করে মেরে ফেলেছে। তাদের অত্যাচারের কারণে আমরা ফিরে যাবো না। যতক্ষণ আমাদের ওপর নির্যাতন বন্ধ হবে না ততক্ষণ আমরা ফিরে যেতে চাই না। আমাদের মৌলিক অধিকার ফিরে পেলে অবশ্যই আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাবো। মংডু দক্ষিণের ঘরাখালী গ্রামের সায়েত উল্লাহ (৩২) বলেন, সব কিছু হারিয়ে এখানে আশ্রয় পেয়েছি। আবার ফিরে গিয়ে জীবনটাই যেন হারাতে না হয় সে দিকে আপনারা খেয়াল রাখলে আমাদের স্বদেশে ফিরতে আপত্তি নেই। শুধু জীবনের নিরাপত্তা চাই। জাতিসংঘের বিশেষ দূত তাদের কথা শুনে বলেছেন, রোহিঙ্গা মুসলমানরা যেভাবে বাস্তুচ্যুত হচ্ছে তাতে স্পষ্ট যে, মিয়ানমারের নিরাপত্তাবাহিনী তাদের নাগরিকদের রক্ষা করছে না। গণহত্যার শিকার রোহিঙ্গাদের প্রকৃত চিত্র জাতিসংঘে তুলে ধরা হবে। বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা মুসলমানদের নিজ ভূমি রাখাইনে ফিরিয়ে নিতে জাতিসংঘের মাধ্যমে মিয়ানমারের প্রতি জোরালো চাপ সৃষ্টির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।[২১৮] এতে রোহিঙ্গারা আশার আলো দেখছেন।

সহিংস জাতিগত নিধন অভিযানের শিকার রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছা, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন যুক্তরাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন সিনেটর জেফ মের্কলেই। তিনি বলেছেন, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধগুলো ভয়ঙ্কর। এটি আগামী প্রজন্মের বিষয়ে আমাদের চিন্তিত করে তোলে। বাংলাদেশে শরণার্থী শিবিরগুলোতে আমি রোহিঙ্গাদের সাথে কথা বলেছি। তাদের কাছে ধর্ষণ ও হত্যার কথা বর্ণনা শুনেছি। আমি অগ্নিদগ্ধ নারীদের সাথেও কথা বলেছি। ঘরে আগুন দেয়ার পর তারা সেখান থেকে পালিয়ে এসেছেন। সেখানে আমি শিশুদের আঁকা ছবি দেখেছি যাতে তারা নির্দোষ গ্রামবাসীকে সেনাবাহিনী গুলি করছে বলে দেখিয়েছে। এমন সহিংস জাতিগত নিধন অভিযানের পর আমাদেরকে অবশ্যই রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছা, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে হবে।[২১৯] সিনেটর জন ম্যাককেইন বলেন, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে, যা বিস্ময়কর। ২০১৭ সালের আগস্ট মাস থেকে সাড়ে ছয় লাখের বেশি নারী, পুরুষ ও শিশুকে অকথ্য নির্যাতনের মাধ্যমে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। জাতিসংঘ এটিকে 'জাতিগত নিধনের পাঠ্যপুস্তকীয় উদাহরণ' হিসেব বর্ণনা করেছে। এখন বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সরকার প্রত্যাবাসন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অনেক রোহিঙ্গা মনে করেন ফিরে গেলে তাদের আরো বেশি সহিংসতার শিকার হতে হবে। বিতাড়িত পরিবারগুলোর ফিরে যাওয়া নিরাপদ, স্বতঃস্ফূর্ত ও মর্যাদাপূর্ণ হবে- এমন নিশ্চয়তা থাকতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এ দাবিতে ছাড় দেয়া উচিত হবে না।[২২০]

www.pathagar.com

সিনেটর টড ইউয়াঙ্গ বলেন, রোহিঙ্গাসহ অন্যান্য জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ভয়াবহ সহিংসতার কারণে লাখ লাখ মানুষ বিতাড়িত হয়েছে। শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন স্বেচ্ছা, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে আমিও সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করতে চাই। সিনেটর টিম কাইন বলেন, রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অব্যাহত নির্যাতন ও ভয়ঙ্কর জাতিগত নিধন অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। অত্যাচারীদের বিচারের মুখোমুখি না করা পর্যন্ত আমরা দাবি ত্যাগ করবো না। সিনেটর ও ডেমোক্র্যাট দলের নেতা অ্যাডওয়ার্ড জে মার্কেই বলেন, মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে বিলম্ব করে বাংলাদেশ সঠিক কাজ করেছে। জোরপূর্বক প্রত্যাবাসন কখনই সঠিক পদক্ষেপ ছিল না। নিজেদের পুড়িয়ে দেয়া গ্রামে ফিরে যাওয়ার আগে রোহিঙ্গাদের অবশ্যই নিরাপদ বোধ করতে হবে।[২২১] এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন স্থগিত করাকে স্বাগত জানিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র হিথার ন্যুয়ার্ট বলেছেন, আমরা নিশ্চিতভাবে একে ভালো ধারণা বলে মনে করছি। রোহিঙ্গাদের দেশে ফেরা শুধু নিরাপদ হলেই চলবে না, এটা স্বেচ্ছা ও মর্যাদাপূর্ণ হতে হবে। নিরাপদ বোধ না করলে রোহিঙ্গাদের জোর করে ফেরত পাঠানো যাবে না।[২২২]

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় মিয়ানমারের আন্তরিকতা আগে যেমন প্রশ্নবিদ্ধ ছিল বর্তমানে তা অনেকটা প্রকাশই হয়ে পড়েছে। বিষয়টিকে খানিকটা 'ওপেন সিক্রেট বলে মন্তব্য করেন বিশেষজ্ঞ মহল। দৈনিক ভোরের কাগজের কার্টুনিস্ট শিশির ভট্টাচার্য একটি কার্টুনচিত্রের মাধ্যমে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকে সুন্দরভাবে ফুটে তুলেছেন।[২২৩]

কার্টুন চিত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, চিত্রের অগ্রভাগে সেনাবাহিনীর পোষাকে সজ্জিত বাম হাতে আলপিন আকৃতির একটি লৌহ, ডান হাতে একটি রশি - যা ঢিলা করে রাখা হয়েছে, মাথায় বার্মা লেখা সম্বলিত ক্যাপ (টুপি) পরিহিত একজন ব্যক্তি; কার্টুনিষ্টের দৃষ্টিতে সে হচ্ছে মিয়ানমারের সামরিকজান্তা। তার পিছনেই রয়েছে প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নিত একটি স্তম্ভ এবং মধ্যভাগে রয়েছে 'রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা' লেখা সম্বলিত

www.pathagar.com

একটি বড় ধরনের পোটলা বা পাথর; যা রশি দ্বারা বাধাইকৃত। শেষে পিঠে (পরিহিত বস্ত্রের) 'বাংলাদেশ' লেখা সম্বলিত একজন ব্যক্তি; যা দ্বারা বাংলাদেশকে বুঝানো হয়েছে। কার্টুনটি রোহিঙ্গা সমস্যায় বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয়ে একটি বিশেষ উপাদান।

এ সংক্ষিপ্ত স্কেচ চিত্রে বুঝানো হয়েছে যে, সামরিক জান্তা তার হাতের আলপিন আকৃতির লৌহ দ্বারা রোহিঙ্গাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে; যার প্রেক্ষিতে জীবন বাঁচানোর জন্য তারা শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে চলে আসে। কিন্তু দরিদ্র জনবহুল বাংলাদেশের জন্য এটা একটি বড় ধরনের বোঝা হয়ে পড়লে বিভিন্ন প্রক্রিয়া তা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক বিশ্বের সহায়তায় দু'দেশের মধ্যে সম্পাদিত যৌথঘোষণার মাধ্যমে সামরিক জান্তাকে তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে রাজি করাতে সক্ষম হয়; কিন্তু এটা ছিল মিয়ানমারের লোক দেখানো স্বীকৃতি মাত্র। তারা বিশ্ববাসীর সামনে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেও আন্তরিকভাবে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করেনি; শরণার্থী টেনে নেবার জন্য বাধাইকৃত রশিটি না টেনে ঢিলা দিয়ে রাখাই তার প্রমাণ। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ প্রাণপণ চেষ্টা করেও যাতে সফল না হয় এজন্য সামরিক জান্তা রাস্তার মধ্যখানে একটি স্তম্ভ স্থাপন করেছে। মূলত এ স্তম্ভটি হল রোহিঙ্গা প্রত্যাবসনের অন্তরায় হিসেবে সামরিক জান্তা কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহ, যথা-চুক্তি সম্পাদনের পরও আরাকানে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন অব্যাহত রাখা, প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের তত্ত্বাবধান মেনে না নেয়া, প্রত্যাবাসিত নাগরিকদেরকে পূর্ণ নাগরিক সুবিধা না দেয়া প্রভৃতি। ফলে শরণার্থী প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশ তার সকল প্রচেষ্টা আন্তরিকভাবে অব্যাহত রাখলেও অদ্যাবধি পুরোপুরিভাবে সফল হতে পারে নি।

সরকারি পকিল্পপনার ভিত্তিতেই মগসেনা ও স্থানীয় মগ জনগোষ্ঠী প্রকাশ্যভাবে রোহিঙ্গাদের উপর গণহত্যা, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, মুক্তিপণ ও চাঁদা আদায়, ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান, ইতিহাস ঐতিহ্যের ধ্বংসসাধন এবং নিজস্ব বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদপূর্বক রোহিঙ্গাদের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার হরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। আরাকানে মুসলিম জাতিসত্ত্বা বিনাশ করে এককভাবে মগ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য উচ্ছেদকৃত রোহিঙ্গাদের বসতবাড়ীতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মগদের এনে প্রত্যাবাসন করা হয়।[২২৪] জাতিসংঘের তথ্যমতেও রোহিঙ্গারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ভাগ্যাহত জনগোষ্ঠী। শত শত বছর ধরে তারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে। নির্যাতনের চিত্রগুলো বিশ্বমিডিয়ায় প্রকাশ পেয়েছে। নির্বিচারে হত্যা ও নারীদেরকে ধর্ষণের শিকার হতে হচ্ছে রোহিঙ্গাদের। সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নেয়াসহ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ দেয়া হয় না। তাদের সংখ্যা যাতে বাড়তে না পারে সে জন্য বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয় না। ধর্মীয় ইবাদত-বন্দেগী পালনেও বাধা দেয়া হয়। বৌদ্ধ

www.pathagar.com

রাখাইনদের টার্গেট হলো নিরস্ত্র রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নির্যাতনের মাধ্যমে নির্মূল করা। সেই লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও সেনাবাহিনী পরকল্পিতভাবে রোহিঙ্গাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতেই যত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে।[২২৫] স্বাধীকার আন্দোলনের নিমিত্তে কিছু কিছু সংগঠন কাজ করলেও মিয়ানমার সরকারের রোহিঙ্গানীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত সাংগঠনিক ও বৈপ্লবিক শক্তি কোনটিই রোহিঙ্গাদের নেই। এমতাবস্থায় মিয়ানমারের তিন লক্ষাধিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিয়মিত বাহিনী ও অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের সম্মুখে তাদের মুক্তিবাহিনী বা রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করা যেমন কঠিন, তার চেয়েও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যাওয়া কঠিনতর হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে অসহনীয় নির্যাতনের হাত থেকে জীবন বাঁচানোর তাগিদে নিজেদের বসতবাড়ী ছেড়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা ছাড়া কোন গত্যান্তর থাকে না। কফি আনানের নেতৃত্বাধীন প্রকাশিত প্রতিবেদনে রোহিঙ্গাদের অধিকার নিশ্চিত করতে বেশ কয়েকটি সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে– রোহিঙ্গাদের পূর্ণ নাগরিকত্বের ব্যবস্থা করা, তাদের অবাধ চলাচলের সুযোগ ও আইনের চোখে সমান অধিকার দেয়া, রোহিঙ্গাদের স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যার অভাবে স্থানীয় মুসলমানেরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে; এবং নিজ ভূমিতে ফিরে আসা রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের সহায়তা কাজে লাগানো। আনান কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে রোহিঙ্গা সংকটের অবসান ঘটবে। এ সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস কয়েকটি প্রস্তাবনা পেশ করেন।[২২৬] প্রস্তাবনাসমূহ হচ্ছে– ক, আনান কমিশনের সদস্যদের নিয়ে অবিলম্বে একটি 'বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করা; যার কাজ হবে কমিশনের সুপারিশগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান করা। খ, দেশটি থেকে শরণার্থীর প্রবাহ বন্ধ করতে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ। গ, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদেরকে নিয়মিতভাবে পীড়িত এলাকাগুলো পরিদর্শন করতে আমন্ত্রণ জানানো। ঘ, যে সব শরণার্থী ইতোমধ্যে দেশ ত্যাগ করেছে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা এবং ফিরে যাওয়া শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য জাতিসংঘের অর্থায়ন ও তত্ত্বাবধানে মিয়ানমারে ট্রানজিট ক্যাম্প স্থাপন। ঙ, বাস্তবায়ন কমিটির কর্তৃত্বে আনান কমিশনের প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদান এবং রোহিঙ্গাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অবাধে চলাফেরার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

অধ্যায় সমাপনী হিসেবে বলা যায়, রোহিঙ্গাদের শরণার্থী জীবন গ্রহণ করা একটি প্রচলিত রীতি হয়ে গেছে। ১৯৭৪, ১৯৭৮ এবং ১৯৯১-৯২ সালে শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণের পর আন্তর্জাতিক বিশ্বের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার তাদের পুনরায় স্বদেশে পাঠিয়ে দিলেও মিয়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে আরাকানে রোহিঙ্গা নির্যাতনের কোন অবসান হয়নি। তাই তারা আর শরণার্থী হিসেবে না এসে সুযোগ মত আত্মীয়তার সূত্র ধরে কিংবা শরণার্থী জীবনে বাংলাদেশের আগমনের সুবাদে সৃষ্ট

www.pathagar.com

পরিচয়ের ভিত্তিতে পরিবার পরিজন নিয়ে বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলছে। এমন কি ১৯৯১-৯২ সালে আগত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন কর্মকাণ্ড চলাকালীন সময়েই প্রত্যাবাসিত ও স্থানীয় রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে অনেকেই পুনরায় বাংলাদেশে এসে স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলেছে। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কক্সবাজার সূত্রে জানা যায়, শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থানরত ২১ হাজার শরণার্থী ছাড়াও প্রায় আট লক্ষ রোহিঙ্গা কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলার বিভিন্ন থানার লোকালয়, পাহাড়, সমতল এবং কক্সবাজার পৌর এলাকাসহ সমুদ্র সৈকতে অবৈধ বসতি গড়ে তুলেছে। রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের কারণে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি, আলীকদম থানা ও কক্সবাজার জেলার আইন-শৃংখলার পরিস্থিতি ব্যাপক অবনতি ঘটেছে এবং মৎস ও বনজ সম্পদ উজাড়ের মাধ্যমে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। সেই সাথে স্থানীয় শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে রোহিঙ্গাদের ব্যাপক অনুপ্রবেশের কারণে সরকারের নিবন্ধকৃত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনেও বিঘ্ন ঘটছে। কারণ, বেহিসেবী অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের অনুপ্রেরণায় প্রত্যাবাসনের জন্য অপেক্ষমান নিবন্ধকৃত শরণার্থীরা প্রত্যাবাসন তারিখের পূর্বেই ক্যাম্প থেকে পালিয়ে তাদের সাথে মিশে যায়।[২২৭] কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস আরো বেশি ভয়াবহ। ২০১২ সাল থেকে শুরু করে ২০১৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের যে প্রেক্ষাপটে এবং যে প্রক্রিয়ায় আগমন ঘটেছে তাতে তাদের মিয়ানমারে ফিরে যাওয়া ক্রমশ কঠিনতর হয়ে পড়ছে। তাই অতিসত্তর শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন, মিয়ানমারকে রোহিঙ্গা নির্যাতন থেকে বিরতকরণ ও আরাকান থেকে রোহিঙ্গা অনুপ্রেবেশ বন্ধকরণের জন্য আন্তর্জাতিক বিশ্বের সহযোগিতা আরো জোরদার করা দরকার এবং বাংলাদেশ সরকারকে এ বিষয়ে আরো বেশি তৎপর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠক থেকে উত্থাপিত চারটি দাবির কথা উল্লেখ করা যায়।[২২৮] প্রথমত, অবিলম্বে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা বন্ধ করা হোক। দ্বিতীয়ত, আরাকানের যে অঞ্চলে রোহিঙ্গাদের বসতি বেশি অর্থাৎ উত্তর আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য একটি 'সেইফ জোন' তৈরি করা। তৃতীয়ত, রোহিঙ্গাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণসহ পূর্ণাঙ্গভাবে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করে উচ্ছেদ হওয়া সকল রোহিঙ্গাকে আরাকানে ফিরিয়ে নেয়া। চতুর্থত, গণহত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে মানবতাবিরোধী অপরাধে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বিচার করা।

www.pathagar.com

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

---

১ *দৈনিক সংবাদ*, ১ মার্চ, ১৯৯১; *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮৪; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ মে, ১৯৯১।
২ *দৈনিক সংগ্রাম* ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।
৩ *দৈনিক সংগ্রাম* ২০ মে, ১৯৯২।
৪ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ মার্চ, ১৯৯২।
৫ *দৈনিক ইত্তেফাক* ১১ মার্চ, ১৯৯২।
৬ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ মার্চ, ১৯৯২।
৭ *আরাকান সংবাদ*, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৫ মার্চ, ২০০০, রোহিঙ্গা জাতীয় প্রতিষ্ঠান আরাকান।
৮ *যায় যায় দিন*, ২৯ আগস্ট, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯।
৯ *দৈনিক সমকাল*, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯।
১০ *দৈনিক আমার দেশ*, ২৫ অক্টোবর ২০০৯।
১১ *প্রথম আলো*, ২২ এপ্রিল ২০১০।
১২ *যায় যায় দিন*, ৩ ডিসেম্বর, ২০১১।
১৩ মুহাম্মদ খায়রুল বাশার, 'রোহিঙ্গাদের বাঁচাতে জাতিসঙ্ঘকে এগিয়ে আসতে হবে', *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১৮ জুন ২০১৫।
১৪ *দৈনিক মিল্লাত*, ৮ জুন, ১৯৯১।
১৫ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ মার্চ, ১৯৯২।
১৬ *দৈনিক মিল্লাত*, ৮ জুন, ১৯৯১।
১৭ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ মার্চ, ১৯৯২।
১৮ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৬ জুন, ১৯৯১।
১৯ *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৮ এপ্রিল, ২০০৯।
২০ *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৮ এপ্রিল, ২০০৯।
২১ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৯ এপ্রিল, ২০০৯।
২২ *প্রথম আলো*, ১৭ মে, ২০০৯।
২৩ *প্রথম আলো*, ৩০ জুন, ২০১০।
২৪ *দৈনিক আজাদ*, সম্পাদকীয়, ২৫ মে, ১৯৯১; *দৈনিক মিল্লাত*, ২০ এবং ২৫ মে, ১৯৯১।
২৫ সালেহ নোমান, "আরাকানের আর্তনাদ", *দৈনিক ইনকিলাব*, ৩০ মে, ২০০০।
২৬ *দৈনিক মিল্লাত*, ১২ জানুয়ারি, ১৯৯২; *New Straits Times*, 11 Nov., 1992.
২৭ *দৈনিক আজাদ*, সম্পাদকীয়, ২৫ মে, ১৯৯১।
২৮ *দৈনিক মিল্লাত*, ১২ জানুয়ারি, ১৯৯২; *New Straits Times*, 11 Nov., 1992.
২৯ *দৈনিক মিল্লাত*, ২০ জুলাই, ১৯৯২।
৩০ *দৈনিক বাংলা*, ৩০ জানুয়ারি, ১৯৯২; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ এপ্রিল, ১৯৯২ এবং *The New Nation*, 8 April, 1992.
৩১ http://parstoday.com/bn/news/bangladesh-i45048
৩২ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৯২; *দৈনিক বাংলার বাণী*, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৯২ এবং *দৈনিক দিনকাল*, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৯২।
৩৩ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২০ মে, ১৯৯২;
৩৪ *দৈনিক জনতা*, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯১ ও *দৈনিক সংগ্রাম*, ৯ এপ্রিল, ১৯৯২।
৩৫ *দৈনিক জনতা*, ২৮ জানুয়ারি, ১৯৯২।
৩৬ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।

www.pathagar.com

৩৭ 'আরাকানী শিশু ও অমনাবিকতা' পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত শিশুদের বিবরণসমূহ পত্র-পত্রিকার আলোকে ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ লিখিত প্রবন্ধ 'নাফের পানিতে ভাসছে মানবতা' *মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠ*, নভেম্বর ২০১৭ সংখ্যা এবং 'রোহিঙ্গা শিশুদের হাসতে দাও, স্বপ্নগুলো উড়ে যাচ্ছে ঘরপোড়া ধোঁয়ার সাথে' *মাসিক কিশোর পাতা*, নভেম্বর ২০১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধের তথ্যের আলোকে প্রণীত।

৩৮ *প্রথম আলো*, অনলাইন ভার্সন, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৩৯ *চ্যানেল আই অনলাইন*, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

৪০ *সাপ্তাহিক আজকাল*, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

৪১ হুমায়ুন কবির জুশান, *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৩ জানুয়ারি ২০১৮।

৪২ ইকরাম চৌধুরী টিপু, 'সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপ : বাংলাদেশে আসা সাড়ে ৩৬ হাজার রোহিঙ্গা শিশু এতিম' *এনটিভি*, অনলাইন, ১৪ নভেম্বর ২০১৭।

৪৩ *দৈনিক জনতা*, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১।

৪৪ *দৈনিক মিল্লাত* ১২ জানুয়ারি, ১৯৯২ ও *New Straits Times*, 11 Nov. 1992.

৪৫ *দৈনিক জনতা*, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১।

৪৬ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২০,২১ জানুয়ারি, ১৯৯২।

৪৭ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৯২।

৪৮ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৩০ মার্চ, ১৯৯২।

৪৯ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ মার্চ, ১৯৯২।

৫০ *দৈনিক মিল্লাত*, ২০ জুলাই, ১৯৯২।

৫১ *দৈনিক ইনকিলাব*, ২২ নভেম্বর, ২০১৬।

৫২ *দৈনিক ইনকিলাব*, ২২ নভেম্বর, ২০১৬।

৫৩ *চ্যানেল আই অনলাইন*, সম্পাদকীয়, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৫৪ এহসান রফিক 'মিয়ানমারে মুসলিম নিধনের শেষ কোথায়' *শীর্ষনিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম*, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৫৫ *দৈনিক আমাদের সময়*, অনলাইন ডেস্ক, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৫৬ *বাংলা ট্রিবিউন*, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

৫৭ *দৈনিক বাংলার বাণী*, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯১; *Dawn*, Pakistan, March 17, 1992.

৫৮ *দৈনিক বাংলা* ২৬ জানুয়ারি, ১৯৯২। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এসে সাংবাদিকের কাছে নিজের ইজ্জত হানির বর্ণনা দিতে গিয়ে গুলচেহের বেগম তার আঞ্চলিক ভাষায় বলেন : "আঁই ইতারার পা ধরি কইয়ি - তোঁয়ারা আঁর বাপর মতন, আঁই দয়া চাই, আঁর পেডত পোয়া-হেরপরও বর্মার পশুঅলে আঁর ইজ্জত লই গেইয়ে।"

৫৯ *দৈনিক বাংলা*, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯২।

৬০ *দৈনিক আজাদ*, ৫ জুলাই, ১৯৭৮।

৬১ *দৈনিক সংবাদ*, ১২ মে, ১৯৭৮।

৬২ *তদেব*।

৬৩ *দৈনিক বাংলা*, ৩০ জানুয়ারি, ১৯৯২।

৬৪ *দৈনিক মিল্লাত*, ২৮ জানুয়ারি, ১৯৯২ ও *দৈনিক রূপালী*, ঢাকা, ৩০ জানুয়ারি, ১৯৯২।

৬৫ *দৈনিক মিল্লাত*, ১২ জানুয়ারি, ১৯৯২; *New Straits Times*, 11 Nov., 1992.

৬৬ *দৈনিক বাংলা*, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯২। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের ২৭ জানুয়ারি সাংবাদিক কাজী রওনাক হোসেন ও তোফায়েল আহমদ ধেচুয়া পালং শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গা শরণার্থী গুলবানু ও

www.pathagar.com

তার দু'মেয়ের সাথে কথা বলে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। সংবাদের শুরুতেই গুলবানুর আঞ্চলিক ভাষায় সাহসিকতার কথাটি এভাবে বর্ণনা করা হয় - "আঁর চোগর সামনতদ্দি আঁর দুই মাইয়ারে ক্যাম্পত দরি নিব-জুলুম গরিবাল্লাই। হেতল্লাই দিলুম টাকফাল দি এক কোঁপ...।"

৬৭ এহসান রফিক 'মিয়ানমারে মুসলিম নিধনের শেষ কোথায়' *শীর্ষনিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম*, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৬৮ ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী 'মিয়ানমারে কি পিশাচের সরকার?' উপসম্পাদকীয় *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৬৯ ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী 'কক্সবাজার থেকে বালুখালী পানবাজার' উপসম্পাদকীয় *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৫ নভেম্বর ২০১৭।

৭০ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, 'মানুষ মানুষের জন্য, *বিডি নিউজ ২৪ ডট কম*, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

৭১ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ৩০ নভেম্বর, ২০১৭। উল্লেখ্য, রোহিঙ্গাদের ওপর যৌন নিপীড়নের ঘটনা তদন্তে সম্প্রতি কক্সবাজারের আশ্রয়শিবির পরিদর্শন করে জাতিসঙ্ঘের এক অনুসন্ধানী দল। সেখানে গিয়ে তারা ভয়াবহ যৌন নিপীড়নের ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেন। এ ছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমও তাদের সাম্প্রতিক খবরে রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের ধারাবাহিকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হওয়ার কথা তুলে আনে। জাতিসঙ্ঘের দুই কর্মকর্তা সেই সময় জানান, রোহিঙ্গাদের রাখাইন থেকে তাড়ানোর অস্ত্র হিসেবে সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ষণকে ব্যবহার করছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী।

৭২ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ৩০ নভেম্বর, ২০১৭।

৭৩ *দৈনিক মিল্লাত*, ২০ জুলাই, ১৯৯২।

৭৪ *দৈনিক মিল্লাত*, ১৪ মে, ১৯৯১।

৭৫ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৯ এপ্রিল, ১৯৯৭ ও *New Straits Times*, 9 April, 1992.

৭৬ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০।

৭৭ *দৈনিক বাংলা*, ১৮ জুন, ১৯৯১।

৭৮ *দৈনিক বাংলা*, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।

৭৯ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯১।

৮০ *দৈনিক বাংলা*, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯২।

৮১ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯১।

৮২ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯১; *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।

৮৩ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।

৮৪ *দৈনিক মিল্লাত*, ২০ মে, ১৯৯১।

৮৫ *দৈনিক মিল্লাত*, সম্পাদকীয়, ২৫ মে, ১৯৯১।

৮৬ *দৈনিক মিল্লাত*, ২২ আগস্ট ১৯৯১; *দৈনিক সংগ্রাম* ৯ এপ্রিল, ১৯৯২ ও *The Daily Star*, 31 March, 92.

৮৭ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৩ এপ্রিল, ১৯৯২।

৮৮ *তদেব*।

৮৯ তদেব।

৯০ *দৈনিক মিল্লাত*, ১৪ মার্চ, ১৯৯২।

৯১ *দৈনিক মিল্লাত*, ১৪ মার্চ, ১৯৯২।

৯২ *দৈনিক মিল্লাত*, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৯১।

৯৩ *কালের কণ্ঠ*, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

৯৪ *কালের কণ্ঠ*, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

www.pathagar.com

৯৫ *দৈনিক বাংলা*, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯২।

৯৬ *দৈনিক বাংলার বাণী*, ১৮ অক্টোবর, ১৯৯৩।

৯৭ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৭ জুলাই, ১৯৯৯।

৯৮ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৯ মে, ১৯৯৩ ও *দৈনিক জনতা*, ১১ নভেঃ, ১৯৯১।

৯৯ তদেব।

১০০ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১১ নভেম্বর, ১৯৯৫।

১০১ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, এবং *দৈনিক আজকের কাগজ*, ১১ মে, ১৯৯৭ ও *Consumer Economist of Bangladesh*, Chittagong, 26 July, 1992.

১০২ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ জুলাই, ১৯৭৮।

১০৩ *দৈনিক বাংলা*, ২৪, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৭ মার্চ, ১৯৯২; *দৈনিক সংগ্রাম*, ২২ মে, ১৯৯২; *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১১ মার্চ, ৮ মে, ১৯৯২; *দৈনিক দিনকাল*, ১ এপ্রিল, ১৯৯২; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ মার্চ, ৩ এপ্রিল, ১৯৯২; *দৈনিক জনতা*, ২০ মার্চ, ১৯৯২; *The New Nation*, 31 March, 1992; *Gulf News*, 10 March, 1992 and *New Straits Times*, 9 March, 1992.

১০৪ *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।

১০৫ *দৈনিক জনতা*, ২০ মার্চ, ১৯৯২ ও *The Daily Star*, 28 Oct., 1992.

১০৬ *দৈনিক ইনকিলাব*, ৮ মে, ১৯৯২।

১০৭ *দৈনিক বাংলাবাজার*, ১৬ মে, ২০০৯; *প্রথম আলো*, ১৭ মে, ২০০৯; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ মে, ২০০৯।

১০৮ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১০ জুন, ২০০৯।

১০৯ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ অক্টোবর, ২০০৯।

১১০ *দৈনিক সমকাল*, ১০ নভেম্বর, ২০০৯।

১১১ *প্রথম আলো*, ৩০ জুন, ২০১০।

১১২ *প্রথম আলো*, ২২ এপ্রিল, ২০১০।

১১৩ *যায় যায় দিন*, ২৫ ডিসেম্বর, ২০১০।

১১৪ *দৈনিক যুগান্তর*, ২৪ জানুয়ারি, ২০১১।

১১৫ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৪ মার্চ, ২০১১।

১১৬ মুহাম্মদ খায়রুল বাশার, 'রোহিঙ্গাদের বাঁচাতে জাতিসঙ্ঘকে এগিয়ে আসতে হবে', *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১৮ জুন ২০১৫।

১১৭ আশরাফ হায়দার চৌধুরী, 'মিয়ানমার : গণতন্ত্র ও রোহিঙ্গা গণহত্যা' *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ০৪ জুন ২০১৫।

১১৮ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ০৪ জুন ২০১৫।

১১৯ আশরাফ হায়দার চৌধুরী, 'মিয়ানমার : গণতন্ত্র ও রোহিঙ্গা গণহত্যা' *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ০৪ জুন ২০১৫।

১২০ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ০৪ জুন ২০১৫।

১২১ আহমেদ বায়েজীদ, 'মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা', *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ৩০ নভেম্বর ২০১৬।

১২২ http://www.somewhereinblog.net/blog/Humaira/29616654

১২৩ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১০ জুন ২০১২।

১২৪ *দৈনিক ইনকিলাব*, ১০ জুন ২০১২।

১২৫ *দৈনিক আমার দেশ*, ১৫ জুন, ২০১২।

১২৬ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১২ জুন ২০১২।

১২৭ 'বাংলাদেশ, মায়ানমারঃ রোহিঙ্গা নির্যাতন এখন আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে' *গ্লোবাল ভয়েস*, ২৯ জুলাই ২০১২।

www.pathagar.com

১২৮ *তদেব*।

১২৯ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৩ জুন, ২০১২।

১৩০ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১৪ জুন, ২০১২।

১৩১ *গ্লোবাল ভয়েস*, ২৯ জুলাই ২০১২।

১৩২ মাত্র কয়েকদিনে ১৬ শত বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: *দৈনিক আমার দেশ*, ১৫ জুন, ২০১২।

১৩৩ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩ জুন, ২০১২।

১৩৪ সাইয়েদ ইকরাম শাফী, 'রাখাইন মগদের তাণ্ডব ও রোহিঙ্গা সমস্যা' *যায় যায় দিন*, রোববার জুলাই ২০১২।

১৩৫ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩ জুন, ২০১২।

১৩৬ *দৈনিক আমার দেশ*, ১৫ জুন, ২০১২।

১৩৭ *দৈনিক সংবাদ*, ১৬ জুন, ২০১২।

১৩৮ *দৈনিক সমকাল*, ১৫ জুন, ২০১২।

১৩৯ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ জুন, ২০১২।

১৪০ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২১ জুলাই, ২০১২।

১৪১ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২১ জুলাই, ২০১২।

১৪২ *গ্লোবাল ভয়েস*, ২৯ জুলাই ২০১২।

১৪৩ *গ্লোবাল ভয়েস*, ২৯ জুলাই ২০১২।

১৪৪ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ মার্চ, ২০১৩; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ এপ্রিল, ২০১৩।

১৪৫ মাসুম বিল্লাহ, 'মিয়ানমারে মুসলিম গণহত্যা, *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ৩ এপ্রিল, ২০১৩; *দৈনিক সংগ্রাম*, ১০, ২২ এপ্রিল, ২০১৩।

১৪৬ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৮ আগস্ট, ২০১৩।

১৪৭ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ০১ নভেম্বর, ২০১৫।

১৪৮ মুহাম্মদ খায়রুল বাশার, 'রোহিঙ্গাদের বাঁচাতে জাতিসঙ্ঘকে এগিয়ে আসতে হবে', *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১৮ জুন ২০১৫।

১৪৯ আহমেদ বায়েজীদ, 'মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা', *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ৩০ নভেম্বর ২০১৬।

১৫০ কাজী শওকত হোসেন, 'মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা ও বিশ্বরাজনীতি', *দৈনিক যুগান্তর*, ১ অক্টোবর, ২০১৭।

১৫১ *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

১৫২ ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী 'মিয়ানমারে এই বর্বরতার শেষ কোথায়' উপসম্পাদকীয় *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৬ নভেম্বর ২০১৬।

১৫৩ *ককসবাজার নিউজ ডট কম*, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

১৫৪ *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১৯ জুলাই, ২০১৭।

১৫৫ *ভালুকা ডট কম*, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭। উল্লেখ্য ২০১৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্র ভবনের শিক্ষক লাউঞ্জে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্যোগে এ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মূল বিষয় উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট রোহিঙ্গাগবেষক রাবি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর সভাপতি প্রফেসর ড. আসাদুজ্জামান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় ছিলেন রাবি ভাষা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কামাল উদ্দীন। অনুষ্ঠানে

www.pathagar.com

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. আবদুর রহমান সিদ্দিকী। আলোচনায় আরো অংশ গ্রহণ করেন রাবি শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর ড. মু. আজহার আলী, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শিক্ষকগ্রুপের সাবেক আহ্বায়ক প্রফেসর ড. শামসুল আলম সরকার, সাংবাদিক নেতা ও কথাশিল্পী নাজিব ওয়াদুদ, প্রফেসর ড. মোস্তফা কামাল আকন্দ, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শিক্ষকগ্রুপের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. মু. এনামূল হক, প্রফেসর ড. মু. নিজাম উদ্দিন, প্রফেসর ড. গোলাম হোসেন, প্রফেসর ড. জে এ এম সকিলউর রহমান, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন, প্রফেসর ড. গোলাম কিবরিয়া ফেরদৌস, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম মণ্ডল, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আতাউল্যাহ প্রমূখ। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, http://www.valuka.com/News/NewsDetail/46977

১৫৬ *তদেব।*

১৫৭ http://www.somewhereinblog.net/blog/Humaira/29616654

১৫৮ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ৩০ নভেম্বর, ২০১৭। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ২৯ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তারা এ দাবি করেন। ঢাবির ভিসি অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে এবং রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (আরএমএমআরইউ) সমন্বয়ক অধ্যাপক ড. সি আর আবরারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ইংরেজি বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বিচারপতি ড. সৈয়দ রিফাত আহমেদ, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী, অধ্যাপক স্বপন আদনান, বাংলাদেশ বৌদ্ধকৃষ্টি প্রচার সঙ্ঘের সভাপতি সঙ্ঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথেরো, পার্লামেন্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্সের এমিরিটাস চেয়ার ড. মালিক মুজাহিদ বক্তব্য দেন। দিনব্যাপী এ সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, মালয়েশিয়া ও নেপালের শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং মানবাধিকার কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

১৫৯ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ৩০ নভেম্বর, ২০১৭।

১৬০ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ৩০ নভেম্বর, ২০১৭।

১৬১ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ৩০ নভেম্বর, ২০১৭।

১৬২ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ৩০ নভেম্বর, ২০১৭।

১৬৩ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ৩০ নভেম্বর, ২০১৭।

১৬৪ *প্রথম আলো*, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

১৬৫ আমিনুল ইসলাম শান্ত, "রোহিঙ্গা সঙ্কটের বহুমুখী প্রভাব" *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ০৯ জানুয়ারি ২০১৮।

১৬৬ *দৈনিক সকালের খবর*, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৫; *দৈনিক ইত্তেফাক* ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২; *দৈনিক বাংলা*, ২৯ মাচ ১৯৯২; *The Daily Star*, 8 June, 1992; *New Straits Times*, 13 May, 1992 and *The New Nation*, 8 April, 1992.

১৬৭ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২২ মার্চ, ২০০০।

১৬৮ *দৈনিক সকালের খবর*, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

১৬৯ *তদেব।*

১৭০ বিধায়ক, অনুবন্ধ-উপ সম্পাদকীয়, *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ নভেঃ, ১৯৯১।

১৭১ *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।

উল্লেখ্য, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ 'সেন্টার ফর হিউম্যান রাইট্স এন্ড থার্ড ওয়াল্ড এফেয়ার্স' আয়োজিত ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাব মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত "রোহিঙ্গা সমস্যা ও তার সমাধান" শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধকার দি নিউনেশন পত্রিকার সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দীন এর প্রবন্ধের

www.pathagar.com

অনুকরণে ইনকিলাবে প্রকাশিত। সেমিনারে সভাপতি করেন প্রবীন সাংবাদিক ওবায়দুল হক, প্রধান অতিথি, সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ড. রফিকুর রহমান, আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, অধ্যাপক এন এম হাবিব উল্লাহ ও ড. আবদুল লতিফ মাসুম। (*দৈনিক ইনকিলাব*, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।)

১৭২ বিধায়ক, অনুবন্ধ, *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ নভেম্বর, ১৯৯১।

১৭৩ সম্পাদকীয় *দৈনিক জনতা*, ২ নভেম্বর, ১৯৯১ ও *Holiday*, 28 Feb., 1992.

১৭৪ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ নভেম্বর, ১৯৯১।

১৭৫ সম্পাদকীয় *দৈনিক কিষান* ও *দৈনিক আজাদ*, ৩০ এপ্রিল, ১৯৮১ এবং *The Bangladesh Observer*, 30 July, 1992.

১৭৬ সম্পাদকীয়, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ নভেম্বর, ১৯৮৬, ২০ জুন, ১৯৯১; সম্পাদকীয়, *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৬ নভেম্বর, ১৯৯১।

১৭৭ *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধের আলোকে।

১৭৮ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৬ অক্টোবর, ১৯৯৩। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম কালচার ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত "আরাকানে মানবাধিকার লংঘন" শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রফেসর ড. আবদুল করিম এ কথা বলেন।

১৭৯ সম্পাদকীয়, *দৈনিক দিনকাল*, ১২ নভেম্বর, ১৯৯১; *Gulf News*, 27 Nov., 1991.

১৮০ সম্পাদকীয়, *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৬ নভেম্বর, ১৯৯১।

১৮১ সম্পাদকীয়, *দৈনিক কিষান*, ও *দৈনিক আজাদ*, ৩০ এপ্রিল, ১৯৮১; সম্পাদকীয়, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ জুন, ৩ নভেম্বর, ১৯৯১; সম্পাদকীয়, *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬, ২০ ও ২৬ নভেঃ, ১৯৯১; সম্পাদকীয়, *দৈনিক মিল্লাত*, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১; সম্পাদকীয়, *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৫ সেপ্টেম্, ১৯৯১, উপ সম্পাদকীয়, ২১ জানুয়ারি, ১৯৯০; সম্পাদকীয়, *দৈনিক জনতা*, ২ নভেঃ, ১৯৯১। ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতির মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত "রোহিঙ্গা সমস্যা ও আমাদের সার্বভৌমত্ব" শীর্ষক আলোচনা সভায় বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী, *দৈনিক ইনকিলাব*, ২১ মার্চ, ১৯৯২ এবং *দৈনিক মিল্লাত*, ৪ নভেম্বর, ১৯৯১ তে প্রকাশিত জাতীয় সংসদে কার্যপ্রণালী বিধির ৬৮ বিধি অনুসারে এনডিপি সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী "বার্মায় আরাকান রাজ্যের রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর বর্মী সেনাবাহিনীর অত্যাচার ও হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীর বাংলাদেশে প্রবেশ" শীর্ষক জনগুরুত্ব সম্পন্ন নোটিশের আলোচনা।

১৮২ *দৈনিক আজকের কাগজ*, ২৪ জানুয়ারি, ১৯৯২; *The Daily Star*, 18 April, 1992 and *The Daily Life*, 22 March, 16 April 1992.

১৮৩ *দৈনিক বাংলা*, ১৩ নভেঃ, ১৯৯১ ও *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৪ জানুয়ারি, ১৯৯২।

১৮৪ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ জুলাই, ১৯৭৮; *Far Eastern Economic Review*, 21 July, 4 Oct., 1978; *World Times*, 27 July, 1978 and *Asiaweek*, 28 July, 1978; 23 March, 1979.

১৮৫ *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক বাংলা*, *দৈনিক আজকের কাগজ* ও *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ নভেম্বর, ১৯৯১।

১৮৬ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩, নভেম্বর, ১৯৯১।

১৮৭ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৫ এপ্রিল, ১৯৯২।

১৮৮ *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২৬ এপ্রিল, ১৯৯২।

১৮৯ *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২৭ এপ্রিল, ১৯৯২।

১৯০ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ এপ্রিল, ১৯৯২ ও *The Daily Star*, 30 April, 1992.

১৯১ *তদেব*। উল্লেখ্য, মিয়ানমারের চৌদ্দ সদস্যের প্রতিনিধিদল ঐদিন অপরাহ্নে স্বদেশের পথে ঢাকা ত্যাগ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন

www.pathagar.com

চৌধুরী, ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খান, স্বরাষ্ট্র সচিব লুৎফুল্লাহিল মজিদ, পররাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত সচিব এএইচ মাহমুদ আলী ও ফারুক সোবহান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক) সফিউর রহমান, বাংলাদেশ রাইফেলস-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবদুল লতিফ প্রমুখ। মিয়ানমারের তথ্যমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মিয়ো থাই এবং ঢাকায় নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত উ সয়ে মিনও সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

১৯২ *তদেব*।

১৯৩ *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৪-২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯১; *দৈনিক রূপালী*, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯১; *দৈনিক দিনকাল*, ২৯-৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯১; *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৪ ও ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯১।

১৯৪ *দৈনিক জনতা*, ২৯ এপ্রিল, ১৯৯২।

১৯৫ *দৈনিক জনতা*, ৩০ এপ্রিল, ১৯৯২।

১৯৬ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৩০ এপ্রিল, ১৯৯২ ও *The New Nation*, 24 June, 1992.

১৯৭ *দৈনিক আজকের কাগজ*, ৩০ এপ্রিল, ১৯৯২।

১৯৮ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ এপ্রিল, ১৯৯২।

১৯৯ *দৈনিক আজকের কাগজ*, ৩০ এপ্রিল, ১৯৯২।

২০০ *দৈনিক জনতা*, ৬ মে, ১৯৯২।

২০১ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৭ মে, ১৯৯২ ও *New Straits Times*, 30 Sept., 1992.

২০২ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৭ মে, ১৯৯২।

২০৩ *New Straits Times*, 30 Sept., 1992.

২০৪ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ মে, ১৯৯২।

২০৫ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ মে, ১৯৯২; *New Straits Times*, 6 May, 1992; *The New Nation*, 30 July, 1992 and *The Weekly Dialogue*, Dhaka, 4 Sept., 1992.

২০৬ *তদেব*।

২০৭ *দৈনিক বাংলার বাণী*, ৩০ এপ্রিল, ১৯৯২।

২০৮ *দৈনিক আজকের কাগজ*, ২৫ মে, ১৫ জুন, ১৯৯২; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ মে, ৩,১০ জুন, ১৯৯২; *দৈনিক জনতা*, ১১ জুলাই, ১৯৯২।

২০৯ *দৈনিক আজকের কাগজ*, ১৫ মে, ১৯৯২; *দৈনিক সকালের খবর*, ১১ জুলাই, ১৯৯২; *দৈনিক জনতা*, ১১ জুলাই, ১৯৯২; *The Telegraph*, 12 May, 1992; *The Morning Sun*, May 8, 1992; *The Bangladesh Times*, September 25, 1992.

২১০ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ জুন, ১৯৯২।

২১১ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯, ১০ জুন, ১৯৯২, ১৩,১৫,১৬ মে, ১৯৯৩; *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২,৯ নভেম্বর, ১৯৯৩; *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ৯ নভেম্বর, ১৯৯৩; *দৈনিক আজকের কাগজ*, ২০ নভেম্বর, ১৯৯৩; *দৈনিক সকালের খবর*, ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৩।

২১২ *তদেব*।

২১৩ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ জুন, ১৯৯২।

২১৪ *দৈনিক আজকের কাগজ*, ২০ নভেম্বর, ১৯৯৩; *দৈনিক বাংলা*, ২৩ আগস্ট ১৯৯২; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ এপ্রিল, ১৯৯২ এবং *দৈনিক সকালের খবর*, ২৪ জুলাই, ১৯৯২ ও ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৩।

২১৫ *দৈনিক বাংলাবাজার*, ১০ মে, ১৯৯৪; *দৈনিক সকালের খবর*, ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৩; *দৈনিক আজকের কাগজ*, ২০ নভেম্বর, ১৯৯৩ ও ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪; *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ৯ নভেম্বর, ১৯৯৩; সংবাদ, ৫ জুলাই ১৯৯৩ ও ৯ মে, ১৯৯৪০; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩; *দৈনিক আজকের কাগজ*, ১৫ জুন, ১৯৯২।

www.pathagar.com

২১৬ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২২ মার্চ, ২০০০; *দৈনিক দিনকাল*, ২৪ এপ্রিল, ২০০০; *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১৮ জানুয়ারি, ২০০০।

২১৭ *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ২৪ জানুয়ারি ২০১৮; *দৈনিক আমাদের সময়*, ২৪ জানুয়ারি ২০১৮।

২১৮ হুমায়ুন কবির জুশান, *দৈনিক নয়াগিন্ত*, ২৩ জানুয়ারি ২০১৮।

২১৯ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৪ জানুয়ারি ২০১৮। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও রাজ্যের ডেমোক্র্যাট দলের সিনেটর জেফ মের্কলেইর নেতৃত্বে কংগ্রেসের একটি অনুসন্ধানী দল গত নভেম্বরে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সফর করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন- টড ইউয়াঙ্গ, টিম কাইন ও জন ম্যাককেইন। তারা চারজন মার্কিন সিনেটের সামনে রোহিঙ্গা ইস্যুতে নেয়া প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

২২০ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২৪ জানুয়ারি ২০১৮।

২২১ *তদেব*।

২২২ *তদেব*।

২২৩ *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১১ নভেম্বর, ১৯৯২।

২২৪ *দৈনিক ইনকিলাব*, উপসম্পাদকীয়, ১৯ অক্টোবর, ১৯৯০।

২২৫ এহসান বিন মুজাহির 'মজলুম রোহিঙ্গাদের বাঁচাতেই হবে' *দৈনিক সংগ্রাম*, ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬।

২২৬ ড. মুহাম্মদ ইউনুস, 'রোহিঙ্গা ট্রাজেডি: সংকটের অবনতি না অবসান,' *কাণ্ডারী*, আবু সাঈদ হান্নান সম্পাদিত, উদ্বোধনী ও রোহিঙ্গা সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৯।

২২৭ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৭ জুলাই, ১৯৯৯।

২২৮ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৭। উল্লেখ্য, উল্লেখ্য ২০১৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্র ভবনের শিক্ষক লাউঞ্জে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্যোগে এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেখান থেকে এ প্রস্তাবনা উত্থাপিত হয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- *ভালুকা ডট কম*, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়
রোহিঙ্গা বিষয়ে সচেতন জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি

মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের সাথে বাংলাদেশের প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক সুদৃঢ় থাকার কারণে রোহিঙ্গা সমস্যার সাথে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠী ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত। তাই দেশের সচেতন জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে রোহিঙ্গা সমস্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি নিরূপণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আরাকান ও রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস, রোহিঙ্গা সমস্যার প্রকৃতি, এ সমস্যায় বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও পত্র পত্রিকায় প্রতিফলনসহ প্রভৃতি বিষয়ের উপর বাংলা, ইংরেজি ও উর্দূ ভাষায় প্রণীত বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকাসহ সরকারি দলীল দস্তাবেজ উপাত্ত হিসেবে পাওয়া গেলেও সচেতন জনগোষ্ঠীর মতামত যাচাই করতে এ ধরনের কোন উপাত্ত নেই। ফলে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি জানার নিমিত্তে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার (Questionnaire) মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির সচেতন ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ ও ২০১৬-১৭ সালের রোহিঙ্গা গণহত্যা বিষয়ে নতুন তথ্যের প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে সংযোজন হিসেবে আরো কিছু সচেতন নাগরিকের ভাবনাকে যুক্ত করা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গ্রন্থকার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নমালা তৈরি করে[১] একই প্রশ্নমালার মাধ্যমে সারাদেশের সমগ্র সচেতন জনগোষ্ঠীকে যথাক্রমে শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিক-কলামিষ্ট, পেশাজীবি, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ও আশ্রায়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত NGO সমূহের বিভিন্ন শ্রেণির বাংলাদেশী কর্মকর্তা, ওলামা, আমলা ও রাজনীতিবিদ প্রভৃতি শ্রেণিতে ৮ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক বিভাগ থেকে ৫ জন করে মোট ৪০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।[২]

৬.১ সচেতন জনগোষ্ঠীর শ্রেণিবিন্যাস ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এ গ্রন্থ প্রণয়নের আংশিক পরিপূরক হিসেবে "সচেতন জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি" শীর্ষক অধ্যায়ের সংযোজন করায় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গিকেই উপাত্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে বলে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, সামাজিক মর্যাদা তথা তাঁদের পদ মর্যাদাসহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে। নিম্নে তাঁদের গোষ্ঠীভিত্তিক শ্রেণি বিন্যাসপূর্বক সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো–

ক) শিক্ষাবিদ

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড; আর মেরুদণ্ডের নির্মাতা হলেন শিক্ষক মহোদয়গণ। তাই তাঁদেরকে জাতি নির্মাতাও বলা হয়। সচেতন জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি সংগ্রহের জন্য শিক্ষক তথা শিক্ষাবিদদেরকে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে নির্ধারণ করে সারাদেশ থেকে ৫

www.pathagar.com

জন শিক্ষাবিদকে বেছে নিয়ে তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-সাবেক উপাচার্য, ডক্টর-প্রফেসর; যারা আরাকান ও রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে বেশকিছু লেখালেখি করেছেন।

খ) সাংবাদিক

বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার সুবাদে বর্তমান বিশ্বে সংবাদ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্টিং মিডিয়াসমূহ ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে সম্রাট নেপোলিয়নের মন্তব্য হচ্ছে "একলক্ষ সৈনিকের চেয়ে আমি তিনটি সংবাদপত্রকে বেশি ভয় করি।"[৩] ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, মরো, রোহিঙ্গা সমস্যাসহ বিশ্বের খবরা-খবর এ মিডিয়াগুলো থেকেই জানা যায়। আর খবরের মূল বাহক হলেন সাংবাদিকগণ; যাদেরকে জাতির বিবেক বলা হয়। বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংবাদিকগণকেও অন্যতম প্রধান জনগোষ্ঠী হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকসমূহের মধ্যে দৈনিক বাংলা ও দি নিউন্যাশন থেকে শুরু করে প্রথম আলো পর্যন্ত সকল জাতীয় পত্রিকার সম্পাদক, উপদেষ্টা সম্পাদক, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, সাবেক সম্পাদকসহ জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও বিবিসি- বাসস এর সংবাদ দাতাদের মধ্যে থেকে যারা রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রচুর পরিমানে সংবাদ (News), ফিচার, সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় লিখেছেন তাঁদেরকে এ শ্রেণির সচেতন জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

গ) কবি-সাহিত্যিক-কলামিষ্ট

দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কবি-সাহিত্যিক-কলামিষ্ট ও গবেষকগণ অন্যতম। তাঁরা কোন বিষয়কে তৃনমূল পর্যায় পর্যন্ত অবগত হয়ে বিচার বিশ্লেষণপূর্বক জাতির সামনে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা সহকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। অতীতের শিক্ষা থেকে ভবিষ্যতের দূরদর্শি ভাবনার আলোকে বর্তমানের পরিকল্পনা প্রণয়নের চেষ্টা করে থাকেন। রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে দেশের শীর্ষস্থানীয় যে সকল কবি-সাহিত্যিক-কলামিষ্ট ও গবেষক সাহিত্য রচনা করেন, কলাম লেখেন এবং গবেষণা করেন তাঁদের মধ্যে থেকে ৫ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) পেশাজীবী

পেশাজীবীগণ সমাজের সচেতন জনগোষ্ঠীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি; যাদের কর্মের মাঝে সাধারণত সেবার দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, নাট্যকার, নাট্যশিল্পীসহ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও ব্যাংকারদের মধ্য থেকে এমন ৫ জন পেশাজীবীকে বাছাই করা হয়েছে যাদের মধ্যে ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রায়ন-প্রত্যাবাসনে সেবামূলক কাজে জড়িত ছিলেন। ব্যারিস্টার তথা আইনজীবী হিসেবে যাকে নেয়া হয়েছে তিনি রোহিঙ্গা শরণার্থী বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং একটি মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি

www.pathagar.com

হিসেবে বিশ্বের নির্যাতিত মানবাধিকার বঞ্চিত মানুষের পক্ষে কাজ করেন, যার অংশ হিসেবে তিনি রোহিঙ্গাদের নিয়ে একাধিকবার আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেছেন। অভিনয় জগতে যিনি অত্যন্ত প্রবীণ, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে লেখা লেখিও করেছেন; এমন একজনকে চিত্র-নাট্য জগৎ থেকে বাছাই করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ছাড়াও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কাজে যিনি সেবা প্রদানে নিয়োজিত থাকেন এমন একজন ব্যক্তিকেও পেশাজীবীর শ্রেণিভুক্ত করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

ঙ) NGO কর্মকর্তা

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রায়ন ও প্রত্যাবাসন কাজে Gono Shasthya Kendra, MSF (Halland), International Islamic Relief Organisation (IIRO), Mennonite Central Committee (MCC), World Concern, Rabita Al-Alam-Al-Islami সহ মোট ৩১টি NGO বিভিন্নমুখী সেবা প্রদান করেছে।[৪] এ সকল সংস্থার মধ্য থেকে ৫ টি অন্যতম প্রধান সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য থেকে ৫ জন বাংলাদেশী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। যেহেতু তাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ শরণার্থী শিবিরে অবস্থান করে রোহিঙ্গাদের কাছাকাছি থেকে তাদের ব্যাপারে অনেক তথ্য অবগত হবার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁরা UNHCR এর কার্যক্রম এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বিশ্বের মতামতের পাশাপাশি বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গিও জানতে সক্ষম হয়েছেন। এ জন্য বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

চ) ওলামা

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আলিম সমাজ সচেতন জনগোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বায়তুল মোকাররমসহ দেশের প্রধান প্রধান শহরের কেন্দ্রীয় মসজিদসমূহের খতীব ও ইমামগণ মুসলিম বিশ্বের অবস্থাকে অবগত হয়ে স্বদেশ ও বহির্বিশ্বের অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক খুতবা প্রদান করে থাকেন। সম্মানিত পীর মাশায়েখ, শীর্ষস্থানীয় মাদ্‌রাসাসমূহের অধ্যক্ষ ও মুবাল্লিগসহ কিছু কিছু আলিম বহির্বিশ্বের মুসলমানদের ব্যাপারে বেশ সজাগ এবং তাঁরা নবীদের (আ.) ওয়ারিশ হিসেবে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট, তাই দেশের শীর্ষস্থানীয় ৫ জন আলিমকে বাছাই করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

ছ) আমলা

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকতা, বিশেষ করে সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব, সহকারী সচিব এবং তাঁদের পদমর্যাদা সম্পন্ন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকতাগণকে সাধারণত আমলা বলা হয়। মূলত আমলারাই রাষ্ট্রে পরিচালনার মূল চালিকা শক্তি। সরকার দেশের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হলেও আমলারাই দেশ পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ের অবকাঠামো তৈরি এবং

www.pathagar.com

বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করে থাকেন। সুতরাং তাঁরা বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশের গুরুতপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়কে তত্তাবধান করেন বলে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাই রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে সচেতন জনগোষ্ঠীর মতামত সংগ্রহের জন্য তাঁদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যে সকল সচিব, উপসচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রোহিঙ্গা সমস্যাকে নিয়ে কাজ করেছেন তাঁদের মধ্য থেকে ৫ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

জ) রাজনীতিবিদ

বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী হবার সুবাদে রাষ্ট্র পরিচালনার চাবিকাঠি রাজনীতিবিদগণের হাতে। কারণ এক সময়ের বিরোধী দল অন্য সময়ের সরকার আর বর্তমান সময়ের সরকার অন্য দিনের বিরোধীদল। এ প্রেক্ষিতে রাজনীতিবিদগণকে বাদ দিয়ে সতেন জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি নিরূপন করা সম্ভব নয় হেতু দেশের প্রধান প্রধান পাঁচটি বিরোধীদল বিশেষত, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধীদল ও রোহিঙ্গা সমস্যাকালীন (১৯৭৮-৭৯; ১৯৯১-৯৫) সরকারি দল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি); দীর্ঘ সময়ের ক্ষমতাসীন দল জাতীয় পার্টি (এরশাদ) এবং রাজপথের দীর্ঘ আন্দোলনের অভিজ্ঞ সংগঠন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, মেহনতি মানুষের দল বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টি, ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) এর দলীয় প্রধান; কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের ৫ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

৬.২ প্রশ্নের বিষয়বস্তু ও ধরন

এ অধ্যায়ে সাক্ষাৎকারের নিমিত্তে উদ্ধৃত প্রশ্নাবলির মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, মিয়ানমার সরকারের নির্যাতন, তাদের বাংলাদেশে আগমনের কারণ, মানবাধিকার লংঘনসহ মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ অবস্থা, শরণার্থী আগমনে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পর্যালোচনা; সর্বোপরি রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে সচেতন জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি সংগ্রহ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এছাড়াও নির্দিষ্ট প্রশ্নের বাইরে রোহিঙ্গা সমস্যা সম্পর্কে অভিমতসহ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে তাঁদের উন্মুক্ত পরামর্শ গ্রহণের জন্যও দু'টি আলাদা ছক রাখা হয়েছে।

৬.৩ রোহিঙ্গারা আরাকানের কোন ধরনের নাগরিক?

আরাকানে মুসলিম বসতি সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু হলেও রোহিঙ্গা শব্দের প্রয়োগ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে; অর্থাৎ আরাকানরাজ নরমিখলা বা সোলায়মানশাহ কর্তৃক ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত নতুন রাজধানী 'ম্রোহং' এর অধিবাসীদেরকে রোহিঙ্গা বলা হয়। কোম্পানি ও বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশ এবং ভারত থেকে কাজের অন্বেষণে আগত মুসলমানরাও কালক্রমে রোহিঙ্গা নামে খ্যাত হয়েছে। সুতরাং রোহিঙ্গাদের কেউ

www.pathagar.com

হাজার বছর, কেউ পাঁচ শতাধিক বছর আর কেউবা কয়েকশত বছর ধরে সেখানে বসবাস করছে।

বৃটিশ শাসিত বার্মাকে মুক্ত করার আন্দোলনে রোহিঙ্গারা স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা অং সানকে সমর্থন করে বার্মাকে বৃটিশ শাসন মুক্ত করলেও তারা তাদের অধিকার ফিরে পায়নি। স্বাধীনতা উত্তর বার্মার শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন অজুহাতে তাদেরকে মিয়ানমার বা আরাকানের ভূমিপুত্র বা নাগরিক হিসেবে গ্রহণ না করে শুধুমাত্র আরাকানের বাসিন্দা হিসেবে আখ্যা দেয়।[৫]

রোহিঙ্গারা নিজস্বভাবে আরাকানের স্বাধিকার আন্দোলন শুরু করলে ১৯৫৪ সালের ২৫ সেপ্টেরম্বর রাত আটটায় প্রধানমন্ত্রী উ নু রেডিওর মাধ্যমে তাদেরকে স্বদেশী (Indigenous Ethnic Community) হিসেবে ঘোষণা করলেও তা ছিল তার রাজনৈতিক কৌশল মাত্র।[৬] ১৯৭৮-৭৯ সালে মিয়ানমার থেকে প্রায় তিন লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী সরকারি নির্যাতনের শিকার হয়ে বালাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করলে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের চাপ ও বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কুটনৈতিক তৎপরতা মিয়ানমারের সামরিক শাসক নে উইনকে বেকায়দায় ফেলেছিল। তাই তিনি রোহিঙ্গাদের নিঃশেষ করে দেবার জন্য কৌশল অবলম্বন করে ১৯৮২ সালে বিবর্তনমূলক বর্ণবাদী নাগরিকত্ব আইন ঘোষণা করে। এ আইনে নাগরিকদের Citizen, Associate এবং Naturalized শ্রেণিতে ভাগ করে ১৮২৩ সালের পরে আগত বলে Associate কিংবা ১৯৮২ সালে নতুনভাবে দরখাস্ত করে Naturalized Citizen ঘোষণা করার ব্যবস্থা করে। উক্ত আইনের ৪নং প্রভিশনে আরো শর্ত দেয়া হয়, কোন জাতিগোষ্ঠী রাষ্ট্রের নাগরিক কিনা তা নির্ধারণ করবে আইন-আদালত নয়; সরকারের নীতি নির্ধারণী সংস্থা Council of State. এ আইনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ভাসমান নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। রোহিঙ্গাদের কাছে কালো আইন হিসেবে বিবেচিত এ আইন তাদের সহায়-সম্পত্তি অর্জন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা সার্ভিসে যোগদান, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ কিংবা সভা সমিতির অধিকারসহ সার্বিক নাগরিক অধিকার কেড়ে নেয়।[৭] আন্তর্জাতিকবিশ্ব, বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাসহ প্রচার মাধ্যমগুলো তাদেরকে সেখানকার স্থায়ী নাগরিক হিসেবে সম্বোধন করে। তাদের নাগরিকত্ব বিষয়ে বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নমালায় সর্বপ্রথম এ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য "রোহিঙ্গারা আরাকানের কোন ধরনের নাগরিক বলে আপনি মনে করেন?" রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত এ প্রশ্নের ৪ টি উত্তর প্রশ্নমালায় উল্লেখ করা হয় যথা– ক) জন্ম সূত্রে খ) বৈবাহিক সূত্রে গ) অভিবাসী (Immigrant) ঘ) নাগরিক নয়। আমলা এবং শিক্ষাবিদগনের মধ্যকার ২ জন উত্তরদাতা এ প্রশ্নে নিরব থেকেছেন। ফলে উত্তরপর্বে 'মন্তব্য নেই' একটি কলাম সংযোজন করা হয়।

www.pathagar.com

লক্ষণীয় যে, উত্তর দাতাদের ৪০ জনের মধ্যে ৩৮ জনই রোহিঙ্গাদেরকে আরাকানের জন্মসূত্রে নাগরিক হিসেবে মতামত দেন; যা মোট সচেতন জনগোষ্ঠীর শতকরা ৯৫ ভাগ। রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন করায় অধিকাংশ উত্তর দাতাই আশ্চার্য হয়ে গবেষককে পাল্টা প্রশ্ন করেন, এতদিন পরে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন কেন? কোন লোক বৈধ পন্থায় কোন দেশে ৫ বছরের উর্দ্ধে অবস্থান করলেই তিনি সে দেশের নাগরিক অধিকার পেয়ে যায়। তাছাড়া বৈবাহিক সূত্রে কিংবা অভিবাসী (Immigrant) হিসেবেও অনেকে নাগরিকত্ব পেয়ে থাকে। আরাকানে রোহিঙ্গাদের ইতিহাস যেখানে হাজার বছরের চেয়েও পুরাতন আজ সেখানে তাদের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন উত্থাপন করা অত্যন্ত বেমানান এবং অবান্তর।

"কিন্তু মিয়ানমার সরকার এবং সেখানকার মগ অধিবাসীরা যে তাদেরকে 'কুল্লা' (বিদেশী) ও 'অভিবাসী' (বাংলাদেশ ও ভারত থেকে আগত) বলে পুরোপুরি নাগরিক অধিকার দেয় না"[৮] গবেষকের পক্ষ থেকে এ কথা বলা হলে উত্তরে তাঁরা বলেন, এটা মিয়ানমার সরকার ও স্থানীয় মগ অধিবাসীদের একগুয়েমী, স্বার্থান্ধ ও স্বৈরাচারী মনোভাবেরই বর্হিপ্রকাশ; যা মানবাধিকারের চরম লংঘন ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের কাছেও অত্যন্ত নিন্দনীয়। কেননা রোহিঙ্গাদের কেউ কেউ বাংলা বা চট্টগ্রাম থেকে এলেও তা ছিল প্রায় ৬শ বছর আগে আরাকান রাজা নরমিখলার সময় এবং কেউ কেউ এসেছে বৃটিশ রাজত্ব কায়েম হবার পর উনবিংশ শতাব্দীতে; তাও শতাধিক বছর পেরিয়ে গেছে। সুতরাং বর্তমানে রোহিঙ্গারা জন্মসূত্রে আরাকানের নাগরিক।

৬.৪ মিয়ানমারের সামরিক সরকার কর্তৃক বিভিন্ন অজুহাতে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ

রোহিঙ্গাদের উপর সরকারি নির্যাতনের ইতিহাস অনেক পুরাতন। ১৭৮৫ সালে বর্মীরাজ বোধপায়া কর্তৃক আরাকান দখলের সময় সামন্ত রাজাদের অনুপ্রেরণায় অধিকাংশ আরাকানী জনগণ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বর্মী বাহিনীকে স্বাগত জানালেও বর্মীরা স্বাধীনতাকামী আরাকানীদের[৯] উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায়। তারা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে আত্মসর্মপনের সুযোগ দিয়ে আত্মসর্মপনকৃত স্বাধীনতাকামীদের হত্যা করে।[১০] কিন্তু ১৯৩০ এর দশক পর্যন্ত স্থানীয় মগদের সাথে রোহিঙ্গাদের সম্পর্ক ছিল খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। ১৯৩৭ সালে বৃটিশ প্রশাসন কর্তৃক Home Rule জারি ও ১৯৪০ সালে মুসলমানগণ কর্তৃক গৌতম বুদ্ধের অবমাননার অভিযোগ এনে সরকারি মদদে স্থানীয় স্বার্থন্বেষী মগগোষ্ঠী মুসলিম নিধনে নেমে পড়ে এবং ১৯৪২ সালে ১ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমানকে হত্যা করে ও ৫ লাখ রোহিঙ্গাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে।[১১] সে সময় থেকে স্বাধীনতা উত্তর বার্মায় মগ-রোহিঙ্গা দাঙ্গা ব্যাপকভাবে শুরু হয় এবং সামরিক সরকার নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রোহিঙ্গা উচ্ছেদে ওঠে পড়ে লাগে। নির্যাতনের মাধ্যমে নিজস্ব বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে মিয়ানমার সরকার পরিকল্পিতভাবে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মগদের এনে পুনর্বাসিত করে। সরকারের প্রত্যাক্ষ মদদে

www.pathagar.com

মগসেনা, স্থানীয় ও পুনর্বাসিত মগগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদেরকে হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ এবং জবরদস্তি শ্রমে নিয়োজিতকরণে মেতে ওঠে।[১২] সরকারিভাবে দেশের অভ্যন্তরেই রোহিঙ্গাদের যাতায়াতের উপর কঠোরতা আরোপ করে; এমন কি এক থানা থেকে অন্য থানায় অনুমতি ছাড়া যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বিনা অভিযোগে গ্রেফতার, নির্যাতন, গুম, হত্যাকাণ্ড স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শুধুমাত্র রোহিঙ্গাদের উৎপাদিত কৃষি দ্রব্যাদির ওপর মাত্রাতিরিক্ত উচ্চাহারে করারোপ করা হয়। অতিরিক্ত কর দিতে না পারলে মজুতকৃত খাদ্য শস্য বাজেয়াপ্ত করে, নারী, পুরুষ, শিশু, নির্বিশেষে ধরে নিয়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক জবরদস্তিমূলক বিনামূল্যে শ্রম আদায়, সেনাবাহিনীকে পাল্টা রসদ যোগানো, রোহিঙ্গা মুসলিম যুবতীদের ধরে নিয়ে ধর্ষণ, ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামায় উসকিয়ে দেবার পাশাপাশি শত শত মসজিদ মাদ্রাসা বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করে দেবার মত ঘটনা ঘটে।[১৩] সেখানে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। টিভি, রেডিও এবং সংবাদ মাধ্যমে ইসলামি মূল্যবোধকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয় ও কুরআন-হাদিসের পৃষ্ঠা সিগারেটের ফিল্টার তৈরিতে ব্যবহার করে। তারা রোহিঙ্গাদের ইতিহাস, মুসলিম প্রত্নতত্ত্ব, মুসলিম সংস্কৃতি মনুমেন্ট এবং মুসলিম স্থাপত্যের উপর চরম ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে; এমন কি শতশত বছরের লালিত বাংলা ভাষা, ফার্সী ভাষার নাম নিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলা হয়েছে।[১৪] দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকাসহ আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম, আরাকান থেকে আগত রোহিঙ্গাদের সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন মহল থেকে মিয়ানমারের সামরিক সরকার কর্তৃক বিভিন্ন অজুহাতে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। কিন্তু মিয়ানমারে প্রশাসন এ নির্যাতনের খবরকে ভিত্তিহীন বলে প্রচার করে।[১৫] তাই এ বিষয়ে বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি সংগ্রহ করার নিমিত্তে প্রশ্নমালায় উল্লেখ করা হয়; মিয়ানমারের সামরিক সরকার বিভিন্ন অজুহাতে রোহিঙ্গাদের নির্যাতন করছে বলে পত্র-পত্রিকাসহ বিভিন্ন মহলে অভিযোগ উঠেছে; আপনি এই অভিযোগ কি দৃষ্টিতে দেখেন?

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরে ৪০ জন উত্তর দাতার মধ্যে ৩৯ জনই মিয়ানমারের সামরিক সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগকে সত্য বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন; যা সমগ্র সচেতন জনগোষ্ঠীর শতকরা ৯৭.৫ ভাগ। আর একজন মাত্র উত্তর দাতা (তিনি আমলা) একে আংশিক সত্য বলে আখ্যা দিয়ে বলেন, আরাকান থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীরা নির্যাতনের খবরকে সাংবাদিকদের নিকট অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করে; আর দেশী-বিদেশী প্রচার মাধ্যম তথা পত্র-পত্রিকাগুলো সে খবরকে কোন তদন্ত ও প্রমাণ ছাড়াই হুবহু পরিবেশন করে থাকে। মূলত মিয়ানমারের সামরিক সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের যে খবর প্রকাশিত হয় তাও আংশিক সত্য; পুরোটাই নয়। পক্ষান্তরে ৩৯ জন উত্তরদাতা নির্যাতনের অভিযোগকে সত্যায়ন করেন এবং তাঁদের অধিকাংশই বলেন, মিয়ানমারে সামরিক সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের যে খবর প্রচার হয় এটা খণ্ডচিত্র মাত্র; পুরো চিত্র নয়। মিয়ানমার সামরিক শাসন বা অবরুদ্ধ দেশ হবার কারণে সেখানে কোন সাংবাদিক মিশন বা প্রচার

www.pathagar.com

মিডিয়ার সদস্যগণ নির্বিঘ্নে মাঠ পর্যায়ে বিচরণ করে নির্যাতনের পুরো চিত্র সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়। নির্যাতনের যে খবর প্রকাশিত হচ্ছে, মূলত সেখানকার অবস্থা তার চেয়ে আরো ভয়াবহ।

৬.৫ আরাকান থেকে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আসার কারণ

বাংলাদেশ আরাকানের নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র হবার কারণে যে কোন সমস্যার সম্মুখিন হলেই আরাকানীরা এদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। আরাকানরাজ নরমিখলা বর্মীরাজ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ১৪০৬ সালে বাংলায় আশ্রয় নেন এবং দীর্ঘ ২৪ বছর বাংলায় অবস্থান করেন। অতঃপর সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহের ঐকান্তিক সহায়তায় তিনি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন।[১৬] ১৭৮৫ সালে বর্মীরাজ আরাকান দখল করলে কয়েক লক্ষ মুক্তিকামী আরাকানী জনগণ জীবনের নিরাপত্তার জন্য বাংলায় আশ্রয় নেয় এবং তাদের অনেকেই ক্ষমতাচ্যুত আরাকানরাজ ঘা থিন ডার পুত্র সিন পিয়ানের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে চট্টগ্রামের পাহাড়িয়া এলাকায় অবস্থান করে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ সংগ্রাম চালান।[১৭] কোম্পানি ও বৃটিশ শাসনামলে তাদের বৃহৎ অংশই স্বদেশে ফিরে যায় কিন্তু ১৯৪২ সালের গণহত্যায় পাঁচ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা প্রাণ ভয়ে বাংলার চট্টগ্রাম কক্সবাজার ও বান্দরবান এলাকায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে।[১৮] ১৯৫৮ সালে সরকারি মদদে মগসেনা ও স্থানীয় মগজনগোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে জীবন বাঁচাতে হাজার হাজার রোহিঙ্গা আরাকান থেকে বাংলা তথা তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পালিয়ে আসে। পূর্ব পাকিস্তান ও বর্মী সরকারের মধ্যে উর্ধ্বতন পর্যায়ে বৈঠক করে অবশেষে বর্মী সরকার পালিয়ে আসা উদ্বাস্তুদের ফিরে নেয় এবং আকিয়াবের কিছু মগ এ সমস্যার সৃষ্টি করেছিল বলে বর্মী সরকার উল্লেখ করেন। অনুরূপভাবে ১৯৭৪, ১৯৭৮ ও ১৯৯১-৯২ সালে যথাক্রমে ১০ হাজার, ৩ লাখ ও আড়াই লাখ রোহিঙ্গা নির্যাতনের মুখে নিজেদের পৈর্তৃক বসতবাড়ী এবং সুখের সংসার ত্যাগ করে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। পুনরায় বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে মিয়ানমার সরকারের সম্মতিক্রমেই তারা স্বদেশে ফিরে যায়। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের নৃতাত্ত্বিক অস্তিত্বের নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে ফেরত নিলেও নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রাখে।[১৯] দীর্ঘদিন যাবৎ নির্যাতনের ফলে রোহিঙ্গারা শরণার্থী হিসেবে আরাকান থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আসে; পক্ষান্তরে মিয়ানমার সরকার চোরাচালানীর জন্য রোহিঙ্গাদের দায়ী করে। বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠী এ বিষয়ে কি দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন যে নিমিত্তে প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়, আরাকান থেকে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আসার কারণ কি?

লক্ষণীয় যে, বর্মী সরকারের দাবিকে অযৌক্তিক ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠীর মধ্যকার ৪০ জন উত্তর দাতাই রোহিঙ্গাদের আরাকান থেকে বাংলাদেশে আসার একমাত্র কারণ হিসেবে মিয়ানমার সরকারের নির্যাতনকে উল্লেখ করেন; যা শাতকরা ১০০ ভাগ।

www.pathagar.com

১জন আমলা ১ জন সাংবাদিক ও ১ জন শিক্ষাবিদ চোরাচালানীতে রোহিঙ্গাদের অংশ গ্রহণের কথা উল্লেখ করে বলেন, কিছু কিছু রোহিঙ্গা বর্মী নির্যাতনের নাম করে সীমান্ত চোরাচালানীতে নিয়োজিত রয়েছে। চোরাচালানী কারবারীদের মধ্যে কিছু কিছু বাঘব বোয়াল রয়েছে; যারা রোহিঙ্গাদের শরণার্থী ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক চোরাচালানীতে নিয়োজিত। এদের শিকড় অনেক গভীরে এবং এরা বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে বিলাশ বহুল জীবনযাত্রা গড়ে তুলছে। উত্তরদাতাদের মধ্যকার অধিকাংশই মন্তব্য করেন যে, চোরাচালানী কারবার রোহিঙ্গারা করে না বরং রোহিঙ্গাদের ছদ্মবরণে আরাকানী মগগোষ্ঠীসহ মিয়ানমারের স্বার্থন্বেষী মহল এ কাজে জড়িত। যারা পৈতৃক বসতবাড়ী ছেড়ে বাংলাদেশে চলে আসে; এরা নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে নিরূপায় হয়েই আসে। এরা অত্যন্ত নিরীহ। তবে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যা হয়, দারিদ্রের কষাঘাতে দু'চার জন অসৎ উপায় অবলম্বনে জড়িয়ে পড়ে; যাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। রোহিঙ্গাদের মাঝে এমন অনেক ধার্মিক পরিবার রয়েছে যারা না খেয়ে মরে গেলেও অসৎ উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করে না। আমলা ও এনজিও কর্মকর্তাদের কয়েকজন মন্তব্য করেন যে, বর্মী সরকারের নির্যাতন তো আছেই সাথে সাথে এটাও সত্য কথা যে, যারা শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে আসে এদের অধিকাংশই দরিদ্র। শরণাথী শিবিরে যে মানের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদের জীবনযাত্রা এর চেয়েও নিম্নমানের। এছাড়া তাদের অনেকেই অত্যন্ত অলস প্রকৃতির লোক হবার কারণে বসে থেকে নিরাপদে থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা পেলে দেশ ছেড়ে চলে আসতে সমস্যা কোথায়?

কক্সবাজারের একজন সংবাদিককে সফরসঙ্গী করে গবেষক টেকনাফের নয়াপাড়া শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করতে গেলে বেশ কয়েকজন শরণার্থীর সাথে কথা হয়। আবদুল জব্বার নামে পঁচাত্তর বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধ গবেষককে দেখেই কেঁদে ব্যাকুল হয়ে জানান যে, গবেষকের মতই তার একজন ছেলে ছিল; যাকে মগসেনারা ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। অতঃপর গবেষক পঞ্চাশোর্ধ এক বৃদ্ধকে নিয়ে তাদের অবস্থা দেখার জন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করেন। ছোট একটি কক্ষের মধ্যে খড়ের বেড়া দিয়ে জায়নামাজের সমান একটি জায়গায় আড়াল করে রাখা হয়েছে। সেখানে উঁকি দিতেই একজন মহিলা জড়োসড়ো হয়ে আড়ালে লকানোর চেষ্টা করল। মধ্য বয়সী এক মহিলা (তিনি ঐ বাড়ির গৃহকত্রী) জানালেন ওখানে তার ছেলে বউ থাকে। ছেলেকে নতুন বিয়ে করানো হয়েছে। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১০ জন। একটি কক্ষে ১০ জন লোকের শুয়ে থাকার মতো জায়গাও নেই। জিজ্ঞেস করা হল, এতটুকু জায়াগায় ১০ জন থাকেন কেমন করে? জবাবে তিনি জানালেন কষ্ট করেই থাকতে হচ্ছে। ইতোমধ্যে একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এসে জানালেন, আপনি হয়তো আমাদের অবস্থা দেখে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। এ অবস্থাতেই আমাদের দুটো সুখ, একটা হলো নিরাপদে ঘুমাতে পারি; কেউ এসে মারবেনা। দ্বিতীয়ত, মসজিদে গিয়ে নামাজটা পড়ে আসতে পারি; কেউ বাঁধা দিবেনা। এ প্রশ্নের উত্তর লিখতে গিয়ে জনৈক আলেম বল্লেন, কেউ জানমালের নিরাপত্তা

পেলে কিংবা সুখে থাকার সুযোগ পেলে নিজেদের বসতবাড়ী এবং স্মৃতিময় গ্রাম ছেড়ে অন্যদেশে শরণার্থীর জীবন বেছে নিতে চায়না। মিয়ানমার সরকারের নির্যাতন সকল ইতিহাসকে ছেড়ে গেছে এবং সে জন্যই রোহিঙ্গারা দেশ ছেড়ে শরণার্থী হয়েছে।

৬.৬ রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার লংঘন

জীবনের উষালগ্ন থেকেই বিভিন্ন পর্যায়ে সকল কালের, সকল দেশের, সকল মানুষের ন্যূনতম সর্বজন স্বীকৃত ও সংরক্ষিত অধিকারের নামই মানবধিকার। একে দলন বা হরণ করার অধিকার কারো নেই।[২০] ন্যায় বিচারকে পদদলিত করা ব্যতিত কোন ব্যক্তিকে এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।[২১] কিন্তু মিয়ানমার সরকার মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাকে উপেক্ষা করে রোহিঙ্গাদের উপর মানবাধিকারের চরম লংঘন করে চলছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ধারা ৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেকেরই জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। ৫ ও ৬নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর অমানুষিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তিভোগে বাধ্য করা চলবে না। আইনের সমক্ষে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে। ৮ নং ধারায় বলা হয়েছে, যে কার্যাদির ফলে শাসনতন্ত্র বা আইন কর্তৃক প্রদত্ত মৌল অধিকারসমূহ লংঘন হয় সেগুলোর জন্য উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের মারফত কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। কাউকে খেয়াল খুশিমত গ্রেফতার, আটক অথবা নির্যাতন করা যাবে না। অনুরূপভাবে ১৯,২০,২১,২২,২৫ ও ২৭ ধারায় মতামত প্রকাশ, সংঘবদ্ধ হওয়া, সরকারি অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রমের নায্য মজুরি পাওয়া, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণাদীর প্রাপ্তিসহ নিজস্ব বিশ্বাস ও সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ রয়েছে।[২২] কিন্তু মিয়ানমারের সামরিক সরকার জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আইনের এ সকল সনদের তোয়াক্কা না করে নিজের খেয়াল খুশিমত রোহিঙ্গাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে মানবাধিকারের চরম লংঘন করছে। এ সম্পর্কে Amnesty International রিপোর্টের মন্তব্য "UNHCR now has a field presence both in Bangladesh and in Rokhine State where they monitor human rights voiolations against Rohingyas."[২৩] মাসিক দাওয়াত - Amnesty International এর আরো একটি রিপোর্টের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছে "The Rohingyas are a Muslim minority from the a Arakan state in Myanmar. They are apparently fleeing because of human rights violations committed by Myanmar armed forces who have intensified the level of their operation in Arakan state."[২৪]

রোহিঙ্গারা তাদের বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ হয়ে বার বার শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে আসার ফলে তারা ক্রমশ সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারসহ মানবাধিকারের চরম লংঘনের এ ঘটনায় বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠী কি দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন সে লক্ষ্যেই এ প্রশ্ন;

www.pathagar.com

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মানিবাধিকার সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার রয়েছে; রোহিঙ্গারা বিতাড়িত হবার ফলে তাদের এ অধিকার কি লঙ্ঘিত হচ্ছে না?

প্রশ্নোত্তরে লক্ষ্য করা যায় যে, রোহিঙ্গারা আরাকান থেকে বিতাড়িত হবার ফলে তাদের মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে বলে ৩৯ জন উত্তর দাতাই হ্যাঁ বলেছেন; যা সচেতন জনগোষ্ঠীর শতকরা ৯৭.৫ ভাগ। আর একজন উত্তর দাতা যিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী-এ প্রশ্নে কোন মন্তব্য করেননি। রোহিঙ্গা সমস্যা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশের কলামে তিনি লেখেন-আরাকান তথা মায়নামারে তো গৃহযুদ্ধ বা যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে না। তাই রোহিঙ্গাদের উদ্বাস্তু হিসেবে বাংলাদেশে আসার কোন প্রশ্নই উঠে না। যারা আসছে তারা ব্যক্তিগত স্বার্থে মিয়ানমার সরকারের তথাকথিত নির্যাতনকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে। সুতরাং মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবার মত কোন বিষয় দেখছি না ।

উত্তরদাতাদের প্রায় সকলেই দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করেছেন-মিয়ানমার সরকার যা করছে তা অবশ্যই মানবাধিকারের চরম লংঘন। পেশাজীবীদের মধ্যকার একজন মন্তব্য করলেন, মিয়ানমার সরকারের সমস্ত কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে যদি শুধুমাত্র ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের সাথে যে আচরণ করছে এটুকু পর্যালোচনা করা যায়; তা হলেই মানবাধিকার লংঘনের ইতিহাসের জন্য যথেষ্ট। মূলত রোহিঙ্গাদের প্রতি মিয়ানমার সরকার যা করছে এটা অত্যন্ত অমানবিক; যা ধিক্কার দেবার ভাষা জানা নেই। শিক্ষাবিদগনের একজন বললেন - বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের শ্লোগান যত বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের উপর অবিচার ও নির্যাতন ততই বেড়ে চলছে। মানবাধিকার নিয়ে এত বেশি রাজনীতি, কুটনীতি ও ব্যবসানীতি শুরু হয়েছে যে, এসবের ভীড়ে মানবাধিকার শব্দেরই মানবাধিকার বিপন্ন। ফলে বাড়ির কাছের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে কথা বলা বা চিন্তা করার সময় ও সুযোগ কারো হাতে নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন নিয়ে যতটা ভাবা হয় তার চেয়ে কম চিন্তা করা হয় আরাকানের মুসলিম নিধন তথা রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার হরণের ঘটনা নিয়ে । ঠিক যেন নিজ ঘরের কাছের মানুষটিকে অবহেলা করে অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার মত ব্যাপার; ফলে লাখ লাখ রোহিঙ্গা মানবেতর জীবন যাপন করে নিঃশব্দে শেষ হয়ে যাচ্ছে ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. রতনলাল চক্রবর্ত্তীর সাথে আলাপকালে তিনি বললেন, রোহিঙ্গারা যদি মুসলমান না হত তবে সমস্যা এত প্রকট হতনা; মানবাধিকার লংঘনের মত এত বড় বড় ঘটনাও ঘটত না। মূলত এটা মিয়ানমার সরকারের সংকীর্ণ মানসিকতার ফল ।

আমাদের রামু ডটকম ও *মাসিক আমাদের রামু* সম্পাদক প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু বলেছেন, জঙ্গি বা সন্ত্রাসী দমনের নামে একজন সাধারণ মানুষও যদি নিহত হয় সেটাও ঘোর অন্যায় এবং মানবাধিকারের ঘোর লঙ্ঘন। এমন কি কোনো দেশে অবস্থান নেওয়া কোনো অবৈধ ব্যক্তিকেও হত্যা করা যায় না। মিয়ানমার স্বীকার করুক বা না-ই করুক

www.pathagar.com

রোহিঙ্গারা ঐতিহাসিকভাবে সে দেশের অধিবাসী। অধিবাসী না হলেও হত্যা কিংবা নির্যাতন করা যাবে না। তিনি আরো বলেন, রোহিঙ্গারা আদতে কোন দেশের এই সমস্যার সুরাহা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার; যদিও সময় কম গড়ায়নি। তবে এই সমস্যার সুরাহা করতে হবে মিয়ানমার এবং বাংলাদেশকে যৌথ উদ্যোগে। কারণ মিয়ানমার বলছে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ থেকে সেখানে গিয়েছে। তাই বাংলাদেশ একেবারে চুপ থাকতে পারে না। কূটনৈতিক শিষ্টাচার এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বজায় রেখে রোহিঙ্গা বিষয়ে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা উচিত। জাতিসংঘকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আরও সোচ্চার এবং দৃশ্যমান ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশ্বময় মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে আরও জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের উপর যতটা আন্তর্জাতিক অনুরোধ এবং চাপ আছে ততটা মিয়ানমারের উপর আছে বলে মনে হয় না। মিয়ানমার এবং সে দেশের জনগণ বুদ্ধের বাণীকে মান্য করলে কিছুতেই এমন মানবতাবিরোধী কাজে লিপ্ত হতে পারে না বা তা মেনে নিতে পারে না। মিয়ানমারের এই আচরণ সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধদের জন্য চরম লজ্জার। তাই এই সময়ে বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলোর উচিত মিয়ানমারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কথা বলা।[২৫]

৬.৭ মিয়ানমারে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি রোহিঙ্গা সমস্যার অন্যতম কারণ কিনা?

গণতন্ত্র হচ্ছে আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ও সমাদৃত রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ভাষায় গণতন্ত্র হচ্ছে Government of the people, by the people and for the people; কিংবা Prof. Seeley এর ভাষায়, Democracy is a form of Government in which every one has a share in it. [২৬] গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষ তার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার সুযোগ পায়। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী হলেও মিয়ানমার এ থেকে ভিন্ন। সেখানে দীর্ঘকাল যাবৎ সমাজতন্ত্রের লেবাসে সামরিকতন্ত্র প্রচলিত থাকায় মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে অহরহ। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি Union of Burma স্বাধীনতা লাভের পর কিছু দিন যাবৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলেও ১৯৬২ সালের ২ মার্চ বার্মার সেনাপতি নে উইন রক্তপাতহীন এক বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে গণতন্ত্রকে হত্যা করেন এবং দীর্ঘ ২৬ বছর যাবৎ কঠোর স্বৈরশাসনের মাধ্যমে ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্রের মূলমন্ত্রে দেশ শাসন করেন। তার স্বৈরশাসনে গণতন্ত্রী ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং বার্মায় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা অং সান এর কন্যা অং সান সুকি ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে দেশে ফিরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী উ নু ও অন্য ২জন সাবেক জেনারেল অং গাই এবং তিন ও কে সঙ্গে নিয়ে এনএলডি গঠন করেন। স্বৈরাচারী শাসকের পক্ষ থেকে জীবন নাশের হুমকির মুখে তারা দেশে ব্যাপকভাবে সভা সমিতি শুরু করেন । আন্দোলন তীব্রতর হলে ১৯৮৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর দেশে বিক্ষোভমুখর রাজ্যকে শান্ত করার জন্য

www.pathagar.com

জেনারেল সেইন লিউইন এর নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী নতুন করে দেশের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেয় এবং সমস্ত নাগরিক অধিকারকে পদদলিত করে হাজার হাজার বেসামরিক লোককে হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করে। সামরিক আইনের কঠোর প্রয়োগেও সেইন লিউইন শেষ রক্ষা পায়নি। তিনি Burma Socialist Programm Party (BSPP) এর সদস্য, বেসামরিক প্রতিনিধিত্ব পরিচয়ধারী মং মং এর হাতে ক্ষমতা দেড়ে দেন। BSPP মূলত সামরিক অফিসারদেরই সংগঠন। মং মং নির্বাচন কমিশন গঠন ও রাজনৈতিক দল রেজিষ্ট্রেশনের দোহাই দিয়েও নিজের পতন ঠেকাতে না পেরে অবশেষে শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করে পুনরায় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল স মং এর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তিনি প্রায় দশ হাজার লোককে হত্যা করে বিভিন্ন মুখী ঘৃণ্য অপকৌশল অবলম্বন করে আন্দোলনে ফাঁটল ধরাতে সক্ষম হন। স মং এর হাতে BSPP শাসনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হলেও নে উইন এর পরামর্শমত তিনি নাৎসী উপদেষ্টা পরিষদের ন্যায় State Law and Order Restoration Council (SLORC) এর মাধ্যমে দেশ চালাচ্ছেন।[২৭]

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে মুক্ত বিশ্বের চাপ এবং অভ্যন্তরীণ আন্দোলনের মুখে স মং ১৯৯০ সালের ২৭মে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন এবং বার্মায় ৩০ বছর পর এ সাধারণ নির্বাচনে গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী অং সান সুকির NLD এর প্রার্থীরা ৯০% আসনে বিজয়ী হন। নির্বাচনে BSPP এবং সামরিক এলিটদের পছন্দসই প্রার্থীরা নির্বাচনে পরাজিত হয়ে নতুন ফন্দি ফিকির এটে নানা টালবাহানা করে স মং ক্ষমতা হস্তান্তর দূরে থাকুক; সুকিকে গৃহবন্দী করে রাখে।[২৮]

রোহিঙ্গা মুসলমানরা রুদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সুকির NLD এর তালা মার্কায় একচেটিয়া ভোট দেয়। গোপন শলা-পরামর্শের ভিত্তিতে মুসলিম সমর্থিত পার্টি National Democratic League for Human Rights (NDLHR) এবং NLD আরাকানের ২৬টি নির্বাচনী এলাকায় একচেটিয়া প্রধান্য বিস্তার করে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট এলাকায় নির্বাচনী আসন কমিয়ে দেয়া, ভোটার তালিকা থেকে রোহিঙ্গাদের বাদ দেয়া, সম্ভাব্য বিজয়ী প্রার্থীকে গ্রেফতার করা, ভোটের দিন ত্রাস সৃষ্টিসহ সামরিক সরকারের নানা কলা-কৌশলের পরও NDLHR এর ৫জন প্রার্থী ব্যাপক ভোটে বিজয়ী হন।[২৯] নির্বাচনের ফলাফল দেখে বর্ণবাদী স মং সরকার রোহিঙ্গাদের উপর দ্বিগুন রোষে ফেটে পড়ে এবং ১৯৯১ এর রোহিঙ্গা বিরোধী অপারেশন তারই ফলশ্রুতি।[৩০]

পত্র-পত্রিকাসহ বিভিন্ন মহল মনে করেন যে, স্বাধীনতা উত্তর মিয়ানমারে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিই . রোহিঙ্গা সমস্যার অন্যতম কারণ, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি সংগ্রহের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

এ প্রশ্নে 'স্বাধীনতা উত্তর মিয়ানমারে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিই রোহিঙ্গা সমস্যার অন্যতম কারণ হিসেবে' উত্তরদাতাদের ৪০জনের মধ্যে ২৩জন অর্থাৎ শতকরা ৫৭.৫ ভাগ সচেতন জনগোষ্ঠী হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়ে সত্যায়ন করেছেন। অবশিষ্ট ১৭জন

www.pathagar.com

অর্থাৎ শতকরা ৪২.৫ জন উত্তরদাতা স্বাধীনতা উত্তর মিয়ানমার গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি রোহিঙ্গা সমস্যার আংশিক কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। হ্যাঁ সূচক উত্তর দাতাদের অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে, বার্মার সামরিক শাসকগণ এমনিতেই সমাজতান্ত্রিক শাসনের ছদ্মাবরণে স্বৈরশাসন ও একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের অধিকারের চেয়ে নিজেদের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে টিকে রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত। তার উপরে আবার মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব রোহিঙ্গাদের উপর নিপতিত। এমতাবস্থায় গণতন্ত্রের অনুপস্থিতির কারণে রোহিঙ্গারাও সংঘবদ্ধ হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন আন্দোলন করতে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের কাছে কোনে দাবি দাওয়া জানাতে পারছেনা। তাছাড়া গণতন্ত্র না থাকায় মিয়ানমার মুক্ত বিশ্বের আবহাওয়া থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে বলে সেখানকার অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশ্বের সামনে কমই প্রকাশিত হয়। ফলে সার্বিক দিক থেকে গণতন্ত্রই তাদের জন্য মুক্তির পথ বয়ে আনতে পারে ।

আংশিক কারণ হিসেবে মতামত প্রদানকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে বিশেষত শিক্ষাবিদ, কবি-সাহিত্যিক-কলামিষ্ট ও রাজনীতিবিদদের অনেকেই গণতন্ত্রকে আংশিত কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, শুধুমাত্র গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিই রোহিঙ্গা সমস্যার অন্যতম কারণ নয়; বরং মানবাধিকার ও আইনের শাসনের অনুপস্থিতিই রোহিঙ্গা সমস্যাকে প্রকট করে তুলছে। মিয়ানমার সরকারের মুসলিম বিদ্বেষী, একগুয়েমী ও স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব রোহিঙ্গা সমস্যার অন্যতম কারণ। কেননা বিশ্বে অনেক গণতন্ত্রী রাষ্ট্র রয়েছে যেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানবাধিকার ও আইনের শাসন না থাকায় সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে ভারতকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

গণতন্ত্রকে সমস্যা সমাধানের পথ মনে করা হলেও সত্যিকার অর্থে মিয়ানমারে গণতন্ত্রের চর্চা এখনো শুরু হয়নি। সামরিক শাসনের অধীনে প্রণীত শাসনতন্ত্রের আওতায় ২০১০ সাল থেকে সংস্কার কর্মসূচি চলছে। ২০১৫ সালের নির্বাচনে অং সান সু চির দল এনএলডি বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। আশা করা গিয়েছিল গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটবে; কিন্তু বিগত কয়েক বছরের কর্মকাণ্ড থেকে প্রমাণিত হয়, দেশ গতানুগতিকভাবে চলছে। গণতন্ত্রের বিকাশ হচ্ছে না। উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী মনোভাব প্রাধান্য পাচ্ছে। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হচ্ছে না। রাখাইনে রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীসহ অন্য ধর্মাবলম্বীকে ন্যূনতম নাগরিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে এবং নিপীড়ন চলছে।[৩১] এ প্রসঙ্গে *আমাদের রামু ডটকম* ও *মাসিক আমাদের রামু* সম্পাদক প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু বলেন, মিয়ানমারে গণতন্ত্রের হাওয়া বইছে বলে রোহিঙ্গা সমস্যা বিনা উদ্যোগে অচিরেই সমাধান হয়ে যাবে, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। কারণ আমাদের দেশে যেমন ধর্মীয় সংখ্যালঘু নিয়ে রাজনীতি হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠদের কথা মাথায় রেখে রাজনীতি করতে হয়, মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের অধিকারের ক্ষেত্রেও শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অং সান সু চির দিকে তাকিয়ে কোনো ফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না; এমন কি তাঁর নোবেল পুরস্কার ফিরিয়ে নিলেও না।[৩২]

www.pathagar.com

৬.৮ রোহিঙ্গারা শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে আসায় এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে কিনা

জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের ১৪ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে "(ক) নির্যাতন এড়ানোর জন্য প্রত্যেকেরই অপর দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা ও ভোগ করার অধিকার রয়েছে। (খ) অরাজনৈতিক অপরাধসমূহ অথবা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি বিরোধী কার্যকলাপ থেকে সত্যিকারভাবে উদ্ভুত নির্যাতনের ক্ষেত্রে এ অধিকার প্রার্থনা করা নাও করা যেতে পারে।"[৩৩] আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের স্বীকৃতি নিয়েই রোহিঙ্গারা নির্যাতনের মুখে এদেশে এলেও বাংলাদেশকে তার ভোগান্তি পোহাতে হয়। বাংলাদেশ নিজেই নিজের জনসংখ্যার ভারে ন্যুয়ে পড়েছে; ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য আবাদী জমি ও বনভূমি ধ্বংস করে আর্থ-সামাজিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ছে। এর উপর রোহিঙ্গারা বিভিন্ন সময় এদেশে এলে এখানকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে কিনা এটাই জিজ্ঞাসা।

উল্লেখ্য, প্রশ্নোত্তরে শুধুমাত্র হ্যাঁ ও না দু'টি কলাম থাকলেও একজন উত্তরদাতা কোন মন্তব্য না করায় আরও একটি কলাম বৃদ্ধি করা হয়। রোহিঙ্গারা আরাকান থেকে বাংলাদেশ শরণার্থী হিসেবে আসার ফলে এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে বলে হ্যাঁ উত্তর দিয়েছেন ৪০ জনের মধ্যে ২৩ জন; যা সমগ্র সচেতন জনগোষ্ঠীর ৫৭.৫% এবং ১৬ জন উত্তরদাতা না মতামত দিয়েছেন আর ১ জন কোন মন্তব্য করেননি।

হ্যাঁ উত্তরদাতাদের মধ্যকার একজন আমলা মন্তব্য করলেন যে, রোহিঙ্গারা নিরূপায় হয়েই এদেশে আসছে এবং আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃতিও রয়েছে; ফলে বাংলাদেশ সরকার তাদের আগমনে কোন বাধা দিতে পারছে না। কিন্তু বাংলাদেশ এমনিতেই নিজের জনসংখ্যার ভারই সহ্য করতে হিমশিম খাচ্ছে। দেশে এখন বেকারত্বের সংখ্যাও প্রচুর পরিমানে বেড়ে গিয়েছে। বাররার রোহিঙ্গারা এসে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। যারা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয় তারা না হয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় জীবন ধারণ করছে কিন্তু যারা ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যায় কিংবা দেশে ফিরে পুনরায় বাংলাদেশে আসে তারা কক্সবাজার, টেকনাফ, উখিয়া ও বান্দরবানসহ বিভিন্ন স্থানে নিজেদের আত্নীয়ের পরিচয়ে কিংবা পূর্বে চলে আসা কোন রোহিঙ্গার পরিচয়ে আবাসন গড়ে তুলে বাংলাদেশের বাসিন্দা হয়ে গেছে। তারা কোন কাজকর্ম না পেয়ে বনজ সম্পদের ক্ষতিসাধনসহ বিভিন্ন প্রকার অসামাজিক কার্যক্রমে লিপ্ত হচ্ছে। এতে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অবশ্যই হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

একজন এনজিও কর্মকর্তা জানালেন, রোহিঙ্গারা ক্যাম্প থেকে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পেয়েও বাইরে দৈনিক মুজরী করতে যায়। ঠিকাদারেরা দেশী মজুরের চেয়ে তাদেরকে কম টাকায় খাটাতে পারে বলে তাদেরকে ব্যবহার করে। এতে দেশীয়

www.pathagar.com

মজুররা কাজ না পেয়ে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়। এছাড়া ক্যাম্প নির্মাণকৃত এলাকা ও পাশ্ববর্তী এলাকায় বনজ সম্পদগুলো ধ্বংস হচ্ছে রোহিঙ্গাদের কারণেই।

মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে গবেষক চট্টগ্রাম, কক্স্বাজার, উখিয়া, টেকনাফসহ দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণের সময় রোহিঙ্গাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। রিকশায় উঠে আবদুল আলিম (১৮) নামক এক রিকসা চালকের সাথে কথা বলার পর জানা যায় সে রোহিঙ্গা ; ১৯৯১ সালে তার আব্বাকে মগসেনারা মেরে ফেলার কারণে দু'ভাই একবোন ও বিধবা মাকে নিয়ে বাংলাদেশে এসেছে। ওরা এখন টেকনাফ থানার হ্নীলায় বসবাস করে। দেশে ফিরে যাবার কথা বললে সে উত্তর দেয়; দেশে গেলে সে কি তার আব্বাকে ফিরে পাবে? তার চেয়ে এখানেই ভাল । ওদের সংসার কি করে চলে জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দেয়, সে রিকসা চালায়; ওর মা-ভাই গরু ছাগল পোষে; এ দিয়ে সংসার চলে। ওরা এখানে বেশ সুখেই আছে বলে জানায়। কক্স্বাজার সমুদ্র সৈকতে ঝিনুক বিক্রেতা ফরিদ (১৩) এর নিকট থেকে ঝিনুকের তৈরি জিনিসপত্র ক্রয় করার সুবাদে বিভিন্ন কথা বলে জানা গেল ওরা ওপারের লোক। কেন এসেছে সে কিছু বলতে পারে না। কক্স্বাজারে একজন সাংবাদিকের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলার সময় তিনি বললেন, রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে।

কক্সবাজার অঞ্চলের একজন অধ্যাপক জানালেন যে, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু হবার পর থেকে মিয়ানমার থেকে ফেরত আসা শরণার্থীদের ক্যাম্পে নেয়া হচ্ছে না। অথচ রোহিঙ্গাদের আগমন অব্যাহত রয়েছে। এরা সবাই দেশের বিভিন্ন স্থানে পাহাড়িয়া এলাকায় বনজঙ্গলে নিজেদের জন্য মাথা গোঁজার ঠাই করে আবাস গড়ে তুলেছে। স্থানীয় চেয়ারম্যান মেম্বারগণ তাদের ভোটার বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের আবাসন নির্মাণে সহায়তা করছে।

না বোধক উত্তরদাতাদের মধ্যকার অনেকেই মন্তব্য করেন যে, রোহিঙ্গাদের আগমনে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে না, তবে শরণার্থীদেরকে যেখানে অস্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয় সেখানে সাময়িকভাবে সামান্য অসুবিধা হয়। তবে এ সমস্যার কোন প্রভাব জাতীয় ক্ষেত্রে পড়ে না।

একজন রাজনীতিবিদ জানালেন, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আগমনে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কিছুটা প্রভাবতো পড়বেই; প্রতিবেশী দেশ হিসেবে এটা মেনে নেবার মানসিকতা থাকতেই হবে। তবে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হলে এ অবস্থা আর থাকবে না। একজন এনজিও কর্মকর্তা বললেন, এতে আবার বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা হুমকির সম্মুখীন হবার কি কারণ থাকতে পারে? বরং বাংলাদেশ বিদেশী সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে লাভবান হচ্ছে। তবে তাদের স্থায়ী আবাস গড়ে তোলার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে আরও কঠোর হওয়া উচিৎ।

www.pathagar.com

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আশ্রিত রোহিঙ্গারা ছাড়াও প্রায় চার লাখ রোহিঙ্গা কক্সবাজারের বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে বসবাড়ি গড়ে তুলেছে বলে ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসের রিপোর্টে জানা যায়। তাদের জীবন যাত্রার নানা অনুসঙ্গের কারণে সেখানকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আইন শৃংখলার ক্ষেত্রে ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে বলে স্থানীয় জনগণের অনেকেই অভিযোগ তোলেন।[৩৪] টেকনাফ উখিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে এ সব বসতিপূর্ণ এলাকাগুলো বার্মাপাড়া নামে পরিচিত। এ সব এলাকায় স্থানীয় জনগণের মাঝে এক ধরনের অসন্তোষ ও ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। ককসবাজারের হ্নীলা অঞ্চলের 'রোহিঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি'র সভাপতি মোজাম্মেল হক জানান, দলে দলে নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ফলে তারা আতঙ্কিত। টেকনাফ স্থলবন্দরের মালামাল উঠা-নামাসহ পুরো শ্রমবাজার রোহিঙ্গাদের দখলে চলে যাচ্ছে। সেইসাথে পাহাড়িয়া এলাকার গাছ কাটার ফলে পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে।[৩৫] অন্যদিকে বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ রয়েছে রোহিঙ্গাদের প্রতি। এ কারণে প্রায়ই রোহিঙ্গাদের গ্রেফতার করে থাকে বাংলাদেশের আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা। তাদের অনেককেই কারাগারে পাঠানো হয়। ২০১০ সালের এপ্রিল-মে মাসের মধ্যেই অনুপ্রবেশের সময় দুই শতাধিক রোহিঙ্গাকে আটক করে জেল হাজতে পাঠায় বিডিআর।[৩৬] ২০১০ সালের একটি রির্পোটে জানা যায়, রোহিঙ্গা বন্দির কারণে ককসবাজার জেলা কারাগারের অবস্থা ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। ৪৪০জন হাজতি-কয়েদির জন্য নির্মিত কারাগারে রোহিঙ্গা বন্দিই আছে ৬৪৬ জন।[৩৭]

২০১৬ সালের অক্টেবর থেকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী অনুপ্রবেশ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। সে আলোকে রোহিঙ্গা শরণার্থী আগমনে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক প্রভাব নির্ণয়ে নানাজনের নানা মত পাওয়া যায়। আমিনুল ইসলাম শান্ত একজন সাংবাদিক ও সমাজকর্মী। সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তিনি বলেন, বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সঙ্কটের অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যেসব আশঙ্কা করা হয়েছিল, তা আপাতত প্রাথমিকভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, রোহিঙ্গা শরণার্থীরা পাওয়া অনেক ত্রাণ নির্দিষ্ট মূল্যের প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ কম দামেও স্থানীয় বাসিন্দা-ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। একটি পাঁচ লিটার ব্র্যান্ডের ভোজ্যতেল মাত্র ১০০-১২০ টাকায় বিক্রি করে দেয়ার উদাহরণও অগণিত। জীবন রক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ বিক্রি করেছে নামমাত্র মূল্যে। তদ্রূপ ত্রাণসামগ্রী হিসেবে পাওয়া অতিরিক্ত সম্পদ ও অতিরিক্ত খাদ্যপণ্য সস্তায় বিক্রি করে দেয়ায় স্থানীয় স্বল্প আয়ের মানুষের জীবনে আশঙ্কার ঠিক উল্টো প্রভাব পড়ে। উখিয়া, টেকনাফ, কুতুপালং, বালুখালীতে স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মোট চাহিদার বিপরীতে দ্রব্যের জোগান বেড়ে যায়। রোহিঙ্গাদের ত্রাণসম্পদ বিক্রয় করা নিয়ে স্থানীয় বিবেকবান জনগণ, সেবাকর্মী, সেবাসংস্থা ও প্রশাসনের মধ্যে নেতিবাচক সমালোচনা ও মিশ্র প্রতিক্রিয়াও

www.pathagar.com

পরিলক্ষিত হয়। এমন কি উল্লিখিত কারণে ২০১৭ সালের ১২ থেকে ১৬ ডিসেম্বর সম্পদ অপচয় হওয়ার আশঙ্কা উল্লেখ করে কক্সবাজার জেলা প্রশাসন নোটিশ দিয়ে ত্রাণ বিতরণ সাময়িক বন্ধ করে দেয়।[৩৮]

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ত্রাণ বিক্রয় করে দেয়ার পেছনে মূল কারণ হলো– একজন মানুষের নিত্যপ্রয়োজনের গাণিতিক তালিকা অনেক বড়। কখনো মাথাব্যথার ওষুধ, কখনো পান খাবার নেশা, কখনো ছোট শিশুর জুস খাওয়ার আগ্রহ, কখনো লবণ আছে, তেল আছে, হলুদের গুঁড়া নেই। তখন রান্নার জন্য হলুদের গুঁড়া প্রয়োজন, রান্নার লাকড়ি হিসেবে কাঠ প্রয়োজন, এমন হাজারো তালিকায় মানুষের জীবন আবদ্ধ; কিন্তু ত্রাণসমাগ্রী হিসেবে তারা কেবল ঘুরেফিরে উল্লেখযোগ্য কিছু নিত্যপ্রয়োজনী দ্রব্য পায়। যে কারণে একজন রোহিঙ্গা তার অবশিষ্ট চাহিদা পূরণের জন্য স্থানীয় বাজারে স্বল্পমূল্যে দামি পণ্য বিক্রি করে অতীব দরকারী জিনিস কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য প্রয়োজন বিনিময় প্রথা, যা আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সংস্থাকে সরকার কাজ ভাগ করে দিয়ে সহজেই সামলাতে পারে।

স্থানীয় একজন কর্মজীবি মানুষের সাথে কথা বললে তিনি জানান, স্থানীয় লোকজনের জীবিকা নির্বাহের বিষয়ে বিশেষত শ্রমবাজার ধ্বসের যে আশংকা করা হয়েছে রোহিঙ্গাদের আগমনে এমন কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, কক্সবাজারের একজন শিক্ষানবিস এমবিবিএস ডাক্তার বা একজন ডিপ্লোমা ডাক্তারও দিনে চার-পাঁচ হাজার টাকা সম্মানীতে হেলথ ক্যাম্প করেন। প্রতিদিন চার-পাঁচটি ফ্লাইট ভরে যাত্রী, বিশেষ করে বিদেশী পর্যবেক্ষকদের আগমন বিমান পরিবহনে আর্থিক প্রবাহ বৃদ্ধি করে। বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপক আগমন ঘটে এ সময়ে এবং এখনো অব্যাহত। স্থানীয় পেট্রলপাম্প থেকে তেল ক্রয়ের হিড়িক পড়ে ঢাকা থেকে যাওয়া ত্রাণবাহী লড়ি, ট্রাক ও অন্যান্য বাহনের। অতএব, দৃশ্যত এখন পর্যন্ত সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে না।[৩৯] উল্লেখ্য, রোহিঙ্গারা অল্প শ্রমমূল্যে কাজ করার কারণে কর্তৃপক্ষও তাদের ব্যবহার করে থাকেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। হ্নীলা ইউনিয়নের মুছনি গ্রামের নাজিম উদ্দিন জানান, রোহিঙ্গারা স্থানীয়দের চেয়ে অর্ধেক মূল্যে শ্রম দেয়। যেমন ধান কাটার জন্য স্থানীয় শ্রমিক চারশো টাকা নিলেও রোহিঙ্গারা ২০০ টাকায় করে। এ জন্য স্থানীয় শ্রমিকরা কাজ পায় না।[৪০] তবে এ কথা স্বীকার্য, আমাদের প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা ব্যয় বেড়েছে বহুগুণে। ভবিষ্যতে আমাদের জীবনযাত্রায় প্রভাব পড়তে পারে, যা বুঝা যাবে আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতার পরিমাণ, পরিধি, প্রকৃতি ইত্যাদির ওপর।

রোহিঙ্গা সঙ্কটের সামাজিক প্রভাব বহুমাত্রিক, তবে প্রধান দিকগুলো হলো অপরাধপ্রবণতা। কেউ কেউ অভিযোগ করেন যে, ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে বসবাসকারী রোহিঙ্গারা চুরি, ডাকাতি ও মাদকব্যবসাসহ নানাবিধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে খারাপ পরিণতি ডেকে

www.pathagar.com

আনছে।[৪১] এমন অভিযোগের জবাব পাওয়া যায় সাংবাদিক ও সমাজকর্মী আমিনুল ইসলাম শান্ত'র ভাষ্য থেকে। তিনি উল্লেখ করেন য, এ কথা প্রমাণিত, অতীতে যেসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের কেউ কেউ অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে ও অল্প টাকায় ভাড়াটে হিসেবে অপরাধমূলক কার্যক্রমে অংশও নিয়েছে। কিন্তু সেটা সামগ্রিক চিত্র নয়। গাণিতিক হিসাবে ০.০১ এর নিচে এবং তাও স্থানীয় অধিবাসীদের ছত্রছায়া বা প্রশ্রয়ে। আর অপরাধের ধরন হলো প্রচলিত, যেমন ব্যক্তিগত বিরোধ বা নারীঘটিত বিরোধের জের। কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ঘটনা অপ্রমাণিত।[৪২] উল্লেখ্য, সব দেশ ও সমাজেই কিছু জনগণ অপরাধপ্রবণতার সাথে জড়িত। রোহিঙ্গারাও তার উর্ধ্বে নয়। আর পশ্চাৎপদ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সীমান্তবর্তী অধিবাসীদের অতীতকাল থেকেই আন্তর্জাতিক চোরাকারবারিরা ড্রাগ চোরাচালানে ব্যবহার করে আসছে। এর সাথে বাংলাদেশের নামি-বেনামি বহুমাত্রার লোকজন জড়িত। রোহিঙ্গাদের পালিয়ে আসা এবং ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা এখন আরো অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। ইয়াবা ট্রাফিকিং এখন প্রচলিত পদ্ধতিতে বাধাগ্রস্ত।

ক্যাম্পে অবস্থান, চলাচলের সীমাবদ্ধতা, পথঘাটে পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিজিবির বহুমাত্রিক চেকপোস্ট থাকায় অপরাধে জড়ানোর পথ বহুলাংশে বন্ধ। তবে সামাজিক নিরাপত্তার অন্য দিক হলো স্থানীয় কক্সবাজার অধিবাসীদের একটি বৃহৎ অংশের মানুষ রোহিঙ্গাদের সাথে অতীত থেকেই বিভিন্ন প্রকার আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। অতীতে যারা বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে গিয়েছে বা বাংলাদেশী ভোটার হয়েছে তার জন্য কেবল রাজনৈতিক শ্রেণিই দায়ী নয় বরং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এ জনমিশ্রণও সঞ্চালন হয়ে আসছে। এই সামাজিক মিশ্রণের উদাহরণ বিশ্বের অপরাপর প্রায় সব দেশেরই সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর একটি স্বাভাবিক ঘটনা। কারণ, জনমানুষের সৃষ্টি হয়েছে আগে, আর পরে সৃষ্টি হয়েছে জাতি, রাষ্ট্র ও জাতীয় সীমারেখা।

২০১৭ সালে রোহিঙ্গা শরণার্থী আগমনের প্রেক্ষাপটে টেকনাফের বিভিন্ন অঞ্চলে সাংবাদিক ও স্থানীয় নাগরিকদের সাথে এ বিষয়ে মতবিনিময় করার সুযোগ হয়। স্থানীয় জনগণের অনেকেই 'রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ এবং জীবনধার আগ্রাসন' হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে।[৪৩] পক্ষান্তরে কেউ কেউ এখনো রোহিঙ্গাদের প্রতি ইতিবাচক ও সহানুভূতির দৃষ্টিতেই দেখেন। জনজীবনে অর্থনৈতিক প্রভাবের কথা বলতে একজন স্থানীয় উখিয়াবাসী মন্তব্য করেন, ইতোপূর্বে পুরো শীতকালে শীতের সবজি নিয়ে কালেভদ্রে সবজির ট্রাক আসত স্থানীয় হাটে। আর এখন সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র। রোহিঙ্গাদের চাহিদা মেটানোর জন্য এতো বেশি সবজির ট্রাকের আমদানি, যাতে স্থানীয় ব্যক্তিরাও স্বল্পমূল্যে সবজি ক্রয় করে তুষ্ট। স্থানীয় উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরাও বিভিন্ন দেশী-বিদেশী সংস্থায় পার্টটাইম-ফুলটাইম কাজের সুযোগ পাচ্ছে। রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের ভাষা একই হওয়ায় এনজিওতে স্থানীয়দের চাহিদা অনেক বেশি।[৪৪] কক্সবাজার সদরের স্থানীয় রেন্টাল কারের ব্যবসা এনজিওগুলোর চাহিদার কারণে আকাশচুম্বী। একটি নোয়া বা

www.pathagar.com

হাইস গাড়ি সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শুধু কক্সবাজার থেকে ক্যাম্পে ৫০ কিলোমিটার দূরত্বের যাতায়াত ভাড়া সাড়ে পাঁচ হাজার থেকে ছয় হাজার টাকা। স্থানীয় আবাসিক হোটেলে মওসুমের দুই মাস আগ থেকেই শুরু হয় উপচে পড়া ভিড়। অনেক এনজিও হোটেল বা বাসা ভাড়া নিয়ে অফিস চালু করে। স্থানীয় বড় বাজারে পাইকারদের ব্যবসা জমজমাট ত্রাণের ও বাড়তি জনবলের চাহিদা মেটাতে। তবে এ কথা সত্য যে, সৌন্দর্যের উৎসভূমি ককসবাজার। রোহিঙ্গাদের আশ্রায়ন ক্যাম্প তৈরি ও ঘরবাড়ি নির্মাণের কারণে পাহাড় ও বৃক্ষ নিধনে আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলেও বাংলাদেশ সুদূরপ্রসারী ক্ষতির মুখোমুখি হবে।

৬.৯ রোহিঙ্গা সমস্যার ধরন

বিশ্বের সমস্যা সংকুল জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে মুসলমানদের নিয়ে সমস্যা সবচেয়ে বেশি । কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, বসনিয়া, চেচনিয়া, কসোভোসহ বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর মধ্যে রোহিঙ্গা সমস্যা অন্যতম। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা সমস্যাকে একান্ত মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে যে দাবি করেন, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সে দাবিকে নাকচ করে দিয়ে বলা হয়, বাংলাদেশ এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং গোটা মুসলিম বিশ্বে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের দূর্ভোগের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। সুতরাং এটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা।[৪৫] আন্তর্জাতিক বিশ্ব রোহিঙ্গা সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যা বলে চিহ্নিত করায় বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠী এ সর্ম্পকে কি ধারণা পোষণ করেন তা যাচাইয়ের জন্যই এ প্রশ্ন; রোহিঙ্গা সমস্যাটি কি ধরনের?

উল্লেখ্য, প্রশ্নোত্তরে যথাক্রমে ক) মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ, খ) বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বি-রাষ্ট্রিক, গ) আন্তর্জাতিক এ তিনটি বিষয় উল্লেখ করলেও শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিক-কলামিষ্ট ও ওলামাদের মধ্যকার একজন করে মোট চারজন (খ+গ) অর্থাৎ রোহিঙ্গা সমস্যাটি বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বি-রাষ্ট্রিক এবং আন্তর্জাতিক হিসেবে উল্লেখ করায় চতুর্থত আরও একটি কলাম "বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বি-রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক" নামে সংযোজন করা হয়েছে।

লক্ষণীয় যে, সমস্ত সচেতন জনগোষ্ঠীর ১২.৫% রোহিঙ্গা সমস্যাটিকে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, মিয়ানমার এ সমস্যা সমাধানের জন্য একাই যথেষ্ট। উদার মানষিকতা নিয়ে আইনের শাসন, সুবিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করলে এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ কিংবা আন্তর্জাতিক বিশ্বকে জড়ানোর প্রয়োজন হবে না। সুতরাং এটি মিয়ানমারের আভ্যন্তরীণ সমস্যা।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বি-রাষ্ট্রিক হিসেবে ৭.৫% সচেতন ব্যক্তি মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন আলিম মন্তব্য করলেন যে, বাংলাদেশ যদি মিয়ানমারের সাথে আন্তরিকতার পরিবেশ নিয়ে আরো তৎপরতার সাথে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় বসে তবে হয়তো দু-দেশের বোঝা পড়ার মাধ্যমে মিয়ানমারের সুমতি আসতে পারে।

www.pathagar.com

সমগ্র সচেতন জনগোষ্ঠীর ৭০% লোক বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, রোহিঙ্গা সমস্যাটি বহু পুরাতন। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর ১৯৭৮ সালে আগত শরণার্থীদের ফেরত নেবার সময় মনে হয়েছিল আর এ সমস্যার সৃষ্টি হবে না। কিন্তু মিয়ানমার সরকার অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে; ফলে রোহিঙ্গারা পুনরায় এদেশে চলে আসে। ১৯৭৮ সাল পর্যন্তই এ সমস্যাটি দ্বি-রাষ্ট্রিক ছিল। বর্তমানে এটি আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বি-পক্ষীয় ভিত্তিতে সমস্যাটি স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে। জাতিসংঘ, ওআইসিসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্ব একত্রিতভাবে চাপ প্রয়োগ করা ছাড়া অর্থাৎ আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ ব্যতিত এ সমস্যার সমাধান হবে না।

'বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বি-রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক' উত্তরদাতা হলেন ১০%। তাঁদের মন্তব্য হলো, যেহেতু সমস্যাটি বাংলাদেশের কাঁধেই চেপে বসে; সুতরাং এটি বাংলাদেশেরও সমস্যা। আন্তর্জাতিক বিশ্ব ক্রমান্বয়ে এতে জড়িয়ে পড়ায় এটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সমস্যারূপে পরিগণিত হয়েছে। তাই বলে বাংলাদেশ এ সমস্যা থেকে মুক্ত নয় । এ জন্য সমস্যাটি বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বি-রাষ্ট্রিক এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক।

একজন শিক্ষাবিদ মন্তব্য করলেন, কেউ কেউ এটাকে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ কিংবা শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বিষয় উল্লেখ করে থাকেন। লাখ লাখ মানুষ সরকারি নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য প্রাণ ভয়ে এ দেশে প্রবেশ করলে মানুষ ও একই জাতি হিসেবে এটিকে অন্যের অভ্যন্তরীণ কিংবা শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বলে চুপ থাকা যায় না। পক্ষান্তরে তাদেরকে জোর করে স্বদেশে ঠেলে দেবার অধিকারও কারো নেই; এটা মানবতা বিরোধী কাজ। এদেশে আশ্রয় নিয়েছে বলেই শরণার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের দায়িত্বের বড় বোঝা বাংলাদেশকেই পালন করতে হয়। সেইসাথে মুসলিমবিশ্ব ও UNHCRসহ আন্তর্জাতিক বিশ্ব বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার কারণে বিষয়টিকে বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বি-রাষ্ট্রিক এবং আন্তর্জাতিক বলা যায়।

সাংবাদিক ও কলামিষ্ট এহসান রফিক উল্লেখ করেন, ফিলিস্তিনের মুসলমানদের মতোই হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে নিজ মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা মুসলমানরা। ফিলিস্তিনিরা যেমন ইহুদিবাদী ইসরাইলের আক্রমণের মুখে স্বদেশ ছেড়ে পাশের দেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। তেমনি রোহিঙ্গারাও মিয়ানমারের থাবায় বাংলাদেশসহ নানা দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। মুসলিম নিধনে মিয়ানমারের সাথে হাত মিলিয়েছে ভারত ও ইসরাইল। এক সময়ের স্বাধীন আরাকান রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ রোহিঙ্গারা মাতৃভূমিতে আজ তারা সংখ্যালঘু জাতিতে পরিণত হয়েছেন। অবশেষে ফিলিস্তিনি ও রোহিঙ্গাদের নিপীড়নের বিষয়ে ইসরাইল এবং মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের নীতির মিল থাকার রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। জানা গেছে, ২০১৭ সালে রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর গণহত্যা চালানোর জন্য যেসব সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছে বা হচ্ছে

www.pathagar.com

তা মিয়ানমারের সেনাবাহিনীকে সরবরাহ করেছে ইসরাইল। এ ছাড়া রোহিঙ্গাদের হত্যা-ধর্ষণ চালানোর জন্য অভিযুক্ত মিয়ানমারের সরকারি বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণও দিচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদিবাদী অবৈধ রাষ্ট্রটি।[৪৬] মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম মিডলইস্ট আই ও ইসরাইলি দৈনিক হারেজের প্রতিবেদনে ইসরাইল এবং মিয়ানমারের এ আঁতাতের তথ্য প্রকাশিত হয়।

রোহিঙ্গা সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যা উল্লেখ করে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, তারা কোনো দোষ করেনি। বাস্তবিক তাদের নিয়ে কোনো সমস্যাও ছিল না। কারণ তারা স্বাধীনতা দাবি করেনি, বিদ্রোহীও ছিল না। তবুও তারা রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর হাতে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে। তারা সেখানে কোনো কথা বলতে পারছে না, শুধু শাসকের বশ্যতা স্বীকার করে যাচ্ছে তবুও নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে তাদের। এটাকে আমরা বলি গণহত্যা। এটা মানবতার একটা মারাত্মক নিষ্ঠুর দিক। চীন পুঁজিবাদের ভূমিকায় থেকে মিয়ানমারকে সমর্থন করছে। এমন কি রাশিয়া এবং আমাদের বড় বন্ধুদেশ ভারতও একইভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে অবস্থানকারী রোহিঙ্গাদের মাতৃভূমিতে তাদের নিজ নিজ ঘরবাড়িতে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বিশ্ববাসীর কাছে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, মিয়ানমার সরকার এদের ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে না, এটা পরিষ্কার। এটা পুঁজিবাদের ফ্যাসিবাদী রূপ। এটা বর্বরতা ও অমানবিকতা। রোহিঙ্গা ইস্যু কোনো দ্বিপক্ষীয় সমস্যা নয় বরং এটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। বিশ্বের যারা মানবাধিকারে বিশ্বাস করেন তাদের মানতেই হবে যে এটা কোনো আঞ্চলিক সমস্যা নয় বরং বৈশ্বিক সমস্যা।[৪৭]

রোহিঙ্গা সমস্যাটি এখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপকভাবে আলোচিত। এমন কি জর্ডানের রানী রানিয়া আল আবদুল্লাহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম- টুইটার, ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম ও ওয়েবসাইটে মিয়ানমারের রাখাইন থেকে জাতিগত নিধনের শিকার হয়ে পালিয়ে বাংলাদেশে আসা বিপন্ন রোহিঙ্গাদের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। রানী টুইটারে এক পোস্টে লিখেছেন, কেন বারবার উপেক্ষা করা হচ্ছে বিপন্ন এই মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে? এই কাঠামোগত নিপীড়ন চলতে দেওয়া হচ্ছে কেন? তিনি আরেক পোস্টে উল্লেখ করেন, মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কুতুপালং শরণার্থী শিবিরে যে ভোগান্তি আমি দেখেছি এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কাছ থেকে যে দুর্ভোগের কথা শুনেছি- তা চরম যন্ত্রণাদায়ক ও মর্মান্তিক। অন্য পোস্টে লিখেছেন, মিয়ানমার থেকে গত দুই মাসে প্রায় ৬ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম বাংলাদেশে পালিয়ে গেছেন। তারা বছরের পর বছর ধরে বৈষম্য, অবিচার ও নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছে। একটি ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর দুর্ভাগ্যজনকভাবে পুরো দুনিয়ার সামনে এ ধরনের পদ্ধতিগত নিপীড়ন চলছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই রোহিঙ্গাদের দুর্দশার অবসান ঘটাতে হবে। তাদের অধিকার রক্ষা করতে হবে। জর্ডানের রানী বর্বর নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গাদের নিয়ে টুইটার ছাড়াও নিজের ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম এবং

www.pathagar.com

ওয়েবসাইটেও একই ধরনের বক্তব্য তুলে ধরেন।[৪৮] উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ২৩ অক্টোবর সোমবার জর্ডান থেকে রানী রানিয়া আবদুল্লাহ রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনের জন্য বিশেষ বিমানে ঢাকা হয়ে কক্সবাজারের আসেন। সেখানে তিনি উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করে তাদের দুর্দশার কথা শোনেন।

সমস্যাটি আন্তর্জাতিক হলেও চীন ও ভারত রোহিঙ্গাদের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি না দিয়ে বরং মিয়ানমারের পক্ষেই অবস্থান গ্রহণ করে। ২০১৭ সালের মিয়ানমারের এ মানবিক সংকটের মধ্যেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশটিতে সফর করেছেন। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে অব্যাহত সহিংসতার কারণে লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। নরেন্দ্র মোদি ও মিয়ানমারের নেতা অং সান সুচি এক যৌথ বিবৃতিতে রোহিঙ্গা সমস্যাকে 'সন্ত্রাসবাদ' বলে অভিহিত করে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছেন। রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারতের বিতর্কিত কূটনীতির পেছনে তাদের নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা। এদিকে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরেন রেজিজু স্থানীয় গণমাধ্যমকে বলেন, রোহিঙ্গারা নিবন্ধিত হোক বা না হোক, আইন অনুযায়ী তারা এ দেশে অবৈধ অভিবাসী। ভারত থেকেও তাদের ফেরত পাঠানো হবে।' ভারতীয় সরকারের তথ্যমতে, দেশটিতে বর্তমানে ৪০ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছে।[৪৯] চীন বাংলাদেশেরও বন্ধুপ্রতিম দেশ। কিন্তু রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীনের নীতিকে বাংলাদেশ প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়নি। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক আমেনা মহসিন মনে করেন, চীন এমন একটি রাষ্ট্র যারা নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। মিয়ানমারের সাথে চীনের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত। চীনের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' নীতির জন্য মিয়ানমারকে প্রয়োজন। তাই রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেবার বিষয়টিকে চীন সমর্থন করবে না। বিশিষ্ট কলামিষ্ট কাজী শওকত হোসেন উল্লেখ করেন, মিয়ানমারে চীনের ১৮ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আছে। রাশিয়া গ্যাস ও তেল ব্লকে তার বিনিয়োগ বাড়াবে। প্রচুর খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ আছে মিয়ানমারে। আয়তনে দেশটি বাংলাদেশের চেয়ে প্রায় ৫ গুণ বড়। জনসংখ্যা ৫ কোটি ১০ লাখ। ভারতও নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছে এখানে, ভবিষ্যতে বিনিয়োগ আরও বাড়াবে। বিশ্বের আরও ধনী দেশ এগিয়ে আসবে মিয়ানমারে বিনিয়োগ করতে।[৫০] ফলে চীন, রাশিয়া এবং ভারত মিয়ানমারকে সমর্থ করে যাচ্ছে।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর চলমান নির্যাতন ও গণহত্যা বন্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে বিশ্বব্যাপী। রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধ ও সমস্যা সমাধানের জন্য মিয়ানমারের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মিন অং হ্লাইংকে টেলিফোন করে পদক্ষেপ নিতে বলেছেন মার্কিন জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ এর চেয়ারম্যান জেনারেল জোসেফ ডানফোর্ড। তিনি বলেন, 'এই অবস্থা চলতে পারে না। ২০১৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার

www.pathagar.com

জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হেইলি এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সুচিকেই কেবল নয় সেনাবাহিনীকেও রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধে চাপ দিচ্ছে।[৫১] রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নৃশংসতা ও নিপীড়ন বন্ধে উদ্যোগ নিতে যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির ১৫৭ জন এমপি। রোহিঙ্গাদের সমর্থনে মিয়ানমারের গণতন্ত্রের জন্য গঠিত সর্বদলীয় কমিটির কো-চেয়ারম্যান ও লেবার পার্টির এমপি রুশনারা আলীর নেতৃত্বে পার্লামেন্ট সদস্যরা লিখিত চিঠিতে বলেন, 'জাতিসংঘ, মানবাধিকার সংগঠন ও রোহিঙ্গা সংগঠনের প্রতিবেদনে ভিত্তিতে আমরা মিয়ানমারের ইতিহাসে জঘন্যতম মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করছি।'[৫২]

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান রোহিঙ্গা নির্যাতনকে গণহত্যার শামিল বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় মানবাধকিার কমশিনরে চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদরে প্রতি যেভাবে র্বর্বর নির্যাতন, র্ধষণ, হত্যা ও অগ্নসিংযোগ চলছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। এটি ন্যাক্কারজনক গণহত্যা। এ জন্য মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আর্ন্তজাতিক আদালতে যাওয়া উচতি।[৫৩] ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফ এক টুইট বার্তায় বলেন, মিয়ানমারের জাতিগত নির্মূল অভিযান বন্ধ করতে চাইলে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত জরুরি।[৫৪] এরদোগানের ফোনের জবাবে সুচি বলেছেন, রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার সরকার নিরাপদে রেখেছে। রাখাইনকে সুরক্ষিত করছে মিয়ানমার সরকার। ব্রিটিশের প্রধান বিরোধী দল লেবার পার্টির নেতা জেরেমি করবিন সুচির উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'রোহিঙ্গাদের প্রতি মানবিক আচরণ করে তাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিন। আপনার দুর্দিনে আমরা আপনার প্রতি সদয় ছিলাম। আমরা রাজপথে আপনার জন্য মিছিল-মিটিং করেছি। পেছনের কথা ভুলে যাবেন না।' বৃটিশের ১৫৭ জন এমপি মিয়ানমারের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ বন্ধ করতে সেদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে। রোহিঙ্গা নিধন রোধে মিয়ানমারে সেফ জোন গঠনের পাশাপাশি গণহত্যা বন্ধে দেশটির ওপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য ৬১টি রোহিঙ্গা সংগঠন দাবি জানিয়েছে।[৫৫] এছাড়া মালদ্বীপ মিয়ানমারের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর নৃশংসতার প্রতিক্রিয়ায় এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকেও মিয়ানমারের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান বন্ধ করতে দেশটির প্রতি আহ্বান জানানো হয়। রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে রাশিয়ার চেচনিয়াতেও বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী পাকিস্তানের মালালা বলেছেন, রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে অবৈধ হলে শতাব্দিব্যাপী কীভাবে সেখানে তারা রয়েছে? রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নির্মমতার চিত্র দেখে আমার হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। বাংলাদেশি নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে দেয়া

www.pathagar.com

খোলা চিঠিতে রাখাইনে দ্রুত মানবিক বিপর্যয় বন্ধে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টনি গুতেরেস মিয়ানমারের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করে তাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিন।' আর যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করে মিয়ানমার পরিস্থিতির জন্য দায়সারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।[৫৬] মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানরা ব্যাপক হারে মানবতাবিরোধী অপরাধের শিকার হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়েল গ্রান্ড ইমাম ড. আহমেদ আল তাইয়েব। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে গ্রান্ড ইমাম ড. তাইয়েব বলেন, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের হত্যা ও বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটছে যা মানবতাবিরোধী অপরাধ। এসব নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ড সব ধর্মের শিক্ষার বিরোধী ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী স্পষ্টতই অপরাধ।[৫৭] আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা অনেকেই মনে করেন, জাতিসংঘ মহাসচিবের বক্তব্য ও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ- স্রেফ দায় এড়ানো ছাড়া কিছুই নয়। আর রাশিয়া তো চীন-ভারতের মতো প্রকারান্তরে মিয়ানমারের গণহত্যাকে সমর্থন করেই চলেছে।

মিয়ানমারে সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গাদের ওপর 'গণহত্যা' চলছে জানিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জোট আসিয়ানের সদস্য দেশগুলোর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ। শুক্রবার কুয়ালালামপুরে রোহিঙ্গাদের দুর্দশা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা চালানোর জন্য মিয়ানমারকে আসিয়ান জোট থেকে বহিষ্কার করা উচিত। তিনি বলেন, রোহিঙ্গারা গত আটশ' বছরের বেশি সময় ধরে মিয়ানমারের অংশ হয়ে রয়েছে। তাদের জন্মভূমি থেকে এভাবে বিতাড়ন আইনের বিরোধী। এশিয়া ওয়ান মালয়েশিয়া নিউজ অনলাইনের প্রতিবেদনে বলা হয়, মিয়ানমার থেকে নারী, শিশুসহ হাজারো রোহিঙ্গা সম্প্রতি মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় করে মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের দিকে পাড়ি জমায়। মানব পাচারকারীদের শিকার হওয়া ছাড়াও দমনপীড়নের কারণে তারা দেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে বলে অভিযোগ আছে।[৫৮] মাহাথির বলেন, এটি শুধু নৌকার সমস্যা নয়। কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ নয়– এমন বিবেচনায় আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর চুপ করে থাকার সমালোচনা করেন তিনি। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর বৈষম্য ও 'গণহত্যার' বিষয়ে ইঙ্গিত করে মাহাথির বলেন, হতে পারে এটি কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু জনগণের ওপর এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার করার অধিকারও কোনো দেশের নেই। তিনি আরো বলেন, স্বাধীনতার পবিত্রতা সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণা পাল্টাতে হবে। আর মালয়েশিয়ার সরকারের উচিত হবে, রোহিঙ্গাদের বিষয়টি আসিয়ানে তোলা। গণহত্যা চালায়, এমন কোনো দেশ আসিয়ানের সদস্য থাকুক, আমরা তা সমর্থন করতে পারি না। এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ আমাদের করতেই হবে। মানবিক আচরণ করার আহ্বান মিয়ানমার যথাযথ সাড়া দেয়নি। বরং তারা নির্মমভাবে মানুষ হত্যা করে

www.pathagar.com

চলেছে। রোহিঙ্গারা এমন ভাগ্য আশা করে না। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের বিষয়টি আসিয়ানের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে তোলারও পরামর্শ দেন মাহাথির। তিনি বলেন, বিষয়টি আমরা জাতিসংঘে তুলতে পারি। দেশটিকে একঘরে করা উচিত।[৫৯] জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত অন্তত ২৫ হাজার রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশিকে পাচারকারীরা নৌকায় করে মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। যাদের মধ্যে ৩০০ জন মারা গেছেন।

এ প্রসঙ্গে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী দেশমন্ড টুটু রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে গণহত্যা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। রোহিঙ্গাদের নানা ধরনের অপবাদ দিয়ে কলঙ্কিত করা হচ্ছে, তাদেরকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন এবং একঘরে করে রেখে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের ওপর ধীরে ধীরে গণহত্যা চালানো হচ্ছে। চলতি বছর মিয়ানমার সরকার যাদের নাগরিকত্ব নেই বিশেষত রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে পরিচয়পত্র কেড়ে নিয়েছে। চলতি বছরের শেষের দিকে দেশে নির্বাচন হওয়ার কথা। প্রার্থীদের নির্বাচনে জেতার জন্য রোহিঙ্গাবিরোধী প্রচারণা চালানোর জন্য প্রলুব্ধ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৬০]

রোহিঙ্গাসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে মিয়ানমার সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্থায়ী গণ আদালত ২০১৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার আন্তর্জাতিক অপরাধ তদন্তে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও আইনজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত সাত সদস্যের বিচারক প্যানেল এ প্রতীকী রায় ঘোষণা করে। তারা মিয়ানমারের রোহিঙ্গা, কাচিন ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রায় ২০০ নির্যাতিত মানুষের সাক্ষ্য, ডকুমেন্টারি এবং বিশেষজ্ঞ মতামত পর্যালোচনা করে এই রায় ঘোষণা করেছেন। একইসঙ্গে মিয়ানমারে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ বন্ধে অবিলম্বে দেশটির ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা জারি, মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের বিদেশে থাকা ব্যাংক হিসাব জব্দ, মিয়ানমারের বাইরে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারিসহ মোট ১৭ দফা সুপারিশ করে এ আদালত। ২০১৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মালয়শিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ইন্টারন্যাশনাল পার্মানেন্ট পিপলস ট্রাইব্যুনালে এই বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে গঠন করা এই ট্রাইব্যুনালে পাঁচ দিন ধরে টানা শুনানি চলে। প্রধান বিচারক আর্জেন্টিনার সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজের প্রতিষ্ঠাতা ড্যানিয়েল ফিয়েরেস্টেইন এই রায় পড়ে শোনান। ফিয়েরেস্টেইন বলেন, মিয়ানমার সরকার গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। মিয়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনীকে কাচিন ও মুসলিম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা চালানোর জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে।[৬১] মালয়েশিয়াভিত্তিক দ্য স্টার অনলাইনের খবরের ভিত্তিতে দৈনিক ইত্তেফাক অনলাইন ভার্সনে এ তথ্য জানানো হয়।

www.pathagar.com

বিচারক গিল এইচ বোয়েরিঙ্গার কয়েকটি সুপারিশ ঘোষণা করেন। এর মধ্যে মিয়ানমারকে মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংস অভিযান থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা, কাচিন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতার তথ্য জানতে জাতিসংঘের তথ্য অনুসন্ধান দলকে অবশ্যই সে দেশে ভিসা এবং সহজে প্রবেশাধিকার দিতে হবে। নিপীড়িত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও নাগকিত্বের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক বিলোপ করে মিয়ানমার সরকারকে অবশ্যই সংবিধান সংশোধন করতে হবে। বিচারক গিল বোয়েরিঙ্গার আরও বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সহিংসতার মুখে প্রাণভয়ে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া দেশ যেমন বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়াকে অবশ্যই আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। ট্রাইব্যুনালের অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্য, রায় এবং সুপারিশ অবশ্যই আন্তর্জাতিক মহল এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে প্রদান করা হবে যাতে সেগুলো মেনে চলার জন্য তারা মিয়ানমার সরকারকে চাপ দিতে পারে।

রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন এই গণআদালতের সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম্যান চন্দ্র মুজাফফর। তিনি বলেন, প্রসিকিউশনের যুক্তিতর্ক, বিশেষজ্ঞ সাক্ষীদের মতামত, ভুক্তভোগীদের সাক্ষ্য, বিশ্লেষণ করে দেওয়া এ রায় মিয়ানমার যে ধরনের অপরাধ করছে তা শনাক্ত করার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ গণআদালত গণহত্যাকারী ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের চিহ্নিত করেছে। মিয়ানমারের নৃশংসতা অপরাধের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জোট ও প্রতিষ্ঠান যেমন-আসিয়ান, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ও পরাশক্তিধর দেশগুলো এ গণআদালতের অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্য এবং রায়কে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। আদালতের করা ১৭ দফা সুপারিশের মধ্যে আরো আছে মিয়ানমার সরকার এবং আসিয়ান প্রতিনিধিরা রাখাইনের সকল সশস্ত্র গ্রুপকে নিয়ে একটি অস্ত্রবিরতির প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা শুরু করবে। অং সান সু চির ঘোষিত 'যাচাই প্রক্রিয়ায়' রোহিঙ্গাসহ সব গোষ্ঠীকে পূর্ণ নাগরিকত্ব দিতে হবে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সংস্থাকে রাখাইনের ঘটনা তদন্তের অনুমতি দিতে হবে। মিয়ানমারের পার্লামেন্টে সামরিক প্রতিনিধির কোটা বাতিল করতে হবে। সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশকে পূর্ণ বেসামরিক নিয়ন্ত্রণে আনতে সংবিধানে নিশ্চয়তা থাকতে হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের দায়মুক্তি না দিয়ে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।[৬২] যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ম্যাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনোসাইড স্ট্যাডিজ অ্যান্ড প্রিভেনশনের গবেষক অধ্যাপক গ্রেগরি স্ট্যানটনও জবানবন্দি দেন। তিনি বলেন, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী, পুলিশ, বৌদ্ধ মিলিশিয়া এবং দেশটির বর্তমান বেসামরিক সরকার মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যা চালিয়েছে। সেখানে রোহিঙ্গারা রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের শিকার। এ অভিযোগের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো কোনোও নোবেল বিজয়ী আন্তর্জাতিক গণআদালতে বিচারের মুখোমুখি হন। বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হকও শুনানিতে অংশ নেন। এর দ্বারা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এটি এখন আন্তর্জাতিক বিষয়।

www.pathagar.com

৬.১০ রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বাংলাদেশের ভূমিকা

রোহিঙ্গা সমস্যার বোঝা বাংলাদেশকে বহন করতে হয় বলে বাংলাদেশ সরকার এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন। প্রাথমিকভাবে শরণার্থী আগমনে বাংলাদেশ মিয়ানমারকে হুঁশিয়ারী প্রদান,[৬৩] দ্বি-পক্ষীয় আলোচনা[৬৪] আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ কামনাসহ[৬৫] বহুমুখী প্রচেষ্টা অবলম্বন করে। বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকাকে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন মহল প্রশংসা করলেও[৬৬] কোন কোন মহল এ ভূমিকাকে দূর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন।[৬৭] বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠী এ ব্যাপারে কি দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তা জানার জন্যই এ প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের উত্তরে বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠীর ১৭ জন অর্থাৎ ৪২.৫% উত্তরদাতা রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বাংলাদেশের মুখ্য ভূমিকা হওয়া উচিৎ বলে মতামত দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যকার অধিকাংশের দৃষ্টিভঙ্গি এমন যে, জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে কাজ করলেও রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে শধুমাত্র শরণার্থীদের অস্থায়ী পুনর্বাসন, ভরণ-পোষণ তথা শরণার্থী জীবন যাপনে সার্বিক সহযোগিতা করছে। রোহিঙ্গা সমস্যার অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশকেই এ সমস্যা সমাধানে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। রোহিঙ্গা সমস্যাকে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের নিকট গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরতে হবে; এক্ষেত্রে বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে সমস্যা সমাধানের জন্য উৎসাহিত করে ওআইসিসহ আন্তর্জাতিক মুসলিম সংস্থাগুলো মিলে জাতিসংঘের কাছে এর গুরুত্ব তুলে ধরে চাপ সৃষ্টি করতে হবে ।

একজন কলামিষ্ট বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনায় মন্তব্য করলেন, যেহেতু রোহিঙ্গা সমস্যার জন্য ক্ষতিগস্ত হয় বাংলাদেশ। তাই রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বাংলাদেশকেই উদ্যোগ নিতে হবে। মিয়ানমারের মিলিটারী শাসকরা বিশ্ব মতামতের খুব একটা ধার ধারে বলে মনে হয় না। সে দেশের বিরোধী নেত্রী, নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত অংসান সুকি দীর্ঘদিন যাবৎ বন্দী অবস্থায় দিনাতিপাত করেছেন। তাকে বন্দী রাখার প্রতিবাদে বিশ্বের সর্বত্র তীব্র প্রতিক্রিয়া হলেও সেনাবাহিনী তার প্রতি কর্ণপাত না করে তাদের ইচ্ছামত পদ্ধতিতে নামে মাত্র মুক্তির কথা বলেছে। এমন কি রাষ্ট্রশাসনের কাজটি এখনো সেনাবাহিনীই করে যাচ্ছে। কাজেই বাংলাদেশকে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে সরাসরি মিয়ানমার সরকারের সাথেই আলাপ করতে হবে।

আর অধিকাংশ অর্থাৎ ৫৭.৫% উত্তরদাতা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের ভূমিকাকে সাহায্যকারী হিসেবে মতামত পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। রোহিঙ্গা সমস্যার ঝুঁকি বাংলাদেশকে বহন করতে হলেও সাহায্যকারী ভূমিকা পালন ছাড়া আর বেশি কিছু করার ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। ওআইসি, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং মুসলিম বিশ্বের কাছে রোহিঙ্গা সমস্যাকে গুরুত্বসহকারে তুলে ধরার পাশাপাশি মিয়ানমার সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা উচিৎ।

www.pathagar.com

একজন শিক্ষাবিদ মন্তব্য করলেন, রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বাংলাদেশের ভূমিকা সাহায্যকারীই হবে, তবে গুরুত্বের দিক থেকে অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ সমস্যাটি নিয়ে বিশ্ব সম্প্রদায় এবং আশ্রয়দাতা দেশ হিসেবে বাংলাদেশও অবহেলার চোখে দেখে আসছে বলেই সমস্যাটি আজ আরাকানের ভিতরে ও বাইরে চরম আকার ধারণ করেছে। ১৯৭১ সালে যদি ভারত সরকার বাংলাদেশের সাহায্যে এগিয়ে না আসতো তবে এদেশবাসীকেও বিপাকে পড়তে হত। আফগানদের যদি পাকিস্তান সাহায্য না করতো, তবে আফগানদের দূর্গতি অনেক বাড়তো। পার্শ্ববর্তী দেশগুলো যদি আরো অধিক হারে বসনিয়দের সাহায্য করতো তবে বসনিয়া ট্রাজেডী এতটা ভয়ংকর রূপ নিতো না। সুতরাং আরাকানী মুসলমানদের সাথে বাংলাদেশের সহস্র বছরের বন্ধন ও ঐতিহ্যকে সামনে রেখে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও ধর্মীয়সহ বহুমাত্রিক বন্ধনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে দেশের স্বার্থে; মানবতার স্বার্থে বাংলাদেশের এগিয়ে আসা উচিত।

৬.১১ মিয়ানমার সরকারের রোহিঙ্গানীতি পক্ষান্তরে তথাকার মুসলিম জাতিসত্ত্বা বিনাশের সুগভীর চক্রান্ত কিনা

মুসলিম বিশ্বের মানচিত্র আজ বিবর্ণ। রক্তক্ষয়, হত্যা, ধর্ষণ ও সীমাহীন নিপীড়নের মুখে মুসলমানদের জীবন ও অস্তিত্ব এখন হুমকির সম্মুখীন, ইসলামের নাম বলা এবং মুসলিম হিসেবে পরিচয় দান করাই যেন আজকাল চরম অপরাধ; আর এ জন্যই হিন্দু, খৃস্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ সব জাতিগোষ্ঠী মুসলিম জনগোষ্ঠীকে উৎখাত করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের ইতিহাস ঐতিহ্যকে নির্মূল করতে উঠে পড়ে লেগেছে। জাতিসংঘ, ইসি, এপেকসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো দেখেও না দেখার ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে মুসলিম রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক মুসলিম সংস্থাগুলো নানা শ্রেণি মত বিভেদে লিপ্ত হয়ে নিজেদের সামাল দিতে ব্যস্ত। ফলে এক ভয়াবহ আগ্রাসনের মুখে মুসলামানদের অস্তিত্ব বিলিন হতে চলেছে; তারই এক উজ্জ্বল নজীর আরাকান।[৬৮]

আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের উচ্ছেদ এবং নির্মূল করার জন্য সামরিক জান্তা (SLORC) সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু সামরিক অভিযান নয়, রোহিঙ্গা মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। নে উইনের ২৬ বছরের লৌহ শাসনে সে পদক্ষেপকে আরো জোরদার করা হয়। রোহিঙ্গাদেরকে মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে তাদেরকে দেশহীন (Stateless) ঘোষণা করেছে অথচ হাজার বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আরাকান রোহিঙ্গাদের পৈতৃক আবাসভূমি। বর্তমানে মিয়ানমার সামরিক সরকার রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য জবরদস্তিমূলক কঠোর শ্রমে নিয়োগ, বসতি উচ্ছেদ, জমি বাজেয়াপ্তকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা-নিষেধ আরোপ, যাতায়াতের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, খাদ্যদ্রব্য বাজেয়াপ্তকরণ ও মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংসের মধ্যদিয়ে রোহিঙ্গা উচ্ছেদে মরিয়া হয়ে

www.pathagar.com

উঠেছে।[৬৯] সত্যিকার অর্থেই কি মিয়ানমার সরকারের এ রোহিঙ্গানীতি পক্ষান্তরে তথাকার মুসলিম জাতিসত্ত্বা বিনাশের সুগভীর চক্রান্ত? বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠীর নিকট এ আর এক জিজ্ঞাসা।

উল্লেখ্য যে, প্রশ্নোত্তরে ২জন উত্তরদাতা কোন মন্তব্য না করায় একটি কলাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। সচেতন জনগোষ্ঠীর ৯০% উত্তরদাতা মিয়ানমার সরকারের রোহিঙ্গানীতিকে তথাকার মুসলিম জাতিসত্তা বিনাশের সুগভীর চক্রান্ত বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের অধিকাংশের যুক্তি হল, রোহিঙ্গাদেরকে নিজস্ব বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে সেখানে বিভিন্ন স্থান থেকে মগদের এনে পুনর্বাসিত করার পিছনে এছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে?

একজন শিক্ষাবিদ আফসোস করে বললেন, মিয়ানমারের স্বাধীনতার পর থেকেই শাসকগোষ্ঠী রোহিঙ্গা উৎখাতের চক্রান্তে মেতেছে। রেডিওতে রোহিঙ্গাদের (রোঁয়াই ভাষায়) অনুষ্ঠান প্রচার, ইসলামি তাহযিব-তমুদ্দুনের প্রচারসহ বিভিন্ন কৌশলে স্বাধীনতাকামী রোহিঙ্গাদেরকে নিরস্ত্র করেছে। অতঃপর ১৯৭৮ সালে ড্রাগন অপারেশন দিয়ে মুসলিম নিধনের বিরাট পরিকল্পনা নিলেও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সফল কুটনৈতিক পদক্ষেপ ও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তাদের পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হতে পারেনি; রোহিঙ্গাদেরকে আবার ফেরত নিতে হয়েছে। অতঃপর মুসলমানদের পর্যায়ক্রমে নিঃশেষ করার জন্য ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনের নামে মুসলমানদের হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্যকে মুছে ফেলে নিজ দেশে পরবাসী করেছে। সমস্ত নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করে সেখানে মগদের পুনর্বাসন করছে। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, মিয়ানমার সরকারের রোহিঙ্গানীতি পক্ষান্তরে তথাকার মুসলিম জাতিসত্তা বিনাশের সুগভীর চক্রান্তই প্রমাণীত হয়। কিন্তু একজন বৌদ্ধ সাংবাদিক ও কলামিষ্ট এবং একজন রাজনীতিবিদ এ ব্যাপারে না বোধক উত্তর দিয়েছেন। তাদের যুক্তি হল- সামরিক শাসকের হাতে শুধু রোহিঙ্গারাই নয়; অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীও নির্যাতিত হচ্ছে। তাই মিয়ানমার সরকারের রোহিঙ্গানীতিকে মুসলিম জাতিসত্ত্বা বিনাশের সুগভীর চক্রান্ত বলা যাবেনা।

উল্লেখ্য যে, ২০১১ সাল থেকে মিয়ানমার যখন রাজনৈতিক উদারীকরণের দিকে যাত্রা শুরু করে, তখনই সেখানে উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। সবচেয়ে প্রভাবশালী জাতীয়তাবাদী সংগঠন হলো 'অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য প্রটেকশন অব রেস অ্যান্ড রিলিজিয়ন', বার্মিজ ভাষায় যার সংক্ষিপ্ত নাম 'মাবাথা'। ২০১৩ সালের ২৭ জুন সংগঠনটির জন্ম। এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৫২জন সদস্য আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়ে গড়া এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য মিয়ানমারে তাদের জাতি ও ধর্ম রক্ষা করা। সরকার এ গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলেও কার্যত তেমন ফল আসেনি। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের মতে, মিয়ানমার সরকার মাবাথার বৈশিষ্ট্য ও জনসমর্থন বুঝতে ভুল করেছে। ওই সংগঠনটি ইসলামবিরোধী বা রাজনৈতিক লক্ষ্য বেশি প্রচার না করে বৌদ্ধ

www.pathagar.com

ধর্ম রক্ষার বিষয়টিই গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মাবাথার অনেক ভিক্ষু চরম মুসলমানবিরোধী মনোভাব নিয়ে ধর্ম ও জাতি রক্ষার নামে সহিংসতায় উসকানি দিয়ে থাকে।[৭০] এর ফলে মিয়ানমারে মুসলমানবিরোধী আরো সহিংসতার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। আইএসসিআইয়ের পরিচালক অধ্যাপক পেনি গ্রিন ২০১২ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর হামলাকে 'গণহত্যার প্রক্রিয়া' হিসেবেই অভিহিত করেছিলেন।[৭১] ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন দেশে গণহত্যার প্রক্রিয়া শুরু হয় কোনো জনগোষ্ঠীর ওপর কলঙ্কলেপন, হয়রানির মাত্রা বৃদ্ধি, বিচ্ছিন্নকরণ এবং ধারাবাহিকভাবে নাগরিক অধিকারগুলো থেকে এক এক করে বঞ্চিত করার মধ্য দিয়ে। সেই ধাপগুলো সম্পন্ন করার পরই গণহত্যার শেষ ধাপটি কার্যকর করা হয়।

২০১২ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ব্যাপক নির্যাতন-নিপীড়নের পটভূমিতে সে সময় দুই শতাধিক রোহিঙ্গা মুসলমানকে হত্যার কথা উল্লেখ করা হয়। কুইন মারি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের ইন্টারন্যাশনাল স্টেট ক্রাইম ইনিশিয়েটিভের গবেষকদের মতে, তখন ওই সহিংসতার আয়োজন করা হয়েছিল। রাখাইনে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর হামলার জন্য অন্যদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে ছুরি রাখতে বলা হয়েছিল। এ জন্য তাদের বিনা মূল্যে খাবার দেওয়া হয়েছে। মুসলমানবিরোধী আবহে রাখাইনে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও রাজনীতিকরা তাদের ধর্ম ও জাতি রক্ষায় মুসলমান রোহিঙ্গা জনসংখ্যার সম্প্রসারণ ঠেকাতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।[৭২] নির্বাচনে পরাজয় এড়াতে তখন সরকার এটি করেছিল।

২০১৫ সালেই পেনি গ্রিন বলেছেন, গণহত্যার পথের পাঁচটি ধাপের মধ্যে চারটি ধাপ মিয়ানমার বেশ আগেই সম্পন্ন করেছে। শেষ ধাপটি মিয়ানমারের পক্ষে করা অসম্ভব নয়। ২০১২ সালে রোহিঙ্গাদের নির্বিচারে হত্যার কোনো বিচার হয়নি। ২০১২ সালের পর গত বছর অক্টোবর মাস থেকে রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে নতুন করে হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু হলে জাতিসংঘ একে মানবতাবিরোধী অপরাধ বলে আশঙ্কা করেছিল। সে সময় অভিযোগগুলো তদন্তে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ আন্তর্জাতিক তদন্ত দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেও মিয়ানমার সেই দলকে দেশটিতে ঢুকতে দেয়নি। রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমারের জাতিগত নিধনযজ্ঞ চালানোর অভিযোগ তুলেছে বিশ্বের অনেক মানবাধিকার সংস্থা। ব্রাসেলসভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ ২০১৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর 'বুড্ডিজম অ্যান্ড স্টেট পাওয়ার ইন মিয়ানমার' শীর্ষক প্রতিবেদনে মিয়ানমার সমাজে উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের উত্থান, রাষ্ট্রীয় নীতিতে হস্তক্ষেপ, মুসলমানবিরোধী বক্তব্যের কথা স্থান পেয়েছে।[৭৩]

এহসান বিন মুজাহির একটি কলামে উল্লেখ করেন, এটা অবশ্যই মুসলিম জাতিসত্ত্বা বিনাশের সুগভীর চক্রান্ত। নিরীহ রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর এ নৃশংস বর্বরতার নিন্দা জানানোর ভাষা অভিধানে আজ পরাজিত! বার্মার মজলুম রোহিঙ্গা মুসলমানের কান্নায় পৃথিবীর আকাশ ভারি হয়ে উঠছে। মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুরা

www.pathagar.com

বাঁচাও বাঁচাও বলে আর্তচিৎকার করছে। মিয়ানমারের বর্বর সরকার তাদের ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালাচ্ছে। হত্যা করছে অসংখ্য নিষ্পাপ শিশু, যুবক, বৃদ্ধাদের। ধর্ষণ করে কলঙ্কিত করছে অসংখ্য মা-বোনদের। বিধবা করছে হাজারো নারীদের। সন্তানহারা করছে অসংখ্য মাকে। মজলুম রোহিঙ্গা মুসলমানদের আহাজারিতে পৃথিবীর আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠছে।[৭৪] তিনি আরো বলেন, রাখাইন প্রদেশে সম্প্রতি শুরু হওয়া রোহিঙ্গাদের ওপর ভয়াবহ অত্যাচার-নির্যাতন চালাচ্ছে মিয়ানমার সরকার। মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে বসবাসকারী আদিবাসী রোহিঙ্গা মুসলমানরা কয়েক দশক ধরে জাতিগত নিধনের শিকার হচ্ছে। তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতেও অস্বীকার করে আসছে মিয়ানমার সরকার। ২০১৭ সালের ৯ অক্টোবর থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যা অভিযান চালাচ্ছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী, সীমান্তরক্ষী এবং সীমান্ত পুলিশ। বিবিসি, ইরাবদী, ডিবিভি এবং এএফপিসহ সব মিডিয়া সংবাদ জানাচ্ছে রাখাইন প্রতিবেদক এবং সরকারি সূত্রের বরাতে। এমনটি তারা ২০১২ সালের রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের সময়েও করেছিল। রোহিঙ্গারা মূলত মিয়ানমারের নাগরিক। ধর্মীয় পার্থক্য ও বৈপরীত্যের কারণেই রোহিঙ্গাদের উপর এমন নির্যাতন চালানো হচ্ছে।[৭৫] মুসলিম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর সামরিক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অমানবিক এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মুসলমানশূন্য করার খেলায় মেতে উঠেছে।

রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন ও ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় মিয়ানমারকে সতর্ক করেছে জাতিসংঘ। রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে কোনো অবস্থান নিতে ব্যর্থ হওয়ায় মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সুচির নোবেল শান্তি পুরস্কার ফিরিয়ে নেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ জন্য অনলাইনে এক আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন হাজার হাজার মানুষ। পক্ষান্তরে মিয়ানমারে কোনো জাতিগত নিধন বা গণহত্যার মতো ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি করেছে মিয়ানমার। রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ডাকা বৈঠকে দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এ দাবি করেন। উন্মুক্ত আলোচনায় জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস রাখাইন রাজ্যে সেনা অভিযান বন্ধের আহ্বান জানিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের প্রেক্ষিতে তিনি একথা বলেন। ২০১৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্ব বৃহস্পতিবার নিরাপত্তা পরিষদের এ বৈঠক শুরু হয়। যেখানে মিয়ানমারের নিরাপত্তা পরিষদ উপদেষ্টা উ থাং টুন বলেন, 'মিয়ানমারে কোনো জাতিগত নিধন বা গণহত্যার মতো ঘটনা ঘটেনি। এখানে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে। বর্তমানে আমরা যে পরিস্থিতি মোকাবেলা করছি সেটা ধর্মীয় নয়, সন্ত্রাসবাদের কারণে।' এর আগে বৈঠকের শুরুতে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মিয়ানমার থেকে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। যাতে মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে। এটা চরমপন্থাকে উস্কে দিতে পারে।[৭৬] রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর হত্যা,

www.pathagar.com

অগ্নিসংযোগ, মাইন পুতে রাখা, যৌন সহিংসতার মতো ঘটনা ঘটেছে। জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের দূত নিকি হ্যালিও এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । প্রথম আলো প্রত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে মং জার্নি অত্যন্ত শক্তভাবেই উল্লেখ করেন, মনে রাখতে হবে, তাঁদের চূড়ান্ত স্ট্র্যাটেজিক স্কিম হচ্ছে রোহিঙ্গাদের জাতিসত্তা, তার ইতিহাস, পরিচিতি ও আইনগত অবস্থান ধ্বংস করা। আপনাদের মনে যদি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ দানা বাঁধে, তাহলে গত ২৫ বছরের জাতিসংঘের ডকুমেন্টগুলো, মানবাধিকারের নথিপত্র এবং ১৯৭৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রেস ক্লিপিংগুলো পাঠ করুন।[৭৭] জাতিগত নিধনের বিষয়ে অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন সেন্টার ফর কনটেম্পোরারি কনসার্নস, বার্লিন, জার্মানির রিসার্চ ফেলো ড. মারুফ মল্লিক।[৭৮] গণহত্যা, বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ, ধর্ষণ, প্রভৃতি অমানবিক নির্যাতনের মধ্যদিয়ে মিয়ানমার প্রশাসন রোহিঙ্গাদের জাতিগত নির্মূলের সব প্রক্রিয়া চালু রেখেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার-সংক্রান্ত হাইকমিশনার জাইদ রা'দ আল-হুসেইন এ নিপীড়নকে 'জাতিগত নির্মূলের এক আদর্শ উদাহরণ' বলে অভিহিত করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে পালিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতে শুরু করে রোহিঙ্গারা। সেই ঢল এখনো শেষ হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ গবেষক তেজশ্রী থাপা বলছেন, যেসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসছেন, তাঁদের কারোই মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার আশা নেই। তিনি বলেন, 'বাস্তব অবস্থা খুব খুব খারাপ। কোনো ছবি দিয়ে সেটি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি অনেক শরণার্থীদের সঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু কোনো শরণার্থীদের এতটা বিধ্বস্ত অবস্থায় পাইনি। মানবাধিকারকর্মী ও বার্মিজ রোহিঙ্গা অর্গানাইজেশন ইউকের প্রেসিডেন্ট তুন খিন বলেন, রোহিঙ্গারা অনেক বছর ধরেই গণহত্যার সম্মুখীন হচ্ছে। মিয়ানমারের উগ্র জাতীয়তাবাদীদের সহজ লক্ষ্য তারা। রোহিঙ্গারা একটি ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী এবং এদের চেহারা ও ধর্ম দুই-ই ভিন্ন। সুতরাং রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করাও সহজ। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ক্রাইসিস রেসপন্স বিভাগের পরিচালক তিরানা হাসান এক বিবৃতিতে বলেন, অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার থেকে বিতাড়নের জন্য মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী রাখাইন রাজ্যে সুনির্দিষ্টভাবে প্রচারাভিযান চালিয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে জাতিগত নির্মূল বলাটা কোনো ভুল নয়। সেখানে ছকে বাঁধা নিয়মে ও পূর্বপরিকল্পিতভাবে রোহিঙ্গাদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। নিরাপত্তা বাহিনী একেকটি গ্রাম প্রথমে ঘিরে ফেলছে, পরে গুলি করছে এবং আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। আইনি ভাষায় বললে, এটি হলো মানবতাবিরোধী অপরাধ।[৭৯] এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত হিউম্যান রাইটস ওয়াচের গবেষণা কর্মকর্তা তেজশ্রী থাপা। আগে চালানো হামলার সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, এটি একটি সুসমন্বিত কর্মসূচি। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, সবাইকে তাড়িয়ে দেওয়াই এর মূল লক্ষ্য।

www.pathagar.com

রোহিঙ্গা গণহত্য ও স্বদেশ থেকে বিতাড়ন প্রসঙ্গে *প্রথম আলো* প্রত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে মং জার্নি অত্যন্ত শক্তভাবেই উল্লেখ করেন, মনে রাখতে হবে, তাঁদের চূড়ান্ত স্ট্র্যাটেজিক স্কিম হচ্ছে রোহিঙ্গাদের জাতিসত্ত্বা, তার ইতিহাস, পরিচিতি ও আইনগত অবস্থান ধ্বংস করা। আপনাদের মনে যদি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ দানা বাঁধে, তাহলে গত ২৫ বছরের জাতিসংঘের ডকুমেন্টগুলো, মানবাধিকারের নথিপত্র এবং ১৯৭৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রেস ক্লিপিংগুলো পাঠ করুন।[৮০] সুতরাং এ বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকার অবকাশ নেই যে, মুসলিম জাতিসত্ত্বার মূলোৎপটই মিয়ানমারের লক্ষ্য।

৬.১২ মিয়ানমার সরকারের রোহিঙ্গানীতি প্রতিরোধের জন্য কি বসনিয়া ও কসভো স্টাইলে সামরিক অভিযান প্রয়োজন?

নব্বই দশকের মুসলিম উচ্ছেদ ট্রাজেডীর বিশ্বময় আলোচিত দেশ হলো বসনিয়া ও কসভো। মুসলমানদেরকে দল বেঁধে বিভিন্ন জঙ্গল, ফ্যাক্টরি অথবা খনিতে গাদাগদি অবস্থায় ফেলে রেখে এ্যালসেশিয়ান কুকুর ছেড়ে দিয়ে, মাতাল সেনারা বন্দী শিবিরে প্রবেশ করে অমানবিকভাবে গুলি চালিয়ে বা বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করে নির্বিঘ্নে মানুষ হত্যা করে। বন্দী শিবিরে হাজার হাজার মহিলাদেরকে এনে গণধর্ষণ করে বিভিন্ন লোমহর্ষক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়। বাড়িঘরে আগুন দিয়ে শিশু ও বৃদ্ধ মহিলাদেরকে হত্যা করা হয়। কৃত্রিম দূর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়।[৮১] আরাকানের মুসলমানদের ভাগ্যে ঠিক একই অবস্থা। এ নিষ্ঠুর নির্যাতনের মোকাবেলায় জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থা যথা– (Europeo Community (EC), West Europeo Union (WEU), NATO সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যেভাবে বসনিয়া ও কসভোতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছে;[৮২] মিয়ানমার সরকারের রোহিঙ্গানীতি প্রতিরোধের জন্য বসনিয়া ও কসোভোর স্টাইলে সামরিক অভিযান প্রয়োজন কিনা বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠীর নিকট সর্বশেষে এটাই জিজ্ঞাসা।

সচেতন জনগোষ্ঠীর ২২.৫% উত্তরদাতা মিয়ানমার সরকারের রোহিঙ্গানীতি প্রতিরোধের জন্য বসনিয়া ও কসোভো স্টাইলে সামরিক অভিযানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে, মিয়ানমারের সামরিক সরকার রোহিঙ্গাদের সাথে যে নিষ্ঠুর আচরণ করছে তাতে সামরিক অভিযান জরুরী। ওআইসিসহ মুসলিম বিশ্ব যদি ঐক্যবদ্ধভাবে জাতিসংঘকে প্রকৃত অবস্থার আলোকে সামরিক অভিযান প্রেরণে বাধ্য করতে পারত তবে খুব ভালো হতো।

একজন উত্তরদাতা কোন মন্তব্য করেননি। অবশিষ্ট ৭৫% উত্তরদাতা সামরিক অভিযানকে অপ্রয়োজনীয় মনে করছেন। তবে প্রায় সকলেই উল্লেখ করেছেন যে, জাতিসংঘের পক্ষ থেকে মিয়ানমারে পর্যবেক্ষক পাঠিয়ে সঠিক অবস্থা অবগত হয়ে কঠোরভাবে কুটনৈতিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের মানবাধিকারের বিষয়টি

www.pathagar.com

জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করে সরাসরি তদারকির ব্যবস্থা করা উচিৎ। সেই সাথে ওআইসিসহ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একযোগে মিয়ানমার সরকারকে চাপ প্রয়োগ করা উচিৎ; যাতে তারা রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বে বহাল করে এবং পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রদানে বাধ্য হয়। কিন্তু ২০১৬-১৭ সালের গণহত্যার প্রেক্ষাপটে শুধু অভিযান পরিচালনাই নয় বরং মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথাও উচ্চারিত হয়েছে অনেক বুদ্ধিজীবির লেখায়। বিশেষকরে এ ক্ষেত্রে কবি নির্মলেন্দু গুণের সাহসী উচ্চারণ– আমি মনে করি, বাংলাদেশের পক্ষে বার্মা সরকারের যথেচ্ছাচারের নীরব দর্শক হয়ে সীমান্তে সীমাবদ্ধ থাকার সুযোগ নেই। শয়তানদের সমুচিত জবাব দেবার জন্য এখন আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করার সময় এসেছে। মায়ামনারের সমারিক জান্তা ও শান্তির জন্য নোবেলজয়ী অশান্তি বেগমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা এখনই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হোক। অনেক হয়েছে, আর নয়। আমি ভগ্নবক্ষ নিয়েও সেই ন্যায়যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে রাজি আছি। আমি বিশ্বাস করি, যুদ্ধ শুরু হলে বিশ্ববিবেক আমাদের পাশে থাকবে এবং ১৯৭১ এর মতো বার্মার বর্গীদের বর্বরতার বিরুদ্ধে আমরাই জীয় হবো।[৮৩] কিন্তু এ দাবি যুক্তিসঙ্গত মনে করে বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশগুলো রোহিঙ্গাদের হয়ে বাংলাদেশ ও জাতিসংঘকে কতখানি সমর্থন দেবে সেটাই বড় প্রশ্ন।

৬.১৩ রোহিঙ্গা সমস্যা সর্ম্পকে সচেতন জনগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত অভিমত

প্রশ্নমালায় ১০টি প্রশ্নের মাধ্যমে সচেতন জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি সংগ্রহের এ প্রয়াসের সাথে বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা সমস্যা সর্ম্পকে আর কি ধরনের অভিমত বা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তা জানার জন্য "রোহিঙ্গা সমস্যা সম্পর্কে আপনার অভিমত (Views) কি? সে সর্ম্পকে অতি সংক্ষেপে কিছু বলুন" শিরোনামে একটি কলাম রাখা হয়। সেখানকার বক্তব্যের আলোকেই পূর্বের প্রশ্নোত্তর পর্বের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রশ্নের বাইরেও যে সব বক্তব্য অবশিষ্ট থাকে তা এখানে উপস্থাপন করা হয়। সেইসাথে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা মারফত রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে যে ধরনের পরামর্শ পাওয়া গেছে সেগুলোরও কিছুটা আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা ইস্যুটি একটি জাতিগত সংখ্যালঘু ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মানবিক সমস্যা; যা মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংকট গোপন করার কৌশল হিসেবে SLORC জান্তার বর্ণবাদীনীতি এবং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার চূড়ান্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের বহুমুখী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ বিশেষ বলেও এটি ব্যাখ্যা করা যায়। রোহিঙ্গাদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও আরাকানের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, রোহিঙ্গারা আলাদা জাতি ও আলাদা ভূখণ্ডের মালিক। বৃটিশের বিদায়লগ্নে বার্মাকে স্বাধীনতা প্রদানকালে রোহিঙ্গাদের আবাসভূমি আরাকানকে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেবার প্রয়োজন ছিল অথবা তদানিন্তন পূর্বপাকিস্তানের প্রদেশ হিসেবে গণ্য করা উচিত ছিল;

www.pathagar.com

তা হলে এ সমস্যার সৃষ্টি হত না। রোহিঙ্গারা যাতে স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় মিয়ানমার সরকার পরিকল্পিতভাবেই তাদের বিরুদ্ধে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

পরিশেষে সচেতন জনগোষ্ঠীর কাছে জানতে চাওয়া হয় "সর্বোপরি এ সমস্যাটি সমাধানকল্পে আপনার পরামর্শ কি হতে পারে"? উত্তরে প্রত্যেক উত্তরদাতাই বিভিন্নমুখি পরামর্শ প্রদান করেন; তাঁদের পরামর্শসমূহকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে নিম্নে বর্ণনা করা হল।

প্রথমত, মিয়ানমার সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা ছাড়া রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান কল্পনা করা যায় না। তাই সামরিক শক্তি প্রয়োগ না করে বাংলাদেশ মিয়ানমার দ্বি-পক্ষীয়ভাবে আলোচনা করে ফিলিস্তিন, আয়ারল্যান্ড ও বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের মত শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছতে হবে। সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না; যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীলংকা, কাশ্মীর, বসনিয়া, চেচনিয়া ইত্যাদি। রোহিঙ্গা সমস্যাটি যেহেতু এখনো খুব জটিল নয়; এখন পর্যন্ত রোহিঙ্গারা কোন সামরিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। সুতরাং সমস্যাটির মানবিক দিক বিবেচনা করে রক্তক্ষয় ও ধ্বংস এড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে দ্বি-পক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে আরাকানকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা যেতে পারে। কেননা রোহিঙ্গাদের স্বাধীন অস্তিত্বের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা মিয়ানমার-আরাকান ও বাংলাদেশ সবার জন্যই কল্যাণকর।

দ্বিতীয়ত, রোহিঙ্গারা কি চায়, এ ব্যাপারে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সেখানে গণভোট হতে পারে। রোহিঙ্গারাও পূর্বতিমুরের মত স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহায়তা পাবার অধিকারী। আন্তর্জাতিক শরণার্থী কনভেনশন অনুযায়ী মুসলমান দেশগুলো যদি আন্তরিকতার সাথে বিষয়টি সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা হলে জাতিসংঘের পক্ষে বিষয়টি উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না।

তৃতীয়ত, একটি স্বাধীন আরাকানই হবে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান; এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কর্তব্যগুলো পালন করতে হবে- ১. রোহিঙ্গাদেরকে সাহস ও ধৈর্য্য সহকারে সাধারণ নিয়ম শৃংখলার মধ্য দিয়ে দেশ ত্যাগের মনোভাব পরিহার করে নিজ দেশে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে। ২. দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে নিজেদের মানোন্নয়নে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে; এ ক্ষেত্রে মুসলিম দেশসমূহকে সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে। ৩. রোহিঙ্গাদেরকে ক্রমশ স্বনির্ভর হয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ৪. শক্তি সঞ্চয় করে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝেঁপে পড়তে হবে এবং রোহিঙ্গাদের স্বাধীকার আন্দোলনের সমর্থনে মুসলিম বিশ্বকে এগিয়ে আসতে হবে। ৫. পরবাসী রোহিঙ্গাদেরকে স্ব-স্ব দেশের সরকার প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। ৬. কাশ্মীরের জন্য পাকিস্তানের ভূমিকা ও

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের জন্য ভারতের ভূমিকার মত বাংলাদেশকে আরাকানের জন্য ভূমিকা পালন করতে হবে। ৭. জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহের সমর্থন আদায় করার ব্যবস্থা করতে হবে। মূলত এ তিনটি পদ্ধতিতেই রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান আসতে পারে।

পরবর্তীকালে রোহিঙ্গা সমস্যাকে ঘিরে সচেতন জনগোষ্ঠীর অনেকেই অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রাচীনকালে দক্ষিণ আফ্রিকা কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে যে ধরনের আচরণ করত একবিংশ শতাব্দীর অত্যাধুনিক যুগে এসেও মিয়ানমার সরকার সে দেশের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের সাথে নির্মম ও বর্বর আচরণ করছে। এ প্রসঙ্গে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ ২০১৫ সালের ১২ জুন কুয়ালালামপুরে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বলেছেন, মিয়ানমারে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চলছে। এই গণহত্যা বন্ধে মালয়েশিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জোট আসিয়ানের সদস্যদেশগুলোর হস্তক্ষেপ করা উচিত।[৮৪]

অধ্যায় সমাপনীতে মালয়েশিয়ার কিংবদন্তি নেতা মাহাথির মোহাম্মদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়, আসিয়ানের উচিত রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগ করা। হতে পারে এটি কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু জনগণের ওপর এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার করার অধিকারও কোনো দেশের নেই। স্বাধীনতার পবিত্রতা সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণা পাল্টাতে হবে। রোহিঙ্গাদের বিষয়টি আসিয়ানেও তোলা উচিৎ। গণহত্যা চালায়, এমন কোনো দেশ আশিয়ানের সদস্য থাকুক, আমরা তা সমর্থন করতে পারি না। এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ আমাদের করতেই হবে।'[৮৫] মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের বিষয়টি আসিয়ানের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে তোলারও পরামর্শ দেন মাহাথির। একই সাথে দেশটিকে একঘরে করতে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনায় পরামর্শ দেন মাহাথির মোহাম্মদ। প্রেসিডেন্ট ওবামা এবং জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বারবার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন বন্ধ হয়নি। মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য সে দেশের রাজনীতিকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ আরো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি। পশ্চিমাদের উচিত, মিয়ানমানকে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করা। রোহিঙ্গা সঙ্কটের একমাত্র সমাধান হচ্ছে, এসব অসহায় লোককে তাদের নিজেদের দেশ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ফিরিয়ে নিতে হবে এবং তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। আশিয়ান ও জাতিসংঘকে এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। জাতিসংঘ ও আসিয়ানের মাধ্যমে মিয়ানমারকে এ সংকট সমাধানে বাধ্য করতে হবে। অন্যথায় তাদেরকে সারা বিশ্ব থেকে একঘরে করে রাখার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ প্রশ্নমালা তৈরির ক্ষেত্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী, প্রফেসর মিসেস কামরুন রহমান, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ও সভাপতি ড. এ.এইচ.এম. জেহাদুল করিম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন।

২ উল্লেখিত ৮ শ্রেণীর ৪০ জন ব্যক্তিকে সচেতন জনগোষ্ঠীর নমূনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষক স্বয়ং কয়েক দফায় রাজশাহী থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, উখিয়া, টেকনাফসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকারের আওতাভূক্ত সচেতন জনগোষ্ঠীর সকলেই অত্যন্ত কর্মব্যস্ত হওয়ায় তাদের নিকট থেকে সময় নিতে গবেষককে প্রচুর সমস্যায় পড়তে পেতে হয়। সময় নেবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই অনেকবার টেলিফোনে আলাপ কিংবা সাক্ষাৎ করতে হয় এবং নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হলেও তারা ব্যস্ততার কারণে অন্যত্র চলে যান কিংবা অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়ায় সাক্ষাৎকার না নিয়েই গবেষককে ফিরে আসতে হয়। পুনরায় টেলিফোনে যোগাযোগ করে সময় নিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করায় গবেষককে প্রচুর সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে হয়। তবে সাক্ষাৎকার গ্রহণের সংশ্লিষ্ট সকলেই আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করেন এবং সকলের নিকট গবেষক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

৩ শফিকুর রহমান নেওয়াজ, *সংবাদ লেখার সহজ কৌশল* (ঢাকা: পল্লীবার্তা গ্রুপ অব পাবলিকেশনস, ১৯৯৪), ১৪।

৪ *Ministry of Foreign Affaris*, SEA, M.Sec., File No. 119, Relief for Myanmar Refugees.

৫ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১৪।

৬ Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, p. 99.

৭ Abdur Razzaq and Mahfuzul Haque, *A Tale of Refugees*, 196-208; জামাল নদভী, *সারজমিন আরকান কি তাহরিকে আজাদী*, পৃ. ৩১৯-২০।

৮ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ মার্চ, ১৯৯২।

৯ এখানে আরাকানী বলতে মগ ও রোহিঙ্গাদের বুঝানো হয়েছে।

১০ Harvey, *History of Burma*, p. 180.

১১ মাহমুদ, *বার্মায় মুসলিম গণহত্যা*, পৃ. ২-৩ এবং সামিউল আহমদ খান, "রোহিঙ্গা মুসলমান" পৃ. ২২০-২১।

১২ *Asia Watch*, "Burma : Rape, Force Labour..." May 1992; *Amnesty International*, Human Rights Violations Against Muslim" May 1992; *দৈনিক বাংলা*, ২৯ জানু, ১৯৯২; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ মার্চ, ১৯৯১; *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০ মে, ১৯৯২।

১৩ The Return of the Rohingya Refugee to Burma : Voluntary Repatriation or Refoulement? *US Committee for Refugees*, Washington, March 1995, p. 3; মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, পৃ. ৬৮-৬৯।

১৪ *মাসিক দাওয়াত*, এপ্রিল- মে, ১৯৯৯, ১১ সংখ্যা, চট্টগ্রাম, পৃ. ১২-১৩।

১৫ *দৈনিক মিল্লাত*, ১৮ অক্টোবর, ১৯৯১।

১৬ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, পৃ. ২০৯-৫৪।

১৭ Harvey, *History of Burma*, p. 180; Pearn, "King Bearing", p. 55.

১৮ A. Aspinal, "English Relations with Burma", p. 101.

১৯ এ. জেড. এম. শামসুল আলম, 'মুখবন্ধ', *হাবিব উল্লাহ, রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*।

www.pathagar.com

২০ মোঃ মাহবুব-উল-হক জোয়ার্দার, *আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার* (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ১; আবদুল কুদ্দুস হাওলাদার, *আধুনিক আইন বিজ্ঞান* (রাজশাহী ঃ বেগম কামরুন নাহার, ১৯৮০), পৃ. ২১৫; ডঃ আবদুল করিম জায়দান, *ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা* (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ. ৫৭।

২১ Faiues Ezejiofor, *Protection of Human Right Under the Low* (London:Butter worths, 1964), p. 3.

২২ *মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র* (ঢাকা ঃ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ১৯৯৮), পৃ. ৭-৮।

২৩ *Ethnicity and Nationality: Refugees in Asia*, Amnesty International, October, 1997, London, p.15.

২৪ *মাসিক দাওয়াত*, পৃ. ১৩ ।

২৫ *বিডি নিউজ ২৪ ডট কম*, ২২ নভেম্বর, ২০১৬।

২৬ ড. আবুল ফজল হক ও অন্যান্য, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান তত্ত্ব ও নীতিমালা* (রাজশাহী ঃ বুক্স প্যাভিলিয়ন, ১৯৯০) পৃ. ৬৮-৬৯।

২৭ *Human Rights Watch / Asia*, September, 1996, vol. 8, No. 9 (c), p. 34; *'দনিক ভোরের কাগজ*, ৮ ও ৯ অক্টোবর, ১৯৯২।

২৮ মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, পৃ. ৬৬-৬৭।

২৯ *SLORC Announcement*, No. 1/90, July 27, 1990; *Human Rights Watch/Asia*, Vol. 8, No. 9(c), Sept., 1996, p. 11.

৩০ মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, পৃ. ৬৬-৬৭; *দৈনিক বাংলা*, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২; *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২।

৩১ ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক, 'রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী : সমস্যা এবং সমাধান' *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

৩২ *বিডি নিউজ ২৪ ডট কম*, ২২ নভেম্বর, ২০১৬।

৩৩ *মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র*, ১০।

৩৪ *দৈনিক যুগান্তর*, ২৩ অক্টোবর, ২০০৯।

৩৫ *প্রথম আলো*, ২২ এপ্রিল, ২০১০।

৩৬ *প্রথম আলো*, ৩০ জুন, ২০১০।

৩৭ *দৈনিক বাংলা বাজার*, ৬ জুলাই, ২০১০।

৩৮ আমিনুল ইসলাম শান্ত, "রোহিঙ্গা সঙ্কটের বহুমুখী প্রভাব" *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ০৯ জানুয়ারি ২০১৮।

৩৯ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ০৯ জানুয়ারি ২০১৮।

৪০ *যায় যায় দিন*, ৩ ডিসেম্বর, ২০১১।

৪১ *যায় যায় দিন*, ২৫ ডিসেম্বর, ২০১০।

৪২ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ০৯ জানুয়ারি ২০১৮।

৪৩ *যায় যায় দিন*, ৩ ডিসেম্বর, ২০১১।

৪৪ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ০৯ জানুয়ারি ২০১৮।

৪৫ *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৪ জানুঃ, ১৯৯২।

৪৬ এহসান রফিক 'মিয়ানমারে মুসলিম নিধনের শেষ কোথায়' *শীর্ষনিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম*, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৪৭ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ৩০ নভেম্বর, ২০১৭। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ২৯ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তারা এ দাবি করেন। ঢাবির ভিসি অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে এবং রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি

www.pathagar.com

মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (আরএমএমআরইউ) সমন্বয়ক অধ্যাপক ড. সি আর আবরারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ইংরেজি বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বিচারপতি ড. সৈয়দ রিফাত আহমেদ, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী, অধ্যাপক স্বপন আদনান, বাংলাদেশ বৌদ্ধকৃষ্টি প্রচার সঙ্ঘের সভাপতি সঙ্ঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথেরো, পার্লামেন্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্সের এমিরিটাস চেয়ার ড. মালিক মুজাহিদ বক্তব্য দেন।

৪৮ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, অনলাইন ডেস্ক; অক্টোবর ২৫, ২০১৭।

৪৯ এহসান রফিক 'মিয়ানমারে মুসলিম নিধনের শেষ কোথায়' *শীর্ষনিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম*, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৫০ কাজী শওকত হোসেন, 'মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা ও বিশ্বরাজনীতি', *দৈনিক যুগান্তর*, ১ অক্টোবর, ২০১৭।

৫১ *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

৫২ ড. সুলতান মাহমুদ রানা, 'রোহিঙ্গা সমস্যা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়', অভিমত, *এনটিভি অনলাইন*, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৫৩ *প্রথম আলো*, ১১ সপ্টেম্বের ২০১৭। ঐ দিন সোমবার বেলা ১১টায় কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের সম্মলেন কক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে কাজী রিয়াজুল হক এ কথা বলেন।

৫৪ 'মিয়ানমারে মুসলিম নিধনের শেষ কোথায়' *শীর্ষনিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম*, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৫৫ *দৈনিক যুগান্তর* সম্পাদকীয়; ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

৫৬ 'মিয়ানমারে মুসলিম নিধনের শেষ কোথায়' *শীর্ষনিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম*, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৫৭ এহসান বিন মুজাহির 'মজলুম রোহিঙ্গাদের বাঁচাতেই হবে' *দৈনিক সংগ্রাম*, ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬।

৫৮ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ জুন, ২০১৫।

৫৯ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ জুন, ২০১৫।

৬০ মুহাম্মদ খায়রুল বাশার, 'রোহিঙ্গাদের বাঁচাতে জাতিসঙ্ঘকে এগিয়ে আসতে হবে', *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১৮ জুন ২০১৫।

৬১ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৭। উল্লেখ্য, গণআদালতের অন্য বিচারকরা হলেন, মালয়েশিয়ার জুলাইহা ইসমাইল, কম্বোডিয়ার আইনবিদ হেলেন জার্ভিস, অস্ট্রেলিয়ার সিডনির মেকুইয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক প্রধান জিল এইচ বোয়েরিঙ্গার, ইন্দোনেশিয়ার মানবাধিকার আইনজীবী নুরসিয়াবানি কাতজাসুংকানা, ইরানের মানবাধিকার আইনজীবী সাদি সদর ও ইতালির সুপ্রিম কোর্ট অব ক্যাসেসনের বর্তমান সলিসিটর জেনারেল নিলো রেসি প্রমুখ। ১৯৭৯ সালে ইতালিতে ৬৬ জন আন্তর্জাতিক সদস্য নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল পার্মানেন্ট পিপলস ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে মানবাধিকার এবং গণহত্যার সঙ্গে জড়িত অনেক মামলা নিয়ে ৪৩টি অধিবেশন হয়েছে এ ট্রাইব্যুনালে। যদিও প্রতীকী বিচারের রায় মানার কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই দায়ী রাষ্ট্রগুলোর।

৬২ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

৬৩ *দৈনিক আজকের কাগজ*, ৮ অক্টোবর, ১৯৯১; *দৈনিক মিল্লাত*, ১৮ অক্টোবর, ১৯৯১।

৬৪ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ নভেম্বর, ১৯৯১।

৬৫ *The Morning Sun*, March, 13, 1992; *The Star*, 14 March, 1992.

৬৬ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ ও ১৬ মে, ১৯৯৩।

৬৭ মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, মুখবন্ধ।

www.pathagar.com

৬৮ ইকবাল কবির মোহন, *আগ্রাসনের মুখে মুসলিম বিশ্ব* (ঢাকা ঃ নার্গিস মুনীরা, ১৯৯৩), পৃ. ৪; মাসিক দাওয়াত, পৃ. ১৬।

৬৯ *চিত্রবাংলা*, ১১ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ১১-১৮ অক্টোবর, ১৯৯১, পৃ. ৮।

৭০ মো. বজলুর রশীদ, 'রোহিঙ্গা নিধনে মাথাবা,' আবু সাঈদ হান্নান সম্পাদিত *কাঙ্খী*, জানুয়ারি, ২০১৭, পৃ. ২৭-২৮।

৭১ *কালের কণ্ঠ*, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

৭২ *কালের কণ্ঠ*, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

৭৩ *কালের কণ্ঠ*, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

৭৪ এহসান বিন মুজাহির 'মজলুম রোহিঙ্গাদের বাঁচাতেই হবে' *দৈনিক সংগ্রাম*, ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬।

৭৫ *দৈনিক সংগ্রাম*, ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬।

৭৬ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

৭৭ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: ড. মং জানির বিশেষ সাক্ষাৎকার, 'রোহিঙ্গা গণহত্যার নীলনকশা তৈরি হয় ১৯৬৬ সালে' *প্রথম আলো*, অনলাইন ভার্সন, ১৫ অক্টোবর, ২০১৭।
অথবা দ্রষ্টব্য: http://www.amadershomoy.biz/unicode/2017/10/16/345045.htm

৭৮ ড. মারুফ মল্লিক, 'জাতিগত নির্মূল : বনি ইসরাইল থেকে রোহিঙ্গা,' আবু সাঈদ হান্নান সম্পাদিত *কাঙ্খী*, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ২৩-২৪।

৭৯ *প্রথম আলো*, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৮০ উল্লেখ্য, ড. মং জার্নি মিয়ানমারের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে পাশ্চাত্যে সবচেয়ে সোচ্চার ব্যক্তিদের অন্যতম। জন্ম ১৯৬৩ সালে মিয়ানমারের মান্দালয়ে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং উইসকনসিন-মেডিসন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৮ সালে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছেন। শিক্ষকতা করেছেন লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস, অক্সফোর্ড ও হার্ভার্ডে। ১৯৯৫ সালে তিনি প্রবাসী বর্মি ভিন্নমতাবলম্বীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন ফ্রি বার্মা কোয়ালিশন। ৩০ বছর ধরে মিয়ানমারের মানবাধিকারের প্রবক্তা হওয়ার কারণে বর্মি সরকার ও তাদের সমর্থক মিডিয়ার কাছে তিনি 'রাষ্ট্রদ্রোহী', এমনকি তাঁকে 'জাতীয় বিশ্বাসঘাতক' হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর কুয়ালালামপুরের পুলম্যান হোটেলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে এবং পরে ই-মেইল যোগাযোগের ভিত্তিতে এই সাক্ষাৎকার তৈরি করছেন সাংবাদিক মিজানুর রহমান খান। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: ড. মং জানির বিশেষ সাক্ষাৎকার, 'রোহিঙ্গা গণহত্যার নীলনকশা তৈরি হয় ১৯৬৬ সালে' *প্রথম আলো*, অনলাইন ভার্সন, ১৫ অক্টোবর ২০১৭।
অথবা দ্রষ্টব্য: http://www.amadershomoy.biz/unicode/2017/10/16/345045.htm

৮১ ইকবাল কবির মোহন, *আগ্রাসনের মুখে মুসলিম বিশ্ব*, পৃ. ৬৬।

৮২ সালাহি রামাদান সোনিয়েল, এস আবদুল হাকিম অনূদিত, *মুসলিম বসনিয়ায় গণহত্যা* (ঢাকা ঃ পালাবদল পাবলিকেশনস লিমিটেড, ১৯৯৫) পৃ. ৪১।

৮৩ নির্মলেন্দু গুণ, মায়ানমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই" আবু সাঈদ হান্নান সম্পাদিত *কাঙ্খী*, চট্টগ্রাম, উদ্বোধনী ও রোহিঙ্গা সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ০৭।

৮৪ মুহাম্মদ খায়রুল বাশার, 'রোহিঙ্গাদের বাঁচাতে জাতিসঙ্ঘকে এগিয়ে আসতে হবে', *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১৮ জুন ২০১৫।

৮৫ *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১৮ জুন ২০১৫।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়
উপসংহার

আরাকান এককালে যেমন স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও অধুনাকালে মিয়ানমারের একটি প্রদেশ; তেমনি রোহিঙ্গারাও এক সময় স্বাধীন আরাকানের অমাত্যসভা থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখলেও বর্তমানে তারা আরাকানের সবচেয়ে নিগৃহীত জাতিগোষ্ঠী। ১৭৮৫ সালে বর্মীরাজ বোধপায়া কর্তৃক আরাকান দখলের মধ্য দিয়েই মূলত রোহিঙ্গাদের নিগৃহীত জীবনের সূচনা হয়। অতঃপর বৃটিশ শাসনের সমাপ্তি লগ্নে বৃটিশ কুটকৌশলের ফলে তাদের জীবনে দ্বিতীয় বারের মত অনিশ্চয়তা নেমে আসে। স্বাধীতা উত্তর বার্মায় ১৯৬২ সালে সামরিক জান্তা নে উইন কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর হতে রোহিঙ্গারা ক্রমশ নাগরিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হতে থাকে। অবশেষে ১৯৮২ সালে প্রণীত নাগরিকত্ব আইনের নামে তাদেরকে বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করে কল্লা বা বিদেশী আখ্যা দিয়ে দেশ থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে। বর্তমানে রোহিঙ্গা জাতিসত্তা নির্মূলের সর্বশেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে। রোহিঙ্গারা জন্মসূত্রে আরাকানের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের জীবনে এ দূর্ভোগের পিছনে নিম্নোক্ত কারণ উল্লেখ করা যায় -

প্রথমত, রোহিঙ্গারা দীর্ঘ হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় আরাকানের অমাত্যসভাসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন থাকলেও তারা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কোন ধারা সৃষ্টি করতে পারেনি। এমন পরিস্থিতিতে বর্মীরাজ বোধপায়া কর্তৃক আরাকান দখলের পর আরাকানের সর্বময় ক্ষমতা বর্মীদের হাতে চলে যায়। তারা পরিকল্পিতভাবে রোহিঙ্গাসহ আরাকানী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে হত্যা করে। অবশিষ্টদের অনেকেই প্রাণ ভয়ে বাংলায় পালিয়ে আসে এবং ১৮২৬ সালে প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের মাধ্যমে আরাকান দখল পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ে দেশের বাইরে অবস্থান করে। এ সময়ে সিন পিয়ানসহ অনেক আরাকানী নেতা স্বদেশ পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করলেও বিভিন্ন কারণে তারা ব্যর্থ হয়। ফলে বাংলায় আশ্রিত রোহিঙ্গাসহ আরাকানে বসবাসকারী রোহিঙ্গারা নেতৃত্বের দিক থেকে আরো পিছিয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, ১৮২৬ সালে আরাকানে বৃটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তারা রোহিঙ্গাদেরকে বাহ্যিক কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতার ভিত্তি মজবুত করে। শাসকগোষ্ঠী নিজেদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রয়োজনেই আরাকানের প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্র ছাড়াও কৃষি, ব্যবসা প্রভৃতি কাজের জন্য বাংলায় আশ্রিত রোহিঙ্গাসহ আরাকানীদেরকে স্বদেশে বসবাসের সুযোগ প্রদান করে। এ সময় রোহিঙ্গাদের নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত শ্রেণির অনেকেই আরাকানে ফিরে না গিয়ে বাংলার কক্সবাজার ও বান্দরবান অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত

www.pathagar.com

শ্রেণিসহ কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় রোহিঙ্গা স্বদেশে ফিরে গেলেও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নতুন করে কোন অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। পক্ষান্তরে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা বৃটিশের কর্তৃত্বকে সহজে মেনে না নেবার কারণে বরাবরই তারা মুসলমানদেরকে শত্রু মনে করতো। ফলে বার্মায় পুরোপুরিভাবে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর রোহিঙ্গারা যাতে বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে না পারে সেজন্য তাদেরকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত না করে স্থানীয় মগদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এমন কি বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বার্মাকে স্বাধীনতা প্রদানের পূর্বে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বিষয়েও মগদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা উত্তর মিয়ানমারের ক্ষমতাসীন বর্মী ও স্থানীয় মগরা সে ইস্যুকে ক্রমশ শক্তিশালী করে তোলে; যার সর্বশেষ পরিণতি হিসেবে রোহিঙ্গারা কল্লা বা ভিনদেশী চিহ্নিত হয়ে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়।

বর্তমানে রোহিঙ্গা সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছে এবং বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক বিশ্ব এর সাথে জড়িত হবার কারণে এটি আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তিন, মরো (মিন্দানাও) ও কাশ্মীর সমস্যার মতই রোহিঙ্গা সমস্যাও মুসলিম বিশ্ব তথা আন্তর্জাতিক বিশ্বের অন্যতম প্রধান ট্রাজেডি। সরকারি পকিল্পপনার ভিত্তিতেই বর্মীসেনা ও স্থানীয় মগ জনগোষ্ঠী প্রকাশ্যভাবে রোহিঙ্গাদের উপর গণহত্যা, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, মুক্তিপণ ও চাঁদা আদায়, ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান, মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্যের ধ্বংসসাধন এবং নিজস্ব বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদপূর্বক রোহিঙ্গাদের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার হরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। আরাকানে মুসলিম জাতিসত্ত্বা বিনাশ করে এককভাবে মগ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য উচ্ছেদকৃত রোহিঙ্গাদের বসতবাড়ীতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মগদের এনে প্রত্যাবাসন করা হয়। গণমাধ্যম প্রথমে একে 'এথনিক ক্লিনজিং' বলে উল্লেখ করছে। অন্যদিকে ২০১৬-২০১৭ সালে সৃষ্ট এ রোহিঙ্গা সংকটে যারা বাংলাদেশে এসেছেন তাদের ৭০ ভাগ নারী-শিশু। অথচ সে দেশে পুরুষরা নারীর সমসংখ্যক। তাহলে অবশ্যই একটি প্রশ্ন উঠবে যে সেখানকার পুরুষরা কোথায় গেল? স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিতে হবে মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা খুন করেছে। জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ খুন 'গণহত্যা' হবে না তো কী?[১] সৈয়দ আবুল মকসুদ রোহিঙ্গা নির্যাতনকে গণহত্যা আখ্যা দিয়ে বলেন, মানবতা বিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত বর্মি নেতাদের বিরুদ্ধে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে অবিলম্বে মামলা হওয়া উচিত।[২] এ অবস্থা চলতে থাকলে এক সময় রোহিঙ্গা নামের এ জনগোষ্ঠী আরাকানে নয়, শুধু পুরাতন বইপত্র ও কাগজেই থাকবে। এ প্রেক্ষাপটে স্বাধীন আবাসভূমি ছাড়া রোহিঙ্গাদের মুক্তির জন্য কোন পথ নেই বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু স্বাধীকার আন্দোলনের নিমিত্তে কিছু কিছু সংগঠন কাজ করলেও মিয়ানমার সরকারের রোহিঙ্গানীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত সাংগঠনিক ও বৈপ্লবিক শক্তি কোনটিই রোহিঙ্গাদের নেই। এমতাবস্থায় মিয়ানমারের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিয়মিত

www.pathagar.com

বাহিনী ও অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের সম্মুখে তাদের মুক্তিবাহিনী বা রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করা যেমন কঠিন, তার চেয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যাওয়া আরো কঠিনতর হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে অসহনীয় নির্যাতনের হাত থেকে জীবন বাঁচানোর তাগিদে নিজেদের বসতবাড়ী ছেড়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। রোহিঙ্গা সমস্যার এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে -

প্রথমত, রোহিঙ্গারা শত শত বছর ধরে মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশে বসবাস করছে। বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকার প্রতিফলন, বাংলাদেশের সচেতন জনগোষ্ঠীর মতামত জরিপ এবং নাগরিকত্ব আইনের দৃষ্টিতে তারা জন্মসূত্রেই মিয়ানমারের নাগরিক। যদিও বাংলাদেশ সরকার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দূর্বলতা প্রদর্শন করে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের বিভিন্ন চুক্তিতে (সমঝোতা স্মারক) তাদেরকে Lawful Citizens of Burma না বলে Lawful Residents of Burma উল্লেখ করেছেন। এমন কি চুক্তিসমূহে তাদেরকে রোহিঙ্গা হিসেবে উল্লেখ করাও হয় না। মিয়ানমার সরকার কর্তৃক তাদের নাগরিকত্বের অস্বীকৃতি অন্যায়, অবৈধ এবং স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ।

দ্বিতীয়ত, সে দেশের স্বীকৃত নাগরিক বা জনসাধারণ বা বাসিন্দা হিসেবে রোহিঙ্গাদের স্বাধীনভাবে মৌলিক অধিকার সহকারে সম্মান ও জানমালের নিরাপত্তাসহ মানবাধিকারের স্বীকৃতি নিয়ে জীবন ধারণের অধিকার রয়েছে। বিভিন্ন নির্যাতনের মাধ্যমে তাদেরকে নিজস্ব বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে অন্য দেশে তাড়িয়ে দেয়া মানবাধিকারের চরম লংঘন।

তৃতীয়ত, নির্যাতনের শিকার হয়ে মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদেরকে মানবিক কারণে আন্তর্জাতিক বিধি মোতাবেক বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়া হয়।

চতুর্থত, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আগমনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মত একটি ছোট জনবহুল রাষ্ট্রের উপর ভয়ানক চাপ পড়েছে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

পঞ্চমত, মিয়ানমার সরকারের রোহিঙ্গানীতি পক্ষান্তরে তথাকার মুসলিম জাতিসত্তা বিনাশের চক্রান্ত।

ষষ্ঠত, মিয়ানমার সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের প্রেক্ষাপটে দ্বি-পাক্ষিকভাবে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান বিলম্বিত হবার কারণে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক বিশ্ব এতে সম্পৃক্ত হয়েছে। ফলে সমস্যাটি এখন আর মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ কিংবা দ্বি-রাষ্ট্রিক নয়, বরং এটি এখন আন্তর্জাতিক সমস্যা।

সপ্তমত, বাংলাদেশে আশ্রিত সকল শরণার্থীকেই মিয়ানমারে ফেরত নিতে হবে; এ ব্যাপারে কোন দ্বি-মতের অবকাশ নেই এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখা জরুরী।

www.pathagar.com

রোহিঙ্গাদের শরণার্থী জীবন গ্রহণ করা যেন একটি প্রচলিত রীতি হয়ে গেছে। ১৯৭৪, ১৯৭৮ এবং ১৯৯১-৯২ সালে শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণের পর আন্তর্জাতিক বিশ্বের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার তাদের পুনরায় স্বদেশে পাঠিয়ে দিলেও মিয়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে আরাকানে রোহিঙ্গা নির্যাতনের কোন অবসান হয় নি। তাই তারা আর শরণার্থী হিসেবে না এসে সুযোগ মত আত্মীয়তার সূত্র ধরে কিংবা শরণার্থী জীবনে বাংলাদেশে আগমনের সুবাদে সৃষ্ট পরিচয়ের ভিত্তিতে পরিবার পরিজন নিয়ে বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলছে। এমন কি ১৯৯১-৯২ সালে আগত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন কর্মকাণ্ড চলাকালীন সময়েই প্রত্যাবাসিত ও স্থানীয় রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে অনেকেই পুনরায় বাংলাদেশে এসে স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলেছে। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কক্সবাজার সূত্রে জানা যায়, শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থানরত ২১ হাজার শরণার্থী ছাড়াও প্রায় দেড় লক্ষ রোহিঙ্গা কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলার বিভিন্ন থানার লোকালয়, পাহাড়, সমতল এবং কক্সবাজার পৌর এলাকাসহ সমুদ্র সৈকতে অবৈধ বসতি গড়ে তুলেছে। রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের কারণে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি, আলীকদম থানা ও কক্সবাজার জেলার আইন-শৃংখলার পরিস্থিতি ব্যাপক অবনতি ঘটেছে এবং মৎস ও বনজ সম্পদ উজাড়ের মাধ্যমে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। সেই সাথে স্থানীয় শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে রোহিঙ্গাদের ব্যাপক অনুপ্রবেশের কারণে সরকারের নিবন্ধনকৃত (Registard) শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনেও বিঘ্ন ঘটছে। কারণ, বেহিসেবী অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের অনুপ্রেরণায় প্রত্যাবাসনের জন্য অপেক্ষমান নিবন্ধকৃত শরণার্থীরা প্রত্যাবাসন তারিখের পূর্বেই ক্যাম্প থেকে পালিয়ে তাদের সাথে মিশে যায়।[৩]

আরাকান রাজ্যটি ১৯৭৪ সালে রাখাইন এলাকা রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর পরই ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর সহিংসতার ঘটনা ঘটে। তখনই প্রথমবারের মতো প্রচুরসংখ্যক রোহিঙ্গা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে আসে। অবশ্য মিয়ানমারের তৎকালীন জান্তা সরকারের ভাষ্য ছিল, 'অবৈধ অভিবাসনের' বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে। এর এক বছর পর অনেক রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৮২ সালে সামরিক জান্তা সরকার ওই সব লোককে নাগরিক ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগত অধিকার কেড়ে নেয়। ১৯৯৪ সালে নতুন জন্ম নেওয়া রোহিঙ্গা শিশুদের সরকারি জন্মসনদের আবেদনও প্রত্যাখ্যান করা শুরু হয়। অং সান সু চির নেতৃত্বে মিয়ানমারে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন হলেও রোহিঙ্গাদের বঞ্চনা কিন্তু শেষ হয়নি। রোহিঙ্গাদের বাদ রেখেই চালানো হয় ২০১৪ সালের আদমশুমারি।

গত ৫০ বছরে মোট কয়েক দফায় বড় আকারে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে ঢুকেছে। ১৯৭৭-৭৮, ১৯৯১-৯২, ২০১২ এবং ২০১৬-১৭ সাল। প্রতিবারই সহিংসতা এড়াতে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে ঢুকেছে। এসব সহিংসতা ও নিপীড়নের অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করছে মিয়ানমারের সরকার। গত ২০১৭ সালের এপ্রিলে অং সান সু চি

www.pathagar.com

জাতিগত নির্মূলের সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।[৪] অন্যদিকে ২০১৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে সু চি তার ভাষণে ৫টি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। ১. তিনি শরণার্থী ফিরিয়ে নিতে প্রস্তুত, ২. মুসলমান রোহিঙ্গা চলে যাওয়ায় তিনি উদ্বিগ্ন, ৩. মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত হবে, ৪. আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণে তার ভয় নেই, কূটনীতিকদের পরিদর্শনে আমন্ত্রণ এবং ৫. আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হবে। সু চির ভাষণকে ভাঁওতাবাজি হিসেবে দেখছে আন্তর্জাতিক মহল। কারণ তিনি গণহত্যার কথা স্বীকার করেননি। রোহিঙ্গাদের জন্মভূমি যে মিয়ানমার, সে কথা মানতে চান না। ১৯৮২ সালে আইন করে তাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করা, নাগরিক হিসেবে সব সুযোগ-সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করা, তাদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা সে কথাই বলে। সু চির মতে বাংলাদেশের রোহিঙ্গারা যে মিয়ানমারের অধিবাসী ছিল, তার প্রমাণ দেখাতে হবে।[৫]

রোহিঙ্গা সমস্য সমাধানে অং সান সু চির প্রতি আস্থাশীল হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এ বিষয়ে মং জার্নি উল্লেখ করেন, আমি বহু বছর আগে তাঁর সম্পর্কে যা লিখেছিলাম, তা তখন বিশ্বাস করতে অনেকেরই কষ্ট হতো। তাঁরা তাঁকে রোমান্টিসিজমের জায়গা থেকে প্রশ্রয় দিতেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর সর্বাত্মক ও গভীর বর্ণবাদী মন একটুও বদলে যায়নি। আমি যখন তাঁর নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও নেতৃত্বের যথাযথ সমালোচনা করেছি, তখন তাঁর সমর্থকেরা কষ্ট পেয়েছেন। একটি সামরিক পরিবারে আমার বেড়ে ওঠার সময় তাঁর বাবা ছিলেন আমার রোল মডেল। ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে আমি যখন আমার দেশ ত্যাগ করি, তখন আমার ওয়ালেটে তিনটি ছবি ছিল। একটি আমার পরিবারের, দ্বিতীয়টি মহামুনি বুদ্ধের এবং অপরটির অং সানের পরিবারের। এই ছবিতে সু চি ছিলেন দুই বছরের। মাঠের কর্মী হিসেবে আমি সু চির পক্ষে কথা বলেছি একটানা ১৫ বছর। তিনি যেভাবে স্বেচ্ছায় বিরোধী শিবিরে প্রবেশ করেছিলেন, তা তিন দশকের মধ্যে প্রথম গণ-অভ্যুত্থান এনেছিল। তাঁকে সমালোচনায় আমার কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা হিংসা নেই। আমি কোনো রাজনীতিবিদের আনুগত্যে বা অনুরাগী হতে বিশ্বাসী নই, কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই খুব বেশি মনুষ্য প্রজাতির। আমি একজন কর্মী হিসেবে 'আমার দেশ সেরা, সেটা ভুল বা শুদ্ধ যা-ই করুক' ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদী ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়াকে নাকচ করে দিই।[৬]

বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমার সরকার দেশি-বিদেশি সাহায্য-সহযোগিতায় নিজেদের শক্তি সামর্থ্য বাড়িয়েছে। বিশেষ করে গত বছর যুক্তরাজ্য তিন লাখ পাঁচ হাজার পাউন্ড খরচ করেছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ব্যয় বাবদ। যুক্তরাজ্য মূলত মিয়ানমারের সেনাদের গণতন্ত্র, নেতৃত্ব ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়। এ ছাড়া ২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের ভেতরে ও বাইরে ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য প্রায় ছয় কোটি ৩০ লাখ ডলার দিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক যে সংকট তৈরি হয়েছে তাতে বিশ্বের এসব সাহায্যকারী দেশ রীতিমতো

www.pathagar.com

উদ্বিগ্ন ও হতাশ হয়েছে।[৭] এমন কি রোহিঙ্গাদের এই মানবিক সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের মহানুভবতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ প্রশংসা করছে।

রোহিঙ্গা সংকটের ইস্যুতে আন্তর্জাতিকভাবে গভীর ষড়যন্ত্র হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে যথেষ্ট। সারা বিশ্বের কাছে এটি পরিষ্কার যে, মিয়ানমার খনিজ সম্পদে ভরপুর একটি দেশ। ভৌগোলিকভাবেও এই দেশটি পরাশক্তির স্বার্থের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমার প্রায় পুরোপুরি চীনের ছত্রছায়ায় এবং চীনের প্রত্যক্ষ মদদে পরিচালিত হচ্ছে। রাশিয়ার সঙ্গেও তারা যোগাযোগ অব্যাহত রাখছে। চীন ও রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়ায় মিয়ানমার 'ডোন্ট কেয়ার স্টাইল' অবলম্বন করছে।[৮] চীন ও রাশিয়া তাদের হাতে থাকলে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো প্রস্তাবই জাতিসংঘে টিকবে না- এমন আত্মবিশ্বাসটাও তাদের রয়েছে। মিয়ানমারে এত বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনা ঘটার পরও ভারত সরাসরি মিয়ানমারের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। এভাবে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসমূহ পক্ষ-বিপক্ষ অবস্থায় গেলে ক্রমেই এই ইস্যুটি আরো ঘোলাটে হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এই মুহূর্তে জাতিসংঘ যদি কোনো জোরালো পদক্ষেপ নিতে না পারে তাহলে রোহিঙ্গাদের ওপর চলমান নির্যাতন কোন পর্যায়ে পৌঁছাবে তা আন্দাজ করা মুশকিল। কূটনৈতিক সূত্রগুলোর তথ্য অনুযায়ী, অতীতের মতো এবারও বিশ্বসম্প্রদায় ও প্রভাবশালী দেশগুলো বিভক্ত নিজ নিজ স্বার্থে।[৯] এ কারণে মিয়ানমারে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন, এমন কি গণহত্যা ও জাতিগত নিধনের মতো ভয়াবহ অভিযোগ সত্ত্বেও তারা একে অগ্রাহ্য করছে।

রোহিঙ্গা সংকটে চীন, রাশিয়া ও ভারতের ভূমিকা নিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় মং জার্নি বলেন, অবশ্যই এরা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাধা। চীন ও রাশিয়া এমন কি উদ্বেগ জানিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে বিবৃতি দিতে রাজি হয়নি। ভারতে উগ্র বর্ণবাদী দল ক্ষমতায়। তারা হিন্দু মৌলবাদী জাতীয়তাবাদকে উসকে দিতে চাইছে। সু চি-মোদির যৌথ ঘোষণা বলছে, তারা নাকি সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় লড়াই করতে একমত। এর মাধ্যমে ভারত কার্যত সু চির বর্ণবাদী গণহত্যার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আবার পশ্চিমা কোনো প্রভাবশালী দেশই কিন্তু এই তিন দেশের সমালোচনা করছে না। পাশ্চাত্য যারা মানবাধিকার, বিশ্বশান্তি ও নাগরিক স্বাধীনতার কথা বলে, তারাই তেলের জন্য অন্যের ভূখণ্ড দখল করতে পারে। রোহিঙ্গা প্রশ্নে আমি পশ্চিম ও পূর্ব ব্লকের মধ্যে কোনো ফারাক দেখি না। তাই রাশিয়া, চীন ও ভারত নয়, পাশ্চাত্যও একইভাবে ভণ্ড। পাশ্চাত্য সার্বিয়া ও বেলগ্রেডে বোমা ফেলেছে। মিলেসোভিচের প্যালেসেও বোমা ছুঁড়েছে। মিলেসোভিচ সার্বিয়া ও বসনিয়ার মুসলমানদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিল। ইসরায়েলের বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদ ২৩০টির বেশি প্রস্তাব পাস করেছে। কিন্তু তারা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলেছে। তাই আমি এটা বলব না, এই তিন দেশই মিয়ানমারের গণহত্যা বন্ধে বাধা তৈরি করেছে। তবে আমরা মনে রাখব, নিরাপত্তা পরিষদই জীবন ও ইতিহাসের যবনিকা নয়।[১০]

www.pathagar.com

চীন-ভারতের অবস্থান সম্পর্কে ড. মুনতাসীর মামুন মন্তব্য করেন, মিয়ানমার-সংলগ্ন চীন ও ভারত রোহিঙ্গা সমস্যার বিষয়গুলো জানে। কিন্তু দেশটির খনিজ সম্পদের ওপর তাদের লোভ অনেকদিনের। সে জন্য তারা এতদিন এসব অগ্রাহ্য করেছে। তাদের এই সমর্থনের বিষয়টি এতদিন কেউ গুরুত্বসহকারে না নিলেও বোধহয় এখন তারা গণহত্যাকারী সমর্থক হিসেবে বিশ্বে চিহ্নিত হবে।[১১]

ড. হাবিব সিদ্দিকি তার এক সাক্ষাৎকারে ব্যাখ্যা করেন, মিয়ানমারে আসলে কি ঘটছে। এই সমস্যার কেন্দ্রে আছে মিয়ানমারের ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন, যে আইনে বলা হয়েছে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে নাগরিক নয়। তারা বহিরাগত। রোহিঙ্গাদেরকে তাদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে। আর এই আইন এই তথ্যকে একেবারে অর্থহীন করে ফেলে যে রোহিঙ্গাদের পূর্বপুরুষেরা হাজার বছর আগে আরাকানে প্রবেশ করেছিল। একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে বলতে পারি যে রাখাইন বা বৌদ্ধ ধর্মালম্বীরা সম্ভবত দশম শতাব্দীর শেষ পর্যায়ের আগে আরাকানে প্রবেশ করেনি। শুরুতে এখানে যে সমস্ত রাজবংশ শাসন করেছে বলা হয়ে থাকে যে তারা ভারতীয়, যারা বাংলার মত এখানকার জনগণের শাসক ছিল।[১২]

রোহিঙ্গা সঙ্কটের রাজনৈতিক প্রভাব সুদূর প্রসারী। রোহিঙ্গা শরণার্থী নিয়ে কাজ করছে এমন দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার সাথে বিভিন্ন সময় মতবিনিময় করা হয়েছে। কক্সবাজারসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শরণার্থী বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছে। সেখানে এমন কথাও উঠে এসেছে যে, নতুন আগত রোহিঙ্গাদের শরণার্থীর মর্যাদা দিতে রাজি হয়নি বাংলাদেশ সরকার। সরকারের এ কাজটি এক অর্থে ইতিবাচক। কারণ, শরণার্থী হিসেবে মর্যাদা দিলে তাদের ফিরিয়ে দেয়া বা ভবিষ্যতে যেকোনো প্রক্রিয়ায় পুশব্যাক করার ক্ষেত্রে এসব আন্তর্জাতিক সংস্থা বাদ সাধবে। অন্যদিকে বায়োমেট্রিক নিবন্ধনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে বিদেশী সংস্থাগুলো মনে করে, বায়োমেট্রিক নিবন্ধনপ্রক্রিয়ায় প্রদত্ত আইডি কার্ডে ইউএনএইচসিআরের স্বাক্ষর যুক্ত করা প্রয়োজন ছিল। যদিও তারা পুরনো শরণার্থীদের আইডি কার্ড প্রদান করেছে। তদুপরি ভবিষ্যতে সরকারপ্রণীত শরণার্থীর পরিসংখ্যান অস্বীকার করতে পারে ইউএনএইচসিআর। রাজনৈতিক প্রভাবের প্রসঙ্গে গণমাধ্যমকর্মী আমিনুল ইসলাম শান্ত বলেন, আমি ঘুমদুম সীমান্তে কয়েক দফা জরুরি সেবা নিয়ে কাজ করেছি আর্তমানবতার সেবায়। রোহিঙ্গারা আসার প্রাক্কালে একটি যুদ্ধ যুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল মিয়ানমার। মিয়ানমারের সামরিক হেলিকপ্টার বারবার বাংলাদেশ আকাশসীমা লঙ্ঘন করায় নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরা একটি সুস্পষ্ট যুদ্ধের ইঙ্গিত হিসেবে দেখছিলেন। মিয়ানমারের ওইসব কর্মকাণ্ডের পেছনে নির্ঘাত একটি অ্যাসেসমেন্ট ও অ্যাসাইনমেন্ট ছিল, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যত উসকানিই দেয়া হোক যুদ্ধে জড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। এ কথার সূত্র ধরে বলা যায়, শুধু আকাশসীমা লঙ্ঘন নয়, যদি কেউ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করে ও যুদ্ধে বাধ্য করে, তখন আমরা চাইলে কি বিরত থাকতে পারব? সেই

www.pathagar.com

আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জাতীয় প্রস্তুতি পুরোপুরি বেসামরিক তো নয়ই, আন্তর্জাতিক রাজনীতির উর্ধ্বেও নয়।[১৩] তিনি আরো বলেন, রোহিঙ্গা টেস্ট কেসে বিজয়ের পর আঞ্চলিক পরাশক্তি এখন যদি আসামের মুসলমানদের জাতীয়তা কেড়ে নেয়, কালক্রমে যদি পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে বাংলাভাষীদের একটি তালিকা পুশব্যাক করানো হয়, তবু আমাদের রথ দেখায় ব্যস্ত থাকলেই চলবে? পুরো বাংলাদেশ কি একটি শরণার্থী ক্যাম্প হতে যাচ্ছে? মোগল শাসন, মুসলিম আধিপত্য, ব্রিটিশ ভারতের উপনিবেশ, ভারত-পাকিস্তানের বিভক্তি, ৬৫ যুদ্ধ ও স্থান বদল, আর '৭১-এর স্বাধীনতার বাঁকে বাঁকে নানান জটিল উপকরণ ছড়িয়ে আছে, যাকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক প্রভাবকেরা নিপুণ ভূরাজনৈতিক পরিকল্পনার পথে হাঁটছে। এ বিষয়ে আনু মুহাম্মদ মন্তব্য করেন, পাশের দেশ মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর পরিকল্পিত জাতিগত নিধন ও নির্যাতনের ফলে লাখ লাখ রোহিঙ্গা পরিচয়ের মানুষ এখন বাংলাদেশ। কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়িত হলেই এর স্থায়ী সমাধান সম্ভব।[১৪] বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা ও জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে গ্রহণযোগ্য কূটনীতি এখন সময়ের দাবি।

তাই অতিসত্ত্বর শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন, মিয়ানমারকে রোহিঙ্গা নির্যাতন থেকে বিরতকরণ ও আরাকান থেকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বন্ধকরণের জন্য আন্তর্জাতিক বিশ্বের সহযোগিতা আরো জোরদার করা দরকার এবং বাংলাদেশ সরকারকে এক্ষেত্রে আরো বেশি তৎপর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা পেশ করা যেতে পারে-

প্রথমত, সমস্যাটির মানবিক দিক বিবেচনা করে রক্ত ক্ষয় ও ধ্বংসযজ্ঞ এড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশ-মিয়ানমার আরো আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে অবশ্যই আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।[১৫]

দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পূর্ব তিমুরের মত জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গাদের চাহিদা ও মতামত যাচাই করার জন্য আরাকানে গণভোট হতে পারে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শরণার্থী কনভেনশন অনুযায়ী মুসলিম দেশগুলো যদি আন্তরিকতার সাথে বিষয়টি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তা হলে জাতিসংঘের পক্ষে বিষয়টি উপেক্ষা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশকেই বেশি অগ্রণী ভূমিকা পালন করা দরকার।

তৃতীয়ত, ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের এক পর্যালোচনা বৈঠকে বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন আরাকান অঞ্চলকে অনুন্নত এলাকার নজীর বলে উল্লেখ করে।[১৬] দীর্ঘ দিনের অনুন্নত পরিবেশও কার্যত এখানকার অধিবাসীদেরকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে অভিবাসনে উৎসাহিত করে থাকে।[১৭] তাই রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের নিমিত্তে মিয়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে তাদের উপর নির্যাতন বন্ধ করে এ অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের জন্য আর্থ-সামাজিক

www.pathagar.com

সুব্যবস্থা সৃষ্টির পাশপাশি তাদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করে কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি আরো অধিক গুরুত্ব দেয়া জরুরী।[১৮] এ ব্যাপারে জাতিসংঘ ও ওআইসির তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে হবে।

চতুর্থত, জাতিসংঘের পক্ষ থেকে মিয়ানমারে পর্যবেক্ষক পাঠিয়ে সঠিক অবস্থা অবগত হয়ে কঠোরভাবে কুটনৈতিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের মানবাধিকারের বিষয়টি জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করে সরাসরি তদারকির ব্যবস্থা করা উচিৎ। সেই সাথে ওআইসিসহ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একযোগে মিয়ানমার সরকারকে চাপ প্রয়োগ করা উচিৎ; যাতে তারা রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বে বহাল করে এবং পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রদানে বাধ্য হয়।

পঞ্চমত, উপরোক্ত পদ্ধতিতে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে স্বাধীন সার্বভৌম আরাকান রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য রোহিঙ্গাদেরকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে-

১. রোহিঙ্গাদেরকে সাহস ও ধৈর্য সহকারে সাধারণ নিয়ম শৃংখলার মধ্য দিয়ে দেশ ত্যাগের মনোভাব পরিহার করে নিজ দেশে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিৎ এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে নিজেদের মানোন্নয়নে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. রোহিঙ্গাদেরকে ক্রমশ স্বনির্ভরতা অর্জন করে ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করে শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে সশস্ত্র সংগ্রাম জোরদার করা দরকার;[১৯] এ ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের স্বাধীকার আন্দোলনের সমর্থনে মুসলিম বিশ্বকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন এবং পরবাসী রোহিঙ্গাদেরকে সংগঠিত হয়ে স্ব-স্ব দেশের সরকার প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

সর্বোপরি, রোহিঙ্গা নেতৃবৃন্দ ও মুসলিম দেশসমূহকে সম্মিলিতভাবে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহের সমর্থন আদায় করার জন্য জোর তৎপরতা অব্যাহত রাখা জরুরী।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

---

১ মুনতাসীর মামুন, 'রোহিঙ্গাদের একনদী দুঃখ, বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ, *বিডি নিউজ ২৪ ডট কম*, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

২ সৈয়দ আবুল মকসুদ, 'রোহিঙ্গা ইস্যু আঞ্চলিক নেতাদের জন্য পরীক্ষা,' আবু সাঈদ হান্নান সম্পাদিত *কাঞ্চী*, চট্টগ্রাম, উদ্বোধনী ও রোহিঙ্গা সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ২০।

৩ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৭ জুলাই, ১৯৯৯।

৪ *প্রথম আলো*, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৫ কাজী শওকত হোসেন, 'মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা ও বিশ্বরাজনীতি', *দৈনিক যুগান্তর*, ১ অক্টোবর, ২০১৭।

www.pathagar.com

৬ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: ড. মং জানির বিশেষ সাক্ষাৎকার, 'রোহিঙ্গা গণহত্যার নীলনকশা তৈরি হয় ১৯৬৬ সালে' *প্রথম আলো*, অনলাইন ভার্সন, ১৫ অক্টোবর ২০১৭।
অথবা দ্রষ্টব্য: http://www.amadershomoy.biz/unicode/2017/10/16/345045.htm

৭ ড. সুলতান মাহমুদ রানা, 'রোহিঙ্গা সমস্যা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়', অভিমত, *এনটিভি অনলাইন*, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৮ ড. সুলতান মাহমুদ রানা, 'রোহিঙ্গা সমস্যা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়', অভিমত, *এনটিভি অনলাইন*, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৯ ড. সুলতান মাহমুদ রানা, 'রোহিঙ্গা সমস্যা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়', অভিমত, *এনটিভি অনলাইন*, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

১০ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: ড. মং জানির বিশেষ সাক্ষাৎকার, 'রোহিঙ্গা গণহত্যার নীলনকশা তৈরি হয় ১৯৬৬ সালে' *প্রথম আলো*, অনলাইন ভার্সন, ১৫ অক্টোবর ২০১৭।
অথবা দ্রষ্টব্য: http://www.amadershomoy.biz/unicode/2017/10/16/345045.htm

১১ মুনতাসীর মামুন, 'রোহিঙ্গাদের একনদী দুঃখ, বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ, *বিডি নিউজ ২৪ ডট কম*, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

১২ 'বাংলাদেশ, মায়ানমার: রোহিঙ্গা নির্যাতন এখন আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে' *গ্লোবাল ভয়েস*, ২৯ জুলাই ২০১২।

১৩ আমিনুল ইসলাম শান্ত, "রোহিঙ্গা সঙ্কটের বহুমুখী প্রভাব" *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ০৯ জানুয়ারি ২০১৮।

১৪ আনু মুহাম্মদ, "সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ, উন্নয়ন এবং উদ্বাস্তু ভার সমস্যা" *প্রথম আলো*, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

১৫ সচেতন জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি সংগ্রহের নিমিত্তে প্রণীত প্রশ্নমালার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ৫জন শীর্ষস্থানীয় নেতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ঐ সাক্ষাৎকারে তাদের অধিকাংশই এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বাংলাদেশকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। তারা আন্তর্জাতিক বিশ্বের সহযোগিতা নিয়ে রাজনৈতিক ভাবে দ্বি-পাক্ষিক ভিত্তিতে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পরামর্শ প্রদান করে।

১৬ *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৯ নভেম্বর, ১৯৯৩।

১৭ *তদেব।*

১৮ *তদেব।*

১৯ উল্লেখ্য, আরাকানের রোহিঙ্গাদের সংকট নিরসনে অনেকেই স্বাধীন আরাকান প্রতিষ্ঠাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাইতো কবি নির্মলেন্দু গুণের সাহসী উচ্চারণ– আমি মনে করি, বাংলাদেশের পক্ষে বার্মা সরকারের যথেচ্ছাচারের নীরব দর্শক হয়ে সীমান্তে সীমাবদ্ধ থাকার সুযোগ নেই। শয়তানদের সমুচিত জবাব দেবার জন্য এখন আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করার সময় এসেছে। মায়ামনারের সমারিক জান্তা ও শান্তির জন্য নোবেলজয়ী অশান্তি বেগমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা এখনই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হোক। অনেক হয়েছে, আর নয়। আমি ভগ্নবক্ষ নিয়েও সেই ন্যায়যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে রাজী আছি। আমি বিশ্বাস করি, যুদ্ধ শুরু হলে বিশ্ববিবেক আমাদের পাশে থাকবে এবং ১৯৭১ এর মতো বার্মার বর্গীদের বর্বরতার বিরুদ্ধে আমরাই জীয় হবো। [নির্মলেন্দু গুণ, মায়ানমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই" আবু সাঈদ হান্নান সম্পাদিত *কাঞ্চী*, চট্টগ্রাম, উদ্বোধনী ও রোহিঙ্গা সংখ্য, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ০৭।]

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রাথমিক উৎস (Primary Source)

১.১ সরকারি দলিল-দস্তাবেজ

বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মিয়ানমার সেকশনে সংরক্ষিত, বাংলাদেশ-মিয়ানমার রোহিঙ্গা সমস্যা কেন্দ্রিক নথিপত্রসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত ফাইল ব্যবহৃত হয়েছে।

ফাইল নং	শিরোনাম
104	Press Report.
115	Internal Ministerial Meeting.
116	(B) Senior Official Meeting.
118	UNHCR Affairs.
119	Relief for Myanmar Refugees.
130	Repatriation Agreement.
409	Repatriation of Myanmar Nationals.
602	VIP Visit Between two Countries.
603	Foreign Minister's Visit to Myanmar.
604	Visit of Myanmar Foreign Minister U Ohn Gyaw.
605	Myanmar Home Ministers Visit.

১.২ মুহাম্মদ সিদ্দিক খান সংগ্রহ

মরহুম মুহাম্মদ সিদ্দিক খান, ইন্ডিয়া হিস্ট্রিক্যাল রেকর্ড বর্তমানে ন্যাশনাল আর্কাইব বা ভারতীয় জাতীয় মুহাফেজ খানা থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহপূর্বক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দান করেছেন। তাঁর অবদানকে স্মরণ রেখে Muhammad Siddiq Khan Collection (সংক্ষেপে MSKC) নামে সংগ্রহীত তথ্যের শিরোনাম দেয়া হয়েছে। সংগৃহীত দলীলপত্র থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

A. Political Consultation, 1794-1824.
B. Secret Consultation, 1794-1824.

১.৩ Refugee Relief and Rehabilitation Commissioner থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলি

ক) রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পরিসংখ্যান।

খ) মাসিক ভিত্তিতে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের পরিসংখ্যান।

১.৪ কক্সবাজার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ত্রাণ-সাহায্যের খতিয়ান।

www.pathagar.com

১.৫ গেজেটিয়ার, সংবিধান, আদমশুমারি ও ভৌগোলিক রিপোর্ট

Smart, R.B. *Burma Gazetteer Akyab District*, Vol. A . Rangoon : Burma Government, Printing & Stay, 1959.

The Constitution of the Socialist Republic of Union of Burma. 1974, Sec. No. 30/5.

Government Official Population Census of Arakan in 1931. Union of Burma.

SLORC Announcement. No. 1/90, July 27, 1990.

১.৬ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্ট

"Burma : Entrenchment or Reform?" *Human Rights Watch / Asia,* July 1995, vol. 7, No. 10.

"Burma : The Rohingya Muslims Ending a Cycle of Exodus," *Human Rights Watch / Asia,* vol. 8, No. 9 (c), September, 1996.

"Ethnicity and Nationality : Refugees in Asia," *Amnesty International,* London, U. K., 1 October, 1997.

"National Refugee Week : Report on Three Asian Refugee Trouble Spots Hong Kong–Bangladesh–Thai / Burmese Border," *AUSTCARF,* The Refugee Council of Australia, The International Commission of Jurists Australian Section, 17 June 1992, Sydney, Australia.

Operation Hope : An Operation to Provide Relief, Succour, Food and Shelter to the Myanmar Rohingya Refugees in Bangladesh, Commissioner, Chittagong Division Coordinator, Myanmar Rohingya Refugee Relief and Repatriation Operation, 7 April 1992, Chittagong, Bangladesh.

Report on the Situation for Muslim in Burma, May 1997, IMAGES ASIA.

"Return to Myanmar Repatriating Refugees from Bangladesh," *Information Bulletin*, UNHCR, June, 1995.

The Return of the Rohingya Refugees to Burma : Voluntary Repatriation or Defaultment? U. S. Committee for Refugees Issue Paper, March, 1995.

"Burma : Rape, Force Labour..." *Asia Watch.* May 1992;

"Human Rights Violations Against Muslim" *Amnesty International*, May 1992.

The Yale Journal of Human Rights, *Contents*, vol. 3, No. 2, Chicago.

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র, ঢাকা ঃ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ১৯৯৮।

www.pathagar.com

১.৭ অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভসমূহ

Ali, M. Shamsher, "The Beginning of British Rule in Upper Burma : A Study of British Policy and Burmese Reaction 1885-90" (Unpublished Ph. D. Dissertation University of London, March 1976.).

Bahar, A.S. "The Arakani Rohingya in Burmese Society" (Unpublished M. A. Theses, Department of Sociology and Anthropology, University of Windsor, Ontario, Canada, 1981.).

Nilsson, Janell Ann, "The Administration of British Burma, 1852-1885 (Unpublished Ph.D. Dissertation University of London, 1970.).

Sidhu, Jagjit Singh, "British Administration in Upper Burma" (Unpublished Ph.D. Dissertation University of London, 1963.)

১.৮ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা

ক) বাংলা দৈনিক পত্রিকাসমূহ

দৈনিক আজকের কাগজ, ঢাকা।

দৈনিক আজাদ, ঢাকা।

দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা।

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা।

দৈনিক জনতা, ঢাকা।

দৈনিক দিনকাল, ঢাকা।

দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা।

দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা।

দৈনিক বাংলা, ঢাকা।

দৈনিক বাংলা বাজার, ঢাকা।

দৈনিক বাংলার বাণী, ঢাকা।

দৈনিক ভোরের কাগজ, ঢাকা।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ, ঢাকা।

দৈনিক মিল্লাত, ঢাকা।

দৈনিক রূপালী, ঢাকা।

দৈনিক সকালের খবর, ঢাকা।

দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা।

দৈনিক সংবাদ, ঢাকা।

www.pathagar.com

খ) সাপ্তাহিক ও মাসিক বাংলা পত্রিকাসমূহ

মাসিক দাওয়াত, এপ্রিল-মে ১৯৯৯, ১১ সংখ্যা, চট্টগ্রাম।

চিত্রবাংলা, ১১ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ১১-১৮ অক্টোবর, ১৯৯১।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৬ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ১২ মে, ১৯৭৮।

গ) ইংরেজী দৈনিক পত্রিকাসমূহ

Bangkok Post, Bangkok, Thailand.
Bangladesh Observer, Dhaka.
Bangladesh Times, Dhaka.
Business Times, Dhaka.
Daily Guardian, Rangoon.
Daily Life, Chittagong.
Daily Star, Dhaka.
Dawn, Karachi, Pakistan.
Gulf News, Dubai, UAE.
Holiday, Dhaka.
Khaleej Times, Dubai, UAE.
Morning Sun, Dhaka.
Nation, Bangkok, Thailand.
New Nation, Dhaka.
New Straits Times, Kuala Lumpur, Malaysia.
News Day, Dhaka.
New York Times.
Pakistan Times, Karachi, Pakistan.
Peoples View, Chittagong.
Saudi Gazette, Riyadh, KSA.
Star, Kuala Lumpur, Malaysia.
Telegraph, Dhaka.

ঘ) সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকাসমূহ

Asia Week, Hong Kong.
Bangladesh Illustrated Weekly, Dhaka.
Consumer Economist of Bangladesh, Chittagong.
Far Eastern Economic Review, Hong Kong.
Friday, Dhaka.
Impact International, London, UK.
New Sun Day Times, Kuala Lumpur, Malaysia.
Weekly Dialogue, Dhaka.
World Times, London, UK.

www.pathagar.com

২. গৌণ উৎস (Secondary Source)

২.১ ইংরেজি ভাষায় প্রণীত গ্রন্থাবলি

Abrol, Mridula. *British Relations with Frontier States, 1863-1875.* New Delhi: S. Chand, 1974.

Adas, Michael. *The Burma Delta: Economic Development and Social Change on Asia Rice Frontier. 1852-1941.* Madison: University of Wisconsin Press, 1974.

Ali, Muhammad Mohar, *History of the Muslim of Bengal,* vol. I. Ryadh : Imam Muhammad Ibn Soud Islamic University, 1985.

Anwar, M. N. & M. M. Al-Faroque. *Bangladesh and Neighbors.* Dhaka : Payra Prakashani, 1996.

Arnold, Edwin. *The Marquis of Dalhousies`s Administration of British India. 2 vols.* London: Sounders, Othey and Co., 1862.

Aung, Maung Htin. *A History of Burma.* New York : Columbia University Press, 1967.

Aung, San tha. *The Buddhist Art of Ancient Arakan.* Rangoon : Daw Saw Sapay, 1979.

Baillie, John. *Rivers in The Desert, or Mission Scenes in Burma.* London : Seelcy, 1858.

Baker, Thomas Turner. *The Recent Operation of The British Forces at Rangoon and Martaban.* London: Thomas Hatchard, 1852.

Banerjee, Anil Chandra. *Annexation of Burma.* Calcutta: Mukherjee, 1944.

______. *The Estern frontier of India.* Calcutta: Mukherjee, 1964.

Bayfield, G.T. *Historical Review of the Political Relation Between the British Government in India and the Empire of Ava, from the Earthiest Date on Record to The Present Year.* Calcutta: Government Printers, 1835.

Bearce, George D. *British Attitudes Towards India* 1787-1858. London: Oxford University Press, 1961.

Bennett, Paul J. *Conference under the Tamarind Tree: Three Essays in Burmese History.* New Haven: Yale University Southeast Asia Studies. 1971.

Bessaignet, P. *Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts.* Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1958.

Bigandet, Paul Ambrose. *An Outline of the History of the Catholic Burmese Mission From the Year 1720 to 1887.* Rangoon : Hanthawaddy Press, 1887.

www.pathagar.com

Blalock, H.M. *Toward a Theory of Minority Group Relations*. New York: John wiley and sons, Inc., 1976.

Brecher, M. *The New states of Asia: A Political Analysis*. New York: Oxford University Press, 1963.

Buchanan, K. *The South Asian World: An Introductory Essay*. London: G. Bell & Sons Ltd., 1967.

Cady, J.F. *A History of Modern Burma*. New York : Cornell University Press, 1958.

Chakravarti, N. R. *The Indian Minority in Burma*. London: Oxford University Press, 1971.

Chatterjee, Dr. Suniti Kumar. *The Origin and Development of The Bengali Language*. Part 1., London: Unwine Brother Ltd., 1979.

Cheng Siok-Hwa. *The Rice Industry of Burma* 1852-1940. Kualalumpur: University of Malaya Press, 1968.

Christian, J. L. *Burma*. London: Collins, 1945.

Cochrance, W. W. *The Shans*. Rangoon: Government Printers, 1915.

Cooks, S.W., *A Short History of Burma*. London : Macmellan, 1910.

Cox, Hiram. *Journal of a Residence in the Burmhan Empire and more Particularly at The Court of Amarapoorah*. London: J. Warren, 1821.

Dani, Ahmad Hasan, *Muslim Architecture in Bengal*. Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1961.

Desai, Walter Sadgun. *A pageant of Brumes history*. Bombay : Orient Longmans, 1961.

_______. *History of the British Residency in Burma 1826-1840*. Rangoon: University of Rangoon, 1939.

Dobbs, Richard Stewart. *Reminiscences of life in Mysore, South Africa and Burma*. Dublin: G. Herber, 1882.

Donnison, F. S. V. *Burma*. London: Ernest Benn limited, 1970.

Durber, George, *A History of India from the Earliest Times to Nineteen Thirty Nine*. London : Nicholson and Watson, 1939.

Elias, New. *Introductory Sketch of the History of the Shans in upper Burma and Western Yunnan*. Calcutta : Foreign Department Press, 1876.

Emerson, R. *From Empire to Nation: The Rise of Self- Assertion of Asian and African Peoples*. Cambridge, Mass: 1960.

Eytch, Albert. *Burma past and present with personal Reminiscences of the Country*. 2 vol. London: kegan Paul, 1857.

www.pathagar.com

Ezejiofor, Faiues, *Protection of human right under the Low.* London : Butter worths, 1964.

Farnon, L. *A. Dying colonialism.* New York: Grove Press, Inc., 1965.

Fisher, C.A. *Burma: A Social Economic and Political Geography.* London: Mathvan and company limited, 1967.

Furnival, J.S. *An Introduction to the Political Economy of Burma.* Rangoon : Peoples literature Committee, 1957.

Furnival, J.S. *Colonial policy and practice: A comparative study of Burma & Netherlands India.* Cambridge: Cambridge University Press, 1957.

Geertz, C. *Old Societies and New States : The Quest for Modernity in Asia & Africa.* New York: The Free Press, 1963.

Ghosh, Jamini Mohan. *Magh Raider in Bengal.* Calcutta : Book land Private Ltd., 1960.

Gouger, Henry. *Personal Narrative of two years " Imprisonment in Burmah* 1824-26. London : Murray, 1860.

Hall, D.G.E. *Burma.* New York : Hutchinson University library, 1950.

______. *Europe & Burma: A study of European Relations with Burma to the Annexation of Thibaw's Kingdom 1886.* London: Oxford University Press, 1945.

______. *A History of South East Asia.* London : St. Martins Press, 1970.

______. *Early English Intercourse with Burma* 1578-1743. London : Longmans, 1928.

Hall, R.L. *Ethnic Autonomy- Comparative Dynamics, the Americans, Europe & the Developing World.* New York : Pergamon Press, 1979.

Harvey, G. E. *British Rule in Burma 1824-1942.* London: Faber & Faber, 1946.

Harvey, G. E. *History of Burma : From the Earliest Times to 10 March 1824. The Beginning of the English conquest.* London : Frank Cass & Co., 1967.

_______. *Outline of Burmese History.* Bombay: Green & company, 1949.

Hornby, A.S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English.* Fifth Ed. New York : Oxford University Press, 1995.

Hunter, W. W. *The Marques of Dollhouse and The Final Development of The Company's Rule.* Oxford : Clarendon Press. 1895.

Irwin, A. *Burmese Outpost.* London: Collins, 1945.

www.pathagar.com

Karim, Abdul. *The Rohingyas : A Short Account of their History and Culture.* Chittagong : The Institute of Arakan Studies, 1998.

Khan, Dr. Muin-ud-Din Ahmad, *Muslim Communities of South-East Asia : A Brief Survey.* Chittagong : Islamic Cultural Centre, 1980.

Knap Lund, Paul. *The British Empire 1815-1939,* London: Hamish Hamilton, 1942.

Kyaw, Natmagh Bon. *History of Anglo-Burmese War.* Rangoon : Pagan Publisher, 1975.

Lach, Donaald. F. *South East Asia in the Eyes of Europe in The Sixteenth Century.* Chicago : University of Chicago Press, 1968.

Laurie, William F. B. *The Second Burmese War: A Narrative of the Operations at Rangoon in 1852. London : Smith, Elder & co., 1853.*

Leach, Edmund, R. *Political Systems of Highland Burma : A Study of Kachin Social Structure.* London: Athlone Press, 1954.

Leifer, M. *Dilemmas of Statehood in South East Asia.* Vancouver : University of British Columbia Press, 1972.

Ma, Myasein, *Administration of Burma : Sir Charles Crosthwaite and the Consolidation of Burma.* Rangoon: Zabu Meitswe Pilaka Press, 1938.

Majumder, R. C. *Hindu Colonies in the far East.* Calcutta : General Printers and Publication, 1944.

Maring, J. M. *History & Cultural Dictionary of Burma.* New Jersey: The Scarecrow Press, Inc., 1973.

Marks, J.E., *Forty years in Burma.* New York: E. P. Dutton, 1917.

Marshall, H. I. *The Karen People of Burma: A Study in Anthropology and Ethnology.* Columbus : Ohiostate University Bulletin, 1922.

Marshall, W. H. *Four Years in Burma.* London : Skeet, 1860.

Marshman, J. C. *How Wars Arise in India: Observations on Mr. Cobden's Pamphlet Entitle "The Origin of the Burmese War.* London: N. P., 1853.

Mason. F. *Burmah, Its People and Natural Productions.* Rangoon: Ranney, 1866.

Maung, Htin Aung. *A History of Burma.* New York: Columbia University Press. 1967.

_______. *Burmese Drama,* London : Oxford University Press, 1937.

_______. *Burmese Folk Tales,* Calcutta: Oxford University Press, 1949.

www.pathagar.com

Maung, Htin Aung. *Burmese low Tales: The legal Element in Burmese Folklore.* London : Oxford University Press 1962.

_______. *Folk Elements in Burmese Buddhism.* London: Oxford University Press, 1962.

Maung, Maung, *Burma in the Family of Nations.* Amsterdam : Uitgverij Djambatan, 1956.

_______. *Burma in the Family of Nations.* Amsterdam : Uetgverij Djambatan, 1956.

Mi Mi Khaing, *Burmese Family.* London : Longmans, 1946.

Myrdal, G. *Asian Drama: An Introduction into the poverty of Nations.* New York: Pantheon Books, 1971.

Niharranjan Ray. *An Introduction to the Study to Theravada Buddhism in Burma.* Calcutta: Calcutta University Press, 1946.

O'Malley, L.S.S. *Eastern Bengal District Gazetteers.* Calcutta : The Bengal Secretarial Book Depot, 1908.

Panikker, K.M. *Asia and Western Dominance.* New York : Collier Books, 1969.

Park. R.E. *Race & Culture.* Glencoe : Free Press, 1950.

Pheyre. Arthur P. *History of Burma Including Burma Proper, Pegu, Taungu, Tenasserim and Arakan, From the Earliest time to the End of the First war with British India.* London: Susil Gupta, 1967.

Philips, C.H. *The East India Company, 1784-1834.* Manchester: Manchester University Press, 1940.

Pointon, A. C. *The Bombay Burmah Trading Corporation limited 1863-1963.* Southampton, England: Millbrook Press, 1964.

Polk, Olldver, B. *Empires in collision Anglo-Burmese Relations in the Mid-Nineteenth Century.* London: Greenwood Press, 1979.

Powell, J.C., *A History of India.* London : Jhomas Nelson, 1950.

Purer, W. B. & Saunderds, *Modern Buddhism in Burma.* Rangoon: Christian literature Society, 1914.

Razzaq, Abdur, and Mahfuzul Haque, *A Tale of Refugees Rohingyas in Bangladesh.* Dhaka: The Centre for Human Rights, 1995.

Rex. J. *Race Relations in Sociological theory.* London: Weidenfeld and Nicholson, 1970.

Robertson, T. C. *Political Incidents of the First Burmese War.* London: Bentley, 1853.

www.pathagar.com

Saheb, N. A. *History of Arakan*. Karachi: Department of Dawah, 1978.

Said, A. & L. R. Simons. *Ethnicity in International Contexts*. Brunswick: Transactions, 1976.

Sangermano, P. V. *A Description of the Burmese Empire*. London: Susil Gupta, 1966.

Sar Desai, D. R. *British trade and Expansion in Southeast Asia 1830-1914*. New Delhi : Allied Publisher's, 1977.

_______. *South-East Asia : Past & Present*. Dacca : Dacca University Press, 1981.

Sarkar, Dr. Jagadish Narayan. *Islam in Bengal*. Calcutta : Ratna Prakashan, 1972.

Sarkar, Jadunath. *History of Bengal, Vol, II, Muslim Period 1200-1757*. Dacca: University of Dacca, 1948.

Sarkisyanz, E. *Buddhist Backgrounds of the Burmese Revolution*. The Hague : M, Nijhoff, 1965.

Scott, J.G *Burma From the Earliest times to the Present Day*. London : T. Fisher Unwin, 1924.

Sein, M. M. *Burma*. London: Oxford University Press, 1943.

Serajuddin, A. M. *The Revenue Administration of the East India Company in Chittagong*. Chittagong: Chittagong University Press, 1971.

Shakespeare, L. W. *History of Upper Assam, Upper Burma and North East Frontier*, London: 1914.

Silverstein. J. *Burma: Military Rule and Politics of Stagnation*. Ithaca: Cornell University Press, 1977.

_______. *Burmese Politics: The Dilemma of National Unity*. New Jersey: Rutgers University Press, 1980.

Singhal, D.P. *The Annexation of Upper Burma*. Singapore: Eastern University Press, 1960.

_______. *The Annexation of Upper Burma*. Singapore : Eastern University Press, 1960.

Smith, D.E. *Religion and Politics in Burma*. Princeton : Princeton University Press, 1965.

Symes, M. *Account of an Embassy to the Kingdom of Ava in 1795*. London : Bulmer, 1800.

Tarling, Cholas. *A Concise History of Southeast Asia*. London : 1960.

Taylor, A. *Focus on South East Asia*. New York : Praeger Publishers, 1972.

www.pathagar.com

Tin, P.E. Maung and C. H. Luce, *The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma.* London : Humphrey, Milford, 1913.

Tinker, H. *The Union of Burma, A Study of First Years of Independence.* London : Oxford University Press, 1967.

Trager, H.G. B*urma Through Alien Eyes : Missionary Views of the Burmese in the Nineteenth Century.* New York: Praeger. 1966.

Trager, R.N. *Burma from kingdom to Republic : A Historical and Political analysis.* New York : Praeger, 1966.

Tun wai. *Economic Development of Burma from 1800 to 1940.* Rangoon : University of Rangoon, 1961.

Vincent, F. *Land of the White Elephant*. London : Harper, 1873.

Wilfogel, K.A. *Oriental Despotism – A Comparative Study of Total Power.* New Havent : Yale University Press, 1957.

Woodman. D. *The Making of Burma.* London : Cresset Press, 1962.

Yegar, Moshe, *The Muslim of Burma: A study of Minority Groups.* Wiebaden : Otto Harrassowitz, 1972.

Yunus, Mohammed. *A History of Arakan : Past & Present,* Chittagong : Magenta colour, 1994.

_______. *What Fate is in Store for the Rohingyas?* (Arakan : RSO, 1995).

২.২ ইংরেজি ভাষায় প্রণীত প্রবন্ধসমূহ

Alam, Mohammed Ashraf, "Historical Background of Arakan," *Souvenir, Welcoming the Silver Jubilee Anniversary (1975-2000),* Arakan Historical Society, Chittagong.

Ali, S.M., "Arakan Rule in Chittagong", *Journal of The Asiatic Society of Pakistan*, Vol. xii, No. 3, 1967.

Chowdhury. Mohammed Ali, "The Advent of Islam in Arakan and The Rohingyas," *AHSC, Annual Magazine-1995-96.*

Chowdhury. Vasant, "The Arakani Governors of Chittagong and their coins," *Journal of The Asiatic Society of Bangladesh*, vol. 42, No. 2, December 1997.

Collis, M.S., "Arakan's place in the civilization of the Bay" *JBRS*, 50th Anniversary publication, No. 2, Rangoon, 1960.

Collis, M.S., and San Shwe Bu,"Arakans Place in The Civilization of the Bay" *JBRS*, Vol. xv, No.1. 1925.

Hall, D.G.E. "Studies in Dutch Relation with Arakan," *JBRS,* vol. XXV1, 1936.

Harvey, G.E., "The Fate of Shah Shuja, 1661" *JBRS*, Vol. xii, August 1922.

Huq. Syed Ahmadul, "Hundred years of Arakan as a feudatory State to Bangladesh" (1480 AD to 1530 AD) *Annual Magazine 1995-96, Arakan Historical Society, Chittagong.*

Hussain, Sayed Sajjad, "A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts," *JASP.* Dacca, Publication no 3.1960 281-82

Jilani, A.F.K. "A Brief Account of the regional Geography of Arakan, (physical Features) " *AHSC, Annual Magazine-1995-96.*

Johnston, E.H., "Inscription of Arakan," *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, No 11, London, 1944.

Kamal, Narul, "Chittagong- Arakan: A region of a people, A Chronicle Studies of medieval period," *Annual Magazine 1995-96, Arakan Historical Society, Chittagong.*

Khan, M. Siddiq, "The Tragedy of Mrauk-U-(1660-1666)", *JASP*, vol. XI, No. 2, August 1966.

_______. "Muslim Intercourse with Burma" *Islamic Culture*, Vol. X. Hydrabad, July 1936.

Lwin, Moung Than, "Rakhin kala or Rohingya," *The Mya Wadi Magazine,* Issue July 1960.

Pearn, R.B., "King Bearing", *JBRS*, XXIII, Part 1, 1933.

Sarkar, J.N. "The Ferenghi Pirates of Chittgong," *JASB,* vol. iii, 1907.

Stenbarg, David 1., "Constitutional and Political Bases of Minority Insurrection in Burma," *Armd Separatisisum in South Asia.* Singapor: Institute of South East Asian Studies, 1984.

Stuart, J., "An Appeal for more light on Arakane History", *JBRS*, Vol. VIII, Part. 1, 1923.

Stuart, J., "Political History of the Extraordinary Events Which led to the Burmese war," *JBRS,* Vol. XI, Part. III, 1921.

Tha, Taher Ba, "Salver Raids in Bangal or Heins in Arakan," *The Guardian Manthly,* Rangoon vol. vii, October 1960.

Waheed, Sufi A. M. "Arakan Was free Muslin State Till British Occupation," *Annual Magazine 1995-96 Arakan Historical Society, Chittagong.*

Yusuf, Mohammad, "The plight of the Rohingyas: A living Human Tragedy in Arakan, "*Arakan*-Official Mouthpiece of ARIF, Vol. 5, ISSUE 7, 31 July 1992.

www.pathagar.com

২.৩ বাংলা ভাষায় প্রণীত গ্রন্থাবলি

আখন্দ, মাহফুজুর রহমান। *আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ২০১৩।

আখন্দ, মাহফুজুর রহমান ও আবু নোমান। *সমকালীন বিশ্বে মুসলিম সংখ্যালঘু*, ঢাকা : গ্রন্থকুটির, ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

আলী, সৈয়দ এমদান। *মুসলিম বাংলার আত্মকথা*। ঢাকা: সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ১৯৬৯।

আলম, অধ্যক্ষ শাহ মুহম্মদ খুরশীদ। কর্নেল (অব.) আলি আহমদ বীর বিক্রম ঃ জীবনের শেষ নেই। ঢাকা : বাংলাদেশ বইঘর, ১৯৯৭।

আলম, মাহবুব উল। *চট্টগ্রামের ইতিহাস নবাবী আমল*। চট্টগ্রাম : নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৫।

________। *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল*। চট্টগ্রাম : নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৫।

আহমদ, ওয়াকিল। *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।* ঢাকা : খান বাদার্স, ১৯৭০।

আহসান, সৈয়দ আলী। *পদ্মাবতী*। ঢাকা : ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৮।

ইসলাম, মোঃ সিরাজুল। *ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক। ঢাকা* : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

উল্লাহ, এন.এম. হাবিব। *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস।* ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১৯৯৫।

করিম, আবদুল। *চট্টগ্রামে ইসলাম।* চট্টগ্রাম : ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৮০।

________। *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল।* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৩৮৪ বাং।

________। *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন। ঢাকা* : বাংলা একাডেমী, ১৩৮১ বাং।

________। *বাংলার ইতিহাস মোগল আমল* (প্রথম খণ্ড) রাজশাহী : ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯২।

________। *বাংলার ইতিহাস - মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত ১২০০-১৮৫৭*। ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯।

খান, মোঃ মাইমুল আহসান। *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী* : বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে। ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৯৯৮।

চক্রবর্ত্তী, রতন লাল। *বাংলাদেশ - বার্মা সম্পর্ক ১৭৮৫-১৮২৪।* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪।

চৌধুরী, মোতাহার হোসেন। *সংস্কৃতি কথা*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮০।

www.pathagar.com

চৌধুরী, আবদুল হক। *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী।* *ঢাকা* : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

________। *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি।* চট্টগ্রাম : জোবাইদা বানু চৌধুরী, ১৯৮০।

জোয়ার্দ্দার, মোঃ মাহবুব-উল-হক। *আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার।* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।

জায়দান, আবদুল করিম। *ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা।* ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৬।

তরফদার, মমতাজুর রহমান। *বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী হিন্দী পটভূমি।* ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১।

তালিব, মুহাম্মদ আবু। *উত্তরবঙ্গে সাহিত্য সাধনা।* রাজশাহী : কুইক প্রিন্টার্স, ১৯৭০।

দাশ, আশা। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি।* কলিকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৯।

দাশগুপ্ত, তামোনাশ চন্দ্র। *প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস।* কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২।

দীন মুহম্মদ, ও কাজী। *পাকিস্তানী সংস্কৃতি।* ঢাকা : সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ১৯৬৯।

নাথান, মির্জা। *বাহারীস্তান-ই-গায়বী।* খালেক দাদ চৌধুরী অনূদিত। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

পাল, হরেন্দ্র চন্দ্র। *বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ।* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭।

বালা, অমৃতলাল। *আলাওলের কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি।* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

বন্দোপাধ্যায়, অসিত কুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* প্রথম খণ্ড। কলিকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৮২।

বড়ুয়া, নূতন চন্দ্র। *চট্টগ্রামের বৌদ্ধজাতির ইতিহাস।* চট্টগ্রাম : কুসুম কুমার বড়ুয়া, ১৯৮৬।

মজুমদার, শ্রী রমেশ চন্দ্র। *বাংলাদেশের ইতিহাস,* দ্বিতীয় খণ্ড। কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৮০।

মোহন, ইকবাল কবির। *আগ্রাসনের মুখে মুসলিম বিশ্ব।* ঢাকা : নার্গিস মুনীরা, ১৯৯৩।

রহীম, ডক্টর এম এ। *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* ১ম খণ্ড। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

শরীফ, আহমদ। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ২য় খণ্ড।* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

________। *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ।* ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৭।

www.pathagar.com

________ । *সৈয়দ সুলতান, তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ।* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৩৭৯ বাং।

সেন, সুকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* ১ম খণ্ড। কলিকাতা : ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭৫।

সাকলায়েন, গোলাম। *বাংলাদেশের সুফী-সাধক।* ঢাকা : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ ১৩৮৭ বাং।

________ । *মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক।* ঢাকা : আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৭৬।

সাহিত্য বিশারদ, আবদুল করিম, সংকলিত, এবং আহমদ শরীফ সম্পাদিত। *পুঁথি পরিচিতি*। ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

সোনিয়েল, সালাহি রামাদান। এম. আবদুল হাকিম অনূদিত, *মুসলিম বসনিয়ায় গণহত্যা*। ঢাকা : পালাবদল পাবলিকেশনস লিঃ, ১৯৯৫।

সেন, শ্রী সুকুমার। *বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস।* কলিকাতা : ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।

হক, মুহাম্মদ এনামুল এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। *আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য।* মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

হক, মুহাম্মদ এনামুল। *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*। মহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

হাবিবুল্লাহ, মুহাম্মদ। *ইসলাম ও ভারতবর্ষ।* ঢাকা : সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ১৯৬৯।

হামিদ, দেওয়ান আবদুল। *মুসলিম বাংলা সাহিত্যে জাতীয় চেতনা।* ঢাকা : সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ১৯৭০।

হাওলাদার, আবদুল কুদ্দুস। *আধুনিক আইন বিজ্ঞান।* রাজশাহী : বেগম কামরুন নাহার, ১৯৮০।

২.৪ বাংলা ভাষায় প্রণীত প্রবন্ধসমূহ

আখতারুজ্জামান, "আরাকানী রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর উৎস ও ক্রমবিকাশ : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা (১২০৪-১৭৮৫ খৃঃ)", *ইতিহাস পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, পঞ্চবিংশ বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৯৮ সংখ্যা।

আখন্দ, মাহফুজুর রহমান আখন্দ, রোহিঙ্গাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম : বর্তমান প্রেক্ষিত, ড. মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী সম্পাদিত, *আরাকানের মুসলমান: ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* চট্টগ্রাম : আরাকান হিস্টরিক্যাল সোসাইটি, ২০০০।

www.pathagar.com

________। আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিম ও মানবাধিকার প্রসংগ, *কলা অনুষদ, গবেষণা পত্রিকা*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ১০, ২০০৫।

________। আরাকানী অমুসলিম সমাজে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ জার্নাল*, সংখ্যা ৩৪, ২০০৬।

________। বাংলাদেশ-মিয়ানমার চুক্তি ১৯৭৮: রোহিঙ্গা প্রেক্ষিত পর্যালোচনা, *কলা অনুষদ গবেষণা পত্রিকা*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ১২, ২০০৭।

________। আরাকান রাজসভায় মুসলিম অমাত্যের ভূমিকা : প্রসঙ্গ আশরাফ খান, *কলা অনুষদ গবেষণা পত্রিকা*- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রয়োদশ সংখ্যা, ২০০৭-২০০৮।

________। আরাকানী সমাজে মুসলমানদের গোত্রগত শ্রেণিবিন্যাস: একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা, *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ জার্নাল*, সংখ্যা ৩৫, ২০০৭।

________। আরাকানী সমাজে ইসলাম বিস্তারে বণিক ও আউলিয়া কিরামের ভূমিকা, *কলা অনুষদ গবেষণা পত্রিকা*- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চর্তুদশ সংখ্যা, ২০০৮-২০০৯।

________। চট্টগ্রাম ও আরাকানী মুসলিম সমাজে অমুসলিম সংস্কৃতি: একটি পর্যালোচনা, *ইসলামী গবেষণা পত্রিকা*, রাজশাহী, তৃতীয় সংখ্যা, নভেম্বর, ২০০৮।

________। নরমিখলার হৃতরাজ্য আরাকান পুনরুদ্ধার: বাংলা-আরাকান সম্পর্কের ঐতিহাসিক মেরুকরণ, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ২০০৯।

________। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী: আর্থ-সামাজিক প্রভাব, *রাজশাহী ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস এন্ড ল*, সংখ্যা ৩৬, ২০০৮।

________। রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব সমস্যা: একটি ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, *রাজশাহী ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস এন্ড ল*, সংখ্যা ৪০, ২০১২।

________। আরাকানে বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রেক্ষাপট ও গতিধারা: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, *গবেষণা পত্রিকা, (কলা অনুষদ)* রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯তম সংখ্যা, ২০১৩-২০১৪।

________। ম্রাউক উ শাসনামলে (১৪৩০-১৭৮৫) আরাকানি মুসলিমদের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস: একটি সমীক্ষা *রাজশাহী ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস এন্ড ল*, সংখ্যা ৪১, ২০১৩।

ইসলামি বিশ্বকোষ ২২শ খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬।

www.pathagar.com

করিম, আবদুল, "রোহিঙ্গাদের হাজার বছরের ইতিহাস", ঢাকা, *পাক্ষিক পালাবদল*, ১ম বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ১৯৯২।

খান,আবদুল মাবুদ, "চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস ও প্রসঙ্গ কথা", *ইতিহাস*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৫শ-২০বর্ষ সম্মিলিত সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৮৮-চৈত্র ১৩৯৩।

________। "আরাকানের মুক্তি সংগ্রাম ও তার উৎস", *ইতিহাস*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ত্রয়োদশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৮৬।

খান, মুহম্মদ সিদ্দিক, "ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে মুসলমান" *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৬৮।

খান, সামিউল আহমদ "রোহিঙ্গা মুসলমান" *ইসলামিক ফাইন্ডেশন পত্রিকা,* মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, তেইশ বর্ষ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

"বার্মার মুসলমান" মুহাম্মদ রুহুল আমিন অনুদিত, তেহরান টাইমস, ২৪ মে ১৯৮৩ এর সৌজন্যে, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, তেইশ বর্ষ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

মনসুর, ওসমান গণি, "আরাকানে স্বাধীনতার লড়াই; *নতুন ঢাকা ডাইজেষ্ট*, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ১৯৯১, ঢাকা।

২.৫ উর্দু ভাষায় প্রণীত গ্রন্থসমূহ

আন্দালছী, ইবনে আবদুর রাব্বী আল।*(العقد الفريد) আল ইকদুল ফরিদ*, ১ম খণ্ড। তৃতীয় সংস্করণ,কায়রো : প্র.বি., ১৯৬৯।

জুবাইর, কাজী রশিদ বিন। *(كتاب الدخاير والتحف) কিতাবুস যাখায়ের ওয়াত তুহুফ* । কুয়েত : প্র.বি., ১৯৫৯।

নদভি, মুহাম্মদ আমিন।*(تاريخ اركان كا ايك كمشده باب) তারিখে আরকান কা এক গামছুদা বাব।* আরাকান: আরাকান হিষ্ট্রি কনফারেন্স, ১৯৮৬।

নদভি, মুহাম্মদ তাহের জামাল। *(سرزمين اركان كئ تحريك ازادئ تار يخئ بس منظر مي) সারজমিন আরকান কি তাহরীকে আজাদী: তারিখি পাঁচ মানজার মে।* চট্টগ্রাম: আরাকান হিষ্ট্রিক্যাল সোসাইটি, ১৯৯৯।

নদভি, সাইয়্যেদ সুলায়মান। *(هندوستان عربون كئ نظر مي) হিন্দুস্থান আরাবিউ কা নজর মে।* আজামগড়: দারুল মুসান্নেফিন, (তা:বি:)

www.pathagar.com

মানসুরী, নূর মুহাম্মদ। *(کونسی وادئ مي هئ کونسئ منزل مي هئ عشق بلاخيز کا قافلہ سخت جان)* *কোন সি ওয়াদি মে হ্যায়, কোন সি মনজিল মে হ্যায়: এশ্‌কে বালাখিজ কা কাফেলায়ে সখত যা।* করাচী: ইত্তেহাদ পাবলিকেশন্স ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৯৭।

মুবারকপুরী, কাজী আতাহার। *(عرب و هندعهد رسالت مي)* *আরব ওয়া হিন্দ আহদে রিসালাত মে।* দিল্লী: নদওয়াতুল মুসান্নেফিন (তা: বি:)।

_______।*(اسلامي هند کئ عظمت رفته)* *ইসলামী হিন্দ কি আজমত রফতা।* দিল্লী: নদওয়াতুল মুসান্নেফিন (তা: বি:)

রহমান, মুহাম্মদ খলিলুর। *(کربلاء اركان)* *কারবালা-ই-আরকান।* ফটোকপি, বিশেষ সংগ্রহ, আরাকান হিষ্ট্রিক্যাল সোসাইটি লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম।

_______। *(تاريخ اسلام برما واركان)* *তারিখ-ই-ইসলাম: বার্মা ওয়া আরকান।* কালকাতা: দি স্টার আর্ট প্রেস, ১৯৮৬।

সাইফুল্লাহ, খলিদ। *(تذكرهء شهداء جهاد اركان)* *তাযকিরায়ে শুহাদায়ে জিহাদে আরকান।* কারাচী: ইত্তেহাদ পাবলিকেশন্স ইন্টারন্যাশনাল ১৯৯৭।

হাকিম, আবু আবদুল্লাহ।*(المستدرك للحكيم)* *মুস্তাদরাক-ই-হাকিম*, ১ম খণ্ড। দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ : প্র.বি, তা.বি।

২.৬ রোহিঙ্গাদের প্রকাশনাসমূহ

A Memorandum at to his excellency General Mohammad Zia-ul-Haq, President of the Islamic Republic of Pakistan, by RPF Arakan, Burma, 7-8 December 1985.

An Ardent Appeal of the Rohingya Patriotic Front, Placed Before the 14th Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers at Dhaka, Bangladesh, 1st October 1983, RPF Arakan, Burma.

ARAKAN, News Letter of the ARIF, Arakan, Burma,

INSAF (Urdu Version) International Organ of RSO, Arakan, Burma.

INSAF, (English Version) Rohingya's Voice and Vision, Quarterly Mouthpiece of RSO, Arakan, Burma.

Islam, Narul. *The Rohingya Muslims of Arakan: Their Past and Present Political Problems,* papers of lectures, The south international conference of world Assembly of Muslim Youth, 22-27 January, 1986.

www.pathagar.com

Manifesto of ARIF, (Arakan: committee on press and information, 1992)

Manifesto of ARNO, (Arakan: ARNO, 1998).

Manifesto of the RPF (Arakan: International of publicity Depth,1978.)

Memorandum to the 18th Islamic Conference of Foreign Ministers in Riyadh, from ARIF, Arakan, Burma, 13 March, 1989.

News Letter (Bangali Version) RSO, Arakan, Burma.

Roshigyas Outcry and Demands, RPF, Arakan, Burma, 1976.

The call of Rohimegya : Quarterly Magazine of the RPF, Rohang (Arakan), Burma.

The News Letter (English version) RSO, Arakan, Burma.

The Rohingya problem (Arakan: ARNO, 1999).

Genocide in Burma Against The Muslim of Arakan, published by Rohingya Patriotic Front, Arakan, Burma.

Documentation, *Warld Press On Rohingya Muslim Refugees in Bangladesh,* 1978-79, compiled by N. Kama, Chittagong.

ইউনুছ, ডা. মুহাম্মদ। *অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস*। আরাকান ঃ আরএসও, ১৯৯০।

_______। *আরাকানের স্বাধীন ঐতিহ্য ও রোহিংগা মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রাম*। আরাকান : আরএসও, ১৯৮৯।

রোহিঙ্গার আর্তনাদ, আরএসও' এর মাসিক পরিক্রমা, আরএসও, আরাকান।

আরাকান সংবাদ, আরাকান, রোহিঙ্গা জাতীয় প্রতিষ্ঠান আরাকান।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক

THE ANCIENT CITIES OF ARAKAN

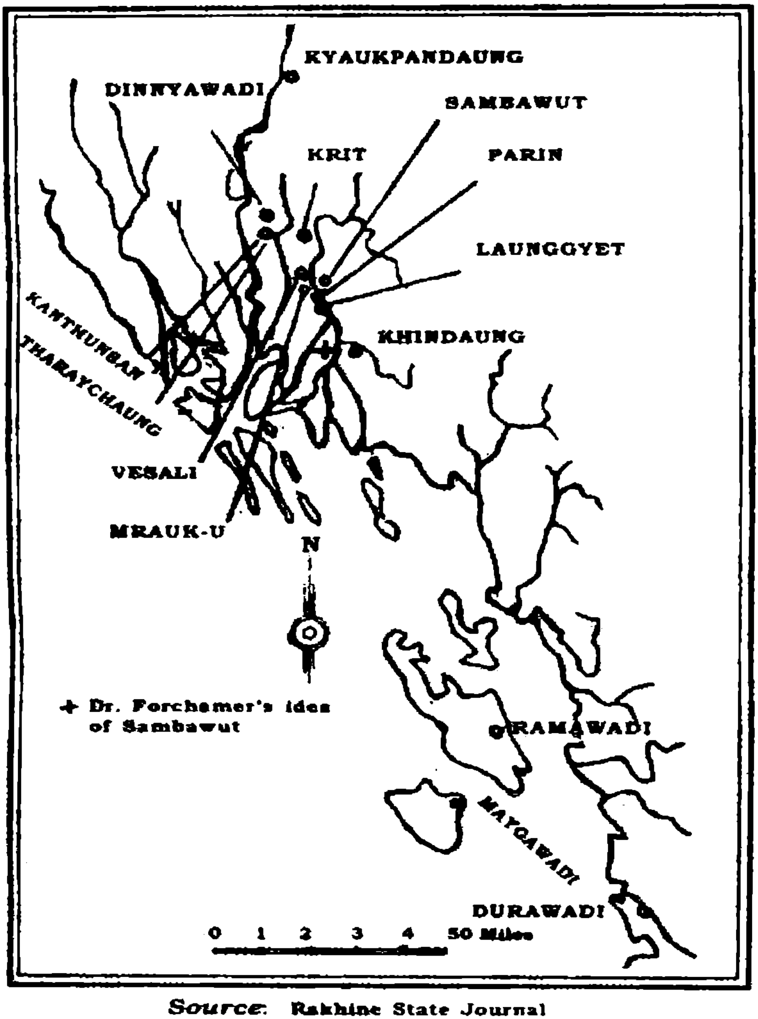

Source: Rakhine State Journal

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট খ

আরাকান এর মানচিত্র

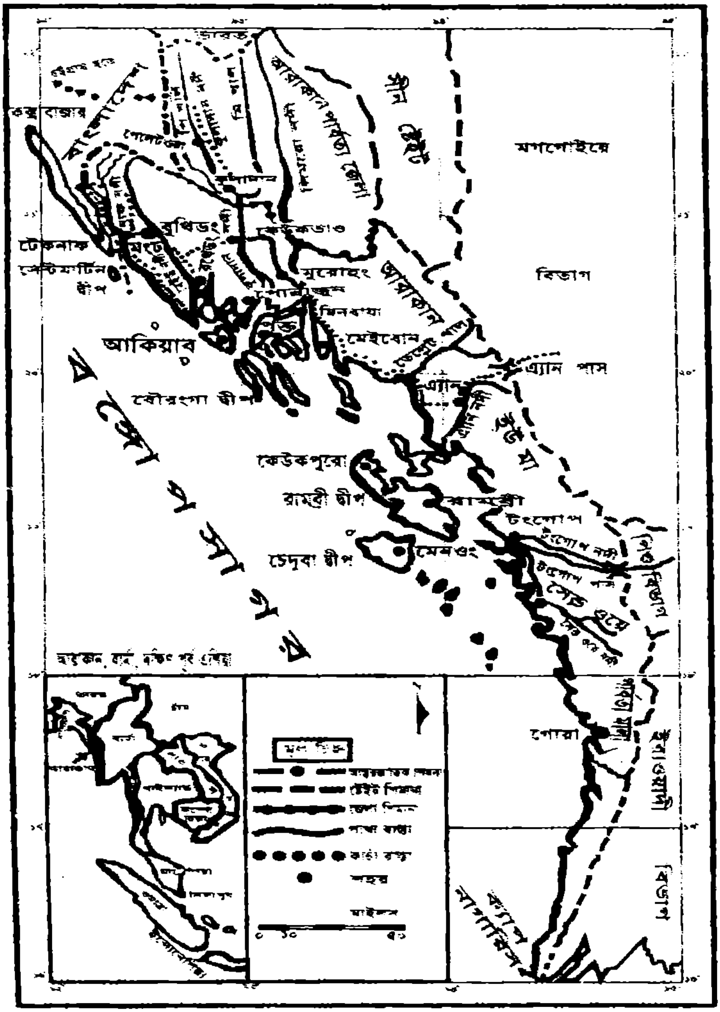

Source : John Bartholomew (ed.), *The Times Atlas of the World* (London : The Times Publishing Com. Ltd., Mid-Century Edition, 1985). p. 24.

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট গ

AGREED MINUTES SIGNED BETWEEN THE GOVERNMENT OF BURMA (MYANMAR) AND THE GOVERNMENT OF BANGLADESH ON REPATRIATION OF THE BURMESE REFUGEES, 1978.

The leaders of delegations, duly authorized by and on behalf of the Government of the Socialist Republic of the Union of Burma and the Government of the People's Republic of Bangladesh, following their talks held in Dhaka on 7th – 9th July 1978 have agreed as follows :

1. (a) The Government of the Socialist Republic of the Union of Burma agrees to the repatriation at the earliest of the lawful residents of Burma who are now sheltered in the camps in Bangladesh on the presentation of Burmese National Registration Cards along with the members of their families, such as, husband, wife, parents, parents-in-law, children, foster-children, grandchildren, son-in-law, daughter-in-law and widowed sisters;

2. (b) The Government of the Socialist Republic of the Union of Burma also agrees in the second phase to the repatriation at of the people who are able to present their documents issued in Burma with indication their residence in Burma, along with the members of their families, such as, husband, wife, parents, parents-in-law, children, foster-children, grandchildren, son-in-law, daughter-in-law and widowed sisters and also those persons and the members of their families, such as husband, wife, parents, parents-in-law, children, foster-children, grandchildren, son-in-law, daughter-in-law and widowed sisters, who will be able to furnish evidence of their residence in Burma, such as, address or any other particulars.

3. The residents of Burma mentioned in paragraph 1 above will be received on the border by the authorities of the Government of Burma in batches from the authorities of the Government of Bangladesh. The process of repatriation of such residents will commence not later than August 31, 1978, and is expected to be completed within six months from the date the first batch is received.

4. The two governments agree to appoint within the month of July 1978, their representatives who after scrutinizing the one inch and half-inch maps published by the Survey Department of India up to 1944 of the land section of the inherited Burma-Bangladesh international boundary, notifications and other relevant records and correspondences including the Surveyor-General of India Letter No. 6610-C dated 11th October 1944 to the Secretary to the Government of Burma, will submit to their respective government for approval of their recommendations on agreed international boundary description with a view to

www.pathagar.com

concluding a formal boundary agreement between the two countries. The demarcation work is to start at the earliest opportunity on that section of the land boundary immediately north of the Naaf River Section and leading towards the tri-junction of the Burma-Bangladesh-India border.

5. The two Governments also agree to pursue at the earliest the task of the repairing or replacing damaged or missing reference markers in the Naaf River Section of the inherited Burma-Bangladesh international boundary and of making necessary amendments in the Protocol signed in Rangoon on 28 April 1966 and of the maps attached there to, which Protocol forms an integral part of the agreement between the Governments of the Union of Burma and the Governments of the Islamic Republic of Pakistan on the Demarcation of a Fixed Boundary between the two countries in the Naaf River signed in Rawalpindi on 9 May 1966.

6. The two Governments agree to adopt Border Ground Rules for effective control of the international boundary. The agreed Border Ground Rules shall be made effective at the earliest after the demarcation of the southern portion of the land boundary.

7. After compaction of repatriation of all the aforesaid residents of Burma from Bangladesh, the two Governments will co-operate for the prevention of the illegal crossing of the border by prisons from either side. Both Governments agree to receive the repatriation of their residents who cross the boundary subsequent to the date when the Border Ground Ruled comes into force and who are found illegally in each other's country.

8. The two Governments agree to pursue further negotiations for the delimitation of the maritime boundary between Burma and Bangladesh.

Sd./-

TABARAK HUSSAIN

Foreign Secretary and Leader of the Delegation of the Government of the People's Republic of Bangladesh

Dhaka, 9th July 1978

Deputy Minister for Foreign Affairs and Leader of the Delegation of the Government of the Socialist Republic of the Union of Burma

Dhaka, 9th July 1978

Source : Abdur Razzaq and Mahfuzul Haque, *A Tale of Refugees : Rohingyas in Bangladesh*, pp.

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ঘ

JOINT STATEMENT BY THE FOREIGN MINISTERS OF BANGLADESH AND MYANMAR ISSUED AT THE CONCLUSION OF THE OFFICIAL VISIT OF THE MYANMAR FOREIGN MINISTER TO BANGLADESH FROM 23-28 APRIL, 1992.

1. At the invitation of his excellency Mr. A S M Mustafizur Rahman minister for Foreign Affairs of the Government of the people's Republic of Bangladesh, his excellency U Ohn Gyaw, Minister for Foreign Affairs of the Union of Myanmar paid an official visit to Bangladesh from 23-28 April 1992 at the head of a 14- member delegation which included the Minister for Information of the Union of Myanmar his excellency Brig. General Myo Thant as Alternate Leader.
2. During his stay the Myanmar Foreign Minister U Ohn Gyaw accompanied by Brig. General Myo That, Minister for Information called on his Excellency Mr. Adbur Rahman Biswas, President of the people's Republic of Bangladesh. The Myanmar Foreign Minister accompanied by Myanmar Information Minister called on her Excellency Begum Khaleda zia Prime Minister of Bangladesh. H.E. Brig. General Myo Thant Minister for Information called on Barrisrer Nazmul Huda, Minister for Information, and the Minister of State for Relief and Rehabilitation of Bangladesh Mr. Lutfr Rahman Khan also called on his Excellency U Ohn Gyaw. Mr Darioush Bayandor, Chief of Mission of UNHCR in Dhaka called on H.E.U. Ohn Gyaw, Minister for Foreign Minister of the Union of Myanmar.
3. Besides extensive tete-a-tete the two Foreign Ministers held two rounds of extensive talks, assisted by their respective delegation lists of which are annexed.
4. At the opening session of the official talks, his excellency the Foreign Minister of Bangladesh welcome his counterpart and expressed the hope that his long awaited visit would help in resolving the outstanding issues particularly the problem of Myanmar refugees not sheltered in Bangladesh. He briefly outlined the present situation of the Myanmar refugees now in Bangladesh and emphasized on four basic elements:

a) The exodus of people from Myanmar to Bangladesh to stop immediately;

b) Repatriation of the refugees to their original place of residence in honor, safety and dignity;

c) Undertaking of certain confidence building measures such as withdrawal/ cutback of troops from border areas/ forward position; and

www.pathagar.com

d) Lasting solution of the problem in the sense that there should be on recurrence of such or similar problems in future.

The Foreign Minister proposed the involvement of UNHCR to ensure the above. He mentioned that Bangladesh had all along had a peaceful border with Myanmar except on two occasions 1978-79 when there were influxes of refugees from Myanmar into Bangladesh.

The Foreign Minister reiterated that Bangladesh was committed to maintain the traditional friendly and good neighborly relations with Meaner and was hopeful that through amicable negations a peaceful and lasting solution of the problem will be achieved. The foreign Minister categorically mentioned that Bangladesh had on intention to interfere in the internal affairs of Myanmar. He added that Bangladesh and Myanmar were permanent neighbors which was of overriding consideration which was and it was in the interest of both the countries to remove the existing irritants through amicable negotiations. The Foreign Minister of Bangladesh then introduced the members of his delegation and handed over a draft agreement to counterpar for examination. He then invited Myanmar counterpart to put forward their proposals.

5. In reply, the leader of the Myanmar Delegation expressed his gratitude for the warm welcome accorded to him and his delegation by the Bangladesh side and stated that he had brought along the goodwill of the Myanmar leaders and the people to he leaders and the people of Bangladesh. The size and composition of the Myanmar Delegation is indicative of this positive attitude to amicably resolve the issue. Both sides were acquainted with each other and understood what was required to be done. He also confirmed that their exist positive elements on what both sides need to undertake. In conclusion, he stated that Myanmar looked beyond resolving the current issue and expressed his desire that both sides would co-operate more closely in the future.

6. The two Foreign Ministers decided to form a Working Group consisting of senior members of the delegations for detailed discussion on the question of safe and voluntary repatriation Myanmar refugees presently sheltered in Bangladesh and related issues and to resolve the problem on a permanent and lasting basis.

7. In the light of the above, both sides exchange views and agreed as follows:

   i. The two sides retreated their firm conviction to resolve their problems amicably and peacefully through bilateral negotiations on the basis of mutual understanding, accommodation, trust and goodwill and maintain peace and tranquility on their borders.

www.pathagar.com

ii. The two sides agreed in full faith to abide by the Five Principles of Peaceful Co-existence.

iii. The Government of the Union of Myanmar agreed to take all necessary measures that would half the outflow of Myanmar residents to Bangladesh and encourage those who had left Myanmar to return voluntary and safely to their homes.

iv. The Government of the Union of Myanmar in a spirit of co-operation agreed to accept after scrutiny all those people who took shelter in Bangladesh and whose presence had been recorded through Refugee Registration Cards issued by the Government of Bangladesh at their point of entry into Bangladesh and which inter-alia listed available evidence of their residence in Myanmar. On the basis of the scrutiny of the lists provided by the Government of Bangladesh, the Government of the Union of Myanmar agreed to repatriate in batches all persons inter-alia: carrying Myanmar citizenship Identity Cards / National Registration Cards: those able to present any other documents issued by relevant Myanmar authorities and: all those persons able to furnish evidence of their residence in Myanmar, such as addresses or any other relevant particulars. The Government of the Union of Myanmar agreed that there could be no restriction of number of persons so long as they could establish bonfire evidence of their residence in Myanmar. They further assured that the lists provided by Bangladesh closely coincided with those persons verified by the Myanmar authorities.

v. The two sides agreed that the residents of Myanmar identified in Para (iv) above would be received at the borders by the authorities of the Government of the Union of Myanmar in bathes from the authorities of the Government of the people's Republic of Bangladesh by a specific Mutual Agreement on physical arrangements for repatriation of Myanmar residents to be agreed upon at the technical level which would include inter-alia time schedules, transport and logistic arrangements, reception procedures, communication systems. Both sides agreed that the process of repatriation should commence within two or three weeks at a mutually agreed date and be completed within six moths from the date the first batch is received.

vi. Both sides agreed that repatriation should be safe and voluntary, that the Myanmar returnees should be settled in their own households and original places or residence to enable them to carry on their livelihood as members or Myanmar society. It was agreed that the Government of Bangladesh would fully associate the

www.pathagar.com

representatives of the UNHCR to assist them in the process of safe and voluntary repatriation. The Government of the Union of Myanmar agreed that the services of the UNHCR could be drawn upon as heeded at an appropriate time.

vii. Both sides recognize the role of UNHCR in various stages of repatriation process, facilitating the reduction of international concern in the context of voluntary and safe return of the Myanmar residents, the Myanmar side also assured that on-ground work programme will be drawn up in full consideration of this aspect after consultation with relevant authorities in Myanmar.

viii. The two Governments agreed to work for a comprehensive and permanent solution of the problem so as to prevent its recurrence in the future.

ix. After completion of the repatriation process from Bangladesh of the Myanmar residents, the two Governments agreed to co-operate for the prevention of illegal border crossings by persons from either side appropriate controls.

x. The two Governments agreed to take all necessary measures to enhance security and tranquility in their borders in full compliance with the Agreement on Border Arrangements and Cooperation (Border Ground Rules) signed by the two countries in 1980. In this context they agreed to take necessary confidence building measures. The two sides meetings between the sector commanders of their respective border security forces towards this end.

xi. Both Governments agreed that they would oppose any form of terrorism; insurgency or unfriendly acts such as smuggling, gun running or drug trafficking directed against their neighbors. They agreed that they would not harbor or support any terrorists or criminals involved in such activities. They also agreed that their respective law enforcing agencies would closely cooperate together to prevent such acts.

xii. The land boundary North of the Naaf River Sector of the common boundary had been successfully demarcated jointly by the two Governments in accordance with the Agreement between the Government of the Socialist Republic of the Union of Myanmar and the Government of the people's Republic of Bangladesh on the Demarcation of the Land Section of the Boundary North of the Naaf River signed at Dhaka on 23 May 1979, pursuant to article III of the said agreement, Myanmar side drafted the text of the boundary treaty which was transmitted to the Bangladesh side on 10

www.pathagar.com

June,1991. The two Governments hereby agree that the Boundary Treaty should be signed at the earliest possible opportunity.

8. The meeting was conducted in a friendly and cordial atmosphere reflecting the traditional friendship existing between Myanmar and Bangladesh. Both sides expressed their appreciation on the positive outcome of the discussions.
9. The leader of the Myanmar Delegation expressed his deep appreciation for the warm hospitality extended to his Delegation by the Government of the people's Republic of Bangladesh during its stay in Dhaka.

Sd./-	Sd./-
A.S.M. Mostafizur Rahman	Ohn Gyaw
Minister for Foreign Affairs	Minister for Foreign Affairs
Leader of Bangladesh Delegation	Leader of Myanmar Delegation
Dhaka, 28th April, 1992	

Source : *Ministry of Foreign Affairs*, Repatriation Agreement, File No. 130.

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ঙ

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH AND THE OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES

The Government of the people's Republic of Bangladesh (hereinafter referred to as the GOB), and the office of the United Nations commissioner for Refugees (hereinafter referred to as the UNHCR):

- Recalling the problems created by refugees and displaced persons coming from the Union of Myanmar.
- Recalling the request of the GOB dated 13 February 1992 for humanitarian assistance to the Secretary General of the United Nations and the United Nations High Commissioner for Refugees.
- Noting that the Secretary General of the United Nations requested the UNHCR to co-ordinate assistance from the international community to Myanmar Refugees in Bangladesh.
- Recalling further the response dated 14^{th} of February 1992 by the High Commissioner in which she agreed to assist GOB within the framework of the UNHCR mandate.
- Mindful of the generous hospitality continued assistance and security provided by the GOB and the people of Bangladesh to the Myanmar refugees in the light of cumulative political, economic, social pressure and environmental degradation faced by them in hosting quarter millon refugees.
- Bearing in mind the fact that the High Commissioner shall provide for the protection of refugees falling under the competence of her office by promoting through special agreements with the GOB the execution of any measure calculated to improve the situation of refugees and to reduce the numbers requiring protection and assisting governmental and private offers to promote voluntary repatriation or resettlement in third countries.
- Recalling the GOB's commitment to the principle of voluntary repatriation and UNHCR's involvement in the repatriation process on both Myanmar and Bangladesh for the safe return of refugees to Myanmar.
- Recalling further UNHCR's commitment to deploying every effort to ensure necessary funds for care, maintenance and voluntary repatriation of Myanmar refugees in Bangladesh.

www.pathagar.com

- Considering that the work of the UNHCR is entirely nonpolitical and only humanitarian and social and shall relate, as a rule, to groups and categories of refugees.
- Noting that the Understanding of the 8th October 1992 reached after prolonged negotiation between the GOB and the UNHCR provides a viable framework for progressive cooperation on repatriation of Myanmar refugees in Bangladesh.
- Recalling the exchange of letters of 11,12,21 January 1993 between the prime Minister of the peoples Republic of Bangladesh and the Minster for Foreign Affairs, Government of the Peoples Republic of Bangladesh and the United Nations High Commissioner for Refugees.
- Considering further, UNHCR's willingness to provide technical assistance and financial support to the communities where the influx of refugees have caused negative impact on environment and other infrastructures and that this would be through appropriate agreements with the Ministry of Relief and the Economic Relations Division of the Government of Bangladesh.
- Resolving to co-operate in the promotion of voluntary repatriation of Myanmar refugees from Bangladesh to Myanmar.

Have agreed on the following provisions:

1. Safe and Voluntary Repatriation

a. The two sides shall co-operate with each other to ensure safe and voluntary repatriation of Myanmar refuges who opt to return under existing conditions. GOB will allow free access to officials of the UNHCR and independently interview refugees in transit camps (so designated by GOB where refugees volunteering to return will be located) to determine the voluntary character of their decision to return.

b. The procedures to be followed by the UNHCR officials in this respect for conducting independent interviews with prospective returnees for certifying the voluntary nature of the repatriation are described at Annexure-1 of this MOU.

c. The UNHCR shall assist the GOB in smooth repatriation of refugees who opt to return on the basis of their (refugees) own judgment of the situation in their country. The Two sides shall co-operate and use their best endeavors to ensure that there would be no residual problems in Bangladesh.

d. The two sides have hared to further expand the cooperative framework established through the Understanding reached

www.pathagar.com

between the Government of Bangladesh and the UNHCR on 8th October 1992.

2. Freedom of Option :

The two sides shall cooperate with each other to prevent any attempt by any side to interfere with the exercise of freedom of option by the refugees.

3. Information Session :

The GOB will arrange holding of periodic information session in various camps in association with UNHCR in order to raise the level of awareness of the refugees of their options and responsibilities to the host country and to other fellow refugees. Both sides shall explain following:

a. The temporary nature of the refugees' presence in Bangladesh will be stressed. They will also be told that they were accepted on humanitarian ground and given temporary shelters until their repatriation can be arranged.

b. The refugees must abide by the law of Bangladesh and regulations of the camp. They should not get involved in any criminal activity including violence rioting possession of arms, ammunition etc. prejudicial to the public order and national security of the host country.

c. A refugee waiting to return to Myanmar can do so at any time, and none can prevent him from exercising this right. No refugee, likewise, will be forced or coerced to leave Bangladesh, and

d. That UNHCR will assist those refugees who would like to return voluntarily to their country of origin.

4. Security Responsibility :

a. The GOB shall retain the responsibility for safety and security for the Myanmar refugees in the camps and outside. The GOB shall not allow armed elements in the camps nor possession of arms, ammunition and explosive devices by any among the refugees without proper permission of the competent authority of Bangladesh and will take appropriate measures to ensure this.

b. In order to avoid situation which may lead to friction with local communities and to avoid the broad based dispersal of refugees to other parts of the country, the refugees shall be expected to reside within the camps and abide by the regulations of GOB in this respect.

c. Persons arrested or detained under the laws of the land from the camps can avail legal assistance provided by UNHCR or shall be released in accordance with relevant procedure.

www.pathagar.com

d. The camp officials of the GOB may seek cooperation of UNHCR officials to defuse situations that are likely to degenerate into violence in camps of circumstances permit them to do so.

e. While handling any problem relating to law and order in the camps, maximum restraint should be exercised by concerned officials. To this effect, UNHCR would facilitate provision of equipollents required for this purpose.

f. The GOB assures that no refugee will be coerced into leaving against his/her will. Any allegation in this respect that is brought to the attention of GOB at the local level and at the capital will be promptly investigated and remedial action taken where appropriate.

5. Access to Camps :

In order to enable UNHCR to discharge its responsibilities including identification of those volunteering to return to return to Myanmar, GOB authorizes UNHCR to have free access to all refugee camps from 10 a.m. to 5 p.m. on all days and during other time on need basis UNHCR will provide a list of UNHCR personnel both international and local for whom special passes will be issued for this purpose.

6. UNHCR Assistance to Returnees :

a. UNHCR shall undertake promotional activities to motivate the refugees to return home once intentional pressure for observing reasonable conditional for safety for the returnee is established in Myanmar in line with the Agreement of 28th April 1992 between the GOB and Myanmar. The GOB as a part of international community will work for having such a prides as soon a presence.

b. UNHCR will provide repatriation assistance, the composition of which shall be agreed upon between the two sides as soon as possible.

c. The two sides agree that relief efforts designed to meet minimum needs of refugees in all relevant sectors including in transit centers, shall be pursued. To this effect, a project agreement shall be signed between the concerned Ministries of GOB and UNHCR.

7. Orientation Session for UNHCR and GOB Officials :

Both sides agreed to organize orientation sessions and training workshops for camp officials of the GOB and local officials of UNHCR and NGOs with a view to familiarize themselves with the objectives, functions and responsible of each side. It may be noted that Bangladesh being the host country to the refugees GOB is primarily responsible for the welfare, security and repatriation of the refugees and the UNHCR is here to assist

www.pathagar.com

GOB for these purposes and for discharging its international protection mandate.

Emphasis should be on evolving a code of conduct based on mutual respect and observing sensitivity of the country and its people.

8. Revision of the MOU :

Both sides agree to keep the matter of progressive development of the MOU under constant review particularly the subject of access based on their experience of implementation of the existing provisions of this MOU for a reasonable period.

9. Settlement of Difference :

(a) Both sides agree that any difference in interpretation and or implementation of this MOU shall be resolved amicable and expeditiously through consultation.

(b) In the event of failure to resolve differences, as per provision of 9(a) above, both sides reserve the right to withdraw from the Agreement by giving 30 days notice in writing.

(c) Both sides agree not to make any public statement on any matter related to t he MOU and prejudicial to their relations.

10. Entry into Force:

This Memorandum of Understanding shall enter into force from the date of signature by the two sides and shall remain in force for one year from that date. It shall be renewed automatically for another year unless either side give notice to the contrary.

In witness whereof, the authorized representatives of the GOB, and the UNHCR do hereby sign this Memorandum of Understanding.

Done at Dhaka in 1993 in duplicate in the English language,

For the Government of the People's Republic of Bangladesh

For the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

Source : *Ministry of Foreign Affairs*, Repatriation Agreement, File No. 130.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

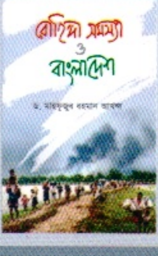

ROHINGYA SOMOSSA
O BANGLADESH
by Dr. Mahfuzur Rahman Akhanda
Cover design : Hamidul Islam
Publisher : Parilekh
Price : Tk. 450.00

পরিলেখ

ISBN 978-984-93438-4-4